পাগল হরনাথ

কার্তিকচন্দ্র রায়

শতাব্দী গ্রন্থভবন
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

পাগল হরনাথ

ভূমিকা

যথাসম্ভব কালানুক্রমিক ও বস্তুগতভাবে বর্ণনা এবং আলোচনা প্রসঙ্গে পাগল হরনাথের জীবন ও কর্মের পটভূমিকায় তাঁহার উপদেশাবলীর আলোচনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে যে সব অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থে কাজে লাগাইয়াছি। তবে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ও নিরপেক্ষদৃষ্টির পরিচয় ইহাতে নাই। পাগল হরনাথের অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক ঘটনাবলীর বিবরণ দান এবং তাঁহার উপদেশাবলীর আলোচনা অধিকাংশ গ্রন্থেই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং, পাগল হরনাথের কালানুক্রমিক জীবনী এবং তাঁহার উপদেশাবলীর নিরপেক্ষ আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নাই বলিলে অন্যায় হইবে না।

বর্তমান আলোচনায় যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং বস্তুগতভাবে পাগল হরনাথের জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার সন, তারিখ যথাসম্ভব নির্ভুল দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য জন্মভূমির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পটভূমিকা, জাতকের বংশ-পরিচয়, গৃহপরিবেশের প্রভাব প্রভৃতি যথাসম্ভব আলোচনা করা হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনাবলীও প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ইহার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু নূতন তথ্যের সংযোজন এবং প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে উপদেশাবলীর আলোচনা যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের পটভূমিকায় ঠাকুর হরনাথের উপদেশাবলীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী ধর্মাচার্য—শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ; বিজয়কৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির সহিত পাগল হরনাথের তুলনামূলক আলোচনা করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। হরনাথ ঠাকুরের উপদেশাবলী আলোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর নিরপেক্ষতা যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পাগল হরনাথের জীবন ও বাণী সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গ্রন্থ আমার পূর্ববর্তী কালে রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, হরনাথ-ভক্তদের নিকট তাহাদের প্রতিকটি দুর্লভ সংগ্রহরূপে গণ্য হইয়াছে। বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান তথ্য বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। হরনাথের কতিপয়

অপ্রকাশিত পত্র এবং জীবনী-বিষয়ক দুইটি পাণ্ডুলিপি হইতেও বহু উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। দুর্লভ এবং বিলুপ্তির পথে অগ্রসর এই সমস্ত পত্র ও পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত উপাদানসমূহ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করায় বর্তমান গ্রন্থের আয়তন কিয়ৎ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের হরনাথ মিশন, সোসাইটি প্রভৃতির সম্পাদকবৃন্দ, প্রাচীন ভক্ত এবং হরনাথের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হইতেও বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ইহাদের সকলের নামোল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের নিকট মার্জনা চাহিতেছি।

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের প্রেরণা এবং উৎসাহ না পাইলে এই দুরূহ কার্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইত না। তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আমি যে মূল্যবান উপদেশ, নির্দেশ এবং অকুণ্ঠ সাহায্যই আমার এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের একমাত্র উপাদান। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমি তাঁহাকে প্রণাম জানাইতেছি। ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পাগল হরনাথ একটি বহুজন-বন্দিত নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত এই মহাপুরুষের পুণ্যনাম আজ শতসহস্র নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত*। হরনাথ-কুসুমকুমারীর পুণ্যনাম তদীয় জন্মভূমি বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তে উচ্চারিত হইতেছে। সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও কুসুম-হরনাম নাম একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার মানসে, রোগমুক্তির জন্য, বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি-কামনায়, মানসিক শান্তি বা আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের মানুষের মতো পৃথিবীর অপরাপর দেশের নরনারীও কুসুম-হরনাথের চরণে শরণ লইয়াছে এবং পরম ভক্তিভরে কুসুম-হরনাথ নাম স্মরণ করিতেছে।

যাঁহার চরণ-তলে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিত্য ভক্তিপ্রণতঃ হইতেছে, সেই হরনাথের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন একজন গৃহস্থ ব্যক্তি। যে সমস্ত গৃহস্থ মাথার উপরে একজন করুণাময় অথচ সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া স্বীয় সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন, হরনাথ এবং তদীয় সহধর্মিণীকে দেখিলে কোনক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইত না। বেশে, বাসে, আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় তাঁহাকে নিতান্ত পরিচিত গোষ্ঠীর একজন বলিয়াই মনে হইত। বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে তাঁহাকে সাধক অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ মনে হওয়াই বেশী স্বাভাবিক ছিল।

সাধকের প্রধান বাহ্যিক লক্ষণ যে গৈরিক পরিচ্ছদ—হরনাথের অঙ্গে তাহা দেখা যাইত না। বেশবিন্যাসে তিনি সাধারণ মানুষের ব্যতিক্রম ছিলেন না। কখনও কোট-প্যাণ্ট, কখনও ধুতি-পাঞ্জাবি—এই ছিল তাঁহার প্রিয় পরিচ্ছদ। তাঁহাকে দেখিয়া 'বাবু' মনে না করার কোন কারণ ছিল না। আহার-বিহারেও গার্হস্থ্য জীবনের

* Souvenir on the Hundredth Birthday Celebration of Pagal Thakur Sree Sree Haranath : Published by Haranath Anath Ashram : Swargadwar : Puri (Page 18)

কোন ব্যতিক্রম তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। "অসময়ের চাঁপানটে শাক, কুমড়ার ছক্কা, সেমুই-এর পায়স প্রভৃতি ছিল তাঁহার প্রিয় খাদ্য।[১] চা, বিড়ি-সিগারেটে তিনি বেশ ভালভাবেই অভ্যস্ত ছিলেন। জরিপাড় ধুতি পরা, পাঞ্জাবি গায়ে অথবা কোট-প্যাণ্ট পরা, মুখে সিগারেটধারী হরনাথকে সুস্থমস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি সাধক বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। বরং সাধু দেখিতে আসিয়া বাবুবেশী হরনাথকে দেখিয়া দাড়ি-গোঁফের বাহুল্য ও বাহার সত্ত্বেও অনেকে বিরক্ত হইতেন।[২] তাঁহাকে সাধু বলিয়া চিনিতে পারি নাই। তাঁহার পরণে ভাল কাপড়, ভাল জামা এবং তাঁহার স্ত্রীর পরণে খুব চওড়া পাড় শাড়ী, হাতে দুই তিন সেট চুড়ী—তাঁহাকে গৃহস্থ বলিয়াই মনে হইল।"[৩]

হরনাথের একজন বিশিষ্ট ভক্তের এই অকৃত্রিম স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে যে, সাধকের বাহ্যিক লক্ষণসমূহ হরনাথে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাই তাঁহার চেহারা দেখিলে ভক্তির উদয় হইত না। "পরিধানে ময়লা কোট প্যাণ্টালুন, মাথায় একটা কদর্য টুপি এবং দাড়ির বাহারও তদনুরূপ।[৪] প্রথমে দেহের রং-ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। পরে অবশ্য উহা পরিবর্তিত হইয়া তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ হয়।[৫] তাহা সত্ত্বেও নরনারীকে আকৃষ্ট করিবার মত কোন বিশেষত্ব তাঁহার চেহারায় ছিল না।"[৬]

১। হরনাথ-স্মৃতি: ষষ্ঠ লহরী, পৃষ্ঠা ৪৯

২। নারায়ণচন্দ্র ঘোষের এরূপ বিরক্তিবোধ হইয়াছিল। সিগারেট সেবনরত ঠাকুরকে দেখিয়া, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মনে মনে সমালোচনা করিয়াছিলেন "হা হরি, শেষকালে এক বিড়ি সিগারেট খাওয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম।" দ্রঃ আমার অভিজ্ঞতা: প্রথম খণ্ড—শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৭

৩। হরনাথ-স্মৃতি: ষষ্ঠ লহরী, পৃষ্ঠা ৪০—ভবানীচরণ বসু, কলিকাতা।

৪। অটলবিহারী নন্দীর উক্তি। দ্রঃ হরনাথ-চরিতামৃত: শ্রীসত্যচরণ সেন, পৃষ্ঠা ৮৬

৫। অটলবিহারী নন্দী—পাগল হরনাথ: ১ম খণ্ড (হরনাথের জীবনী)।

৬। গৌরাঙ্গদেবের অমন সুন্দর ভুবনমোহন রূপ ছিল, তাহা দেখিলেই লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। সে তুলনায় তোমার রূপ কি আছে, তোমার কোমরে দাদ, গাল দুইটি তোবড়ান—লম্বা দাড়ি, মাথায় টাক্—এই তো চেহারা। হরনাথ-স্মৃতি: একাদশ লহরী: ১৩৪৩ সাল, পৃষ্ঠা ১৮। লেখক শিশিরকুমার ঘোষাল, ভবানীপুর, কলিকাতা।

তবুও লোকে পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট অলির ন্যায় ছুটিয়া আসিত হরনাথেরই পাদপদ্মে। তাঁহার মুখের একটি বাণী শুনিবার জন্য দূর-দূরান্তর হইতে শত শত নরনারী আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিত। তাঁহার হাতের লেখা একখানি চিঠির জন্য লোকে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিত। তাঁহার তিরোভাবের পর বহুকাল গত হইয়াছে। অদ্যাপি নরনারীর আগ্রহ হরনাথের প্রতি বিন্দুমাত্রও কমে নাই। বরং নয়নসম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া হরনাথ নয়নের মাঝখানে ঠাঁই লইয়াছেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত ভক্তির স্রোতধারা দিনের পর দিন বর্ধিত হইতেছে।

শুধু কুসুম-হরনাথ নাম শুনিয়া আজ বহু নরনারী হরনাথ-সম্প্রদায়ে নূতন করিয়া যোগদান করিতেছে। তাই, আজ হরনাথ সম্বন্ধীয় নিত্যনূতন পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় হইতেছে। কুসুম-হরনাথের প্রতিকৃতি ও লকেটের চাহিদা অবিশ্বাস্য পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিত্যনূতন মন্দির, আশ্রম ও আলোচনা-চক্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তগণ নবতর উৎসাহে কুসুম-হরনাথ-স্মৃতি-পূজায় আত্মনিয়োগ করিতেছে। আজও তাই হরনাথের জন্মোৎসবে, কুসুম-কুমারীর জন্মোৎসবে এবং আনন্দমিলন উৎসবে দূর-দূরান্তর হইতে অগণিত নরনারীর সমাগম হয় এবং তাহারা সকলে ভক্তিপ্লুত অন্তরে হরনাথের স্মৃতি-চারণ করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হয়। অপ্রকট হওয়ার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও কুসুম-হরনাথের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর এই অনাবিল শ্রদ্ধা-নিবেদন ও আনুগত্য-জ্ঞাপনের মধ্যেই কুসুম-হরনাথের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, তথাকথিত সাধু বা ধর্মগুরুর কোনরূপ বাহ্যিক লক্ষণ হরনাথ বা তদীয় সহধর্মিণী কুসুমকুমারীর ছিল না। তাঁহারা আদর্শ গৃহস্থের জীবন যাপন করিতেন। গৃহী হিসাবে কোনও ত্রুটি তাঁহাদের কাহারও মধ্যে ছিল না। কিন্তু গৃহী হিসাবে তাঁহার আদর্শ যত উচ্চস্তরের হউক না কেন, কেবলমাত্র এই আদর্শে দীক্ষিত বা উদ্‌বুদ্ধ হইবার জন্য লোকে নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট আসিত না। আর বাঙ্গালী গৃহস্থের আদর্শ অবাঙ্গালী বা অন্যান্য প্রদেশবাসী বা

সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আদর্শরূপে প্রতিভাত না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং হরনাথের সুদূর-প্রসারী জনপ্রিয়তার মূলে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শের প্রভাব কিছু থাকিলেও, ইহাই সমস্ত নয়। বরং অন্যান্য অবদানগুলির তুলনায় ইহা পরিমাণে অতি নগণ্য।

হরনাথ যে বহুজন-চিত্তজয়ী, তাঁহার তিরোভাবের পর সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর পরেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।* সে প্রমাণ এমনই প্রত্যক্ষ যে, সময় সময় সন্দেহ জাগে, হরনাথের তিরোভাব বুঝি সত্যই হয় নাই। এই সন্দেহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার মানুষও হরনাথ-সম্প্রদায়ে দুর্লভ নয়। অধিকাংশ নরনারীই বিশ্বাস করেন যে, লুকোচুরি খেলায় অভ্যস্ত ঠাকুর আজও তাঁহাদের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদের আকুলতা ও আগ্রহ দেখিতেছেন, আবার প্রয়োজনবোধ করিলে মানস-নয়নে আবির্ভূত হইতেছেন।[১] তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস চৈতন্যভাগবতের সেই সুপ্রসিদ্ধ উক্তিটির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় :—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
ভাগ্যবান কেহ কেহ দেখিবারে পায়॥

এই জাতীয় ঘটনাবলীর সত্যাসত্য বিচারের সুযোগ নাই। কিন্তু সংখ্যায় এগুলি এত বেশী এবং প্রত্যেকটি ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস এত দৃঢ় যে, প্রামাণিকতা বিচার না

---

* "Years have rolled after his disappearence, yet his thought is as fresh, his presence is felt and he is a family member in many families all over India and abroad". *Man or Superman* : B. R. Mody (Published in the Souvenir on the Hundredth Birthday Celebration of Pagal Thakur Sree Sree Haranath : Haranath Anath Ashran : Swargadwar : Puri (Page 7)

১। "Though Sree Haranath seemingly disappeared, yet thousands of devotees in India and elsewhere are daily seeing Him and getting His blessings and protection". Sree Haranath Centenary Celebrations : 1965 : Madras-5 (Page 17)

করিয়াও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভক্ত-সমাজে হরনাথের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

এই অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিবার পূর্বে দেখা যাউক, ভক্তদের নিকট হরনাথের প্রকাশ কতরূপে এবং কতভাবে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ জনসমাজে হরনাথের প্রচারের পূর্বে কেহ হরনাথ সম্বন্ধে কোনরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। সুতরাং, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালে যাঁহারা হরনাথের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার প্রকাশ কিরূপভাবে হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া অসম্ভব। হরনাথ যখন জনসমাজে প্রচারিত হইলেন, তখন অবশ্য তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দুই-একজন সহচর তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব-স্মৃতি-চারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বিবরণী নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং, এই সময়কার ইতিহাসের জন্য নির্ভর করিতে হয়—হরনাথের নিজের, কুসুমকুমারীর এবং হরনাথ-জননী ভগবতী দেবীর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণ ও ভগিনী কমলার উপর। ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব পত্রাবলীতে বিচিত্রভাবে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। বাকি সকলের নিকট হইতে মুখে শুনিয়া অবগত হইয়া একজন উৎসাহী ভক্ত[১] যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে হরনাথের বাল্য, কৈশোর এবং যৌবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুর একই সময়ে বহুজনের নিকট উপস্থিত হইতেন বলিয়া ভক্ত-সমাজে যে প্রচলিত ধারণা আছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের যে-কোন একটি দিনেরও পরিপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তাঁহার জীবনের এইরূপ কয়েকটি ঘটনা ভক্তগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলি সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি সূক্ষ্মদেহে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারিতেন।

১। ভাগবত মিত্র-রচিত "অমিয় হরনাথ লীলাকথা"—১ম ও ২য় খণ্ডে—হরনাথের জীবনের অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সমস্তগুলি ভ্রম-প্রমাদশূন্য নয়।

ভারতীয় সাধককুলের জীবন-কাহিনী পর্যালোচনা করিলে এই জাতীয় স্বেচ্ছাভ্রমণের (omnipresence) ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।* সেই হিসাবে হরনাথের এই জাতীয় ক্ষমতার কথা অস্বীকার করা যায় না এবং তাহা হইলে তাঁহার রূপ-বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য ব্যাপার।[১] এ সম্বন্ধে বোম্বাই-বাসী একজন ভক্ত পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন "I have failed and failed miserably."[২] অতিশয় অন্তরঙ্গ ভক্তের এই ব্যর্থতা দেখিয়া মনে হয়, অপর যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে হরনাথের পরিপূর্ণ চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। এ-বিষয়ে হরনাথ নিজেই বলিয়াছেন, 'পাগল হরনাথের জীবনী ছোট নয়, সে অনেক দিনের—অনেক কালের।[৩] সুতরাং পাগল হরনাথের জীবনী লেখা প্রচুর সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সমুদ্রের ন্যায় বিশাল তাঁহার জীবনের ইতিহাসের প্রতিটি মুহূর্ত সহস্র তরঙ্গসমাকুল। সেই প্রতিটি তরঙ্গের হিসাব করা ঐতিহাসিকের সাধ্যায়ত্ত নয়। যে সমস্ত তরঙ্গকুল জীবনের বালুকা-বেলায় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সেইগুলির উপর নির্ভর করিয়াই ঐতিহাসিককে অগ্রসর হইতে হইবে।

পাগল হরনাথের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা কালসাগরের তীরে দাগ রাখিয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মুখ্যতঃ আট ভাগে ভাগ করা যায়।

১। বিস্ময়কর আরোগ্যদান; ২। বিপদ হইতে ত্রাণ; ৩। সুখ-সমৃদ্ধি ও মানসিক শান্তি দান; ৪। পুনর্জ্জীবন দান; ৫। বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে উপস্থিতি; ৬। পূর্বাহ্ণে সতর্কী-করণ; ৭। নিবেদিত ভোজ্য গ্রহণ; ৮। অন্ধের চক্ষুদান।

এই সমস্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় হরনাথ-সম্প্রদায়ের অনেকেই পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক

* দ্রঃ ভারতের সাধক: ১ম খণ্ড

১। হরনাথ-স্মৃতি: ষষ্ঠ লহরী, পৃষ্ঠা ২৭

২। আমার অভিজ্ঞতা: ৩য় খণ্ড—পৃষ্ঠা ৮৬

৩। একান্ত আপন: পৃষ্ঠা ২১

ভক্ত প্রথমতঃ এই কারণেই হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।[১]

তাপদগ্ধ এই পৃথিবী, দুঃখে ভরা মানুষের জীবন। জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে—ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি ধ্রুব সত্য এই সংসারের প্রত্যেকটি নরনারীকেই জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিতে হইবে, সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইবে। আপদ, বিপদ, রোগ, শোক, অশান্তি, অকালমৃত্যু প্রভৃতি প্রত্যেকটি মানব-জীবনের নিত্যসহচর। মানুষ দুর্বল, সীমিত তাহার শক্তি, সংসারের প্রতিকূল স্রোতে তাই তাহার জীর্ণ জীবনতরণী সর্বদাই টলটলায়মান। কাণ্ডারী আসিয়া হাল ধরিয়া বিপদের ঢেউ পার করিয়া না দিলে তরণীর নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী। রোগে, শোকে, নৈরাশ্যে, বিফলতায় মানুষ যে অমিত এক অদৃশ্য অস্তিত্বের পরিচয় পায়, তাহার তুলনায় আপনার শক্তির তুচ্ছতা সে মর্মে মর্মে অনুভব করে। তাই তাহার নিত্য প্রার্থনা—শক্তি দাও, শান্তি দাও, 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।' এই প্রার্থনা, এই কামনা যিনি পূরণ করিতে পারেন, মানুষ যে তাঁহারই পদতলে লুটাইয়া পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস এই যে, হরনাথ দুঃখে জর্জরিত নরনারীকে দিয়াছেন সুখের আশা, অশান্তিতে ভরা জীবনে আনিয়াছেন শান্তির স্নিগ্ধতা, রোগীকে করিয়াছেন রোগমুক্ত, শোকে দান করিয়াছেন সান্ত্বনা, দিয়াছেন ধন, দিয়াছেন সম্মান। সুতরাং স্বাভাবিক-ভাবেই মনে হইতে পারে, তাঁহার দ্বারে ভক্তজনের আনাগোনা সুরু হয় প্রধানতঃ এই সমস্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়াই।

কিন্তু এই কারণেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিলে, জনপ্রিয়তার স্থায়িত্ব খুব বেশী দিন হইত না, প্রকৃত ভক্তের শ্রদ্ধাও ইহাতে আকৃষ্ট হইত না এবং তাহার প্রভাব হরনাথের জীবনকাল পর্যন্ত থাকিলেও, তিরোভাবের পর সেই প্রভাব লুপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হর-

১। হরনাথ সম্বন্ধে রচিত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই এই সমস্ত অলৌকিক লীলার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ইহাদের কয়েকটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নাথের তিরোভাবের পরেও তাহা হইলে ভক্ত নরনারীর ক্রম-বর্ধমান সংখ্যায় হরনাথের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। অথচ প্রকৃত ঘটনা এই যে, হরনাথের দেহরক্ষার পরেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীগণ ব্যাপকভাবে ঠাকুরের অনুরক্ত হইতে আরম্ভ করে।* অলৌকিক শক্তিসমূহই যদি তাঁহার জনপ্রিয়তার উৎস হইত, তাহা হইলে তাঁহার তিরোধানের পর উহা শেষ হইয়া যাইত।

প্রকৃত ভক্তসম্প্রদায়ও তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিত। সুতরাং হরনাথের জনপ্রিয়তার মূল কারণ তাঁহার অলৌকিক শক্তি নয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।†

অবশ্য তিনি বিস্ময়কর অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, এই শক্তির বলে তিনি অসাধ্য সাধনও করিয়াছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। কিন্তু এই শক্তির প্রদর্শনী বসাইয়া তিনি কদাপি তাঁহার ভক্তবৃন্দের অন্তরে ভয় বা বিস্ময় জাগাইতে চেষ্টা করেন নাই। হরনাথ সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তবৃন্দের অভিজ্ঞতার বিবরণসমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক ভক্তই তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। বয়স ও প্রকৃতি অনুসারে এই ভালবাসার অভিব্যক্তি ছিল বিভিন্ন। বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহাকে পুত্রের মতো বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো দেখিতেন। সমবয়স্ক ভক্তের নিকট তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো, আর বয়ঃকনিষ্ঠগণের নিকট তিনি স্নেহময় পিতা, পিতৃব্য অথবা জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো প্রতীয়মান হইতেন।[১] অহেতুক করুণা এবং মানবিক স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল তাঁহার অন্তর। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ-

---

* Sree Haranath Centenary Celebrations : 1965 : P. 1

† তুলনীয় : রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের মন্তব্য : কিন্তু ঠাকুরকে যদি আমি দেখিতে পাই, এরিওপ্ল্যানের মত ভোঁ ভোঁ করিয়া তিনি শূন্যমার্গে চলিয়া যাইতেছেন, তাহাতে যে আমার শ্রদ্ধা বেশী বাড়িবে, আমার পক্ষে অন্ততঃ আমি তাহা মনে করি না। আমার কাছে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার যাদুকরী হইতে তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমের যাদুকরী বেশী মূল্য বহন করে। দ্রঃ হরনাথ চরিতামৃত : সত্যচরণ সেন—ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৵০

১। পাগল হরনাথ : ১ম খণ্ড—পৃষ্ঠা ৫৯

নির্বিশেষে তাঁহার অপার করুণা বর্ষিত হইত। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল সহাস্য বদন, নির্মল কৌতুক-রহস্যভরা কথাবার্তায় সকলেই অপার আনন্দ লাভ করিত। অলৌকিক ঐশ্বর্য তাঁহার সম্বল মাত্র হইলে শিশুর মতো সারল্য হরনাথে দুর্লভ হইত। ভক্ত সাধারণও তাঁহাকে নিকট-আত্মীয় জ্ঞান করিতে সঙ্কুচিত হইত। ঐশ্বর্যশালী এবং শক্তিশালীর সহিত আত্মীয়তার সম্বন্ধ কখনও সহজ হইতে পারে না। ঐশ্বর্য ও শক্তির কথা স্মরণ করিয়া সকলেই একটা দূরত্বের ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলে।

সম্প্রদায়ের সকলেরই নিকট হরনাথ ছিলেন নিতান্ত আপনজন। তাঁহার নিকট সকলেরই ছিল সমান অধিকার। "ঠাকুরের ইজারা করা সহাস্য বদন" দর্শনে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনে এই বোধ জাগিত যে, তিনি তাহাদের একান্ত আপনজন। শিশুর সরলতা-ভরা সে-মুখে কোথাও ছিল না ঐশ্বর্য ও অলৌকিক শক্তির এতটুকু চিহ্ন। স্বীয় অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কোন গর্ব, কোনওরূপ অহঙ্কার তাঁহার ছিল না। বরং কেহ কৌতুকচ্ছলেও তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা দৈবী শক্তির কথা উত্থাপন করিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন।[১] তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছু অলৌকিক ঘটিত, তিনি তাহার জন্য নিজের কোন কৃতিত্ব স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু আশ্চর্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কৃষ্ণের খেলা মনে করিবেন। মানুষের কৃত মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। জীবের কোন শক্তি নাই। জীব পুতুল, কৃষ্ণ সূত্রধর, যেমন নাচান তেমনি নাচে।"[২] তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু হইতেছে, তাহা

১। হরনাথ-স্মৃতি : একাদশ লহরী : ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ১৭-১৮

শিশিরকুমার ঘোষাল লিখিত বিবরণী : সোনামুখীর হিমু কাকার সহিত ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা হইত। হিমু কাকার কৌতুক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া ভক্তেরা তাঁহার নিকট আসে কেন? ঠাকুর এই প্রশ্ন করেন। উত্তরে হিমু কাকা ওরফে হিমু গাঙ্গুলী বলেন, তোমার দৈবী শক্তি আছে। ঠাকুর অবজ্ঞাভরে বলিলেন, 'তোমার দৈবী শক্তিতে প্রস্রাব করে দিই।'

২। পাগল হরনাথ : ১ম খণ্ড : ৫ম সংস্করণ : ১৯শ পত্র : পৃষ্ঠা ৪১

সেই কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই। ভক্তগণের নিকটেও তিনি বারে বারে এই কথা বলিয়াছেন, "তোমরা প্রভুর পরম প্রিয়পাত্র, তাই তোমাদের মঙ্গল জন্য প্রভু এ নরাধমের দ্বারা নিজ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন—ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। আমি কতবারই তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমার জীবন একটি প্রহেলিকামাত্র, সদাই অপরের দ্বারা চালিত। আমার সম্বন্ধে যে সকল কার্য তোমরা জান ও চক্ষে দেখিয়াছ, সেগুলি একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে মানুষের শক্তি কিংবা কোন দৈব শক্তির দ্বারা সে কার্য হওয়া একরূপ অসম্ভব। তবে কেন ভাই বার বার ঐ সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। ঐ সকল কার্য যদি নিজ শক্তি দ্বারা হইত, তাহা হইলে তার পূর্বাপর সকল কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিতাম। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে হইতেছে। তোমার আমার ক্ষমতা ইহাতে কিছুই নাই। * * * তিনি যাহাকে clayervoyance power বলেন আমি তার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কেননা, এ সকল কাজ বিনা চেষ্টাতে কিংবা বিনা চিন্তাতেই হইয়াছে।

তাই বলি এ সকল খেলা কেবলমাত্র সেই লীলাময়ের ইচ্ছাতে, আমার কিছুই নাই।......আমার সকল কথা আমিই জানি না এবং বুঝিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারি না, সেজন্য সকলে যেন আমায় ক্ষমা করেন।[১] এই সরল স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে যে, ভক্তদের নিকট প্রকাশিত অলৌকিক শক্তিসমূহ ঠাকুরের স্বাভাবিক সারল্যের মধ্যে কোনরূপ বিকার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অলৌকিক কার্যাবলী আপনা-আপনি ঘটিয়া যাইত, সেজন্য তাঁহাকে কোনরূপ চিন্তা বা চেষ্টা করিতে হইত না। এগুলি ছিল ভক্ত সাধারণের প্রতি হরনাথের অপার করুণার অভিব্যক্তি। দুঃখ-দুর্ভাগ্য-ভরা সংসারের জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত নরনারীর ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও বেদনার বহ্নিজ্বালা জুড়াইবার জন্য হরনাথের অলৌকিক শক্তি স্ফুরিত হইত। শুধু প্রদর্শনের দ্বারা মানুষের মনে ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য বা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব

১। পাগল হরনাথ: চতুর্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ২৮১—২৮৩

প্রচার করিবার জন্য এই সমস্ত শক্তির ব্যবহার তিনি কখনও করিতেন না। করুণাঘন হরনাথ—প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। জীবে দয়া তাঁহার সহজাত ধর্ম। তাই জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। নরনারীর দুঃখ, দৈন্য, রোগ, শোক, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে তাঁহার প্রেম-কোমল অন্তর অহেতুক করুণায় বিগলিত হইত। স্নেহ-ব্যাকুলা মাতার অন্তরে সন্তানের জন্য যে বিরামহীন চিন্তা, কারণে-অকারণে যে অহেতুক আশঙ্কা, হরনাথের অন্তরে ছিল সেই অপূর্ব মাতৃভাব। তাই ভক্তগণের চিন্তায় দিবারাত্রি পরিপূর্ণ থাকিত তাঁহার অন্তর। তাহাদের কোনরূপ অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনিবামাত্র তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হইত অকল্যাণের বীজকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার জন্য। অমঙ্গলের কালো মেঘের পটভূমিকায় অলৌকিক শক্তি বিদ্যুৎ-দীপ্তি লইয়া আবির্ভূত হইলেও, ভক্তজনের অন্তরে প্রতিভাত হইত—তাঁহার পরম প্রেমময় করুণাঘন মূর্তি।

ভক্তজনের নিকট তাঁহার অভিব্যক্তি এই করুণাঘন প্রেমময় মূর্তিতে। তাঁহার সকল ভক্তকে লেখা পত্রে এই প্রেমময় রূপটিই প্রকাশিত। ভক্তজনের অভিজ্ঞতার বিবরণ যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ঠাকুরের ঐশ্বর্য বা শক্তির মোহে কিছুসংখ্যক ভক্তের আগমন হইলেও, সকলের নয়। অধিকাংশ ভক্ত তাঁহাকে চাহিয়াছেন একান্ত আপনার করিয়া। প্রত্যেকে আপনার মতো করিয়া ঠাকুরকে ভালবাসিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন এবং সেবা করিয়াছেন। ঠাকুরও সহাস্য বদনে সকলের ভালবাসা, ভক্তি ও সেবা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহদৃষ্টি—সকলের প্রতি তাঁহার অপক্ষপাত প্রেম ও করুণা।

হরনাথের জনপ্রিয়তার মূল কারণ, তাঁহার এই প্রেম-প্রাচুর্য।* তাঁহার লীলা—প্রেমের লীলা। জগতে প্রেম বিলাইবার জন্যই

---

* তুলনীয়: ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—তিনি আমাদের যে গুণে প্রাণের রাজা হইয়াছেন, তাহা সেই সকল বাহিরের যাদুকরী দেখাইয়া নহে, তিনি প্রাণকে ভালবাসা দিয়া আকর্ষণ করিতে জানেন, তিনি তাঁহার সহজ মূর্তিতে ভিখারীর

যেন তাঁহার আবির্ভাব। এই প্রেমের মহাসাগরে, তাই, ভক্তজন-স্রোতের নিত্য-সঙ্গম ঘটিত। প্রেমের ঠাকুর হরনাথের প্রেমে পাগল ভক্ত সাধারণ আর ভক্ত সাধারণের প্রেমে পাগল ঠাকুর হরনাথ। এই দুই পাগলের প্রেমের খেলাই হরনাথ-লীলার মূলকথা। বিশ্বজনীন প্রেমের উদ্বোধনই হরনাথ-লীলার মর্মবাণী। প্রেমের শক্তি অসামান্য। কারণ, প্রকৃত প্রেম অপার্থিব বস্তু—স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত। সেইজন্য পার্থিব শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি, মননশীলতা যেখানে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে, সেখানে সগৌরবে উড়ে প্রেমের বিজয়-নিশান। সবলে আঘাত হানিয়াও জাগতিক শক্তিনিচয় হৃদয়ের যে রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ, প্রেমের সামান্যতম স্পর্শেই তাহা অবলীলাক্রমে খুলিয়া যায়।

প্রেম অব্যাহত গতি—সম্পূর্ণ অলক্ষিতে, নীরব পদসঞ্চারে ইহা হৃদয় হইতে হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। অপরিসীম ইহার শক্তি। প্রেমের সামান্যতম স্পর্শ, প্রেমপরিপূর্ণ দৃষ্টি, প্রেমে-ভরা নিতান্ত সাধারণ কথা পর্যন্ত অন্তরে অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগাইতে সমর্থ। প্রেমিকের ভাবনা পর্যন্ত অপরের সম্পূর্ণ অলক্ষিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত প্রেমের উদ্বোধন ঘটায়। প্রেম, তাই, মানুষকে আপনা ভোলায়, আত্মহারা করে—প্রেমিকে, মাতালে আর পাগলে তাই বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অনন্যসাধারণ প্রেমিক বলিয়া হরনাথ ঠাকুর 'পাগল হরনাথ'। নবোদ্‌গত প্রেমে বিভোর হরনাথ-সম্প্রদায়ের নরনারী তাই 'পাগলের আবোল তাবোলে' অনাস্বাদিত-পূর্ব মাধুর্যের আস্বাদ পাইতেন। 'সে কথা নারদের বীণা হতে মিষ্ট ও বৃহস্পতির মন্ত্র হতেও সারবত্তায় গভীর ও প্রাণস্পর্শী।'* কারণ, প্রেমের ঠাকুর হরনাথ প্রেমকেই মহাশক্তি বলিয়া জানিয়াছিলেন।

বেশে রাজার মাথা তাঁহার পায়ে নোওয়াইয়া দেওয়ার অদ্ভুত মন্ত্র জানেন। সে মন্ত্রের অর্থ প্রাণ দিয়া বুঝিয়াছি, ভাষা দিয়া বুঝাইতে পারিব না।

দ্রঃ হরনাথ চরিতামৃত : সত্যচরণ সেন : ভূমিকা—পৃষ্ঠা ৶০

তুলনীয় : ভাগবতচন্দ্র মিত্র : হরনাথ-স্মৃতি : পঞ্চম লহরী : পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪

* রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর : কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোজা—উৎসর্গপত্র। পৃষ্ঠা ২ (১৩৩২ সালের সংস্করণ)

প্রেম চিরন্তন—স্থান-কালের গণ্ডি ইহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। প্রেমের তপস্যা তাই যুগ যুগ ধরিয়া বিস্তৃত। একটি জন্মের সঙ্কীর্ণ পরিধি প্রেমের সাধনার জন্য নিতান্তই অপর্যাপ্ত। স্থান হইতে স্থানান্তরে যেমন নদীর স্রোত বহিয়া যায়, প্রেমের স্রোতধারা তেমনি জন্ম হইতে জন্মান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে বহিয়া যায়। প্রেম তাই মৃত্যুঞ্জয়ী। প্রেমের লীলা বলিয়াই রাধাকৃষ্ণলীলা শাশ্বত, প্রেমের আধার বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ চিরঞ্জীব আর প্রেমের খেলা বলিয়াই হরনাথ-লীলা যুগের পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া যুগান্তরেও সজীব ও সবুজ। ভক্তজন তাই বলিয়াছেন, 'তুমি যখন প্রেমের কথা বল, তখন মনে হয় জগতকে যাদু করবার মন্ত্রকাটি তোমার হাতে।'*

পরম প্রেমিক ঠাকুর হরনাথ আর অনন্ত প্রেমের আধার তাঁহার লীলাসঙ্গিনী কুসুমকুমারী। প্রেমের এই যুগল প্রতিমূর্তিকে বাহ্যিক আচারে সম্পূর্ণ গৃহস্থ বলিয়া মনে হইত। সংসারে বাস করিয়া সংসারবাসী সকলের প্রতি যথাযোগ্য গার্হস্থ্য-ধর্মাচরণে তাঁহাদের কোন ত্রুটি লক্ষিত হইত না। পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী, পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, পিতামহ-পিতামহী এবং মাতামহ-মাতামহীর ভূমিকায় তাঁহাদের অভিনয়ে কোন ত্রুটি বাহির করা অতি বড় ছিদ্রানুসন্ধানীর পক্ষেও অসাধ্য ছিল। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাঁহাদের ভূমিকা যে-কোন নরনারীর পক্ষে আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। কিন্তু এই বাহ্য—গার্হস্থ্য তাঁহাদের ছদ্মবেশ মাত্র। গৃহস্থধর্মী অগণিত নরনারীকে ভগবৎ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহারা নিখুঁত গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াছেন। গার্হস্থ্য জীবনে অধ্যাত্মসাধনার এইরূপ আদর্শ ভারতবর্ষে চিরদিনই জনপ্রিয়। বেদ ও উপনিষদের যুগ হইতেই এই আদর্শ ভারতের নরনারী কর্তৃক ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজ একান্তভাবে ধর্মনির্ভর। গৃহস্থের অন্যান্য কর্তব্যের মতো অধ্যাত্মসাধনাও, তাই, হিন্দু সমাজের নরনারী অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেও, গার্হস্থ্য জীবনের নানা

* রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর : কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা—উৎসর্গপত্র। পৃষ্ঠা ২ (১৩৩২ সালের সংস্করণ)

সমস্যায় সেই কর্তব্য পালনে বিরত থাকে। যুগে যুগে আবির্ভূত গৃহস্থধর্মী অধ্যাত্মসাধকগণ তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে এই সমস্ত নরনারীকে ধর্মসাধনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখে আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম' হরনাথ গৃহস্থ সাধারণকে দেখাইলেন যে, গৃহস্থ হইয়াও আধ্যাত্মিকতার চরম সাধনা সম্ভব। ধর্ম-পিপাসু গৃহস্থ নরনারী তাই তাঁহার কাছে ভিড় করিয়াছিল। গৃহী সাধুর নিকট গৃহস্থের আগমন একান্তভাবেই স্বাভাবিক। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই গৃহী ভক্তের নিকট হরনাথের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

হরনাথের জনপ্রিয়তার অপর একটি কারণ তাঁহার সহজ সরল নির্দেশাবলী। আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি যে উপায়সমূহের কথা বলিয়াছেন, যে-কোন গৃহস্থের পক্ষে সেগুলি অল্পায়াসেই পালন করা সম্ভব।

মতবাদের ঔদার্যে সকল প্রদেশ, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর নরনারী হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সাধন-পদ্ধতির সারল্যে সকলের পক্ষেই ধর্মসাধনা সহজ ও সম্ভবপর হইয়া উঠিল। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে হরনাথের করুণা বর্ষিত হইল। তাঁহার ধর্মমতের সার্বজনীনতা প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সকল প্রকার ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটাইয়া সকল ধর্ম ও সকল মতের সমন্বয় সাধন করিল।

ভক্তগণের নিকট তাঁহার অভিব্যক্তি নিতান্ত অনাড়ম্বর ও সহজ সরল রূপে। এমন মানুষকে আপনজন মনে করিয়া পাগল হইয়া উঠায় কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই। পাগল বাবা, পাগলী মা, তাঁহাদের সন্তানের দলও তাই পাগল। তাই, পাগল হরনাথের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণের তীব্রতাও ছিল অসাধারণ। ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণী এবং কার্যকলাপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এই ভালবাসার কথা। ঠাকুরের কাছে লিখিত তাঁহাদের কোন পত্র বা পত্রের নকল আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু কাজ কথার চেয়েও অনেক বেশী জোরে কথা বলে। ঠাকুরের প্রতি

ভক্তদের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় প্রেরিত লিচুর পার্শেলে, চিঠি-পত্রে, তৈলমর্দন ও স্নানলীলায়, প্রসাদপ্রাপ্তির ব্যাপারে, ঠাকুর দর্শনের আগ্রহে সোনামুখী আগমন প্রভৃতি ঘটনায় পরিস্ফুট। হরনাথ-লীলা, হরনাথ-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থরাজি, হরনাথের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীতসমূহ এবং হরনাথ-স্মৃতির পুণ্য বিবরণীসমূহও প্রকাশ করে যে, ঠাকুর উচ্চশিক্ষিত ভক্তজনের নিকটেও কত প্রিয় ছিলেন। সভ্যতার আলোকবর্তিকা যাঁহারা জ্বালাইয়াছেন, শিক্ষার মার্জিত দীপ্তিতে যাঁহাদের অন্তরের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত, সমাজের উচ্চস্তরে যাঁহারা অধিষ্ঠিত—ঠাকুরের নামমাত্র উচ্চারণে বা স্মরণে এবং তাঁহার সঙ্গলাভের স্মৃতি-চারণায় তাঁহাদের হৃদয় কি অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তাঁহাদেরই লেখনীতে তাহা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

"I have often sat for hours at the feet of Haranath picturelike, transfixed to the spot, listening to his discourses on Vaishnava Philosophy and have felt myself thrice-blessed at his words which seem to me to embody the very essence of the creed of love. The world is very materialistic today and the Vaishnava Philosophy, as expounded by this apostle, strikes a new melody in the chord of our spiritual experiences, often too subtle for materialistically bent minds. Haranath speaks Bengali, Hindusthani and English, but he is of course superb when he speaks in his own mother tongue.

I may pay my homage to Haranath for he knows the art of healing the deep wounds of the soul by his sweet oracles of love. He can prove that love is not only the greatest force in the world,—the molecular attraction, the gravitation, and the centrepetal force, being only the external manifestations of a Great Will inspired by love—but it is the one object of pursuit of human life—"the butt and very sea-mark

of our utmost sail—" the goal of all human beings and the one object, the acquisition of which raises the human mind above misery and places it permanently in the regions of beautitude."[১]

"বাবা, তোমার এ পাগল নামটি আমার বড় মধুর লাগে, আমাদের প্রাণের দেবতা নিমাইকে লোকে 'চৈতা পাগলা' বলত। তুমি মজে গেছ, অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়ে তুমি অতল রত্নাকরের ডুবুরী হ'য়ে ডুবেছ। আমরা সংসারদাবদগ্ধ, যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি—ততক্ষণ মনে হয় দিন রাত নাই—তোমার কাছে থাকলে ঘড়ি দেখতে হয় না, তোমার শ্রীমুখের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় যেন সে কথার আর শেষ না হয়। তোমার ভাবের রাজ্যের দোর যদি তুমি দয়া করে খোল তবে তার কণিকা পেলে যে আমরা মাতাল হয়ে যাই।

তুমি যে রিক্তহস্তে শুধুই আনন্দ বিলুচ্ছ, তুমি যে রাজ্যে থাক, সে যে পুত্র কলত্র ঐশ্বর্য্য এ সকলের উর্দ্ধলোক, নীতিকথা ততদূর পৌঁছায় না, সে যে ভাবের অমৃত লোক। সংসারকে তুমি অগ্রাহ্য করনি। যে পরশ মানিক দিয়ে ছুঁলে সংসার সোণা হয়ে যায়, তুমি তাই দিয়ে জগতকে ছুঁয়েছ। এজন্য এই জগত তোমার কাছে আনন্দময় হয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, দিবাবসানের বাতাস বইছে, অজানা রাজ্যের ডাক এসেছে, বাবা, তুমি সেই দেশের কথা বল, যে দেশে গাছ, তরু, জন্তু, সকলই অমৃত, মৃত্যু সে দেশের দোর ডিঙ্গুতে পারে না। সে দেশ দেখি নাই, তার কথা শুনি নাই, কিন্তু তোমার মুখ দেখলে মনে হয়, সে দেশের হাওয়ায় তোমার মানস শতদল ফুটেছে। তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি সেই অজানা দেশের সুর এনেছ, তাই সে কথা নারদের বীণা হতে মিষ্ট ও বৃহস্পতির মন্ত্র হতেও সারবত্তায় গভীর ও প্রাণস্পর্শী।"[২]

১। Rai Dinesh Chandra Sen Bahadur (Vide Preface to Sree Haranath Lilamritam by Narayan Chandra Ghosh : Introduction : Page V).

২। দীনেশচন্দ্র সেন : কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা—উৎসর্গপত্র।

এইজন্যই ভক্তহৃদয় পাগল হরনাথের চরণপ্রার্থী। এত তীব্র তাঁহাদের আকর্ষণ যে, জীবনের একটি মুহূর্তও হরনাথকে ছাড়িয়া থাকার চিন্তাও তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর।

"My Lord ! I do not know by what term I should address you. You have grown so dear to my heart that I cannot live even for a moment without you. I have often found that when my mind is deeply engaged in fighting the battles of life here, my heart like an unruly bee hovers about you to drink the nectar of the lotus of your feet."

ত্রাতারূপে যেমন তাঁহার প্রকাশ, তেমনি আবার ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতারূপেও তিনি বিভিন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ভক্ত নরনারী একদিকে যেমন হরনাথকে পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, বা আপনজনের মত দেখিয়া গভীরভাবে ভালবাসিতেন, অপরদিকে তেমনি সেই সুগভীর ভালবাসার মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে হইত তাঁহাদের অগ্রগতি।

"I loved my Hara like the Morning Sun, with child-like devotion, when I saw Him first. He responded to my devotional instincts and remainded at child to me. Gradually His Diviniy worked so powerfully within me that I realised the perfectness of His Glory and Divinity, as it apparent in the case of mid-day Sun, which is at its Zenith ta that time."[২]

এই স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে, লেখিকার হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া হরনাথ বিরাজ করিতেন। বাৎসল্যরসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি বোম্বেবাসিনী এই লেখিকা। মা যশোদার অপরিসীম বাৎসল্যের রসে অভিষিক্ত তাঁহার অন্তরে গুরু হরনাথ তাই হরগোপালরূপে

১। নারায়ণচন্দ্র ঘোষ : Sree Haranath Lilamritam : Division I (Dedication), Page 5.

২। Vimala Modi (Haranath the Saviour : Page 18)

প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত ভক্তি তো সকলের নাই, অথচ তাহাদের সংখ্যাই অগণিত। সেই ভক্তদেরও প্রতি তাঁহার স্নেহ অবিরল ধারে বর্ষিত হইত। "পাগল ঠাকুরের মত এত স্নেহ কাহার? মনে হয় বুঝি হৃদয়খানি স্নেহে গড়া। হায়রে সেই স্নেহের বালাই লইয়া যেন মরি। তাঁহার সহিত মিলিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, তিনি পরম আত্মীয়। তাঁহার স্নেহ কেবল একমাত্র মাতৃস্নেহের সহিত তুলিত হইতে পারে, তাঁহার অনন্ত দয়ার আভাস কেবল পিতার নিকটেই পাওয়া যায়। তাঁহার শুভ ইচ্ছা এবং হিতকারিতা একমাত্র সদ্‌গুরুর নিকটেই লাভ করা যাইতে পারে। তাঁহার নিকট বড়-ছোট নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, ধনী-দরিদ্র নাই, পণ্ডিত-মূর্খ নাই। তিনি সকল প্রকার বিধি-বিধানের বাহিরে। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম বিশ্বমানবের মানবত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষ তাঁহার নিকট গেলে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, তাই এত আনন্দ পায়, তাঁহার নিকটে গেলে মানুষ তাঁহার প্রকৃত গৌরবের আভাস পায়, ভগবদ্দত্ত শক্তি লইয়া অনন্তের দিকে বর্ধিত হইবার অবকাশ পায়।"[১] বালেশ্বর জেলা স্কুলের তদানীন্তন হেডমাস্টার উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় লিখিত এই বিবরণীই প্রমাণ করে যে, সাধারণ ভক্তদের নিকট হরনাথের প্রকাশ ছিল কি অপূর্বসুন্দর মূর্তিতে। স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় পিতা এবং পরম পবিত্র সদ্‌গুরু, একাধারে এই ত্রয়ীর মিলন হইয়াছিল হরনাথে।[২] তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে আসিলে মানুষের অন্তর এক অননুভূতপূর্ব ভাবের বন্যায় প্লাবিত হইয়া যাইত। অপূর্ব শান্তিতে হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠিত, পরম দয়াময় প্রভু ভক্তের জীবনের সবখানি অধিকার করিয়া লইতেন। তাঁহার নিজ জন হইতে না পারিলেও প্রতিটি ভক্তই তাঁহার প্রিয়জন হইয়া উঠিতেন। তাইতো তিনি প্রেমাবতার ঠাকুর হরনাথ। তাইতো ভক্তের ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে :—

১। হরনাথ চরিতামৃত : সত্যচরণ সেন (পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ২১৯)

২। ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় : দ্রঃ হরনাথ চরিতামৃত (পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ২২৩)

"Haranath is Trans-Divine-Love Frozen"[১] এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের অনাবিল ধারায় অভিষিক্ত হইয়াই প্রেমানন্দের মত্ত ভক্ত মহানন্দে গাহিয়াছেন—"See Haranath, read Haranath, in the best of gifted will, love but love and Holy love and you will see and read and feel."[২]

হরনাথের অপার ও অহেতুকী করুণা ভক্তদের অন্তরে যে প্রেমের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়াছে, তাহার আবেগে বিভোল পাগল হইয়া হরনাথের বন্দনাগান রচনা করিয়াছেন দেশবিদেশের ভক্ত নরনারীগণ। "হরগাথা[৩], পাগলা ঝোরা[৪], শরণাগতি[৫], বিনোদমালা[৬]" প্রভৃতি কাব্যরাজিতে হরনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তহৃদয়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে।

শিক্ষিত, মার্জিতরুচি, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং উচ্চবর্ণের বিভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য হরনাথ-ভক্তের এইরূপ লিখিত বিবরণী অনেক আছে। সেই সমস্ত বিবরণীর উদ্ধৃতি সাহায্যেই একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত হরনাথ-ভক্ত শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয় নাই, নিম্নতম সামাজিক মর্যাদায় যাহাদের প্রতিষ্ঠা, তাহাদেরও অন্তরে ছিল হরনাথের প্রতি সুগভীর ভালবাসা। পরম প্রিয়জনের প্রতি তাহাদের অন্তরের অনাবিল প্রীতির বিবরণ অবশ্য তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু ঠাকুরের নিজের মুখে তাহাদের অপরিসীম প্রীতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই প্রমাণ করে যে, সেই মূঢ় ম্লান বুকের ভালবাসার অনাবিল ধারায় ধৌত হইয়াছিল ঠাকুরের শ্রীচরণযুগল। 'আমার নিতান্ত গরীব মা-বাপদের স্নেহভালবাসাতে আমি সদাই গরীবের

১। P. C. Ganguly: Kusum Haranath—the Lord of Love (Essay)

২। Mr Tata: Kusum Haranath—the Lord of Love (Essay)

৩। হরগাথা—রামগোপাল ভট্টাচার্য রচিত। ৪। পাগলা ঝোরা—শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ৫। শরণাগতি—পাগলভাই। ৬। বিনোদমালা—বিনোদবিহারী ঘোষ।

ছেলে হইতে বাসনা করি। বড় লোকের ছেলে হবার সাধ আমার নাই।[১] সম্পূর্ণ অশিক্ষিত পুলিশ কনেস্টবলের ঠাকুরকে ভগবান-জ্ঞানে ভক্তি করিবার বিবরণী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ('আমার অভিজ্ঞতা'—৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪।) উক্ত লেখক এক নিরক্ষর উড়িয়া আরদালীর অসাধারণ ভক্তির অভিব্যক্তি একটি ঘটনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত আরদালী মেম সাহেবকে হরনাথ ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলায় মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ঠাকুর হরনাথ কে? ইহাতে সে রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিল, 'তাঁহাকে তুমি চেন না, তুমি কেমন মেম সাহেব, তাঁহাকে না চেনে কে?'[২] নিরক্ষর উড়িয়া আরদালীর এই উক্তিই প্রমাণ করে—হরনাথের প্রতি তাহার ভক্তি ও ভালবাসা কত গভীর ছিল। পাচিকা শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর বিবরণ হইতে ঠাকুরের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠার গভীরতা ও ভক্তির প্রগাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৩]

এই মুষ্টিমেয় লিপিবদ্ধ বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়াই বলা যাইতে পারে, হরনাথের সংস্পর্শে যাঁহারা একবারমাত্র আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে হরনাথের প্রতি সুগভীর প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তি জাগিয়াছিল। প্রেমের এই শুভ্র সিংহাসনে প্রেমময় হরনাথের আসন প্রতিটি ভক্তের অন্তরে চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট কোন ভেদ-বিচার ছিল না, তাঁহার সাহচর্যের মধ্যে ছিল এমন একটা levelling effect যাহাতে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সব একাকার হইয়া যাইত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় এই বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বিবরণী দান করিয়াছেন। "প্রকৃত পক্ষে বহু বড়লোকই ঠাকুরের ভক্ত শ্রেণী-ভুক্ত আছেন। মহারাজা, রাজা, জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ইন্‌সপেক্টর প্রভৃতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কি ধনী কি নির্ধন এমনকি ঠাকুরের

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্তকে লিখিত পত্রাংশ। ২। আমার অভিজ্ঞতা: ১ম খণ্ড—পৃঃ ৪১। ৩। হরনাথ স্মৃতি: পঞ্চম লহরী, পৃঃ ২৭।

নিজের ছেলে সকলেই ঠাকুরের নিকট সমান ভাবে ব্যবহার পাইয়াছেন।"[১] "তাঁহার সাহচর্যের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর levelling effect ছিল। তাই, তাঁহার নিকট আসিবামাত্র সকল অভিমান চলিয়া যাইত।"[২]

দয়াল ঠাকুর সকলের সহিত এমন সাধারণভাবে মিশিতেন এবং এত স্নেহ করিতেন যে, কিঞ্চিৎকর-অকিঞ্চিৎকর, সঙ্গত-অসঙ্গত যখন যে প্রশ্ন মনে উদয় হইত, তাহা তাঁহাকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে কেহ কখনও সঙ্কোচবোধ করিত না এবং তিনিও ভক্তদের সমস্ত অন্যায় আবদার দ্বিরুক্তি না করিয়া আনন্দে সহ্য করিতেন। ভক্তেরা যতদিন তাঁহার সঙ্গ-সুখ লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি যে ভক্তদের চেয়ে কোন অংশে বড় বা কোন অংশে ভিন্ন এ-বিষয় মনে আদৌ স্থান পাইত না। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাদিগকে এমন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ঐ বিষয়ে ভাবিবার আদৌ অবসর তাহাদের ছিল না। সুখে-দুঃখে তিনিই ভক্তদের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন এবং তাঁহার অপ্রকট হওয়ার পরেও ভক্তদের বিশ্বাস, হরনাথই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। ঠাকুরের অপ্রাকৃত ভালবাসার স্মৃতি সকল ভক্তের হৃদয়ের সহিত জড়িত, কেহ তাহা কোন দিন ভুলিতে পারে না এবং সে ভালবাসা এমনই চিত্তরঞ্জক যে, সংসারের কোন জিনিসের আকর্ষণ তাঁহাকে ভক্তদের হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিতে সক্ষম নয়। তিনি চাহিয়াছিলেন প্রেম বিলাইতে। প্রতিদানে তিনি প্রেমই চাহিয়াছিলেন। ভালবাসাই ছিল তাঁহার স্বভাব, ভাল না বাসিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি ভক্তদের দোষগুণ বিচার করিতেন না। কে তাঁহাকে ডাকিল, কে ডাকিল না—এই বিচার না করিয়া তিনি সকলের কাছে আসিতেন। তবে একতরফা ভালবাসা তত মিষ্ট নয় বলিয়া, অন্যপক্ষের প্রেম-ভালবাসা তিনি চাহিতেন। তিনি বলিতেন, 'দেখ্ love one-sided তত মিষ্ট নহে, love reciprocrated বড় মিষ্ট।' প্রকৃতপক্ষে,

---

১। আমার অভিজ্ঞতা: ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭। ২। আমার অভিজ্ঞতা: ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮।

আদান-প্রদানেই প্রেমের প্রকৃত মাধুর্য নিহিত। একতরফা প্রেম বিতরণের মধ্যে অহেতুকী করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেমের তরঙ্গভঙ্গে যদি তটের বুকে দোলা না লাগে, তাহা হইলে তটিনীর প্রাণ ভরিয়া উঠে কেমন করিয়া। ভগবানও তাই ভক্তহৃদয়ের দ্বারে প্রেমের ভিখারী। প্রেমের অধীন বলিয়াই তাঁহার মাধুর্য। তাইতো কৃষ্ণভাবনা মধুর এবং সেইজন্যই যে ভাবেই হউক না কেন, কৃষ্ণকথার মাধুর্য চির অমলিন থাকিয়া যায়। প্রেমের ভিখারী হরনাথও তাই ভক্তহৃদয়ের অপরিসীম মাধুর্যের অমৃতধারায় অভিষিক্ত। ভক্ত নরনারীর অন্তরের অনাবিল প্রেমের সিংহাসনে তাই তাঁহার আসন চিরস্থায়ী।

হরনাথের সাহচর্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে হরনাথের চিরস্থায়ী আসন এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। হরনাথের সাহচর্যের মাধুর্য যাঁহারা একটি মুহূর্তের জন্যও আস্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই চিরতরে তাঁহার শ্রীচরণযুগলে আত্ম-বিক্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এমনও অনেক নরনারী আছেন, হরনাথের শ্রীচরণ-দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, সেই সমস্ত ভক্ত নরনারীরও হরনাথ-প্রীতি সেজন্য কিন্তু বিন্দুমাত্রও কমে নাই, বরং চাক্ষুষ-দর্শনে ধন্য ভক্ত নরনারীর মত তাঁহাদেরও ভক্তি ও প্রীতির অনাবিল স্রোত অজস্র ধারায় আসিয়া হরনাথ-সাগর-সঙ্গমে মিলিতেছে। শুধু নাম শুনিয়া বা প্রতিকৃতি দেখিয়া এই সকল নরনারীর প্রত্যেকের অন্তরে জাগিতেছে অপরিসীম হরনাথ-প্রীতি। হরনাথের অপ্রকট হওয়ার পরেও বিভিন্ন প্রদেশবাসী, বিশেষতঃ অন্ধ্র প্রদেশের, নরনারীর ব্যাপকভাবে হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াই আমাদের উপর্যুক্ত উক্তির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।* তিরোভাবের বহু

* "It is now hundred years since our Lord came down amidst us as Haranath and in this period His holy name has spread over all our country. His care to love and fellowship and universal brotherhood has been heard and responded to by thousands in almost all the provinces of Bharat-Varsa. (Haranath Centenary Celebrations,

পরেও হরনাথের এই ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখিয়া অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, হরনাথ-প্রীতির জন্য তাঁহার নাম শ্রবণই যথেষ্ট। কৃষ্ণের নামমাত্র শুনিয়া শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়াছিলেন, নামমাত্র শুনিয়া তেমনি বহু সংখ্যক ভক্ত নরনারী হরনাথের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। এইখানেই হরনাথ মানবিক লীলার বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন। ভক্তবৃন্দের লিখিত ও কথিত বহু বিবরণীর মধ্যে অপ্রকট হওয়ার পর হরনাথ-দর্শনের বহু তথ্য পাওয়া যায়। এই সমস্ত তথ্যের সত্যাসত্য বিচারের অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, ভক্তহৃদয়ে হরনাথের প্রতি প্রীতি আজিও অম্লান। জন্ম-মৃত্যুর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া হরনাথ মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছেন। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে, অনন্ত প্রেমের আধার ঠাকুর হরনাথ।

তাহা হইলেও কিন্তু হরনাথের বিরুদ্ধবাদীর অভাব ছিল না এবং এখনও যে নাই, তাহা মনে হয় না। হরনাথের বিকশিত প্রেমের স্পর্শমণি যখন সুদূর ভারত-সীমান্তের নরনারীর অন্তরকে সোনা করিতেছিল, প্রেমের অনাবিল ধারা যখন কাশ্মীর, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থান মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তখনো পর্যন্ত তাঁহার নিজ বাসভূমি সোনামুখীতে কেহ তাঁহাকে প্রেমাবতার বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। বরং দেশ-বিদেশ হইতে ভক্তগণ যখন পরম ভক্তিভরে হরনাথের চরণোপান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে ভণ্ড পর্যন্ত আখ্যা দিতে দ্বিধামাত্র করেন নাই। ইহাদের মধ্যে হরনাথের বাল্যবন্ধু কয়েকজন ব্যক্তির উৎসাহই ছিল সর্বাধিক। 'নকল পাগল' বলিয়া তাঁহার সুকঠোর সমালোচনা করিয়া এই বিরুদ্ধবাদীর দল তাঁহার উদ্দেশ্য তীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। হরনাথের বাল্যসঙ্গী রসিকলাল দে[১] মহাশয়ের

1965 : P. 1) এখন প্রভুর (হরনাথ) নাম সমগ্র অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাপিয়া ঘণ্টার মত বাজিতেছে।—আমার অভিজ্ঞতা (৩য়), পৃঃ ৮৩। এই দুইটি বিবরণী আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ।

১। পাগল রাধামাধব : রসিকলাল দে—পৃঃ ২৭—পৃঃ ৩১।

নেতৃত্বে 'নকল পাগলের মুখোস' খুলিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ হয়। হরনাথের গৃহস্থ-বেশকে তিনি আতর-ছড়ানো বিষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করেন। নামে আবার অপরাধ কি? হরনাথের এই উপদেশটির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন, 'একথা যিনি বলেন তিনি সম্পূর্ণ পাপের প্রশ্রয়দাতা'। এইরূপ ধারণা হয়তো তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন। হরনাথের মতবাদ তাঁহার সংস্কারে আঘাত করায়, তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং সুদৃঢ় মত প্রকাশ করেন, 'আসল পাগলকে উড়াইয়া নকল পাগলকে লইয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির স্রোতে যদি গা ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে, আর্য্যদেশ শ্মশানে পরিণত হইবে।'[১]

রসিকবাবুর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ঠাকুর বা তাঁহার অনুচর ও ভক্তবৃন্দের কেহ কিছু বলিয়াছিলেন কি না জানা যায় না, তবে রসিকবাবু যে হরনাথের বিরোধিতা করিবেন, ইহার আভাস পাওয়া যায় পাগল হরনাথ-লিখিত কয়েকটি পত্রে। কিন্তু সেগুলি রসিকবাবুর এইরূপ বিরুদ্ধ মত পোষণের কোন সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করে নাই। ইহাতে মনে হয়, রসিকলালের অপপ্রচার যখন সুরু হয়, তখন হরনাথ নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে উঠিয়াছেন।*

তবুও প্রশ্ন জাগে। রসিকবাবুর এইরূপ হরনাথ-নিন্দার কারণ কি? যখন দূর-দূরান্তর হইতে নরনারী দলে দলে আসিয়া হরনাথের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছিলেন, তখন হরনাথের বাল্যবন্ধুর তীব্র বিরোধিতা করিবার পশ্চাতে সঙ্গত কারণ কি থাকিতে পারে? রসিকবাবুর অপর তিনখানি গ্রন্থ[২] পাঠ করিলে তাঁহাকে গৌরসুন্দরের পরম ভক্ত বলিয়াই মনে হয়। হরনাথের পরম ভক্ত শ্রীমতী তমালিনী দেবী এই গ্রন্থত্রয় পাঠ করিয়া ভক্তি ভাবে আপ্লুত

১। পাগল রাধামাধব: রসিকলাল দে—ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।৵৹

* দ্রঃ পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ—পত্রসংখ্যা ৪৪, পৃষ্ঠা ৭০।

২। প্রেমের ডালি—প্রকাশকাল ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। পুষ্পাঞ্জলি—প্রকাশকাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ। রাঙ্গা পা দুখানি—প্রকাশকাল ১৩২১ বঙ্গাব্দ। পাগল রাধামাধব—প্রকাশকাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

হন।[১] অথচ তাঁহার অপর গ্রন্থটিতে হরনাথের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্বেষের পরিচয় নিহিত আছে।

পুস্তকখানির নামেই এই সুতীব্র হরনাথ-বিরোধিতার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রসিকলালের মতে, আসল পাগল ছিলেন বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামের রাইপুর পল্লীর গৌরভক্ত সাধু রাধামাধব দাস। খুব সম্ভব রসিকবাবু তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং স্বীয় অনুরাগের পাত্রকে হরনাথের উর্ধ্বে স্থাপন করিবার জন্যই হরনাথকে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। রসিকবাবুর সমালোচনা হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, এগুলির ভিত্তি মোটেই সুদৃঢ় নয় এবং ইহাদের ঝাঁঝাল ভাবটি সমালোচকের উপযুক্ত মনোভাবের পরিচায়ক নহে। চীৎকার করিলেই যেমন বক্তৃতা হয় না, তেমনি কটূক্তি বর্ষণ করিলেই সমালোচনা হয় না। রসিকবাবুর উক্তিসমূহকে কটূক্তি বলাই সঙ্গত, সমালোচনা বলা কোনমতেই সঙ্গত নয়। তাহা ছাড়া, খুব সম্ভব পূর্ব-প্রচলিত সংস্কারে ছিল তাঁহার অন্ধবিশ্বাস। সেইজন্য হরনাথের 'নামে আবার অপরাধ কি?' উপদেশ তাঁহার আবাল্য-পোষিত সংস্কারের ভিত ধরিয়া নাড়া দেয় এবং তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন।

কিন্তু রসিকবাবুর মত গৌরভক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে অপর একজন বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে বিরূপ?—মন্তব্য করা সম্ভব হইল কিরূপে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হইতে হয় এবং দেখা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি রসিকলালের গোঁড়ামি যেরূপ ছিল, প্রচলিত বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের জ্ঞান তদ্রূপ ছিল না এবং বৈষ্ণবের প্রকৃতিও তাঁহার ছিল না। প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা 'পাগল রাধামাধব' পুস্তিকার গ্রন্থকারের মধ্যে দুর্লভ। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহে সামান্য মাত্র জ্ঞান থাকিলেও তিনি দেখিতে পাইতেন যে, নামে কোন অপরাধ নাই।

১। পুস্তকপাঠে দেখি শুধুই ভক্তির প্রস্রবণ, আহা কি সুন্দর, যেন মনের ভাব বুঝেই প্রভু আমায় কৃপা করে এগুলি পাঠিয়েছেন। মোহন মুরলী—১৩৩৪।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা না কর বিচার।
বৈষ্ণবের দোষগুণ বিচারের পার ॥*

হরনাথের জীবিতকালে আর একপ্রকার হরনাথ-বিরোধিতার চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। এই চেষ্টা যাঁহাদের ছিল তাঁহারা হরনাথকে পরীক্ষা করিয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা অবশেষে হরনাথের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে হরনাথের মাহাত্ম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথেই গিয়াছিল।

হরনাথের বাণী প্রকাশের বাহন তাঁহার পত্রাবলী। ধর্মজগতের ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। এযাবৎকাল ধর্মগুরুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী ভক্তদের অন্তরে প্রেরণা জাগাইত। গুরুর অবর্তমানে প্রধান ভক্তবৃন্দ গুরুর বাণীসমূহ নবাগতদের মধ্যে প্রচার করিতেন। এইভাবে শিষ্য-পরম্পরায় ধর্মগুরুর বাণীর প্রকাশ ও প্রচার হইত। শিষ্যেরা আবার অনেকেই গুরুর উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই সমস্ত লিখিত তথ্য হইতেই পরবর্তী যুগে ধর্মগুরুর বাণীসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা হইত। কিন্তু হরনাথের বাণীর লেখক হরনাথ নিজে। বিভিন্ন স্থানের ভক্তদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাবলী হরনাথের উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত পত্রের মাধ্যমেই পাগল হরনাথের প্রথম-প্রকাশ হয়। মুখেও অবশ্য তিনি উপদেশ দান করিয়াছেন। সেই সমস্ত উপদেশের লিখিত বিবরণীও হরনাথ-ভক্তবৃন্দ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু পত্রাবলীতে তাঁহার স্বহস্তলিখিত উপদেশসমূহ পাওয়া যায়। হরনাথের বৈশিষ্ট্য—এই সমস্ত পত্রের মাধ্যমে বাণী বিতরণ।

পত্রাবলীর মাধ্যমে উপদেশ দান করিতেন বলিয়াই তাঁহার উপদেশসমূহ দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হইত। আবার একজনকে লেখা পত্রের মধ্যে সেই স্থানের আরও সমস্ত ভক্তদের উদ্দেশ্যে বাণী থাকিত। এই এক-একখানি পত্র এক-একটি জীবন্ত প্রচারক হইয়া

* যন্নামশ্রুত যন্নুকীর্ত্তয়েদ্ কস্মাৎ।
হস্তংহঃ সর্পাদম্নুনাম শেষমন্যং।
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভবাদ বা
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়োন্মুমুখ্য॥ —শ্রীচৈতন্য ভাগবত

হরনাথের বাণী জনসমাজে প্রচার করিত। কালক্রমে শ্রীযুক্ত অটল-বিহারী নন্দী কর্তৃক হরনাথের কয়েকটি পত্র সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে গ্রথিত হয় এবং পরবর্তী কালে বহু পত্র সংগৃহীত ও গ্রথিত হইয়া চারিটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়[১] এবং ক্রমে ক্রমে ইহা ইংরাজী, তেলেগু, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়। পত্রাবলীতে প্রদত্ত হরনাথের উপদেশাবলীর সার-সঙ্কলন এবং বিভিন্ন ভাষায় তাহার অনুবাদও ভক্তগণ করিয়াছিলেন[২]। তাহা ছাড়া, দেশী-বিদেশী অগণিত ভক্ত হরনাথের উপদেশাবলীর সার-সঙ্কলন, সংক্ষেপ ও মর্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইভাবে হরনাথের লেখনী-নিঃসৃত বাণীসমূহ দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হইয়া ভক্ত নরনারীবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করে। যাঁহারা তাঁহার স্বলিখিত পত্র পাইতেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই। তাঁহার পত্রাবলী পাঠ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিত, তাঁহারা হরনাথের দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। পত্রাবলীর মধ্যে এমন একটি অনাড়ম্বর মাধুর্য ছিল, যাহা পাঠকের অন্তরে এক অপরূপ ভাবের আলোড়ন জাগাইয়া তুলিত। পাঠ করিতে করিতে সকল নরনারীই আপন আপন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইত। প্রত্যেকটি মানুষের নিকট বিশেষ এবং সমগ্রভাবে নির্বিশেষ, ইহাই হরনাথ-পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য। তাই পত্রাবলীর মাধ্যমেই যাহাদের হরনাথের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটিত, তাহারাও প্রথম হইতেই হরনাথকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে আরম্ভ করিত। প্রথম দর্শনের কাজ হইত প্রথম পত্রপাঠে। হরনাথের এই পত্রাবলী পাঠকের কাছে কিরূপ অমূল্য সম্পদ্ ছিল, তাহাদের স্বীকারোক্তিগুলিই তাহা প্রমাণ করে। বরিশালের একজন অতি নিরপেক্ষ ভদ্রমহোদয়ের [যিনি ঠাকুরকে ইতিপূর্বে কোনদিন দেখেন নাই] নিকট শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

১। হরনাথের চিঠিতে জানা যায় যে, রামরাখাল ঘোষ সম্পাদিত 'গৃহস্থ' পত্রিকায় ইহারা প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্রঃ পাগল হরনাথ: ৪র্থ ভাগ, পৃ. ১৫৬

২। উপদেশামৃত—Haranath—His Play & Precepts ইত্যাদি। উপদেশামৃত হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়।

গুপ্ত মহাশয় শুনিয়াছিলেন যে, "মহাত্মা অটলবিহারী নন্দী ঠাকুরের [প্রায় সমস্তই তাঁহার নিকট কিংবা তাঁহার স্ত্রীর নিকট লিখিত] অল্প কয়েকখানি পত্র সংগ্রহকরতঃ হাতে লিখিয়া একখানা খাতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পশ্চিম দেশীয় একজন যুবক একদিন বৈকালে ঐ খাতাখানি লইয়া রাতভর পাঠকরতঃ আনন্দে অধীর হইয়া তৎপরদিন অতি প্রত্যুষে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট যাইয়া খাতাখানি মালিককে প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধকরতঃ নিজের যুবতী স্ত্রীকে একাকী ঘরে রাখিয়া বন্ধুটির নিকট এই বলিয়া রওনা হইয়া গেলেন যে এহেন ঠাকুরকে না দেখিয়া তিনি আর গৃহে ফিরিবেন না।"[১]

বরিশালের আশুতোষ গুহ মহাশয়ের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি যখন মেসোপটেমিয়ার হাসপাতালে অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন রহস্য-জনকভাবে ঠাকুরের একটি চিঠি পাইয়া অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন এবং ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের পত্রাবলীর সঙ্কলন পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া উঠেন। পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়া থাকেন।[২] হরনাথ-লীলার অদ্বৈতাচার্য শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দী বলেন,—

"I know not what force, He instils in His letters that he charms every one to whom He writes, whether at home or out of doors, He never uses expressions other than sweet, His words are besmeared with nectar as it were."[৩]

নিউ মেক্সিকোর ইউরানিয়া মিশনের ভগিনী অনফা (Sister Ounfa) সুদীর্ঘ কালের প্রতীক্ষার পর হরনাথের পত্র-সঙ্কলন 'পাগল হরনাথ' পুস্তকখানি পাইয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহা পাঠ করিয়া

১। আমার অভিজ্ঞতা : ৩য় খণ্ড—পৃ. ১২২
২। আমার অভিজ্ঞতা : ৪র্থ খণ্ড—পৃ. ২১৯
৩। The Divine Pen : December, 1960, (Page 17)

আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেন।[১] পাগল হরনাথ গ্রন্থচতুষ্টয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় স্বরূপটি ঠাকুর এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে—'পাগল হরনাথ' পাঠ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন না করিয়া উপায় নাই। এই গ্রন্থে ঈশ্বরপ্রেম লাভের উপায় এমন সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ইহাতে মানুষ ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়। সেইজন্য হরনাথের পত্রাবলী একদিকে যেমন পাঠক-পাঠিকার অন্তরসমূহ অপূর্ব মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরটি দান করিয়া ধর্মপিপাসার নিবৃত্তি করে। সেইজন্যই বোধ হয় কেহ কেহ বলেন, 'পাগল হরনাথ পাঠ করিলে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠের আর কোন প্রয়োজন থাকে না।'[২] এই মন্তব্যটির মধ্যে আতিশয্য এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, সত্য যে একবারেই নাই তাহা বলা চলে না। কারণ, ধর্মগ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরপ্রেম লাভ হয়, তাহা হইলে পাগল হরনাথ গ্রন্থে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সহজতম ও সার্বজনীন একটি উপায়ের কথাই বলা হইয়াছে। যে উপায় হৃদয়গলানো কোন নাম-করা[৩]। ইহার সাহায্যেই ঈশ্বরপ্রেম জাগ্রত হয় এবং পরিণামে ঈশ্বরের সাহচর্য-লাভও ঘটিয়া থাকে। সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই তথ্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই পত্রাবলী পাঠ করিলে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন না হইয়া পারে না, অন্তরের অন্তঃস্থলে আলোড়ন জাগ্রত না হইয়া পারে না।

১। Divine Pen : December, 1960, Page 18)

২। Sree Thakur Haranath : K. T. Mody (The Lord Supreme : Vol. No. 2 : No. 1 : January, 1962)

৩। Haranath—His Play & Precepts পুস্তকখানি পাঠ করিয়া লণ্ডনবাসিনী Althea Jordan এই সহজ উপায়টি অনুসরণ করিয়া যে সুফল লাভ করিয়াছিলেন, স্নায়ুদৌর্বল্যে আক্রান্ত তাঁহার এক বন্ধুকে সেই সুফল লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে নাম জপ করিতে বলেন।

The efficacy of taking Sri Kusum Haranath's Name : Althea Jordan, London: (The Lord Supreme : 15th September, 1961 : Page 22)

হরনাথের প্রেম-মধুর কণ্ঠ ইহাতে শোনা যায় এবং সেই আকুল পাগল-করা কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত বাণীসমূহ :—

"haunt the innermost recesses of the soul, an, as deep calls to deep, cause an upsurge of divine motion, an answering response to the same nature—'prem' calling to 'prem'—ever seeking itself out, adding to itself as honey bee garnering honey from every flower."[১]

'পাগল হরনাথ' পাঠে প্রেমের উদ্বোধন হয়, আর এই পরমার্থ সাধিত হইলেই মানুষ পরমার্থের সন্ধান পায়, তাহার পরম প্রাপ্তি হয়। সেইজন্যই ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগকে বারে বারে 'পাগল হরনাথ' পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা যতবার পঠিত হইবে ততবার নবতর অর্থের সন্ধান পাওয়া যাইবে, নূতনতর সঙ্কেতে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাইবে। হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমের নির্ঝরিণী পাগল হরনাথের রবিকরস্পর্শে জাগ্রত হইলেই অভূতপূর্ব আনন্দের ধারায় অন্তর পরিপ্লাবিত হইবে, হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইবে। বীণাযন্ত্রের সুরে দেবর্ষি নারদের অন্তরে প্রেমের উদ্বোধন হয়। সেই প্রেমের পথে পদসঞ্চার করিয়া নারদ লাভ করেন প্রেমময় হরিকে। শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীরবে বৃন্দাবনের গোপীগণের সুপ্ত প্রেমের উৎসমুখ খুলিয়া যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। পাগল হরনাথের ছিদ্রহীন বীণা (লেখনী)-নিঃসৃত অপূর্ব প্রেমের সুরমাধুর্যে বিংশ শতাব্দীর নরনারীর অন্তরে হয় প্রেমের উদ্বোধন।[২] এই প্রেমে পাগল হইয়া পরম প্রেমিকের অভিসারে তাহাদের যাত্রা সুরু হয়। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর মানুষের সিদ্ধিলাভের জন্য হরনাথের লেখনীর অবদান অস্বীকার করা চলে না।

১। The Lila in the Lotus of the Heart : Kenneth Grant (Vide : The Lord Supreme : Vol. 1 : No. 2 : 13th March, 1961 : Page 20)

২। For Narada's Siddhi labha his Veena, for Gopini's Siddhi labha Krishna's Flute, then for your Siddhi labha My Pen.

জীবনী-সংগ্রহের উৎস

হরনাথের জীবনী-সংগ্রহের উপাদানগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত। প্রকাশিত উপাদানসমূহের মধ্যে আবার কতকগুলি তাঁহার নিজ লেখনী-নিঃসৃত, আর কতকগুলি ভক্তজন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ভক্তজন কর্তৃক লিপিবদ্ধ জীবনী বা জীবনীর অংশসমূহের কতকগুলি হরনাথ স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য মন্তব্যও করিয়া-ছিলেন, আর কতকগুলি তাঁহার তিরোভাবের পরে প্রকাশিত হয়। জীবনকাহিনীর অপ্রকাশিত উপাদানগুলির মধ্যে হরনাথের স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি পত্র যাহা ভক্তজনের নিকট হইতে বর্তমানে সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার সাহচর্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন এমন কতকগুলি ভক্ত বা আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতি-চারণা। সুতরাং হরনাথের জীবনী রচনার উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। হরনাথের স্বহস্তলিখিত পত্রাবলী—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত (জীবিতকালের মধ্যে); ২। তাঁহার সম্বন্ধে রচিত জীবনীমূলক ও অন্যান্য গ্রন্থরাজি; ৩। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমূহ; ৪। ভক্তজনের অভিজ্ঞতার মুদ্রিত বিবরণী; ৫। হরনাথের মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও সহধর্মিণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণী; ৬। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের স্মৃতি-চারণা; ৭। যাঁহারা হরনাথের সাহচর্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কাহিনীসমূহ।

হরনাথের জীবনের প্রধান কাহিনীকার তিনি নিজে। সাধারণ্যে তিনি প্রচারিত হন হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনের[১] স্তম্ভে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দীর লেখনীমুখে। ইহা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

১। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত।

তাঁহার বয়স তখন ৪৩ বৎসরেরও বেশী। ইহার পর হইতে তাঁহার নাম ও খ্যাতি আসমুদ্রহিমাচল পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিরোভাব কাল পর্যন্ত তাঁহার জীবনের একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়ার অসুবিধা থাকে না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ জীবনী নয়। মধ্যাহ্ন-গগনে আরূঢ় সূর্যকর যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, ইহাই সমস্ত দিনের ইতিহাস নয়—ইহার পশ্চাতে বর্ণসমারোহের মধ্যে উদয়ের যে সূচনা, দিবসের ইতিহাসের আরম্ভ সেখান হইতেই। কিন্তু প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত হরনাথ লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই সুদীর্ঘ কালের জীবনেতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান খুব সুলভ নয়। অবশ্য, জনসমাজে প্রচারিত হইবার পর ভক্তজনের আগ্রহ ও উৎসাহে হরনাথের বাল্য ও যৌবনের কাহিনী সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হয়। সেই তথ্যসমূহ পাওয়া গিয়াছিল তাঁহার নিজের নিকট হইতে বা তাঁহার মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী বা কুসুমকুমারীর নিকট হইতে। তাঁহার পত্রসমূহের যেগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে হরনাথ তাঁহার বাল্য ও যৌবনের বহু তথ্য প্রকাশিত করেন। আরও বহু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার যে সমস্ত পত্র অদ্যাপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে সেগুলি হইতে। অপ্রকাশিত পত্রাবলী হইতে একটি মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহা হইল—কতকগুলি ঘটনার সময় ও তারিখ। হরনাথ তাঁহার বহু পত্রে তারিখ দিতেন না বা স্থানের উল্লেখ করিতেন না। পূর্বে সংগৃহীত পত্রাবলীর দুই-চারিটি ছাড়া প্রায় সমস্তগুলিতেই তারিখ নাই এবং স্থানের নামও অনুল্লিখিত। এগুলি সংগ্রহ করা হয় নাই বা চেষ্টাও হয় নাই। অপ্রকাশিত পত্রগুলির যেগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির তারিখ ওস্থান উদ্ধার করা হইয়াছে। ফলে, হরনাথের জীবনীর স্থান-কাল সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। স্থান-কাল জ্ঞাত হওয়ার ফলে পূর্ব-প্রকাশিত তথ্যসমূহ যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা হইয়াছে।

হরনাথের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলীতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার জন্মের পূর্বে

সন্ন্যাসীর আগমন-কাহিনী, তাঁহার শিক্ষা-জীবনের ইতিহাস, কাশ্মীর গমন ও কাশ্মীরে অবস্থানকালের ইতিহাস, জন্মান্তরের কাহিনী, সন্তান-সন্ততির জন্মসময়, ভক্তদের সাহচর্যে আসার কাহিনী এবং যে সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তিসমূহ স্ফুরিত হয়, তাহাদের কতকগুলির আভাস তাঁহার পত্রাবলীতে পাওয়া যায়।

হরনাথ-জীবনীর দ্বিতীয় উপাদান তাঁহার সম্বন্ধে রচিত জীবনী-গ্রন্থসমূহ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হরনাথের জীবৎকালেই প্রকাশিত হয়। তিনি সেগুলি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং ইহাদের দুই-একটি সম্বন্ধে মন্তব্যও করিয়াছিলেন। আরও কতকগুলি প্রকাশিত হয় তাঁহার তিরোভাবের পরে। তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত জীবনী-গ্রন্থগুলির প্রায় সমস্তগুলিই কোন-না-কোন অংশে অসম্পূর্ণ। ইহার প্রধান কারণ, ইহাদের প্রত্যেকটি ভক্তজন কর্তৃক লিখিত। হরনাথের সাহচর্যে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহার সঙ্গ-মাধুর্যে তাঁহারা এমনই অভিভূত হইয়া যাইতেন যে, তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি আপনা-আপনিই অবলুপ্ত হইত। হরনাথের সুমধুর বাণী তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। ফলে, তাঁহারা এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা স্তব্ধ হইয়া যাইত। তাঁহাদের রচিত জীবনী-গ্রন্থসমূহে তাই হরনাথের ব্যক্তিরূপটি অনুপস্থিত। ঐতিহাসিককে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাঁহারা ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে প্রভু হরনাথের কথা মুগ্ধচিত্তে বলিয়া গিয়াছেন। তবুও মধ্যে মধ্যে ঐতিহাসিকের আত্ম-প্রকাশ হইয়াছে এবং ব্যক্তি হরনাথের জীবনের কিছু কিছু তথ্য তখনই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে পড়ে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দী রচিত 'পাগল হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী', শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষের 'হরনাথ-লীলামৃত' (ইংরাজীতে) এবং শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন (কবিরাজ) লিখিত 'হরনাথ চরিতামৃত'।

শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দীই হরনাথ-লীলার অদ্বৈতাচার্য; অর্থাৎ, ইঁহারই মাধ্যমে হরনাথ জনসমাজে প্রচারিত হন। পরে তিনি নিজে সোনামুখী আসিয়া হরনাথ-জীবনী সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ

করিয়াছিলেন এবং 'পাগল হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী' রচনা করিয়া 'পাগল হরনাথ'—প্রথম খণ্ড গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছিলেন। ইহাই হরনাথ-জীবনীর প্রথম ও প্রধান প্রামাণিক উপাদান। কিন্তু অটল-বিহারী রচিত 'পাগল হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী' একটি নাতিবৃহৎ প্রবন্ধ মাত্র। ইহাতে মাত্র কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রথম হইলেও হরনাথ-জীবনীর বিস্তৃত পরিচয় ইহাতে দুর্লভ।

হরনাথ-জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ রচনা করিতে ব্রতী হন—নারায়ণ-চন্দ্র ঘোষ। তাঁহার পরিকল্পিত Sree Haranath Lilamritam গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনায় তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

প্রথম খণ্ডের উপজীব্য হরনাথের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হইলেও, তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য হরনাথের জীবনী রচনায় Sree Haranath Lilamritam (Div. I) গ্রন্থখানির অবদান যথেষ্ট।

জীবিতকালে রচিত হরনাথের জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে দুইজন লেখকের রচনায়। তাঁহারা হইলেন শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন (কবিরাজ) এবং শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মহাশয়ের 'হরনাথ চরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় ১৩৩১ সালের ৬ই বৈশাখ। সুতরাং ইহার পরের ঘটনার বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায় না। অথচ ইহার পরেও দুই বৎসরাধিক কাল হরনাথ জীবিত ছিলেন। অন্ত্যলীলার এই দুইটি বৎসর ছাড়া হরনাথ-জীবনীর বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া লেখক হরনাথকে ইহা শুনাইয়াছিলেন এবং হরনাথ তাহাতে যে মন্তব্য[১] করিয়াছিলেন, গ্রন্থখানির প্রামাণিকতার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভাগবতচন্দ্র মিত্র কর্তৃক হরনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ ও তাঁহার নিজের লেখা কতকগুলি বিবরণ, কতিপয় ভক্ত কর্তৃক

১ "বাবা, তুমি কি আমার নোট বহিখানি চুরি করিয়াছিলে? যেখানে যাহা লিখিয়াছ, তাহা যে আমার জীবনের সকল ঘটনার সহিত হুবহু মিলিয়া যাইতেছে, বাবা!"

প্রদত্ত বিবরণ—এই গ্রন্থ রচনার উপাদান ছিল। তাহা সত্বেও, গ্রন্থ-বর্ণিত কোন কোন ঘটনার বিবরণে, বিশেষতঃ জন্মান্তরের বিবরণে[১], কিছু কিছু ভুল-ক্রটি থাকার জন্য গ্রন্থখানিকে হরনাথ-জীবনীর নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্রের 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা' দুই খণ্ডে হরনাথ-জীবনীর বহু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত লেখকগণ হরনাথের পিতা জয়রাম হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব যুগের বিবরণ তাঁহাদের গ্রন্থে দুর্লভ। শ্রীযুক্ত মিত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হরনাথ-জীবনী রচনা করিবার মানসে হরনাথের পূর্বপুরুষগণের বিবরণ, সোনামুখীর প্রাচীন ইতিহাস এবং হরনাথের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐতি-হাসিকের পক্ষে সেগুলি দুর্লভ সংগ্রহ।

কিন্তু ঝোড় কাটিয়া শিব বাহির করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শিবেরই মাথায় আঘাত করিয়া বসিয়াছেন।* হরনাথ-লীলাকথায় প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করিতে গিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত যাচাই প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় বহু অবান্তর তথ্য এই গ্রন্থদ্বয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। তাহা হইলেও শ্রীযুক্ত মিত্রই সর্বপ্রথম সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া হরনাথ-জীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং সেই কারণে হরনাথ-জীবনী রচনায় তাঁহার অবদান অপ্রমেয়। উক্ত লেখকের Haranath Souvenir গ্রন্থখানিতে চিত্রে হরনাথ-লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবশ্য, দুই-একটি ছাড়া বাকী প্রায় সমস্ত চিত্রই কাল্পনিক। তিরোধানের পরেই হরনাথ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনার ব্যাপক প্রসার হয়। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া,

---

১। এই সমস্ত ভুল-ক্রটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র হরনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তাঁহাকে জানান, "বাবা, তুমি যাহা লিখিয়াছ, সত্য। কেতাব ছাপা হয়ে যাবার পর স্নেহের নারাণ দাদার ও স্নেহের সত্যবাবার পুস্তক দেখি। তখন আর যাহা লিখিয়াছে তাহা পরিবর্তন করা অসম্ভব। তাই কিছু বলি নাই। মনে করেছিলাম পরে কেউ এটি ঠিক করে লিখিবে। আজ তোমার চেষ্টা দেখে আনন্দ হল। দ্রঃ শ্রীহরনাথ সঙ্গ (পাণ্ডুলিপি), পৃষ্ঠা ৩৯।

* হরনাথ ভাগবতবাবুকে 'ঝোড়কাটা ভাগবত' বলিতেন।

তেলেগু, মারাঠী ও গুজরাটী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় হরনাথের জীবন ও উপদেশ অবলম্বনে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়।* প্রধানতঃ পূর্ব-সূরীগণ কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করিলেও হরনাথের অলৌকিক লীলাকাহিনী এবং তাঁহার জীবন সম্বন্ধে প্রকাশিত কিছু কিছু নূতন তথ্যও ইহাদের রচনার মধ্যে দুর্লভ নয়।

হরনাথ-জীবনের বহু অপ্রকাশিত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে রায়-সাহেব অক্ষয়কুমার গুপ্ত রচিত 'ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা' নামে গ্রন্থের চারিটি খণ্ডে। ইহাদের মধ্যে চতুর্থ খণ্ডে হরনাথের অন্তঃলীলার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্র ঠাকুরের তিরোধান সম্বন্ধে তাঁহার 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা'র প্রথম খণ্ডে আভাস মাত্র দিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে ভক্তজন কর্তৃক পোষিত ধারণার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রায়সাহেবের গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হরনাথের তিরোধানের সময়ের পরিপূর্ণ বিবরণ। এই দিক দিয়া ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে 'আমার অভিজ্ঞতা' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী।

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ রচিত Wonderful Lilas of Haragopal গ্রন্থটি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানিতে লেখকের ইষ্টদেবতা গোপালের সহিত হরনাথের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। লেখকের ভক্তমনোভাব হরনাথ এবং গোপালকে অভিন্ন করিয়া হরগোপালরূপে দেখিয়াছে। হরগোপালের লীলা-বর্ণনাই গ্রন্থখানির প্রধান উদ্দেশ্য।

M. Sri Rammurti রচিত Life and Message of Bhagawn Sri Kusum-Haranath নামক গ্রন্থখানি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ইংরাজী ভাষায় লিখিত হরনাথ-জীবনীসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থটিতেই হরনাথ-জীবনীর একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। হরনাথের তিরোভাব সম্বন্ধীয় তথ্য অবশ্য ইহাতে অনুপস্থিত। কাশ্মীরের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর তিরোধান কাল পর্যন্ত সময়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী মাত্র ইহাতে প্রদত্ত

* দ্রঃ পাদটীকা ৪, পৃঃ ৩৯

হইয়াছে। তাহা হইলেও নারায়ণচন্দ্র ঘোষ রচিত 'প্রভু হরনাথ অথবা শ্রীকৃষ্ণ, শীর্ষক বিবরণী, হরনাথগোষ্ঠীর দ্বাবিংশ জন প্রধান ভক্তের পরিচিতি, আতরবাড়ী জন্মোৎসবের বিস্তৃত বিবরণী এবং মাতা কুসুমকুমারী দেবীর জীবনী সমাবেশে গ্রন্থখানি হরনাথ-জীবনী রচনায় একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছে। হরনাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে মনোহর দাসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং কনকলতা দেবীর উপাখ্যানের ইঙ্গিতময় বর্ণনা এবং জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে উপদেশাবলীর অবতারণায় শিক্ষার দীপ্তির সহিত ভক্তির মাধুর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। হরনাথ-জীবনী রচনায় গ্রন্থকার-প্রবর্তিত ধারা তাই বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য।

একই বৎসরে M. V. Rao রচিত Sri Kusum-Haranath, The Lord of Love নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির নামকরণেই লেখকের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। ভক্তপ্রেমিকের দৃষ্টিকোণ হইতে হরনাথের জীবন ও বাণীর অভিনব ব্যাখ্যাই গ্রন্থ-খানির উপজীব্য। হরনাথের ছদ্মবেশ, তাঁহার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তাঁহার আকর্ষণ ইত্যাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাতে শিক্ষাদাতা, পথনির্দেশক ও প্রেমময় হরনাথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। হরনাথের জন্মকাহিনী এবং কুসুমকুমারী দেবীর জীবনীও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবনকাহিনীর উপাদানের অপ্রাচুর্য-হেতু হরনাথ-জীবনী রচনায় গ্রন্থখানির গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু হরনাথের বাণী প্রসঙ্গে এবং লীলাকাহিনীর ভক্তিমধুর ব্যাখ্যায় গ্রন্থটির একটি নিজস্ব মূল্য আছে।

শ্রীরামমূর্তি-রচিত An Introduction to Prabhu Haranath গ্রন্থখানিও এই হিসাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। গ্রন্থটিতে হরনাথের জন্ম সম্বন্ধে গুরু নানকের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

পরম ভক্তিমতী বিমলা মোদী-রচিত হরনাথ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে হরনাথ-জীবনীর বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। হরনাথের বোম্বাই লীলার একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণী ছাড়াও, গৃহী-

হরনাথের একটি মনোমুগ্ধকর চিত্র বিমলা মা-র রচনায় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, লেখিকার নিকট হরগোপালরূপে প্রতিভাত হরনাথের লীলার একটি অপূর্ব চিত্র এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

হরনাথের বাণীসমূহ সংগ্রহ করিয়া লেখিকা হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী ভাষাতে প্রচার করেন।[১] ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Sepuri Lakshminarayansayya-রচিত The Divinity of Haranath the Crazy গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হরনাথের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করা। পরিচিতি হিসাবে ইহাতে হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং জীবনকাহিনীর মৃত্থ পরিসরে বহু মূল্যবান তারিখ ও তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া, হরনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন ভক্তের রচনার নির্বাচিত অংশ সংযোজিত হওয়ায়, গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। কুসুম-হরনাথের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লেখক হরনাথ-লীলার আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বহু হরনাথ-ভক্তের নামোল্লেখ ও হরনাথের সংস্পর্শে আসিবার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ফলে, The Divinity of Kusum-Haranath অংশটিতেও হরনাথ-জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

A. Ramkrishnashastri-রচিত The Inspiring precepts from the Divine Pen of Sri Sri Haranath গ্রন্থটি সর্বাধুনিক। গ্রন্থটির উপজীব্য পাগল হরনাথের উপদেশাবলীর সার-সঙ্কলন হইলেও, হরনাথ-জীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

হরনাথের পৌত্র শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'একান্ত আপন'—প্রথম খণ্ড গ্রন্থটিতে হরনাথ-লীলার নবতর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জীবনীর উপাদানও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উক্ত লেখক

১। ইংরাজী গ্রন্থ—(1) Haranath the Saviour—Parts I & II; (2) My Mission (Part I); (3) Message of Haranath; (4) Haranath as a Householder (Parts I—V); (গুজরাটী)— হরসন্দেশ—তিনখণ্ড (হিন্দী), হরশিক্ষামৃত, (মারাঠী) হরশিক্ষাবলী, প্রকাশকাল ১৯৪৩।

কর্তৃক সংগৃহীত বহু তথ্যের সমন্বয়ে গ্রথিত ও অপ্রকাশিত একটি ইংরাজী পাণ্ডুলিপিও[১] হরনাথ-জীবনী রচনার মূল্যবান উপাদান।

হরনাথ-জীবনী অপেক্ষা হরনাথের উপদেশাবলী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ এবং হরনাথ-তত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের সংখ্যা অধিক। জীবনী গ্রন্থের মতো হরনাথ-বাণী গ্রন্থ রচনা ও প্রচারে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দীই পথিকৃতের গৌরব দাবি করিতে পারেন। তিনিই প্রথম 'শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের পাগলামি' নামক পুস্তকখানিতে হরনাথের কতকগুলি পত্র প্রকাশ করেন।

ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে।[২] ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল এই পত্রসংগ্রহ দুই খণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই সময় হইতেই 'পাগল হরনাথ' গ্রন্থ সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ও দূর-দূরান্তরে প্রচারিত হয় এবং 'পাগল হরনাথে'র পাঠক মাত্রেই এই অপূর্ব পত্রলেখকের নিকট-সংস্পর্শে আসিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ অনুভব করে। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত মিত্র প্রমুখ কলিকাতার কতিপয় ভক্তের চেষ্টায় পাগল হরনাথ—তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় (৪২৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে) এবং ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৪৫২ শ্রীচৈতন্যাব্দে। পুরীধামে 'শ্রীশ্রীহরনাথ অনাথ আশ্রম' নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিন খণ্ড 'পাগল হরনাথ'-এর পত্রাবলীতে বিস্তৃত উপদেশাবলীর শ্রেণী-বিভাগ করিয়া রচিত—'উপদেশামৃত' পুস্তকটিতে 'পাগল হরনাথ'-এর ভাষাই সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং ইহার পূর্বেই 'উপদেশামৃত' গ্রথিত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানির ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, তেলেগু এবং উড়িয়া সংস্করণও প্রকাশিত হয়। খুব সম্ভব পাগল হরনাথের চতুর্থ খণ্ড সি. পি. সিংহ

১। The Supreme Beloved : Tulasidas Banerjee.

২। পরবর্তী সংস্করণে হরনাথের আদেশক্রমে পত্রসংগ্রহখানির 'পাগল হরনাথ' নামকরণ করা হয়।

কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত হয়।[১] ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে 'হরনাথ শিক্ষাসঙ্ঘ' কর্তৃক হরনাথের উপদেশাবলীর পদ্যানুবাদ 'শ্রীমৎ হরনাথ গীতা' প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে হরনাথের উপদেশাবলীর সার-সঙ্কলন Teachings and Sayings of Haranath নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ রচিত হরনাথ লীলার দার্শনিক ব্যাখ্যা 'Haranath Tattwa' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী দহিগৌরী খাম্বোলজা[২] কর্তৃক Letters from Lord Haranath নামে একটি পত্র-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনের পত্রগুলির সমস্তই ডাক্তার খাম্বোলজাকে লিখিত। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে T. Lakshminarayan রচিত Kusum-Hara-Gita প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে হরনাথের উপদেশের সার-সঙ্কলন করা হইয়াছে। Sri M. V. N. Subba Rao এই Kusum-Hara-Gita পুস্তিকাটির foreword অংশ লিখিয়াছেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয় Sree Haranath—His Play and Precepts নামে একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থখানিকে বাংলা উপদেশামৃতের হুবহু অনুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিশিষ্টে সংযোজিত পত্রনিচয়। ইহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত পত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে হরনাথের দেহান্ত ও নবজীবন লাভ সম্বন্ধে পত্র-লেখকের জিজ্ঞাসার উত্তরে হরনাথের উত্তর—ঘটনাটির উপর নূতন আলোকপাত করে। কবিরাজ সত্যচরণ সেন কর্তৃক জন্মান্তর কাহিনীর বর্ণনার মধ্যে ভুল-ত্রুটির সংবাদও এই পত্রে পাওয়া যায়। Unpublished Letters of Lord Haranath-এর প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় পর বৎসরে। পত্রগুলিতে হরনাথ-জীবনীর বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে

১। পাগল হরনাথ: চতুর্থ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৩২

২। Letters from Lord Haranath: Parts 1 & 2 by Dahigouri Khambolja.

Pagal Haranath (Parts I & II) সঙ্কলিত হয় Sri R. Satyalu কর্তৃক। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য পত্রশীর্ষে প্রদত্ত তারিখসমূহ। পত্রে তারিখ না দেওয়াই ছিল হরনাথের বৈশিষ্ট্য। Sri R. Satyalu কর্তৃক সংগৃহীত পত্রগুলিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় The Glory of the Divine Pen—ইহার রচয়িতা T. V. Raja Rao. এই গ্রন্থখানিতে হরনাথের উপদেশাবলীর মধ্যে অন্তর্নিহিত তত্ত্বব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৯১৭ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিটি বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে হরনাথ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে এক বাণী World Message প্রেরণ করিতেন। এই জন্মোৎসব-বাণীসমূহে তাঁহার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিত্যনূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মোহন মুরলী' পুস্তিকায় হরনাথের ইহলীলার সর্বশেষ বিশ্ববাণী মুদ্রিত হইয়াছে। 'মোহন মুরলী' পুস্তিকায় তমালিনী মা-লিখিত বিবরণে হরনাথের জীবনকাহিনী ও অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

এইগুলি ছাড়া হরনাথের জীবৎকালে ও তিরোধানের পর তাঁহার উদ্দেশে রচিত কতিপয় সঙ্গীত পুস্তিকা বাংলা, তেলেগু, গুজরাটী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাগল ভাই নিত্যনিরঞ্জন সেন রচিত 'নামের মালা' (প্রকাশকাল বাং সন ১৩৩৩) এবং 'শরণাগতি' (১৩৩৪), রামগোপাল ভট্টাচার্য রচিত 'হরগাথা' (১৩৩১), কুসুম-হরনাথ সেবাসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'পাগলা-ঝোরা' এবং বিনোদবিহারী রচিত 'বিনোদমালা' উল্লেখযোগ্য।

রচিত সঙ্গীতসমূহে ভক্তহৃদয়ের একটি আকূল আর্তি ও আত্ম-নিবেদনের ভাব পরিস্ফুট। 'নামের মালা' গ্রন্থখানির ভূমিকায় ভক্ত-প্রবর রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন—"ইহা সাহিত্যের বৈঠকে বিচারার্হ নিবন্ধ নহে, ইহা দেব পূজার ধূপ ধুনা, ইহা অটো ডি রোজ নহে, ইহা পবিত্র অগুরু, ইহা বৈদ্যুতিক আলো নহে, ইহা আরতির পঞ্চপ্রদীপ।...পাগল বাবা হরনাথের নাম লইয়া এই পুস্তকের অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছে, সুতরাং গানগুলি আমার

মাথায় রাখিবার যোগ্য হইয়াছে।” ভক্তহৃদয়ের পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনের এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত আধুনিক কালের দুইজন প্রথিতযশা কবি কর্তৃক হরনাথ-প্রশস্তি রচনার কথাও শোনা যায়।[১]

বাংলা সন ১৩৩৮ সাল হইতে ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ইং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ কর্তৃক আনন্দমিলন উৎসবে 'হরনাথ-স্মৃতি' নামে মুদ্রিত দ্বাদশটি পুস্তিকাও হরনাথের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দেয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একখানি করিয়া এবং মধ্যবর্তী পাঁচ বৎসরে বাৎসরিক দুইটি করিয়া 'হরনাথ-স্মৃতি' প্রকাশিত হইত। হরনাথ-জীবনী রচনায় ইহাদের অবদান অপরিহার্য।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, হরনাথ প্রথম জনসমাজে প্রচারিত হন 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন'-এর স্তম্ভে। হরনাথ-লীলার প্রচারে এই পত্রিকার অবদান অপরিমেয়। সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরেও এই পত্রিকার প্রচার ছিল। পত্রিকার সম্পাদক[২] মহাশয় হরনাথের অলৌকিক লীলা-কাহিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া ঠাকুর হরনাথের নাম ও যশ নিখিল ভারতে প্রচারিত করেন। হরনাথের প্রতি তিনি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া উঠেন যে, পত্রিকা-পৃষ্ঠায় হরনাথ সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণী প্রকাশ করেন[৩] এবং ইংরাজীতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি হরনাথ-জীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু আরব্ধকার্য সম্পন্ন করিবার পূর্বেই পরপারের ডাকে তাঁহাকে সাড়া দিতে হয়। মহাত্মা শিশিরকুমার কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ হরনাথ-জীবনী রচনার চেষ্টা সফল না হইলেও, তাঁহার সম্পাদিত হিন্দু

১। কবিশেখর কালিদাস রায় রচিত কবিতার নাম পাওয়া যায় নাই, তবে তিনি যে হরনাথের একজন ভক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত কবিতা 'মোহনমুরলী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্রঃ শ্রীশ্রীহরনাথসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১৮৬।

২। সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, নভেম্বর ১৯০৭ সালে অটলবিহারী নন্দী লিখিত পত্র পত্রিকা-পৃষ্ঠে প্রথম প্রকাশ করেন।

৩। হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর ১৯০৭।

স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় হরনাথ নিখিল ভারতে প্রচারিত হন। হরনাথ-লীলার বহু অলৌকিক কাহিনী পত্রিকা-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় বলিয়া পত্রিকাখানি হরনাথ-জীবনী রচনার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'টিও[১] হরনাথ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মনস্বী রামরাখাল ঘোষের সম্পাদনায় 'গৃহস্থ' নামক আর একটি পত্রিকাতেও হরনাথের জীবনের বহু তথ্য প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ 'পাগল হরনাথ'—৩য় ও ৪র্থ খণ্ড পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পূর্বেই পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত হয়, খুব সম্ভব ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে (বাংলা অগ্রহায়ণ মাসে)।

কটকের হরনাথ হরিসভা (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে 'হরনাথ' নামে একটি পত্রিকা বহুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে বাহির হইত। এই পত্রিকাখানিও হরনাথ-জীবনী রচনার একটি মূল্যবান উপাদান।

প্রখ্যাত হরনাথভক্ত কবিরাজ নিত্যনিরঞ্জন সেন (হরনাথ জগতে যিনি 'পাগল ভাই' নামে পরিচিত) মহাশয়ের সম্পাদনায় 'শ্রীকৃষ্ণ' পত্রিকাটিও হরনাথ-লীলা প্রচারের মাধ্যম ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

হরনাথকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক যুগে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে দ্বিভাষিক The Lord Supreme, ইংরাজী The Divine Pen এবং Jyoti পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক The Hindu, বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্র Parasakti, Kalyan ও Kalyan Kalpataru এবং দেশী-বিদেশী আরও বহু বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় হরনাথের জীবনী ও বাণীর আলোচনা হইতেছে।

হরনাথ-জীবনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান ভক্তজনের অভিজ্ঞতায় মুদ্রিত বিবরণীসমূহ। দ্বাদশ লহরী 'হরনাথ-স্মৃতি' গ্রন্থে ভক্তজনসাধারণের হরনাথ-সাহচর্যের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১। Amrita Bazar Patrika, Calcutta, July 19, 1924 (অমিয় হরনাথ লীলাকথা—প্রথম ভাগ, পৃ. ২১১)

আনন্দমিলন (বিজয়া এবং পৌষালী) উৎসবে সমাগত হরনাথ-ভক্তগণ উৎসব-প্রাঙ্গণে মিলিত হইতেন এবং ঠাকুরের সাহচর্যে আসিয়া যে মাধুর্যের আস্বাদ তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতেন। ভক্তজন-বর্ণিত এই বিবরণীসমূহ হরনাথের জীবনের ও উপদেশাবলীর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দেয়। কিন্তু অবাঙ্গালী ভক্তজনের অভিজ্ঞতার বিবরণ 'হরনাথ-স্মৃতি' গ্রন্থে পাওয়া যায় না ; কারণ, 'হরনাথ-স্মৃতি'র বিবৃতি বাংলাতেই প্রকাশিত হইত। অবাঙ্গালী ভক্তজন The Lord Supreme, The Divine Pen এবং Jyoti প্রভৃতি পত্রিকাসমূহে স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকাতে হরনাথের কোন কোন ভক্ত স্মৃতিচারণা করিয়াছেন। কতিপয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে ভক্তগণের হরনাথ স্মৃতিচারণা সংযোজিত হইয়াছে। তৎকালীন বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক স্বলিখিত বা অপরের লিখিত পুস্তকের উৎসর্গপত্রে হরনাথ-স্মৃতি উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হইয়াছে।[১]

হরনাথ-জননী ভগবতী দেবী, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলা হরনাথের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অবহিত ছিলেন। বালক বেলার ক্রীড়া-সঙ্গিনী এবং পরবর্তী কালে সহধর্মিণী কুসুমকুমারীও হরনাথের জীবনের বহু ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনাবলীর যে অংশ উৎসাহী ভক্তজন কর্তৃক সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে, হরনাথের জীবনের প্রথম চারি দশকের পক্ষে সেগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভর-যোগ্য উপাদান। হরনাথের বাল্যসঙ্গীদের মধ্যে হেমন্ত গাঙ্গুলীর সহিত তাঁহার কথোপকথনের একাংশ ভক্তজন কর্তৃক অনুলিখিত হইয়াছে। অপর একজন বাল্যবন্ধু রসিকলাল দে-র রচনায় হরনাথ-জীবনের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হরনাথের সাহচর্যে আসিয়া-ছিলেন এমন দুই-একজন ভক্ত অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট হরনাথের জীবনীর অনেক ঘটনা জানিতে পারা যায়। এই

১। রায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রভৃতি

জাতীয় ভক্তদের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মজুমদার, রমাপ্রসাদ ঘোষ, পি. রামদাস (অন্ধ্র), বি. আর. মোদী. (বোম্বাই), রায় বাহাদুর সন্তোষকুমার রায়, প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী, শরৎচন্দ্র বিশ্বাস, অজয়কুমার ঘোষ (কটক) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হরনাথের পুত্রবধূ, পৌত্র ও পৌত্রী[১] প্রভৃতির মধ্যে কেহ কেহ হরনাথকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন কোন ঘটনা তাঁহার নিজ মুখ হইতে বা বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যরাজিও হরনাথ-জীবনীর উল্লেখযোগ্য উপাদান। একথা সত্য যে, হরনাথের পরিবারস্থ যাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্তঃলীলাকালে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যাবলীর মধ্যে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত তথ্যসমূহই সবিশেষ মূল্যবান। অন্যান্য তথ্যসমূহ প্রকাশিত গ্রন্থ-সমূহেই পাওয়া যায়।

হরনাথের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার মুখে এবং পৌত্র-পৌত্রী ও জামাতা প্রভৃতির মুখে প্রাপ্ত কাহিনীসমূহ গৃহস্থ ও ব্যক্তিপুরুষ হরনাথের একটি জীবন্ত চিত্র দান করে। ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির জন্য হরনাথের নিকট যে সমস্ত নরনারীর আগমন হইত, তাঁহাদের বর্ণনার মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের ও গার্হস্থ্য জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতি সামান্য। ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁহারা হরনাথের স্বরূপ ও লীলা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিয়াছিলেন এবং অনুভূত সেই সত্যই তথ্য বা তত্ত্বের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কল্যাণী পুত্রবধূর মনে পূজ্যপাদ শ্বশুর ও পূজনীয়া শাশুড়ীর

১। হরনাথের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের সহধর্মিণী অদ্যাবধি জীবিত আছেন, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কনিষ্ঠা পুত্রবধূরূপে হরনাথের গৃহে আসেন। সুতরাং তিনি ৭ বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের এবং সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর ব্যাপিয়া ঠাকুরাণীর সাহচর্যে আসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূলের পুত্রকন্যাগণ এবং কৃষ্ণদাসের পুত্র-কন্যাগণের প্রায় সকলেই ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। মাসীমাতা মতিবালাও গ্রন্থারম্ভকালে জীবিত ছিলেন। ইনি বহুকাল ধরিয়া হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সাহচর্যে ছিলেন।

প্রতি সুগভীর ভক্তি বিরাজ করিলেও, তাঁহাদের নিকট তিনি ছিলেন আদরিণী পুত্রবধূ এবং সেই হিসাবে তিনি তাঁহাদের অনাবিল স্নেহের অজস্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনের অজস্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি গৃহস্থ ও ব্যক্তিপুরুষ হরনাথের যে রূপটি বারেবারে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট তাহা ছিল নেপথ্যচারী। পৌত্র-পৌত্রী ও পৌত্রীদের স্বামীর সহিত হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সম্পর্ক ছিল কৌতুক ও রহস্যমণ্ডিত। নাতি-নাতিনীর আব্দারে হিমালয়ের গাম্ভীর্যও টলিয়া উঠে এবং কৌতুক-রহস্যের মন্দাকিনী ধারা নির্গত হয়। এই সব ক্ষেত্রে হরনাথের যে রূপটি প্রকাশিত হইত, জীবনকাহিনীতে তাহার একটি বিশেষ স্থান আছে। সুতরাং হরনাথের জীবনকাহিনীতে নাতি-নাতিনী, নাত-জামাইদের দেওয়া বিবরণের সবিশেষ মূল্য আছে।

পূর্বসূত্র

বংশ-পরিচয়

ইতিহাস প্রামাণিক তথ্যনির্ভর—প্রমাণ ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যে তথ্যের যাচাই হয় নাই, ইতিহাস তাহাকে স্বীকার করে না অর্থাৎ প্রামাণিকতা ও যৌক্তিকতার অরুণাভাবে ইতিহাসের আরম্ভ।

ইহার পূর্বের যুগ উদয়-পূর্বকালের মতো তমসাচ্ছন্ন—কিংবদন্তীর যুগ—জনশ্রুতিনির্ভর যুগ। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের আরম্ভের পূর্বযুগও কিংবদন্তীর যুগ—সেই কিংবদন্তীর ধারা অনুসরণ করিলে সামাজিক ইতিহাসের যে উৎসস্থলে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইল কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের ঘটনা। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় পাগল হরনাথের বংশ-পরিচয়ের অনুসন্ধান এই সময় হইতেই আরম্ভ করা যাইতে পারে।

কিংবদন্তী-মূলক ইতিহাস অনুসারে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পঞ্চজন সাগ্নিক বিপ্র বঙ্গদেশে আগমন করেন গৌড়াধিপতি আদিশূরের আমন্ত্রণে। এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণই কুলীন ব্রাহ্মণকুলের আদি পুরুষ। ইহাদের নাম, যথাক্রমে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি ও কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের ১৬ জন পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র বরাহ বীরভূমের অন্তর্গত কানানদীর নিকট বন্দ্যঘটী (বর্তমানে বন্দিঘাট নামে পরিচিত) গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। বরাহের পুত্র বৈনতেয়, তৎপুত্র সুবুদ্ধি, তৎপুত্র বিধুধেয়। বিধুধেয়ের পাঁচ পুত্র—আউ, গাউ (গুঞি), হংস, বীর, সুভিক্ষ (ইহাদের মধ্যে আউ অনপত্যো মৃতঃ, হংসঃ পিত্রাপরিত্যক্তঃ, বীরঃ দেশান্তরাগতঃ)। সুভিক্ষের পুত্র অনিরুদ্ধ এবং ভয়াপহ[১]।

১। শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র তাঁহার অমিয় হরনাথ লীলাকথা—প্রথম ভাগ গ্রন্থে হরনাথ বংশধারায় সুভিক্ষকে ধরিয়াছেন। বিধুধেয় বা বিধুধেশের পাঁচ পুত্র।

সুভিক্ষের দুই পুত্রের মধ্যে ভয়াপহকে[১] হরনাথের বংশধারায় ধরা হইয়াছে। ভয়াপহ-সুত ধবল[২], তৎপুত্র মহাদেব, তৎপুত্র মকরন্দ, তৎপুত্র দশো বা দাশরথি[৩], দাশু-সুত বনমালী, বনমালী-সুত ভব ও ভীম, ভীম-সুত হরি, মাধব ও নারায়ণ। মাধবের পুত্র উমাপতি, আদিত্য, অচ্যুত ও দেবেন। আদিত্য-সুত পীতাম্বর, দিবাকর, কুবের, ভাস্কর ও অনন্ত। পীতাম্বর-সুত গঙ্গাগতি, চতুর্ভুজ, ধরাধর, অর্জুন, রুদ্র, রাজ্যধর ও শ্রীধর। ইহাদের মধ্যে চতুর্ভুজ কাঁটাদিয়া গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। চতুর্ভুজের পুত্র লোহাই (লবাই), সবাই এবং সুন্দর। সবাই-সুত শ্রীগর্ভ, গোপীনাথ, মধু এবং কেশব[৪]। শ্রীগর্ভ-সুত গৌরীকান্ত, যদুনাথ, রামনাথ, শ্রীরাম এবং চাঁদ। গৌরীকান্ত বল্লভী মেলগত। গৌরীকান্তের পুত্র রামচন্দ্র, চণ্ডীদাস, ভবানী, জগদানন্দ ও রূপনারায়ণ। সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের পর হইতেই বংশধারায় কৌলীনত্ব ভঙ্গ হয়। এই চণ্ডীদাসের পুত্র বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র বলরাম, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র রাঘব পাঠক চক্রবর্তী, তৎপুত্র গোপীনাথ বা গুপীনাথ। ইনি সিদ্ধ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বোবা গোপীনাথ নামে খ্যাত। ইনি কানে শুনিতে পাইতেন, মুখে কথা বলিতেন না। তাঁর বিবাহে অপরে মন্ত্র পাঠ করেন। গোপীনাথ পুত্র রামেশ্বর বাঁকুড়া জেলার লাউগ্রামে আসিয়া

শ্রীযুত মিত্র কোন কারণ নির্দেশ না করিয়াই সুভিক্ষের অন্য চারি ভ্রাতার উল্লেখ করা হইল না লিখিয়াছেন। (আউ অনপত্যো মৃতঃ, হংসঃ পিত্রাপরিত্যক্তঃ, বীরঃ দেশান্তরগতঃ) শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থের প্রদত্ত এই তথ্যের উপর নির্ভর করিলে তিন ভ্রাতার নাম উল্লেখের কারণ থাকে না। কিন্তু গাউকে বাদ দিবার কোন কারণও থাকে না। গাউ হইতে মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ বংশে অধস্তন দশম পুরুষ রাঢ়ীয়, গাউ-সুত হাকুচ হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বৈদ্যনাথ-সুত ঈশান প্রথম কুলীন হন। [দ্রঃ ভাগবত মিত্রের 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা' বংশ-পরিচয় অধ্যায়।]

১। অন্যকারিকা মতে ভয়াপহ উত্তর রাঢ়ী বলিয়া অভিহিত।

২। শ্রীযুক্ত মিত্রের মতে 'ধরণী'। ইহা ভুল পাঠ বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির মতে ভয়াপহ-সুত ধবল, অমর এবং বিশ্ববাহু। ধবল-সুত মহাদেব এবং নীলাম্বর। মহাদেব-সুত চক এবং মকরন্দ।

৩। অন্যকারিকা মতে [দ্রঃ পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।]

৪। ইনি হড়সিদ্ধান্তী।

বসবাস করেন। তৎপুত্র মদনমোহন, তৎপুত্র গঙ্গাধর (বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যাবাসী), তৎপুত্র পৃথ্বীধর জামবনীতে বাস করেন। পৃথ্বীধরের পুত্র সীতানাথ কনকলতা দেবীর কন্যা নিস্তারিণী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র যজ্ঞেশ্বর সোনামুখী গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামমুরলী, তৎপুত্র কুঞ্জবিহারী, তৎপুত্র মদনগোপাল, তৎপুত্র শ্রীকান্ত, তৎপুত্র জয়রাম, তৎপুত্র হরনাথ।

উপর্যুক্ত বংশ-তালিকা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যজ্ঞেশ্বর হইতেই সোনামুখী গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ইতিহাস আরম্ভ। সোনামুখীর চট্টোপাধ্যায় পাড়ানিবাসী কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা—লক্ষ্মী ও কমলা। জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মীর সহিত যজ্ঞেশ্বরের বিবাহ হয়। কুমুদবন্ধুর পুত্রসন্তান না থাকায় যজ্ঞেশ্বর জামবনী হইতে শ্বশুরালয় সোনামুখীতে আসিয়া বাস করেন। কনকলতা দেবীর জীবিতকালেই যজ্ঞেশ্বর সোনামুখীতে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি অপ্রকট হইলে পর কনকলতা দেবীর দৌহিত্র যজ্ঞেশ্বরকে আরাধ্য দেবতা শ্যামসুন্দর তাঁহাকে জামবনী হইতে সোনামুখীতে লইয়া আসিবার জন্য স্বপ্নাদেশ দেন। তদনুসারে যজ্ঞেশ্বর শ্যামসুন্দরকে সোনামুখীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। কুমুদবন্ধুর তিরোধানের পর যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামমুরলী, মাতামহের চাটুয্যে পাড়ায় জমি ও পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্ত সম্পত্তি প্রায় ১৩০ বিঘা জমির অর্ধেক পাইয়াছিলেন। মাতামহের সম্পত্তির অর্ধেক পাইয়াছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্রের অধস্তন পুরুষ চাটুয্যেদের দৌহিত্র বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বর্তমানে চাটুয্যে বংশ অবলুপ্ত। রামচন্দ্রের পুত্র কুঞ্জবিহারী, তৎপুত্র মদনগোপাল, তৎপুত্র শ্রীকান্ত। সম্ভবতঃ বাং ১১৬৬ সালে (ইং ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীকান্তের জন্ম হয়।

শ্রীকান্তের দুই স্ত্রী—ভদ্রকালী* ও আদরমণি। তৎকালীন প্রথামত শ্রীকান্তের ১৪ বৎসর বয়সে ভদ্রকালীর সহিত প্রথম বিবাহ হয়। ভদ্রকালীর গর্ভে চারিটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

* নামটি ভাগবত মিত্রের স্বকপোল কল্পিত। কারণ হরনাথের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শিবনারায়ণ এই নাম মনে করিতেও পারেন নাই।

আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভদ্রকালী তাঁহার নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল ঘোর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ এবং রুক্ষ প্রকৃতি। শোনা যায়, তিনি তাঁহার স্বামীকে সমার্জনী প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তথাপি তাঁহার প্রতি শ্রীকান্ত কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন না। স্ত্রীর ব্যবহারে উত্যক্ত হইলেও শ্রীকান্ত কদাপি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কথা চিন্তা করিতেন না এবং ভদ্রকালীর রুদ্র শাসনাধীনে তিনি জীবনের ৪২ বৎসর হাসিমুখে কাটাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং স্বভাবতঃই তাঁহার প্রকৃতি ছিল শান্ত। শান্তিপ্রিয়তার সহিত কিয়ৎ-পরিমাণে ভীরুতাও তাঁহার চরিত্রে বর্তমান ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় পরদুঃখকাতর। তাঁহার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের মূলে এই পরদুঃখকাতরতাই বিদ্যমান ছিল। কার্যোপলক্ষে শ্রীকান্তকে একবার বেলিয়াড়া গ্রামে যাইতে হয়। তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর। বেলিয়াড়া গ্রামে হরিশরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা আদরমণির বিবাহোপলক্ষেই সম্ভবতঃ তিনি বেলিয়াড়া যান। কিন্তু গভীর রাত্রে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিশরণকে জাতিচ্যুতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকান্ত তাঁহার কন্যা আদর-মণিকে বিবাহ করেন। এই আদরমণির গর্ভে জয়রাম জন্মগ্রহণ করেন। 'জয়রাম' নামটি বিশেষ অর্থদ্যোতক। জাতকের নামকরণের পশ্চাতে বহু পারিবারিক ঘটনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রভাব বিস্তার করে। জয়রামের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়া-ছিল। তাঁহার জন্মদিনে কিংবা জন্মের কয়েকদিন পূর্বে শ্রীকান্ত একটি মামলায় জয়লাভের সংবাদ পান। এই জয়ের ধ্বজা যখন শ্রীকান্তের ভাগ্যাকাশে উড্ডীন হইল, তখনই তাঁহার পুত্রের জন্ম হয়। জয়রাম নাম রাখার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই।

যে মামলায় শ্রীকান্ত জয়লাভ করিলেন, সেই মামলা ছিল তাঁহার কুলদেবতা রাধা-শ্যামসুন্দরকে লইয়া। এই মামলা বাধিয়াছিল শ্রীকান্তের পিতামহ কুঞ্জবিহারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলচাঁদের পৌত্র পূর্ণানন্দ (পিতা গৌরীকান্ত) এবং প্রপৌত্র দুর্লভ (পিতা উচ্ছবানন্দ),

শঙ্করপুত্র শ্রীদাম, হারাধন, রামকানাই, রামচাঁদ ও দামোদর এবং গোকুলচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র ও রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র ঠাকুরদাস প্রভৃতির সহিত। শ্রীকান্ত এই মামলায় বাদী ছিলেন। এই মামলার বিচার করিয়াছিলেন বর্ধমানের পণ্ডিতসভা। জজসাহেবের আদেশক্রমে দুইজন পণ্ডিত সোনামুখীতে আসেন রাধাশ্যামসুন্দরের স্বর্ণপাদপদ্মে কাহাদের নাম লেখা আছে দেখিবার জন্য। বাদী ও প্রতিবাদীদের কাহাকেও আদালত ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু প্রতিবাদিগণ একজন চতুর লোককে সোনামুখীতে প্রেরণ করিয়া সোনামুখীর ধুলাই কামারকে দিয়া নিজেদের ও পিতৃপিতামহের নাম লিখাইয়া লইয়াছিলেন।[১] আগত পণ্ডিতদ্বয়ের অভিজ্ঞদৃষ্টিতে নামগুলি যে সদ্য খোদাই করা তাহা ধরা পড়িল। বিশেষ অনুসন্ধানে তাঁহারা ইহাও অবগত হইলেন যে, যজ্ঞেশ্বরপুত্র রামমুরলী শ্যামসুন্দরের বামে অবস্থিত পৃথক স্বর্ণমূর্তিটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বর্ধমানে ফিরিয়া রায় দিলেন কুঞ্জবিহারীর বংশধরেরা ঐ বিগ্রহ পাইবেন।[২]

এই মামলায় জয়লাভের সহিত সদ্যোজাত পুত্রের নামকরণের একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনে হয়। জয়রামের জন্মতারিখ হইল বাং ১২১২ সালের ৫ই বৈশাখ। পাগল হরনাথের পিতা এই জয়রাম।

১। শ্যামসুন্দরের স্বর্ণপাদপদ্মের নীচে ঠাকুরদাস, রামকানাই, দুর্লভ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর প্রভৃতি নাম এবং শ্রীমতীর স্বর্ণপাদপদ্মের নীচে শ্রীদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচাঁদ, পূর্ণানন্দ লেখানো হইয়াছিল। এই নামগুলি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। পরে প্রকাশ পাইয়াছিল ঠাকুরদাসের নাম তাহার অনুমতি ব্যতিরেকেই লেখানো হইয়াছিল। এই মামলা চারি বৎসরকাল ধরিয়া চলিয়াছিল।

২। এই মামলাটির রায় হয় ১২১২ সালে ইং ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আপীল কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে হয় নাই। তখন বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং প্রিভি কাউন্সিলে এই মামলার আপীল হওয়ার বিষয়ে যে জনশ্রুতি, তাহা সত্য না হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা।

জয়রামের জীবনী

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীকান্তের দুই স্ত্রী—ভদ্রকালী ও আদরমণি। আদরমণিকে বিবাহ করিবার পূর্বেই প্রথমা স্ত্রী ভদ্রকালীর গর্ভে শ্রীকান্তের কয়েকটি পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে (১) হংসেশ্বর, তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ (অপুত্রক)। (২) বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র রাজারাম। (৩) রামদয়াল (তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ, গিরিশ ও কন্যা বগলা বিবাহের পূর্বে মৃত)। (৪) জগন্নাথ (অপুত্রক)। (৫) কন্যা মন্দাকিনী (বিধবা ও অপুত্রক)।

স্বামীগৃহে ভদ্রকালীর ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। ভীষণা প্রকৃতির এই নারীকে শ্রীকান্ত মনে মনে যথেষ্ট ভয় করিতেন। পরদুঃখকাতর হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতে আদরমণিকে বিবাহ করিয়া শ্রীকান্ত ভদ্রকালীর কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন।

ভীষণা প্রকৃতি ভদ্রকালীর সপত্নী-বিদ্বেষ যে ভয়াবহ হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে পারিবারিক শান্তি যে সমূলে বিনষ্ট হইবে, এ-বিষয়ে শ্রীকান্তের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তথাপি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীকান্ত নবপরিণীতা পত্নী একাদশবর্ষীয়া আদরমণি-সমভিব্যাহারে সোনামুখীতে আসিলেন। সপত্নী-দর্শনে ভদ্রকালীর জিঘাংসা লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। পিতামাতার আদরের কন্যা আদরমণিকে সপত্নী-বিদ্বেষের আগুনে দগ্ধ হইতে হইল। এইভাবে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। বিদ্বেষ-জর্জরিত আদরমণির গর্ভে জয়রাম জন্মগ্রহণ করিলেন। এইবার ভদ্রকালীর সপত্নী-বিদ্বেষ ভীষণ আকার ধারণ করিল। জয়রামের অন্নপ্রাশনে শ্রীকান্তের প্রচুর অর্থব্যয় বিদ্বেষের সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দান করিল। ভদ্রকালী আদরমণি ও শিশু জয়রামের উপর অকথ্য নির্যাতন করিতে লাগিলেন। অত্যাচার চরমে উঠিলে প্রতিবেশীগণের পরামর্শে শ্রীকান্ত আদরমণি ও জয়রামকে শ্বশুরালয় বেলিয়াড়ায়

প্রেরণ করেন। শিশু জয়রাম পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে শ্রীকান্ত স্ত্রীপুত্রকে পুনরায় সোনামুখীতে লইয়া আসিলেন, কিন্তু ভদ্রকালী আদরমণি ও শিশুকে গৃহে প্রবেশ পর্যন্ত করিতে দেন নাই। সুতরাং স্বামীগৃহের আশা চিরতরে বিসর্জন দিয়া আদরমণি শিশুপুত্রকে লইয়া পুনরায় পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং সেইখানেই ২৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। স্বামীগৃহবাসে বঞ্চিত হইলেও স্বামীর প্রেম, ভালবাসা ও সাহচর্য লাভে আদরমণি বঞ্চিত হন নাই।

ভদ্রকালীর সপত্নী-বিদ্বেষ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীকান্তের মনে আদরমণির প্রতি স্নেহপ্রীতি ও ভালবাসা দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। দীর্ঘ দিনের অদর্শন ও বিরহ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ফলে, প্রায়ই তিনি আদরমণির পিতৃগৃহ বেলিয়াড়া গ্রামে যাতায়াত করিতেন, সঙ্গে লইয়া যাইতেন প্রচুর জিনিসপত্র। যখন নিজে যাইতে পারিতেন না, তখন অন্য লোক দ্বারাও জিনিসপত্র পাঠাইতেন। ভদ্রকালীর অগোচরেই শ্রীকান্তের বেলিয়াড়ায় দ্রব্যাদি প্রেরণ চলিত। কারণ, ভদ্রকালী জানিলে সমার্জনী প্রহার ও বাক্যবাণে তাঁহাকে জর্জরিত হইতে হইত। স্ত্রীর এইরূপ প্রবল অত্যাচার শ্রীকান্ত নীরবে সহ্য করিতেন, অশান্তির ভয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না। এইজন্য শ্রীকান্তকে স্ত্রৈণ বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হয়। *স্ত্রৈণ ব্যক্তি স্ত্রীর বিরোধিতা করিতে পারেন না।* সেইজন্য স্ত্রৈণ না বলিয়া শ্রীকান্তকে নির্বিরোধ প্রকৃতির একজন ভীরু ভদ্রলোক আখ্যা দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত।

যাহা হউক, মাতুলালয়ে জয়রাম বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই গ্রামের এক পাঠশালায় তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করা হয়। উক্ত পাঠশালায় সংস্কৃতজ্ঞ গুরুমহাশয়ের নিকট জয়রাম সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গুরুমহাশয় তাঁহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

উপনয়নের পর মাতুলগৃহের দামোদর শিলা পূজা করার ভার তাঁহাকে দেওয়া হয়। তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। এই পূজা

সমাপন করিতে জয়রামের ২।৩ ঘণ্টা লাগিত। কারণ, পূজায় বসিয়া নারায়ণ স্মরণ করিবামাত্র তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। সাধনা করিয়া এই ধ্যানের অবস্থা তাঁহাকে অর্জন করিতে হয় নাই।

জয়রামের ধ্যানাবস্থা তাঁহার মাতা, মাতুল ও প্রতিবেশীগণের নিকট নিদ্রাবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সেজন্য তিনি প্রায়ই তিরস্কৃত হইতেন। তথাপি তাঁহার গভীর ধ্যানের অবস্থার উপশম হইল না। তখন তাঁহাকে দামোদর পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। ইহাতে জয়রামের মনে দারুণ নির্বেদ উপস্থিত হয়।

ক্ষুব্ধ জয়রাম দারকেশ্বর নদীতীরে জঙ্গলে আত্মহত্যা করিতে যান। পথিমধ্যে বেলিয়াড়া গ্রামবাসী এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। উক্ত ব্যক্তির নিকট জয়রাম আত্মহত্যার কারণ বিবৃত করায়, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে মাতুলালয়ে ফিরাইয়া আনেন।

লোকটির মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়া জয়রামের মাতা ও মাতুল পুনরায় তাঁহাকে দামোদর পূজার অধিকার দান করেন। জয়রামের গভীর ধ্যানাবস্থার বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরও ধারণা ছিল না। অপর সকলের মতো তাঁহারও ধারণা ছিল যে, তিনি পূজা করিতে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন।

এক সন্ন্যাসীর আগমনে তাঁহাদের সকলেরই এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইল। পূজানিরত জয়রামকে দেখিয়া এই সন্ন্যাসী চমৎকৃত হন। যে অবস্থাকে সকলে জয়রামের নিদ্রা বলিয়া মনে করিতেন, তাহা যে গভীর ধ্যানাবস্থা সন্ন্যাসী ইহা সর্বসমক্ষে প্রচার করেন। ইহার এক বৎসর পরে এক দৈবজ্ঞ জয়রামের করকোষ্ঠী দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি ধার্মিক প্রকৃতির, তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে এবং পুত্রদের মধ্যে একজন মহাপুরুষরূপে লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

দৈবজ্ঞের চতুষ্পার্শে বেলিয়াড়ার বহু নরনারী ভিড় করিয়াছিলেন। এত লোকের সামনে অতগুলি পুত্রকন্যা হইবে বলায় জয়রাম মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হন এবং দৈবজ্ঞের গণনাকে ব্যর্থ করিবার জন্য সেইদিন হইতেই তিনি আজীবন কৌমার্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প করেন।

পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে জয়রামের মাতৃবিয়োগ হয় এবং ষোড়শ বর্ষে তিনি পিতৃহারা হন। শ্রীকান্তের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া জয়রামের মাতুল রামতারণ মুখোপাধ্যায় জয়রামকে সঙ্গে লইয়া সোনামুখীতে আগমন করেন কিন্তু জয়রামের বিমাতা সপত্নীপুত্রকে গৃহে প্রবেশাধিকার দেন নাই। ভদ্রকালীর এতাদৃশ ব্যবহারে সোনামুখী গ্রামের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা অতিশয় বিরক্ত হন। সকলে মিলিয়া ভদ্রকালী ও তাঁহার পুত্রদিগকে জয়রাম সম্বন্ধে বহু অনুরোধ-উপরোধ করেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা বৃথা হয়।

ভদ্রকালী জয়রামকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীকান্তের জ্ঞাতিভ্রাতা নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া জয়রামকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান এবং সেখানে পৃথকভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

এইবার জয়রামের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। মাতুলালয় হইতে আগত জয়রামকে স্নেহকোমল বৃদ্ধ নফরচন্দ্র আর মাতুলালয়ে পাঠাইলেন না। তিনি জয়রামকে মাসিক তিন টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কলিকাতার গালার আড়তে পাঠাইয়া দেন। নফরচন্দ্র কর্তৃক জয়রামকে গালার আড়তে নিয়োগ জয়রামের জীবনে সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা করে।

নূতন কর্মচারী নূতন কর্মস্থানে আসিয়া সবিশেষ মনোযোগ-সহকারে কাজ শিখিতে থাকেন এবং সুদীর্ঘ কালের কর্মসাধনায় গালা-ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি কিছুকাল মধ্যেই কলিকাতায় এক গালার আড়ত খুলিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কলিকাতার ৪১নং বাঁশতলা লেনে তাঁহার এই আড়ত স্থাপিত হয়।

সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় জয়রাম গালার ব্যবসায়ে অদ্বিতীয় বিচক্ষণতা লাভ করেন। সেই সময় Messrs Rally Brothers, Petrocachino Brothers এবং মিশন রোডস্থিত গালার হাটে গালার কাজ খুব জোর চলিত। এই সকল ফার্মের সাহেবগণ ও অন্যান্য মহাজনগণ গালার সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিবার জন্য

জয়রামের নিকট আসিতেন।[১] তিনি ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জেলার বড়া গালা দেখিয়া তাহাতে কতটা খাঁটি মাল জন্মাইবে ও কি প্রকার রং হইবে বলিয়া দিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার পত্নী ভগবতী দেবীরও দক্ষতা কম ছিল না। ইহার কারণ সোনামুখী ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল হইতে জয়রামের কর্মচারী লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গালার নমুনা আনিতেন, তাহা দেখিয়া ভগবতী দেবী ক্রয়যোগ্য গালা নির্বাচন করিতেন।

সোনামুখীতে তিনি ছোট ছোট দুইটি গুদামঘর নির্মাণ করেন। গালা কিছু জমিলে ভগবতী দেবী উক্ত মাল গরুর গাড়িতে করিয়া কলিকাতার আড়তে পাঠাইয়া দিতেন। জয়রাম যখন নফরচন্দ্রের আড়তে কাজ করিতেন, তখনও ভগবতী দেবী এই বড়া গালা খরিদ ও প্রেরণ করিবার ভার গ্রহণ করেন। ১২৭১।৭২ সালে নফরচন্দ্রের পুত্রগণ ইহার প্রতিবন্ধক হন এবং তাহাদের খরিদের বড়া গালার দোষ ধরা পড়ায় জয়রাম বিরক্ত হইয়া পৃথক আড়ত খুলেন। সোনামুখীতে সেকালে প্রচুর গালা জমিত এবং এই গালাকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। "It is from Bishnupur that the East India Company were chiefly supplied with the articles of shellac."[২] সোনামুখীর চারিপার্শ্বে পলাশবনের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের চিহ্ন আজও প্রমাণ করে যে, বিষ্ণুপুরের গালা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল সোনামুখী।

ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় গালার আড়তে জয়রাম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সেই সময় কেহই তাঁহার সেবা করিতে অগ্রসর হয় নাই। রোগ-যন্ত্রণায় কাতব ও তৃষ্ণার্ত জয়রামের সেইদিন উপলব্ধি হয় যে, স্ত্রীপুত্র ব্যতীত এ সংসারে আপনজন কেহ নাই এবং সেই রোগতপ্ত মস্তিষ্কেই তিনি দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষকালের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া রোগমুক্তির পর বিবাহ করিবার নূতন সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর।

১। অমিয় হরনাথ-লীলাকথা: প্রথম খণ্ড—ভাগবত মিত্র, পৃ: ১৯
২। Interesting Historical Events by Holwell, পৃ: ২০০

বসন্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জয়রাম কলিকাতা হইতে সোনামুখী আগমন করেন। তাঁহার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প বৃদ্ধ নফরচন্দ্রের কর্ণগোচর হয়। আনন্দিতচিত্তে নফরচন্দ্র জয়রামের উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে থাকেন এবং অবশেষে সোনামুখীর ব্রাহ্মণপাড়ায় উজ্জ্বল তর্কালঙ্কার উমাকান্ত চক্রবর্তীর ভ্রাতা কার্তিকচন্দ্রের কন্যা ভগবতী দেবীকে পাত্রীরূপে মনোনীত করেন। নফরচন্দ্রই বরকর্তা হইয়া কথাবার্তা কহিয়া ও পাত্রীকে যথারীতি আশীর্বাদ করিয়া বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেন। ছয় মাস পরে ১২৪২ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ভগবতী দেবীর সহিত জয়রামের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে জয়রাম যে ছয় কাঠা পৈতৃক জমি পাইয়াছিলেন, তাহার উপর দুইখানি বাসোপযোগী উলুখড়ের গৃহ নির্মাণ করেন। কিছুদিন পরে আরও দুইখানি ঘর আবশ্যকমতো নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বিবাহের পর কলিকাতা গমনের পূর্বে তিনি বিমলা হাড়িনী নামে একজন দস্যুকন্যা ও দস্যুর স্ত্রীকে গৃহের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

ভগবতী দেবীর বারো বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র সারদাপ্রসাদ ১২৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪৬ সালে চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণের জন্ম হয়। ১২৬৬ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে ভগবতী দেবীর প্রথমা কন্যা কমলার জন্ম হয়। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭০ সালে ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শিবনারায়ণের জন্ম হয়। ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ় তাঁহার চতুর্থ পুত্র হরনাথের জন্ম হয়। ১২৭৩ সালের ২০শে চৈত্র ৪১ বৎসর বয়সে ভগবতী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা বগলার জন্ম হয়। ১২৭৫ সালের ৯ই পৌষ (ইংরাজী ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬৮ সাল) জয়রাম পরলোকগমন করেন। হরনাথের বয়স তখন তিন বৎসর পাঁচ মাস কুড়ি দিন মাত্র।

স্বামীর মৃত্যুর পর ভগবতী দেবী স্বামী কর্তৃক ন্যস্ত সমস্তদায়িত্ব হাসিমুখে বহন করেন। পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি, নাতিনীগণ পরিবৃত অবস্থায় ২১শে ফাল্গুন ১৩০৯ সালে (ইং ৫ই মার্চ ১৯০৩ সালে) ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

ভগবতী দেবীর পিতৃবংশ-পরিচয়

হরনাথ-জননী ভগবতী দেবী স্বামী অপেক্ষা প্রায় কুড়ি বৎসরের ছোট ছিলেন। দশম বর্ষে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের দিন হইতে তাঁহাকে স্বামীগৃহের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, শ্বশুর ও শাশুড়ী বিবাহের, এমন কি তাঁহার জন্মেরও, বহু পূর্বে পরলোকগত হইয়াছিলেন।

অল্পবয়স্কা বালিকার তত্ত্বাবধানের জন্য জয়রাম বিমলা নামে এক হাড়িনীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবতী ও জয়রাম উভয়েরই বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার কর্মপটুতাও ছিল অসাধারণ। সংসারের শ্রমসাধ্য কার্যগুলি এবং বাড়ীর বাহিরের সমস্ত কর্ম বিমলাই করিতেন। তিনি ভগবতীর উপরও কর্তৃত্ব করিতেন। কিন্তু প্রকৃত কর্ত্রী ছিলেন ভগবতী দেবী। সহজাত প্রখরবুদ্ধিবলে তিনি সেই অল্প বয়স হইতেই স্বামীর বহু কষ্টার্জিত অর্থের যাহাতে কণামাত্র অপব্যয় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং অতুলনীয় ব্যবস্থাপনা ও মিতব্যয়িতার গুণে পারিবারিক সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

ভগবতী দেবীর পিতৃকুল পাণ্ডিত্যের ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁহার পিতৃকুলের উর্ধ্বতন ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ পুরুষে রাজ-দত্ত চক্রবর্তী উপাধিধারী মহেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠতাত উমাকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বর্ধমানাধিপতি রাজা তেজচন্দ্রের কর্ণগোচর হয় এবং মহারাজ তাঁহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তখন তিনি তর্কালঙ্কার উপাধি পান নাই। সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরে মহারাজ তেজচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ ঘটে। ক্ষৌরকর্ম না করিয়া মাতার পার-লৌকিক কার্য করিতে অভিলাষী রাজা সভাপণ্ডিত উমাকান্তের সমর্থন

চাহেন। উমাকান্ত ইহাতে আপত্তি জানাইলে, মহারাজ দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী আনয়ন করিয়া এক মহতী সভার আয়োজন করেন এবং ক্ষৌরকর্মের বিপক্ষে পণ্ডিতমণ্ডলীর মত চাহেন। রাজার সন্তোষবিধানার্থ পণ্ডিতমণ্ডলী ক্ষৌরকর্ম না করিয়াই মাতার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করা যায় এই মর্মে রায় দেন। উমাকান্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করেন। পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সুপারিশে মহারাজা উমাকান্তকে তর্কালঙ্কার উপাধি দান করেন। রাজাও উমাকান্তের মতবাদ গ্রহণ করেন।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় দত্তক পুত্র মহতাবচাঁদ বাহাদুর ১৮৪৩ সালে বর্ধমানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালেও উমাকান্ত বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করেন এবং দীর্ঘদিন উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া মহারাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যুর ১০ বৎসর পূর্বে সভাপণ্ডিতের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই তর্কালঙ্কার মহাশয় হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন বলিয়া কথিত আছে। হরনাথের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, হরনাথ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম প্রকৃতই অবগত হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার বংশের কন্যা সহজাত শক্তিবলেই যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবে, ইহা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মতো। ভগবতী দেবীর শাস্ত্রজ্ঞান যে অসামান্য ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, গর্ভাবস্থায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচনা-চক্রে তাঁহার স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করার জনশ্রুতি হইতে।

ভগবতী দেবী ছিলেন অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্না এবং মিতব্যয়ী মহিলা। স্বামীর সামান্য উপার্জন হইতে তিনি যে শুধু সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন তাহা নয়, আয়ের একটা বিরাট অংশ তিনি সঞ্চয়ও করিয়াছিলেন। অলঙ্কারের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আসক্তি ছিল না। ব্যবসায়কর্মে স্বামীকে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পরেও তিনি দীর্ঘ সতের বৎসর কাল কলিকাতার

গালার আড়ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। সোনামুখীতে বসিয়াই তিনি কলিকাতার কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে যথাযথ আদেশ দিতেন। ইহা অসাধারণ দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। শিশুপুত্রদের শিক্ষার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। হরনাথের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহ দেখিয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং পুত্রদের বিবাহও যথাসম্ভব আড়ম্বরের সহিত দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি একটি ইষ্টক-নির্মিত দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন অতিশয় ধার্মিক প্রকৃতির মহিলা—সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল অসাধারণ। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় স্বামীকে উৎসাহদান, জনশ্রুতির নায়ক যে সন্ন্যাসীর হরনাথের জন্মের পূর্বে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার আপ্যায়ন ও সৎকার—তাঁহার দেব-দ্বিজে ভক্তির পরিচয় দান করে।

তাঁহার একটিমাত্র দোষ ছিল—কার্পণ্য দোষ।

মিতব্যয়িতা মাত্রাতিরিক্ত হইলে এই দোষ জন্মিতে বাধ্য। জয়রামের হিসাবের খাতায় প্রাপ্ত অংশে দেখা যায় তাঁহার সংসারের জন্য বাজার খরচ ছিল দৈনিক দুই পয়সা মাত্র। সংসার বাড়িলেও বাজার খরচের জন্য বরাদ্দ পয়সার বৃদ্ধি হয় নাই।

কন্যা ও পুত্রদিগের প্রতি ভগবতী দেবীর স্নেহ ছিল অপরিমিত। ফলে, শিবনারায়ণ অনেক বেশী বয়স অবধি সংসারের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভগবতী দেবীর মৃত্যুর পর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হয়। তিনি যদি সংসার সম্বন্ধে একটুমাত্র সচেতন হইতেন, তাহা হইলে ভগবতী দেবীকে গালার ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিতে হইত না। মাতার স্নেহদৌর্বল্য হরনাথের জ্ঞানলাভে আগ্রহের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। জ্ঞান-লাভের প্রবল আগ্রহে হরনাথ সোনামুখীর পাঠ শেষ করিয়া কুচিয়া-কোল হাই স্কুলে পড়িতে যান। সেখানকার শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বর্ধমান রাজ-কলেজে দুই বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া এফ্. এ. পাস করেন। তৎপরে কলিকাতায় মেট্রোপলিটান

কলেজে ভর্তি হইয়া বি. এ. পড়িতে থাকেন। কিন্তু পর পর তিনবার ফেল করিবার পর পড়া ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভগবতী দেবীর পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ যত প্রবল ছিল, পুত্রবধূদের প্রতি স্নেহ তেমন ছিল না। তাঁহাদের আহার্য, পরিধেয় প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্তরের ছিল। অভাবের জন্য নয়, কার্পণ্যের জন্যও নয়, ইহা পুত্রবধূদের প্রতি শ্বশ্রূমাতার চিরন্তন মনোভাবের ফল।

বাড়ীতে মাছ আসিলে তাহার সমস্ত টুক্‌রাগুলি পুত্রকন্যাদের এবং তাহাদের পুত্রকন্যাদের দেওয়া হইত, পুত্রবধূদের দেওয়া হইত না। পুত্রবধূদের প্রতি ভগবতী দেবীর এই মনোভাব সম্বন্ধে কুসুমকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া একজন ভক্ত যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে।[১]

"ভগবতী দুই পুত্রবধূকে ভাল বস্ত্র পরিতে বা ভাল খাইতে দিতেন না। বস্ত্রের কথা বলিলে ছেঁড়া বস্ত্র সেলাই করিয়া পরিতে বলিতেন। আহার সম্বন্ধে পুত্রবধূগণকে বিশেষ কষ্ট দিতেন। ঘরে আম, কাঁঠাল, গুড় থাকিলেও দুই পুত্রবধূকে এক ধামি করিয়া মুড়ি দিতেন, প্রাণ ধরিয়া আম কাঁঠাল দিতে পারিতেন না। মধ্যাহ্নে কেবলমাত্র এক থালা ভাত, ভাতের উপর খানিকটা ডাল ঢালা ও দুইটা তিনটা কাঁচা লঙ্কা ও সামান্য পরিমাণ শাকের ঘণ্ট দিতেন। বধূগণ কোনদিনও মাছের মুখ দেখিতে পাইতেন না। যে মাছ আসিত তাহাকে ১৬ খণ্ড করা হইত। ৮ খণ্ড থাকিত শিবুর জন্য, ৪ খণ্ড থাকিত হরুর জন্য, আর বাকি ৪ খণ্ড শিবনারায়ণের কন্যা বিনোদিনী ও হরনাথের কন্যা ইন্দুমতীর জন্য থাকিত।"

এই একটিমাত্র দোষ ছাড়া ভগবতী দেবীর চরিত্রে আর কোনও দোষ ছিল না। তিনি অতিশয় ধর্মশীলা রমণী ছিলেন। প্রত্যহ অনাহারী দুই-একজনকে ভোজন না করাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। নররূপী নারায়ণের সেবা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। যেদিন উপবাসী কেহ অন্নগ্রহণের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইত না, সেইদিন হরনাথকে কোলে লইয়া কন্যা কমলা পাড়ায় ঘুরিয়া উপবাসী ব্যক্তিকে সাদরে

১। অমিয় হরনাথ-লীলাকথা: প্রথম ভাগ—পৃ: ১৮০-১৮১

আহ্বান করিয়া আনিতেন। হরনাথের জনসেবায় দীক্ষা এইভাবে অতি অল্প বয়স হইতেই হইয়াছিল।

মাতার দৃষ্টান্তে হরনাথ শিশু বয়স হইতেই শিখিয়াছিলেন, জীব সেবাই শিব সেবা।

প্রচলিত ধারণা এই যে, ভগবতী দেবী সত্যই দেবী ছিলেন। পরম ভক্তিমতী কনকলতা দেবীই জন্মান্তরে ভগবতী দেবীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কনকলতা দেবী জামবনি গ্রামে বাস করিতেন। ইনি গঙ্গাধর বংশীয় গোস্বামী বংশের কন্যা। এই গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠিত বসুধা-জাহ্নবী পরিবারের অন্তর্গত। কনকলতা ঠাকুরানীর পিতার নাম বিষ্ণুচরণ। জামবনী-নিবাসী মাধব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র লক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে কেবল দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে— জ্যেষ্ঠার নাম নিস্তারিণী ও কনিষ্ঠার নাম অভয়া। জ্যেষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণীর সহিত পৃথ্বীধর-পুত্র সীতানাথের বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা অভয়ার সহিত পুরুলিয়া গ্রামনিবাসী দীননাথ গোস্বামীর বিবাহ হয়। জামবনীর কনকলতা দেবীর শ্বশুরবংশের কুলদেবতা ছিলেন শ্যামসুন্দর জীউ। স্বামীর অবর্তমানে কনকলতা বিগ্রহের সেবা করিতেন। তাঁহার তিরোধানের পর জ্যেষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণী ও জামাতা সীতানাথকে বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। নিস্তারিণী দেবী স্বামী-বিয়োগের পর তাঁহার পুত্র যজ্ঞেশ্বরের নিকট আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময় কনকলতা দেবীর শ্যামসুন্দর যজ্ঞেশ্বরকে স্বপ্নাদেশ করেন যে, তাঁহাকে শীঘ্র জাম-বনি হইতে সোনামুখীতে লইয়া আসা হউক। কনকলতা দেবী যেদিন তিরোধান করেন, সেইদিন রাত্রে যজ্ঞেশ্বর এই স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন। স্বপ্নে তিনি ইহাও অবগত হন যে, কনকলতা দেবী পুষ্করিণীতে তিরোহিত হইয়াছেন। যাহা হউক, যজ্ঞেশ্বরের এই স্বপ্নাদেশের কথা গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল এবং গ্রামবাসী অনেকেই যজ্ঞেশ্বরের সহিত জামবনীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। মধ্যাহ্নের পূর্বে যজ্ঞেশ্বর অন্যান্য গ্রাম-বাসিগণ-সমভিব্যাহারে জামবনীতে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে, স্বপ্ন সত্যে

পরিণত হইয়াছে। কনকলতা দেবী পুষ্করিণীতে তিরোহিত হইয়াছেন। কনকলতা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা অভয়া মাতৃ-বিয়োগের শোকে অধীর হইয়া তখনও কাঁদিতেছিলেন এবং পূর্বদিন সন্ধ্যা হইতে তখন পর্যন্ত জেলেরা পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া কনকলতা দেবীর মৃতদেহের ব্যর্থ অনুসন্ধান করিতেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, পূর্বদিন অপরাহ্ণে কন্যা ও জামাতার সম্মুখ দিয়া কনকলতা দেবী স্নানার্থে পুষ্করিণীতে নামিয়াছিলেন, আর উঠেন নাই। সেদিন ছিল পূর্ণিমা—উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে অনুসন্ধানের কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ অনুসন্ধানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সত্য দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর কনকলতার মৃতদেহ অনুসন্ধান করিবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন এবং স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী শ্যামসুন্দরকে সোনামুখী ভবনে লইয়া আসেন। তদবধি শ্যামসুন্দর সোনামুখীতেই আছেন। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামমুরলী সুবর্ণ দ্বারা শ্রীমতীর পৃথক মূর্তি নির্মাণ করাইয়া শ্যামের বামে স্থাপন করেন। তাহাই বর্তমানে যুগলবিগ্রহ রাধাশ্যামসুন্দর নামে পরিচিত।

কনকলতা দেবী অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। তিনি শ্যাম-সুন্দরকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করিতেন। জামবনীর লক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায় এই বিগ্রহের সেবায়েত ছিলেন। স্বামীর বংশে পুরুষের অভাবহেতু গোস্বামী বংশের কন্যা কনকলতা দেবী বিগ্রহের সেবা করিতেন। পুরোহিত পূজা করিতেন এবং কনকলতা দেবী স্বয়ং ভোগ রাঁধিতেন। নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তিনি ঠাকুরের ভোগ দিতেন। এই ভোগ রন্ধন করিতে করিতে শ্যামসুন্দরের প্রতি তাঁহার মনে এক অদ্ভুত মমত্ববোধ জন্মে। জননীর অন্তরে পুত্রের জন্য যে অনাবিল মমতা, কনকলতার মনে শ্যামসুন্দরের প্রতি সেই মমত্ববোধ জন্মিল। ভোগরন্ধন-রত কনকলতার ভাবদৃষ্টিতে শ্যামসুন্দর চিন্ময় হইয়া উঠিলেন। অদ্ভুত এক অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি উপলব্ধি করিতেন, কিসে তাঁহার শ্যামের অসুবিধা হয়, কোন্ খাদ্যে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইবে, কোন্ ব্যঞ্জন তাঁহার শ্যামের মুখে বিস্বাদ লাগিবে। অপূর্ব

নিষ্ঠায় এই পরম ভক্তিমতী রমণী শ্যামের আহার্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকেন এবং পরম স্নেহে সেগুলি শ্যামসুন্দরের সম্মুখে সজ্জিত করেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেন অন্নব্যঞ্জন শ্যামসুন্দরের ভাল লাগিয়াছে কিনা? খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিতে চাহিতেন কোন্ ব্যঞ্জনে তাঁহার তৃপ্তি হইয়াছে, কোন্ ব্যঞ্জন তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। ভাবগ্রাহী জনার্দন ভক্তের আকুলতায় নীরব থাকিতে পারিতেন না। অপূর্ব স্নেহশীলা এই রমণীর স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া তিনি অন্নব্যঞ্জন সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেন এবং খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে স্বীয় ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিতেন। এইভাবে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কনকলতা দেবী শিশুপুত্রস্থানে কুলদেবতা শ্যামসুন্দরকে কোলে করিতে থাকেন। আবার চৈতন্যোদয় হইবামাত্র বিগ্রহের অঙ্গহানি হইবার আশঙ্কায় সত্বর বেদীতে রাখিয়া দিতেন। এইভাবে স্নেহময়ী যশোদার দুলাল কনকলতার স্নেহের দুলালে পরিণত হন এবং তাঁহার স্নেহ-দুর্বলতা লইয়া লীলা করিতে থাকেন।

কনকলতা দেবী শ্যামসুন্দরের প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। অন্নব্যঞ্জনের আস্বাদ সম্বন্ধে শ্যাম যেরূপ মন্তব্য করিতেন, প্রসাদগ্রহণরত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও সাধুপুরুষেরাও ঠিক তেমনি আস্বাদ পাইতেন। শ্যাম যদি বলিতেন, কোন ব্যঞ্জনে লবণ দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরাও সেই ব্যঞ্জনে লবণের আস্বাদ পাইতেন না, কোন ব্যঞ্জনে অতিরিক্ত ঝাল হইয়াছে বলিলে ব্রাহ্মণেরাও অনুরূপ স্বাদ পাইতেন। শ্যামের এই সমস্ত উক্তি নির্বিচারে বিশ্বাস না করিয়া কনকলতা দেবী ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন। ব্যঞ্জন সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্যের সহিত শ্যামের মন্তব্য মিলিয়া যাইত। আহারে শ্যামের কষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া কনকলতা দেবীর দুঃখের সীমা থাকিত না। তিনি আরও সাবধান হইতেন, অধিকতর যত্নসহকারে রন্ধনকার্য করিতেন। মাতৃহৃদয়ের এই আকুলতা শ্যামসুন্দর পরিতৃপ্তি সহকারে উপভোগ করিতেন। অথচ যেদিন কনকলতা দেবী বলিতেন যে, অপরের দ্বারা ভোগ রন্ধন করা হইবে,

সেইদিন শ্যামসুন্দর বলিতেন তাহা হইলে তাঁহার খাওয়াই হইবে না। তাহার পর হইতে শ্যামের খেলা বন্ধ হইত।

কনকলতা দেবীর ভোগরন্ধনের খ্যাতি এইভাবে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের মুখে মুখে দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে ভগবান অন্নব্যঞ্জন সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইত না। দিনের পর দিন প্রসাদপ্রার্থীর সংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল। অথচ কনকলতা দেবীর রন্ধনপাত্রসমূহের কোন পরিবর্তন হইল না। তিনি সেই পাত্রেই রন্ধন করেন।

সমাগত প্রসাদপ্রার্থীর সংখ্যা যতই হউক না কেন, সকলকেই পরিতোষসহকারে ভোজন করেন। দৈব মাহাত্ম্য ব্যতিরেকে ইহা হওয়া সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, কনকলতা দেবীর রন্ধন-করা ভোগের এক অপূর্ব সুবাস ও আস্বাদ থাকিত। ইহাকে এই পৃথিবীর বলিয়া মনে হইত না। স্বাদে, গন্ধে, অপূর্ব-মনোহর এই প্রসাদান্ন সত্যই দেবতার প্রসাদ ছিল।

শুধু প্রসাদের ব্যাপারে নয়, অপরাপর দুই-একটি বিষয়েও শ্যামসুন্দর ও কনকলতা দেবীর সম্পর্কে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একবার শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরের একটি শালের কড়ি পরিবর্তনের আবশ্যক হয়। কড়ির জন্য কনকলতা দেবী যে শালগাছটি কাটান, উহা লম্বায় এক হাত ছোট হয়। মিস্ত্রীদের এই কথা শুনিয়া কনকলতা দেবী শ্যামসুন্দরকে ইহা বলিলে, শ্যামসুন্দর বলেন উহাতেই হইবে। মিস্ত্রীরা পুনরায় মাপিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। কড়িটা মাপে এক হাত বাড়িয়াছিল। প্রত্যহ শ্যামের জন্য শাক ভাজা হইত। কোনদিন শাক না পাওয়া গেলে কনকলতা দেবী শ্যামসুন্দরকে পূর্বাহ্ণে জানাইতেন। শ্যাম বলিতেন, 'তুমি তিনদিন পূর্বে জমিতে যে শাক বীজ বপন করিয়াছ সেখান হইতে শাক সংগ্রহ করিয়া আন।' সেই অবধি প্রচুর শাক ক্ষেত হইতে পাওয়া যাইত।

বন-বিষ্ণুপুরের রাজা একবার মৃগয়া করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলেন। মন্দিরের আলো দেখিয়া তিনি তথায় আসেন এবং পথপ্রদর্শনের জন্য আলো প্রার্থনা করেন। একটিমাত্র প্রদীপ ছাড়া

অপর কোন আলো না থাকায়, সমস্যার সমাধানের জন্য কনকলতা দেবী শ্যামসুন্দরকে অনুরোধ করেন। শ্যামসুন্দরের নির্দেশক্রমে মন্দিরের নিকটে উপবিষ্ট মশালধারী একটি লোক রাজাকে পথ প্রদর্শন করেন ও অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে প্রাসাদে পৌছাইয়া দেন।

একদা একটি বৃহদাকার বন্য ব্যাঘ্র মন্দিরসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্র-দর্শনে ভীত হইয়া প্রসাদপ্রার্থীরা মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করেন। কনকলতা দেবী ব্যাঘ্রকে কুকুরের মত মারিতে থাকেন। তথাপি ব্যাঘ্র মন্দির-চত্বর ত্যাগ করিল না। অবশেষে দৈববাণী অনুসারে কনকলতা দেবী ব্যাঘ্রের সম্মুখে প্রসাদান্ন রাখেন। সানন্দে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ব্যাঘ্র ভীষণ গর্জন করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে।

কনকলতা দেবীর তিরোধান সম্বন্ধে উপাখ্যানটি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয়। কারণ, তাঁহার তিরোধান উপলক্ষেই শ্যামসুন্দরবিগ্রহ সোনামুখীতে আনীত হন।

যেদিন অপরাহ্ণে কনকলতা দেবী তিরোহিত হন, সেদিন মধ্যাহ্নে প্রসাদ পরিবেশনের সময় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাসমভিব্যাহারে জামাতা দীননাথ আগমন করেন। লোকপরম্পরায় কনকলতা দেবীর অলৌকিক ভোগ রন্ধনের কথা অবগত হইয়া কন্যা ও জামাতা দেখিতে আসেন। তাঁহারা যখন মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌছিলেন, তখন কনকলতা দেবী প্রসাদপ্রার্থীদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তকে অবগুণ্ঠন ছিলনা। কন্যার সহিত জামাতাকে দেখিয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন। কিন্তু অবগুণ্ঠিত হইবার কোন উপায় ছিল না। তাঁহার দুই হস্তই পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত ছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি পশ্চাদপসরণ করিতে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে কচি দুইটি শ্যামল হস্ত পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার মস্তকোপরি অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়। চকিতের মধ্যে বাহির হইয়া গুণ্ঠন টানিয়া দিয়া হস্ত দুইটি নিমেষ মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহার জামাতা ইহা দর্শন করিয়া ভক্তিপ্লুত অন্তরে তাঁহার চরণে

গড়াগড়ি দিতে থাকেন। কিন্তু সেইদিন অপরাহ্নেই তিনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে নামিয়া আর উঠেন নাই।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, হরনাথ-জননী ভগবতী দেবীই কনকলতা ঠাকুরানী। কনকলতা ঠাকুরানী শ্যামসুন্দরকে পুত্ররূপে সেবা করিয়াছিলেন, শ্যামসুন্দরকে পুত্ররূপে পাইলে তাঁহাকে কোলে লইতে পারিবেন—এই আশা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন এবং কখনও কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া বিগ্রহকে কোলে লইয়া বসিতেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণের জন্য ভগবান জন্মান্তরে কনকলতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবার আশ্বাস দান করেন এবং হরনাথরূপে ভগবতীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হন। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় নাই। কারণ, ইহা কিম্বদন্তীমাত্র। ভক্তের বিশ্বাসই ইহার উৎপত্তিস্থান। ভক্তের ভগবান বিশ্বাসে কোন কিছুই অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। আবার, হিন্দু ধর্মও জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। লীলার জন্য মানব-জন্ম পরিগ্রহণ করেন এবং মানবদেহ ধারণ করিয়া মানবলীলা করেন—এই বিশ্বাসও হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত। সুতরাং, ভক্তবৃন্দের বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্মমত-বিরোধী বলা চলে না।

জয়রাম ও তাঁহার পুত্র-কন্যার বিবরণ

জয়রাম—জন্ম ৫ই বৈশাখ ১২১২ সাল ইং ১৮০৫ সাল, বিবাহ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১২৪২ সাল ইং ১৮৩৫, মৃত্যু ৯ই পৌষ ১২৭৫ সাল ইং ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬৮। মৃত্যুর সময় ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৪ বৎসর বয়সে মাতৃ-বিয়োগ হয়, ১৫ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। তাঁহার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা।

পত্নী ভগবতী দেবী—৩রা আশ্বিন ১২৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন (ইং সেপ্টেম্বর ১৮২৫ সাল)। মৃত্যু ২১শে ফাল্গুন, শুক্লাষ্টমী, বৃহস্পতিবার, ১৩০৯ সাল (ইং ৫ই মার্চ ১৯০৩ সাল)। মৃত্যুর সময় ৭৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ১২ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৩৪ বৎসর বয়সে কন্যা কমলার জন্ম হয়। ৩৮ বৎসর বয়সে তৃতীয় পুত্র শিবনারায়ণের জন্ম হয়। ৪০ বৎসর বয়সে চতুর্থ পুত্র হরনাথের জন্ম হয়। ৪১ বৎসর বয়সে কন্যা বগলার জন্ম হয়। ৪৩ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ৬০ বৎসর বয়সে গালার ব্যবসায় বন্ধ করেন।

১। জয়রামের প্রথম পুত্র সারদাপ্রসাদ ১২৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়। উপনয়ন হইবার কয়েক মাস পরে পরলোকগমন করেন। সারদাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতে ধীর প্রকৃতির বালক ছিলেন।

২। জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণ ১২৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র ১০ বৎসর বয়সে ১২৫৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম পুত্র সারদাপ্রসাদ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্দর্পনারায়ণকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার আকৃতি, গলার স্বর, চলনের ভঙ্গী ঠিক যমজ ভ্রাতার ন্যায় ছিল। দুই ভাই সর্বদাই এক সঙ্গে থাকিতেন। দুই ভ্রাতার ভিন্ন দেহ হইলেও তাঁহারা হরিহর

আত্মা ছিলেন। ১২৫৩ সালে ৯ বৎসর বয়সে সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হইবার সময় কন্দর্পনারায়ণের বয়স মাত্র ৭ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু কন্দর্পনারায়ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুতে মুহ্যমান হইয়া পড়েন ও সর্বদা তাঁহার শোকে বিমর্ষ থাকিতেন। হাসিখেলা চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপভাবে থাকিতে থাকিতে কন্দর্পনারায়ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার হাঁপানি কাশির লক্ষণ দেখা যায়। সোনামুখীতে দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার কবিরাজি চিকিৎসা হয়। ইহাতে কিছু না হওয়াতে, জয়রাম তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া সাত-আট মাস চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হয় নাই। তাই জয়রাম বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সোনামুখীতে আনেন। ইনি ১২৫৬ সালে ১০ বৎসর বয়সে মারা যান।

৩। জয়রামের তৃতীয় সন্তান কন্যা কমলা ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ; অর্থাৎ, তখন ভগবতী দেবীর বয়স ৩৪ বৎসর আর জয়রামের বয়স ৫৪ বৎসর। দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণের ১২৫৬ সালে মৃত্যু হইলে পর ১০ বৎসর পরে এই কন্যার জন্ম হয়। কাজেকাজেই, কমলা বড় আদরের কন্যা ছিলেন। জয়রাম ও ভগবতী দেবী কমলাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভগবতী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর ৭।৮ বৎসর পর তাঁহার আর পুত্র-কন্যা হইবে না, এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল। প্রতিবেশিনীরা আর সন্তান হইল না বলিয়া দুঃখ করিতেন। ভগবতী দেবী সর্বদাই কুলদেবতার নিকট পুত্র কামনা করিতেন। একদিন স্বপ্নে শুনেন, যেন শ্যামসুন্দর বলিতেছেন, তুমি প্রত্যহ অন্ততঃ একজন অতিথিকে অন্নদান করিলে শীঘ্রই সন্তান লাভ করিবে। সেই অবধি প্রত্যহ অতিথি ভোজন করাইতেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কন্যা কমলাকে লাভ করেন। ভগবতী দেবী তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অতিথি-সেবাব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। সত্য বলিতে কি, সেই ব্রত অদ্যাপি হরনাথ-সংসারে সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

জয়রাম ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাসে কমলার বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। গাত্রহরিদ্রাদি শুভকার্য সকলও করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ার

সন্নিকট শুশুনা-নিবাসী শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু কমলার বিবাহ তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ, ৯ই পৌষ ১২৭৫ সালে তিনি ইহলীলা শেষ করেন। ১২৭৬ সালের মাঘ মাসে কালাশৌচ যাইলে ভগবতী দেবী কমলার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে তিনি অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কমলার পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়। প্রথম পুত্র শরৎচন্দ্র, দ্বিতীয় পুত্র হেমচন্দ্র, তৃতীয় পুত্র মনীন্দ্র, চতুর্থ পুত্র নলিন ও পঞ্চম পুত্র পুলিন। হরনাথের তিরোধানের পর ৫ই আষাঢ় ১৩৩৬ সালে (ইং ১৯শে জুন ১৯২৯ সাল) কমলার ৬৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

কমলা দেবী হরনাথকে সর্বদা কোলে করিয়া বেড়াইতেন। আঁতুড় হইতে তিন-চারি বৎসর বয়স পর্যন্ত হরনাথ কমলার কোলে কোলে থাকিতেন। হরনাথের উপর কমলার স্নেহ ভগবতী দেবী অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। হরনাথের বাল্যজীবনের অনেক কথা তিনি বলিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে পুরীধামের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথদেবের নবকলেবর দেখিবার জন্য সমবেত পাঁচ লক্ষ যাত্রীদের মধ্যে কমলা দেবী ও শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনোদিনী হারাইয়া যান। বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনা হয়।

৪। জয়রামের তৃতীয় পুত্র শিবনারায়ণের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭০ সালে জন্ম হয়। শিবনারায়ণ যে পাঠশালায় ভর্তি হন, সেই পাঠশালায় হরনাথ এক বৎসর পরে ভর্তি হইয়াছিলেন। শিবনারায়ণের পাঠশালার সহপাঠিগণের নাম—(১) রামবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) তেজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৪) মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৭৯ সালের ২০শে চৈত্র শিবনারায়ণ ও হরনাথের একসঙ্গে উপনয়ন হয়। উপনয়নকালে শিবনারায়ণের বয়স প্রায় ১০ বৎসর ও হরনাথের বয়স প্রায় ৮ বৎসর হইয়াছিল। স্কুল ছাড়িবার পূর্বে ভগবতী দেবী শুক্লাসপ্তমী, বৃহস্পতিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৮৩ সালে (ইং ২৭শে জুলাই ১৮৭৬ সাল) বাঁকুড়া জেলার গোপবাঁদী গ্রামে শিবনারায়ণের বিবাহ দেন। শিবনারায়ণের স্ত্রীর নাম গোলাপসুন্দরী ওরফে বিহারিণী। বিবাহের সময় শিবনারায়ণের ১৩

বৎসর বয়স হইয়াছিল ও তাঁহার স্ত্রী গোলাপসুন্দরীর ১১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বাল্যকালে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বিবাহের সময়ে গোলাপসুন্দরীকে ৮।৯ বৎসরের বালিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ৩রা মাঘ ১২৮৮ সালে শিবনারায়ণ ও তাঁহার স্ত্রী একত্র বাঁকুড়া জেলার গোপীনাথপুর-নিবাসী তাঁহাদের কুলগুরু বিশ্বম্ভর গোস্বামী দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

শিবনারায়ণের একটি কন্যা ও দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যার নাম বিনোদিনী, ইনি ও হরনাথের ভগিনী কমলা জগন্নাথ-দেবের নবকলেবর ও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে হরনাথের সহিত পুরী গিয়া হারাইয়া গিয়াছিলেন। শিবনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র গোকুলচন্দ্র। ইনি কাশ্মীরে হরনাথের নিকট থাকিতেন ও পাঞ্জাব হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র নকুলচন্দ্র বিবাহের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(ক) কন্যা বিনোদিনীর জন্ম কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, সোমবার ২৮শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩ সাল (ইং ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৬)। ১৩ই আষাঢ় ১৩০৩ সাল (ইং ২৬শে জুন ১৮৯৬) শুশুনার কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ২৭শে পৌষ ১৩২৫ সালে (ইং ১১ই জানুয়ারি ১৯১৯ সালে) স্বামী-বিয়োগ হয়। হরনাথ নিজে কালীকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসেন ও কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর নবম দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাকে নিমতলাঘাটে সৎকার করা হইয়াছিল। হরনাথ সেই সময় কলিকাতায় ছিলেন। ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৭ সালে (ইং ১৬ই আগস্ট ১৯৩০ সালে) বিনোদিনীর মৃত্যু হয়। বিনোদিনী দুই পুত্র ফকিরচাঁদ ও দ্বিজপদ এবং দুই কন্যা রানী ও রেণুকা রাখিয়া গিয়াছেন।

(খ) প্রথম পুত্র গোকুলচন্দ্রের জন্ম ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল (ইং ৭ই জুন ১৮৯০ সাল)। দুই বিবাহ—প্রথমা স্ত্রীর নাম মিরণবালা বা ফুলকুমারী। ফুলকুমারীর গর্ভে কন্যা কনকলতা ও পুত্র নন্দলাল জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম যমুনাসুন্দরী।

(গ) দ্বিতীয় পুত্র নকুলচন্দ্রের জন্ম ৩রা আশ্বিন ১৩০৮ সাল

(ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০১ সাল)। ১৭ বৎসর বয়সে ১০ই শ্রাবণ ১৩২৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

৫। জয়রামের চতুর্থ পুত্র হরনাথ—জন্ম ১৮ই আষাঢ় ১২৭২ সাল (ইং ১৯শে জুলাই ১৮৬৫), অন্নপ্রাশন ১৪ই ফাল্গুন ১২৭২ সাল (ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬)। বিদ্যারম্ভ ১২ই মাঘ ১২৭৬ (ইং ২৪শে জানুয়ারি ১৮৭০ সাল), উপনয়ন ২০শে চৈত্র ১২৭৯ (ইং ১লা এপ্রিল ১৮৭৩)। বিবাহ ১৭ই মাঘ ১২৮৫ (ইং ২৯শে জানুয়ারি ১৮৭৯)। দীক্ষা ৫ই চৈত্র ১২৯০ (ইং ১৭ই মার্চ ১৮৮৪)। তিরোভাব ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ (ইং ২৫শে মে ১৯২৭)। হরনাথের তিন কন্যা ও দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৬। জয়রামের কন্যা বগলা—জন্ম ২০শে চৈত্র ১২৭৩ সাল, মৃত্যু ৭ই চৈত্র ১২৮০ সাল। ৭ বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়।

হরনাথের দুই পুত্র ও তিন কন্যার বিবরণ

(ক) কন্যা ইন্দুমতী—জন্ম ৯ই শ্রাবণ ১২৯৪ সাল, মামার বাড়ীতে জন্ম হয়। ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩০৩ সালে সোনামুখীতে সিদ্ধান্তপাড়া-নিবাসী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইনি বি. ডি. আর. রেলে স্টেশনমাস্টারের কাজ করিতেন। ২৩শে ভাদ্র ১৩০৯ সালে মৃত্যু হয়। কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই।

(খ) দ্বিতীয়, পুত্র অনুকূল—জন্ম মামার বাড়ীতে, ১১ই বৈশাখ ১২৯৭ সাল, শুক্লাচতুর্থী, বুধবার (ইং ২৩শে এপ্রিল ১৮৯০)। দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ কোচডিহি গ্রামে। স্ত্রীর নাম সন্তোষকুমারী। সন্তোষকুমারীর গর্ভে প্রথমা কন্যা সুষমাসুন্দরী, (ডাকনাম মেনকুর), কোচডিহি গ্রামে মামার বাড়ীতে জন্ম হয়। সুষমাসুন্দরীর চারিটি পুত্রকন্যা ; যথা—(১) রাম, (২) শ্যাম, (৩) লক্ষ্মী, (৪) মণ্টু। অনুকূলচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়বার প্রসবান্তে প্রসূত পুত্রসন্তানসহ সোনামুখীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অনুকূলচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ নায়েকবাঁধ গ্রামে। স্ত্রীর নাম স্নেহলতা। ১৩ই বৈশাখ ১৩২১ সালে বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ৪টি পুত্র ও ৩টি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্র ও কন্যাগণের নাম—(১) রবিনারায়ণ, (২) অনিল, (৩) বিজয়, (৪) কন্যা পুষ্প, (৫) সুনীল, (৬) কন্যা আরতি, (৭) কন্যা সুনীতি।

হরনাথের কুলগুরু সিতিকণ্ঠের পুত্র কুলদা গোস্বামীর নিকট অনুকূল দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুকূল ও গোকুল কাশ্মীরে অবস্থানকালে পাঞ্জাবের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিলেন। অনুকূল পাটের ব্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্য তিন বৎসর ১৬৮নং আপার সার্কুলার রোডস্থ নারায়ণচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩৬৬ সালের (ইং ১৯৫৯) ১লা ভাদ্র পরলোকগমন করেন।

(গ) তৃতীয়, কন্যা সুবাসিনী—জন্ম নিজবাটীতে, ১৩ই আষাঢ় ১৩০০ সাল (ইং ২৬শে জুন ১৮৯৩)। ছয় বৎসর বয়সে মামার বাড়ীর

পুষ্করিণীঘাটে কুসুমকুমারীর ভগিনী দামিনীর ৭ বৎসরের কন্যা অমূল্যরানীর সহিত একত্রে ডুবিয়া মৃত্যু হয়। মধ্যাহ্নে আহারান্তে দুইজনে হাত ধুইতে যায়। পুকুরপাড়ের কাষ্ঠ স্থানচ্যুত হওয়াতে দুইজনে জলে পড়িয়া গিয়া দৈবদুর্বিপাকে জলমগ্ন হইয়াছিল। হরনাথ সে সময়ে কাশ্মীরে ছিলেন।

(ঘ) চতুর্থ, কন্যা রাইমতি—জন্ম নিজবাড়ীতে, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল (ইং ৯ই জুন ১৮৯৫ সাল)। কালনার মহাপ্রভুর বাটীর নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। মামার বাড়ীতে ২৬শে মাঘ ১৩২০ সালে একটি কন্যা প্রসব করার পর ৯ দিন পরে মৃত্যু হয়। কন্যাটি ২১ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। রাইমতি অটলবিহারী নন্দী ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট হাতরাসে থাকিতেন। রাইমতি অটলবাবুর স্ত্রীকে সারিমা বলিয়া ডাকিতেন। হরনাথ অটলবাবুর স্ত্রীকে সারি বলিতেন। ১৯০৩ সাল হইতে বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত রাইমতি অটলবিহারীর নিকট ছিল। বিবাহের সময়ে অটলবিহারী ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

(ঙ) পঞ্চম, পুত্র কৃষ্ণদাস—জন্ম কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্মু শহরে ৪ঠা কার্তিক ১৩০৬ সাল (ইং ২০শে অক্টোবর ১৮৯৯)। মাঝডোবা-নিবাসী জয়রামের মাতুল বংশের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরীবালার সহিত ১২ই বৈশাখ ১৩২৭ সালে বিবাহ হয়। কৃষ্ণদাসের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—(১) সুবলসখা, (২) বসন্ত, (৩) তুলসীদাস, (৪) কন্যা চন্দনা। গোপীনাথপুর-নিবাসী কুলগুরু সিতিকণ্ঠ গোস্বামীর পুত্র কুলদাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস ২৪নং মিডিল রোডের রামরাখাল ঘোষের বাড়ীতে ৬ বৎসর থাকিয়া ম্যাট্রিক পড়েন ও পরে কটকে যোগেশচন্দ্র ঘোষের নিকট ছাপরা শহরে থাকিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। কৃষ্ণদাস হরনাথের কৃতী সন্তান ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন ধীর, তেমনি নম্রপ্রকৃতির ও করুণার আধার। মাঝডোবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সোনামুখী মিউনিসিপ্যালিটির ২নং ওয়ার্ডের একজন কমিশনার (এপ্রিল ১৯৩৭ হইতে মার্চ ১৯৪১) ছিলেন। কৃষ্ণদাসের ১৩৬০ সালের ১৪ই আষাঢ় (ইং ২৬শে জুন ১৯৫৩) মৃত্যু হয়।

সোনামুখী পরিচিতি

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রাম পাগল হরনাথের জন্মস্থান। বিখ্যাত না হইলেও, নানা দিক দিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত এই গ্রামখানি।

প্রাকৃতিক পরিবেশই এই গ্রামখানিকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। উত্তর সীমানায় প্রবাহিত শালি নদী বর্ষাকালে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অন্যান্য ঋতুতে ইহা মন্দগামিনী ও স্বচ্ছতোয়া। দক্ষিণ সীমানায় হিংস্র জীবজন্তু-সমাকুল নিবিড় অরণ্যানী পূর্ব ও পশ্চিম সীমার কিয়দংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। গ্রামখানির চতুর্দিকে কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র। সকল দিক দিয়াই গ্রামখানির বিশেষত্ব গোচরীভূত হয়। সুদূর অতীত কাল হইতে সোনামুখী রেশম, তসর, গরদ এবং লাক্ষা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনেও ইহার স্থান উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সোনামুখী শহরের মধ্য দিয়া জেলার প্রধান রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে। বি. ডি. রেলওয়ে স্থাপিত হইবার পূর্বে বাঁকুড়া ও বর্ধমান শহরের সহিত সংযোগসূত্র রচনা করিয়াছিল মাত্র এই রাজপথটি। আর একটি পথ এই শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে; ইহা পানাগড়ের নিকট গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং বিষ্ণুপুরের নিকট অহল্যাবাঈ রোড—ভারতের এই দুইটি প্রধান রাজপথের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতেই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই পথটি। মাত্র এই রাজপথটির সাহায্যেই নিখিল ভারত সোনামুখীর নিকট-প্রতিবেশী হইয়া উঠিয়াছে। অতীত যুগে এই রাজপথ বাহিয়া কত তীর্থযাত্রী গিয়াছে ভারতের নানা তীর্থে, কত বণিক গিয়াছে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া, আবার কত যুদ্ধাভিযান গিয়াছে দেশজয় ও লুণ্ঠনমানসে। কথিত আছে, সুলেমান কর্ণাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় এই পথ ধরিয়াই গিয়াছিলেন হিন্দু দেবদেবী ধ্বংসের অভিযানে। সোনামুখীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বর্ণমণ্ডিত মুখখানি অপহরণ

করিয়া ও দেবীমূর্তিকে অস্ত্রাঘাত করিয়া কালাপাহাড় তাঁহার জঘন্য হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

সোনামুখীর সীমানায় সুনিবিড় অরণ্যানীর গভীরতা একদিকে যেমন মহাঘোরা মহাকালিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, অপরদিকে তেমনি ইহার ঘন-শ্যামল পত্রশোভা পরমশরণ শ্যামসুন্দরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার পার্শ্বে প্রবহমানা ক্ষুদ্র তটিনীর বর্ষার রুদ্র মূর্তি একদিকে যেমন রুদ্রাণীর কথা স্মরণ করায়, অপরদিকে তেমনি ইহার মৃদুমন্দ কলতান স্মরণ করাইয়া দেয় কিশোরীর নবোদ্গত প্রেমের অর্ধস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি। এক কথায়, সোনামুখীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর ভাসিয়া বেড়ায়, পরস্পর বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের সুর বাজিয়া উঠে।

শহরের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ের সুরটি শোনা যায়। শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অরণ্যচণ্ডিকার, এককালে ছিল সুবর্ণমণ্ডিত বদন, তাই তাঁহার নাম স্বর্ণমুখী বা সোনামুখী। তাঁহার নামানুসারেই স্থানটির নাম হইয়াছে সোনামুখী। পূর্ব সীমান্তে গিরিগোবর্ধন— স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে বৈষ্ণব সাধকচূড়ামণি মনোহর দাসের সমাধি-মন্দির। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার অপূর্ব মিলনক্ষেত্র এই সোনামুখী। এখানে যেমন শক্তিপূজার প্রাচুর্য, বৈষ্ণব মহোৎসবেরও তেমনি অপ্রতুলতা নাই। এখানকার অধিবাসিগণ যেমন আনন্দময়ীর আগমনে আত্মহারা হন, শ্যামামায়ের চরণতলে লুটাইয়া পড়েন, বুড়াশিবের গাজনে আনন্দে নাচিয়া উঠেন, তেমনি আবার মনোহর দাসের মহোৎসবে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব উৎসবে অকৃত্রিম উৎসাহে মাতিয়া উঠেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনার এই দুই ধারার এখানে সমন্বয় সাধন হইয়াছে সুদূর ঐতিহাসিক কাল হইতেই। কোনটিকেই সোনামুখী ছোট মনে করে নাই, কোনটিকেই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বাদ দেয় নাই, বরং প্রত্যেকটিকেই ধর্ম-সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম-সমন্বয়ের অপূর্ব লীলাস্থল এই সোনামুখী তাই ধর্ম-জগতের ইতিহাসে একটি ঐতিহ্য ও বিশেষত্বে মণ্ডিত স্থান।

সোনামুখী একটি অতি প্রাচীন গ্রাম—অধিষ্ঠাত্রী দেবী সোনামুখীর বিগ্রহটিই ইহার প্রমাণ; মূর্তিটি সাত-আট শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং শহরটির বয়সও যে সাত-আট শত বৎসরের কম নয়, ইহা সহজেই অনুমেয়। বীর হাম্বিরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সোনামুখীর মধ্য দিয়া পলায়নকালে কালাপাহাড় সোনামুখী দেবীর সোনার মুখখানি অপহরণ করেন। গিরিগোবর্ধন ও বুড়াশিবের মন্দির আক্রমণ করেন বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, তাহা সত্য হইলে সোনামুখীর উৎপত্তি যে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সোনামুখীর প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ—মনোহর দাসের সমাধি-মন্দির। মন্দিরটি অবশ্য অর্বাচীন কালের, কিন্তু মনোহর দাস বীর হাম্বিরের সমসাময়িক। মনোহর দাসের আগমনের পূর্বে সোনামুখী ছিল শাক্ত সাধনার পীঠস্থান, তান্ত্রিকতার লীলাক্ষেত্র। শহরমধ্যে দুর্গা এবং মহাকালীর পূজার অতি বাহুল্য প্রাচীন কালের সেই তান্ত্রিক সাধনার স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। শাক্ত সাধনার এই পীঠস্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারমানসে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজন্যবৃন্দ ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শাক্ত সাধনার ধারা ইহাতে অবলুপ্ত হয় নাই। মল্লরাজগণের চেষ্টাও যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি ধারাই সোনামুখীতে সমান আদর লাভ করিয়াছিল। কালক্রমে এই উভয় সম্প্রদায়েই অবশ্য কিছু কিছু গ্লানি প্রবেশ করে। তাহা হইলেও ধর্ম-সমন্বয়ের পীঠস্থানরূপে সোনামুখী স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে। পাগল হরনাথে তাহার পূর্ণ পরিণতি। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সাধনার ত্রিবেণী-সঙ্গমে জন্ম বলিয়াই, পাগল হরনাথের উপদেশে এই সমস্ত ধারারই সমন্বয়-সাধন হইয়াছে। পাগল হরনাথ কোন পথকেই ছোট বলিয়া মনে করেন নাই বা অপ্রয়োজনীয়বোধে বাদ দেন নাই। তিনি প্রত্যেকটি ধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, শাক্ত, শৈব ও অগ্নিউপাসনা ধর্মসাধনার প্রথম সোপান সৌর, গাণগত্য মধ্যমাবস্থা এবং বৈষ্ণবতা চরম। এই মতবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই।

সাধারণতঃ মানুষের প্রথম জীবন কাটে মাতা-পিতার স্নেহচ্ছায়ায়, তৎপরে সে আর মাতাপিতার স্নেহচ্ছায়ায় আবদ্ধ থাকিতে চায় না—নিজের তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হস্তেই তুলিয়া লয়। তারপর আসে পরিণয়ের লগ্ন, তখন তাহার হৃদয়-বিনিময় হয়। ইহার পরেই হয় অন্তরের সুপ্ত প্রেমের উদ্বোধন। তখন সে নূতন পথের অভিযাত্রী। কিন্তু বিবাহ হইলেই কন্যা যেমন মাতাপিতার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে না, আবার স্বামীকে অবহেলা করিয়া মাতাপিতার আশ্রয়ে আসিয়া বাসও করে না, তেমনি বৈষ্ণব হইলেই শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণগত্যের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। সোনামুখীর ঐতিহ্য এই অপূর্ব শিক্ষা মনোহর দাসের আবির্ভাবের পূর্বেই আরম্ভ হয়। মনোহরের কালে তাহার মধ্যাবস্থা এবং হরনাথে তাহা চরম পরিণতিলাভ করিয়াছে।

বহু সুসন্তান-প্রসবিনী এই সোনামুখী। এই গ্রামের সুসন্তান মহাত্মা গদাধর শিরোমণি সর্ব শাস্ত্রে অদ্বিতীয় এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যশের সৌরভ শুধু বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ইহার পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিভাবে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একাদিক্রমে দুই বৎসরকাল তিনি মহাত্মা গদাধরের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং বিদায় কালে তাঁহাকে একলক্ষ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন।

"Gadadhar Shiromoni of Sonamukhi, Burdwan, is said to have made his debut on that occassion and Ganga Govind was so much pleased with his eloquence and musical powers that he rewarded him with a lump sum of one lakh of rupees."

ক্যালকাটা রিভিউতে প্রকাশিত এই তথ্যই প্রমাণ করে যে, মহাত্মা গদাধর শিরোমণি একজন সুবক্তা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন[১]।

গদাধর শিরোমণির পুত্র বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ একজন উচ্চস্তরের ভক্ত-সাধক ছিলেন। ইঁহার উপাস্য দেবতা গিরিগোবর্ধন। কথিত আছে,

১। Calcutta Review : Vol. 58 : Page 100

বর্ধমানের রাজার সহিত এক মামলায় জয়লাভের সংবাদ স্বপ্নে তাঁহার উপাস্য দেবতা তাঁহাকে জানাইয়া দেন। স্বপ্ন দেখিয়া তিনি গিরিগোবর্ধনের একটি বৃহৎ মহোৎসব করেন। মহোৎসব যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল, তখন সংবাদ আসে যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন।

সোনামুখীর আর একটি উজ্জ্বল রত্ন উমাকান্ত চক্রবর্তী। ইনি বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর ও মহতাব চাঁদ বাহাদুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তেজচন্দ্র বাহাদুর উমাকান্তকে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করেন। যে ঘটনা উপলক্ষে মহারাজ তেজচন্দ্র উমাকান্তকে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত রূপ :—

উমাকান্তকে সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করিবার কিছুকাল পরে মহারাজ তেজচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। ক্ষৌরকার্য না করিয়া মাতার পারলৌকিক কার্য করা সম্ভব কিনা, মহারাজ এই প্রশ্ন করেন। মহারাজের গোপন ইচ্ছা বুঝিয়া অন্যান্য সভাপণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেন যে, মাতার পারলৌকিক কার্য করিতে ক্ষৌরকর্মের কোন প্রয়োজন নাই। উমাকান্ত কিন্তু এই অশাস্ত্রীয় বিধান সমর্থন করিলেন না। ইহাতে মহারাজ তেজচন্দ্র ভারতবর্ষের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করেন। পণ্ডিতসভার সহিত বিচারে উমাকান্তই জয়লাভ করেন। এই পণ্ডিতসভার সুপারিশেই মহারাজ তেজচন্দ্র উমাকান্তকে "উজ্জ্বল তর্কালঙ্কার শিরোমণি" উপাধিতে বিভূষিত করেন এবং উমাকান্তের বিধানমতো মস্তক মুণ্ডন করিয়াই মাতার পারলৌকিক কার্য করেন। তিনি উমাকান্তকে প্রণামীস্বরূপ ১০০১৲ টাকা ও দুইশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

সোনামুখীর এই সুসন্তানগণের জীবনী আলোচনা করিলে ইহার নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে, অতীত কাল হইতেই নিবিড় বনভূমির বিজন প্রদেশে প্রস্ফুটিত এই আরণ্য কুসুমের সৌরভ অরণ্যের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া দূর-দূরান্তরে প্রসারিত

হইয়াছে। নিখিল ভারতে পাগল হরনাথের প্রচার সোনামুখীর এই ঐতিহ্যের একটি সর্বাধুনিক উদাহরণ।

তাই বলিয়া কেহ যেন ধারণা না করেন যে, সোনামুখীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পাগল হরনাথ নিখিল ভারতে প্রচারিত। কোন বিশেষ স্থানে জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়া উঠে না। বরং জন্মগ্রহণ যেখানেই হউক না, বিশেষ গুণের অধিকারী মানুষের তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সৌরভে আকৃষ্ট অলির ন্যায় গুণগ্রাহী দলও একদিন-না-একদিন আসিয়া উপস্থিত হইবেই। স্থান মানুষকে মাহাত্ম্য দিতে পারে না, স্থানের মাহাত্ম্যই মানুষের উপর নির্ভর করে। নদীয়ায় না হইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্ম যদি অন্য কোন স্থানে হইত, তাহা হইলেও নিখিল ভারত ভক্তিপ্লুতচিত্তে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িত। সোনামুখীতে জন্মগ্রহণ না করিলেও, পাগল হরনাথের জনপ্রিয়তা কম হইত না। তথাপি সোনামুখীর কথা আলোচনা করিবার কারণ এই যে, ইহা পাগল হরনাথের জন্মস্থান। এই স্থান তাঁহার পিতৃ-পিতামহের জন্মস্থান। সোনামুখীর ঐতিহ্য তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিনা, সঠিকভাবে বলা না গেলেও, ধর্মসাধনার বিভিন্ন ধারার যে পরিপূর্ণ সমন্বয় তাঁহাতে ঘটিয়াছিল, তাহার অরুণাভাস এই সোনামুখীতেই পাওয়া গিয়াছিল। হরনাথ-জীবনী রচনাতে তাই সোনামুখীর আলোচনা অপরিহার্য। সোনামুখী হরনাথের জন্মভূমি, তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের লীলাক্ষেত্র সোনামুখী, যৌবনের স্বপ্ন তিনি সোনামুখীতেই দেখিয়াছিলেন। গৃহী হরনাথের গৃহ এই সোনামুখী। হরনাথ-ভক্তের নিকট তাই 'সোনামুখীধাম সাক্ষাৎ ব্রজধাম, তথাকার রজ সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের রজ এবং ঠাকুরঠাকুরাণী সাক্ষাৎ কৃষ্ণরাধা'…[১]

হরনাথের আবির্ভাবকালে সোনামুখীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ধর্ম-সাধনার ধারার উল্লেখ এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই স্থান হইতে অনতিদূরে দারকেশ্বর নদের তীরে নিত্যানন্দ-পার্ষদ্ অভিরাম গোস্বামীর বাসস্থান ছিল। অভিরাম-প্রবর্তিত বৈষ্ণব

১। আমার অভিজ্ঞতা—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫

সাধনার ধারা এই দারকেশ্বর নদের উভয় তীরবর্তী অঞ্চলে বহু পূর্ব হইতেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। অভিরামের বংশধর এক গোস্বামী শাখা সোনামুখীর অনতিদূরে বনবীরসিংহা গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। হরনাথের সমসাময়িক কালে এই গোস্বামী বংশের মধ্যে একজন সিদ্ধসাধকের আবির্ভাব হয়। তিনি তারাচাঁদ গোস্বামীর পুত্র রাধারমণ গোস্বামী। তারাচাঁদ গোস্বামীর প্রচার বর্ধমান জেলা অবধি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। শাঁখারীগ্রামে অবস্থিত তারাচাঁদের সমাধি-মন্দিরটিই তাহার প্রমাণ। তারাচাঁদ মহাজন পদাবলীর মত কতকগুলি পদ রচনাও করিয়াছিলেন। তারাচাঁদের গুরু মুনিমোহন গোস্বামী ছিলেন অলৌকিক সিদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন এক পরম বৈষ্ণব। কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার পীঠস্থান ছিল।

সোনামুখী হইতে বার মাইল দূরে দামোদরের অপর পারে মানকরের সন্নিকটবর্তী এক গ্রামে রাধামাধব নামে একজন বৈষ্ণব সাধক হরনাথের সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সোনামুখীর অংশবিশেষে ইনি পাগল রাধামাধব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্দেশ্যে রচিত একখানি মুদ্রিত পুস্তকও পাওয়া যায়।[১] ইঁহারই অন্যতম প্রধান ভক্ত রসিকলাল দে সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও হরনাথের বিরুদ্ধে সুতীব্র কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

হরনাথের গৃহ-পরিবেশ

পাগল হরনাথের জন্মভূমি এবং তাহার পারিপার্শ্বিকতার আলোচনাকালে দেখিয়াছি, আচারের মরুবালুরাশি ধর্মসাধনার প্রকৃত ধারাটিকে প্রায় গ্রাস করিলেও, সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই। ইহা সম্ভবও নয়। জগতে অধর্মের রাজত্ব যতই প্রবল হউক না কেন, ধর্ম বা ধার্মিকের একেবারে অবলুপ্তি কখনই ঘটে না। দুই-একজন প্রকৃত ধর্মসাধক বিজনে, নিভৃতে সকল সময়েই থাকেন। আচার-সর্বস্বতায় অন্ধদৃষ্টি মানুষের দল ইঁহাদের খোঁজ পায় না এবং

১। পাগল রাধামাধব।

পাইলেও চিনিতে পারে না। এই রকম ধরনের মানুষ ছিলেন জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তদীয় সহধর্মিণী ভগবতী দেবী—সাধক হরনাথের পিতা ও মাতা।

উমাকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইঁনি ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠতাত। পাগল হরনাথ ও কুসুমকুমারী উভয়েই ইঁহার স্নেহধন্য ছিলেন। উমাকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং পরম ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনার সুযোগ না পাইলেও, ইঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা বালক হরনাথকে যে বস্তুতঃপক্ষে খানিকটাও প্রভাবিত করিতে পারিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

হরনাথের পিতা জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পরম ভাগবত। বিমাতার অত্যাচারে তাঁহার পিতৃসঙ্গ লাভের সুযোগ খুব বেশী হয় নাই। মাতা আদরমণির সহিত তাঁহাকে মাতুলালয়েই বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত কাটাইতে হইয়াছিল। মাতুলালয়ে তাঁহার সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা তেমন না হইলেও, পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা বেশ ভালভাবেই হইয়াছিল। পূজার্চনার ব্যাপারে জয়রামের উৎসাহ কোনদিনই স্তিমিত হয় নাই। বরং অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পূজা-পদ্ধতি ও প্রকরণসমূহ তাঁহার অন্তরের গভীরে এরূপ স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, অতি অল্প বয়সেই পূজা করিতে বসিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। মাতুলালয়ে গৃহ-দেবতা দামোদরের পূজার ভার তাঁহার উপর দেওয়া হয়। দামোদরের নিত্যপূজায় তাঁহার নিষ্ঠা এরূপভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। বাহিরের লোকে মনে করিত, পূজায় বসিয়া জয়রাম বুঝি ঘুমাইয়া পড়েন। সেইজন্য তাঁহাকে পূজা করিতে নিষেধ করা হয়। দামোদরের পূজা করিতে পাইবেন না এই চিন্তায় তাঁহার মনে এরূপ নির্বেদ উপস্থিত হয় যে, তিনি গ্রামপার্শ্বস্থ জঙ্গলে আত্মহত্যা করিতে যান। দামোদরের পূজা সম্বন্ধে বালক জয়রামের গভীর আগ্রহের পরিচয় এই ঘটনার মধ্যেই বিশেষভাবে পাওয়া যায়।

কথিত আছে, একজন সাধু আসিয়া বালক জয়রামের পূজা-পদ্ধতি দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়েন। জয়রামের মাতুলের গ্রামের অধিবাসিগণ এই সাধু প্রমুখাৎ অবগত হয় যে, পূজায় বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে জয়রাম গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়েন।

পিতার পারলৌকিক কার্য করিবার জন্য জয়রাম বেলিয়াড়া হইতে সোনামুখী আসিলে, বিমাতার নিকট তাঁহাকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। বিমাতা ভদ্রকালী জয়রামকে গৃহে প্রবেশ করিতেও দেন নাই। পিতার পারলৌকিক কার্য করিতে না পাইলে পিতার বিষয়-সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া ভদ্রকালী জয়রামকে তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য করিতে দিবারও কোনরূপ সুযোগ দিলেন না। বিমাতার এতাদৃশ আচরণেও জয়রাম তাঁহার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই বা তাঁহাকে কটু কথা বলেন নাই। জ্ঞাতি সম্পর্কে খুল্লতাত নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থায় জয়রাম পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য করিয়া, নফরচন্দ্রেরই গালার আড়তে চাকুরি লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন; তবু বিমাতার সহিত কোন বিবাদ-বিসংবাদ করেন নাই। পরে গ্রামবাসী ভদ্রলোকদের সালিশীতে ভদ্রকালী এবং তাঁহার সন্তানগণ জয়রামকে কিছু জমি-জায়গা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ ছিল জয়রামের প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অনেক কম। তথাপি জয়রাম প্রতিবাদের অঙ্গুলিহেলন পর্যন্ত করেন নাই। এত অত্যাচার সত্ত্বেও বিমাতা ও বৈমাত্র ভ্রাতাদের সহিত কোন বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত না হওয়ার দৃষ্টান্ত সহজে মিলে না।

সংসারী হইলেও জয়রাম সংসারে অনাসক্ত ছিলেন। কলিকাতার গালার আড়তে সুদীর্ঘ ষোল বৎসরকাল কার্য করিয়া জয়রাম কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই সঞ্চিত অর্থ বহুকষ্টে অর্জিত। কিন্তু ইহার প্রতি জয়রামের কোন আসক্তি ছিল না। এই সমুদয় অর্থ এবং পরবর্তী জীবনে উপার্জিত অর্থ তিনি শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠায়, নিরন্নকে অন্নদান প্রভৃতি সৎকার্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তখনকার দিনে প্রায় আড়াই হাজার টাকা

খরচ হয়। জয়রাম অকাতরে সে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, কুলদেবতা রাধাশ্যামসুন্দরের নিত্যসেবার পালা তো ছিলই। আশ্রিতকে রক্ষা করাও জয়রামের ব্রত ছিল। সেকালের সমাজে বাস করিয়া দস্যুকন্যা এবং অন্ত্যজ জাতীয়া বিমলি হাড়িনীকে আশ্রয় দান করার মধ্যে জয়রামের সংস্কারমুক্ত সাহসী অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।

হরনাথ-জননী ভগবতী দেবী ছিলেন একজন মহিয়সী মহিলা। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার মত দক্ষতাসম্পন্ন মহিলা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবে দয়া, অতিথি-বাৎসল্য ও দেব-দ্বিজে প্রীতি ছিল সর্বজনবিদিত। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার কালে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়ও তিনি দিয়াছিলেন। নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইলে জয়রাম যখন সস্ত্রীক শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন, তখন স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রতিবাদ করেন। কারণ, ভবগতী দেবী তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এই অন্যায় নিষেধে ক্ষুব্ধ হইয়া জয়রাম দেশের গণ্যমান্য কতিপয় পণ্ডিতকে আনাইয়া এক সভা করেন। ভগবতী দেবী সেই পণ্ডিতসভায় গিয়া শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখান। পট্টবস্ত্রভূষিতা ভগবতী দেবীকে দেখিয়া ও তাঁহার শাস্ত্রীয় যুক্তিনির্ভর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ ভগবতী দেবীর পক্ষে রায় দেন। এইভাবে শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্যে স্বামীর পার্শ্বে স্বীয় স্থানটি শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে অধিকার করায়, ভগবতী দেবীর সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

স্বামীর কুলদেবতা রাধাশ্যামসুন্দরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। সদাশিব মহেশ্বর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন—তাঁহার স্বামী এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। ভগবতী দেবীও স্বামীর এই ধর্মকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া সহধর্মিণী শব্দের যথার্থ অর্থটি উদ্‌ঘাটিত করেন। হরি ও হরের অভিন্নতার মর্মও তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াবতীও ছিলেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে অন্ততঃপক্ষে একজন নিরন্নকে অন্ন

দান না করিয়া তিনি স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিতেন না। অতিথি আপনি আসিয়া উপস্থিত না হইলে, কন্যা কমলাকে অতিথির সন্ধানে প্রেরণ করিতেন অথবা প্রতিবেশী কাহাকেও উপবাসক্লিষ্ট দেখিলে সাদরে আহ্বান করিয়া অন্নদান করিতেন। অথচ তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। একান্তভাবে ধর্মশীলা না হইলে মধ্যবিত্ত-গৃহিণী ভগবতী দেবীর পক্ষে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এবং সযত্নে অতিথি-সৎকার করা সম্ভব হইত না। হরনাথের ভক্তগণের মতে, অতিথিরূপী নারায়ণের সেবাযত্নে তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই বোধ হয় সন্ন্যাসীবেশে একদিন স্বয়ং নারায়ণ আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুটের ডাল ও রুটি দ্বারা অতিথি-সৎকারের মধ্যেই তাঁহার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার পরিচয় পাইয়া ভাবগ্রাহী জনার্দন পুত্ররূপে তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া তাঁহাকে তথা আপনাকেও ধন্য মনে করিয়াছিলেন। জয়রাম ও ভগবতী দেবীর ধর্মপরায়ণতা সে-যুগের সোনামুখীর পক্ষে ব্যতিক্রম ছিল। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জয়রাম তাঁহার সারাজীবনের সঞ্চয় যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। সোনামুখী অঞ্চলে একটি প্রবাদ ছিল যে, জয়রামের পূর্বে আর কেহ কোনদিন এত ব্যয় করিয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্য করেন নাই বা করিবে না। সোনামুখীতে ধনবান ব্যক্তি অপ্রতুল নয়। তথাপি জয়রাম সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত হওয়ার কারণ, শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অপরিমিত ব্যয়বাহুল্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেই সময় সকল প্রকার দ্রব্যাদির মূল্য অতিশয় কম ছিল; তৎসত্ত্বেও উক্ত শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জয়রাম প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। ছত্রিশ জাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। সমস্ত সোনামুখী এবং বহুদূরবর্তী নবদ্বীপ, কাঞ্চী, কাশীধাম প্রভৃতি স্থান হইতেও ব্রাহ্মণদের আনয়ন করাইয়া মাসাধিক কাল ধরিয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করানো, বস্ত্র, কলস এবং যাতায়াতের প্রণামী দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে জয়রামের বহু নগদ অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াতের সকল ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিয়াছিলেন এবং

তাহাদিগকেও বস্ত্র, কলস, বিদায়-দক্ষিণা ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছিলেন। দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্যে এইরূপ যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া জয়রাম ধর্মশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুযোগ্যা সহধর্মিণী ভগবতী দেবী ইহাতে কোন বাধা দান করেন নাই। সর্বদা স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাপন করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া আত্মহারা হন নাই। সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া গোপীগণ পাইয়াছিলেন পরমধন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি, আর শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সর্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব জয়রাম এবং ভগবতী দেবী সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রতিম হরনাথকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য আহরণ করিয়া যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হইয়াছিল, ত্রিভুবনে তাহার তুলনা ছিল না। তিল তিল করিয়া ধর্ম সঞ্চয় করিয়া জয়রাম ও ভগবতী যে পুত্রলাভ করেন, তাহার তুলনাও দুর্লভ।

কনকলতা দেবী হইতে হরনাথের বংশে শ্যামসুন্দর-প্রীতির যে বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে প্রবলতর হইয়া শ্রীকান্তে আসিয়া শ্যামসুন্দরের পূজাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক চেষ্টায় অভিব্যক্ত হয়। শ্রীকান্তের সেই চেষ্টা যেদিন ফলবতী হইল, সেইদিন জয়রামের জন্ম হয়। শ্যামসুন্দরের পূজাধিকার হইতে শ্রীকান্তকে বঞ্চিত করিবার জন্য আত্মীয়বর্গের মধ্যে যে অপচেষ্টা চলিতেছিল, তাহা অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জন্মগ্রহণ করায় নবজাতকের নামকরণ হইল 'জয়রাম'। যিনি বাল্যে এবং কৈশোরে একাগ্রচিত্তে মাতুলালয়ের দামোদর নামধারী শালগ্রামের পূজা করিতেন, ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে সেই জয়রামে আসিয়া শ্যামসুন্দর ও সদাশিব এক হইয়া উঠিলেন। আর হরনাথে আসিয়া সেই সমন্বয়ের সীমারেখা আরও বহু বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, হরনাথের আবির্ভাবের উপযুক্ত পটভূমি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। হরনাথের বংশধারায় বৈষ্ণব প্রভাব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল, তাঁহার গৃহ-পরিবেশে প্রকৃত ধর্মসাধনার আবহাওয়া তাঁহার জন্মের বহু

পূর্ব হইতেই প্রবাহিত ছিল। অর্থাৎ, পাগল হরনাথের পিতৃপিতামহ হইতে ধর্মশীলতার যে প্রদীপটির স্নিগ্ধ জ্যোতি গৃহ-পরিবেশকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, হরনাথে তাহাই উজ্জ্বলতর হইয়া নিখিল ভারতের বিশাল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটিকে আলোকিত করিয়াছিল।

আবির্ভাবকাল

পাগল হরনাথের জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর এই ষষ্ঠ দশকটি নানাদিক হইতে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কালসীমা।

সামাজিক দিক হইতে ইতিপূর্বে বাংলা দেশে একটি নূতন ভাববিপ্লব হইয়া গিয়াছে। সেই ভাববিপ্লবের মৌল কারণ—পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে লব্ধ নবচেতনায় উদ্‌বুদ্ধ বাঙ্গালী-তারুণ্য। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সহিত পরিচিত নব্য বাঙ্গালীর অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসাবৃত্তি অপ্রমেয় হইয়া উঠে। নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে প্রচলিত ও প্রাচীনের নব মূল্যায়ন করিবার স্পৃহা এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে, নব্য বাঙ্গালী ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পর্যন্ত ব্যক্তিগত যুক্তিবিচার-সাপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তার এই উগ্র স্পৃহা প্রথমেই আঘাত হানিয়াছিল সমসাময়িক হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের উপর। হিন্দু ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও হৃদয়হীনতা এবং সমাজপতিগণের অজ্ঞতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে তাহাদের জেহাদ্ ঘোষণা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিপ্লবের বীজ বপন করিল। বাক্‌সর্বস্ব, নৈষ্ঠিক আচার-সর্বস্ব প্রাচীন হিন্দু সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা ফরাসী বিপ্লবের মানবতা-সমুচ্ছ্বসিত-আদর্শে-উদ্‌বুদ্ধ তারুণ্যের সহিত বিরোধিতায় পরাজয় বরণ করিল। শতাব্দী-সঞ্চিত কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার জীর্ণ ভিত্তির অচলায়তন ধ্বংস করিয়া নব্য বাঙ্গালী করিল নূতন উষার স্বর্ণদ্বারের উদ্ঘাটন।

রাজনৈতিক দিক হইতে সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে

একটি নূতন যুগের পদসঞ্চার হইয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, আরম্ভ হইয়াছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন। আভ্যন্তরীণ সুশাসনের অজুহাতে ভারতবাসীকে শোষণ ও বন্ধন করিবার ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে। রেলপথের দ্রুত প্রসার, শিক্ষা-বিভাগ পুনর্গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন হইয়াছে। নীলকরের হাঙ্গামা এবং নীল চাষীদের ধর্মঘট, বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, নাট্যশালা স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার এবং সংস্কারমুক্ত সমাজ-চেতনার ক্ষেত্রে জাতির আত্ম-প্রকাশ চেষ্টার সূচনা করিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে এই বিশেষ কালসীমাটি নবীন ধারার ইঙ্গিত বহন করে। প্রাচীন ধারার কবি ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব এবং মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব, হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনীর অভ্যুদয় —সাহিত্যক্ষেত্রেও নূতন যুগের দিগন্তদুয়ার খুলিয়া দেয়।

কিন্তু ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই কালসীমা যেরূপ সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহা দুর্লভ। রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই কালসীমার গুরুত্ব সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত, দেশের সর্বস্তরে বিস্তৃত নহে। কিন্তু এই সময় হইতেই যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সর্বস্তরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইবার চেষ্টা ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণরা একদিকে যেমন হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের শতাব্দী-সঞ্চিত গ্লানি দূরীভূত করিবার মানসে যাহা-কিছু প্রাচীন তাহারই মূলে যুক্তিবাদের শাণিত কুঠারাঘাত করিতেছিল, অপরদিকে তেমনি খ্রীষ্টান মিশনারি-প্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল এবং উগ্র পরানুকরণ-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বদেশী ঐতিহ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার চরমে উঠিতেছিল। এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। যুক্তিবাদের ফুৎকারে কুসংস্কার ও আচারসর্বস্বতার ভস্মরাশি অপসারিত

করিয়া তিনি বেদান্ত-আশ্রিত একেশ্বরবাদী হিন্দু ধর্মকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মন হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন। কিন্তু কূপমণ্ডূক ও প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজ যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই বেদান্ত ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিল না। ফলে, রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায় "ব্রাহ্ম সমাজ" নামে একটি পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারে ইহার পরিধি কিছুটা বিস্তৃত হয়, কিন্তু কালক্রমে প্রবীণ ও নবীন কর্ণধার দুইজনের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ার ফলে দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ায়, ইহার বিস্তৃতির সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাপ্তির সঙ্কীর্ণতার কারণ—ইহার আবেদন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির নিকট। সেইজন্য কলিকাতার বুদ্ধিজীবী নাগরিক সমাজের বাহিরে যে বিশাল জনসমাজ, তাহার বুকে ইহা তেমন আলোড়ন জাগাইতে পারে নাই। সে আলোড়ন লাগাইয়াছিল যাঁহার বাণী তিনি দক্ষিণেশ্বরের সাধক যুগাবতার রামকৃষ্ণ। পঞ্চবটীর ছায়াঘন সাধনপীঠে তিনি তখন সর্বধর্মের সমন্বয়-সাধনায় রত। সিদ্ধিলাভের পরে সহজ সরল ভাষায় কথিত তাঁহার সেই ধর্মোপদেশ সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ের গভীরে আলোড়ন জাগাইল। ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষ তাঁহার চরণোপান্তে আসিয়া আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার উত্তর পাইল। হৃদয়ের দ্বারে আঘাত হানিয়া সাধক রামকৃষ্ণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য—সকলেরই অন্তরের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ফলে, বিবেকানন্দের বিশ্ব-বিজয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল; হরনাথের গার্হস্থ্য ধর্মসাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল; জনারণ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতির আত্মিক মুক্তির বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু তাহার জন্য জাতিকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

অপরদিকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত লুপ্তপ্রায় ধারাটিও এই সময়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, সাধক বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবে। ব্রাহ্ম সমাজের

আচার্যের বেদীতে বসিয়া তিনি করতাল-মৃদঙ্গসহযোগে নামকীর্তনের ব্যবস্থাপত্র দান করিয়াছিলেন। নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের তাহা মনোমত না হওয়ায়, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অতঃপর সাধনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি পদক্ষেপ করিলেন এবং রাগানুগ ভক্তি ও নামগানের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এখানেও হরনাথের প্রেমধর্ম ও নামসংকীর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

আর একটি দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর এই কালসীমাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বিরাট ব্যক্তিগণ এই দশকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হরনাথ-জন্মাব্দে বঙ্গশার্দুল আশুতোষ কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের ধারা নিয়ন্ত্রণে ইঁহাদের প্রত্যেকের অবদান অবিস্মরণীয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায় যে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের যে ধারা ষষ্ঠ দশকে প্রবাহিত হইয়া ইতিহাসের মৃত্তিকা সরস করিয়াছিল, তাহাতে ছিল ভাবী কালের বনস্পতির বীজ উপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হরনাথ-জন্মাব্দের দশকটি তাই ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য কালসীমা।

কালের এই পটভূমিকায় হরনাথের জন্মস্থান ও তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায়, নিখিল ভারতে ইতিপূর্বে যে ধর্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছিল এতদঞ্চলে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। বরং মল্লরাজগণের চেষ্টায় যে ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহাতে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল। প্রচলিত কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং কূপমণ্ডূকতায় অভিভূত এই অঞ্চলের অধিবাসীর ধর্মসাধনার প্রকৃত স্বরূপটি সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণাই ছিল না। গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ এবং আচার-বহুল ধর্মানুষ্ঠান করিয়াই তাহাদের ধর্মসাধনা চলিত। মন্ত্র দিবার গুরুর সংখ্যাও কল্পনাতীতরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মাত্র চারি আনার বিনিময়ে কর্ণরন্ধ্রে ফুৎকার দিবার মত গুরুর অভাব ছিল না। ধর্মের প্রকৃত মর্ম ইহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ধর্মকে জানিবার কোন আগ্রহই

ইহাদের ছিল না। উপরন্তু শিষ্যের নিকট হইতে আদায়ীকৃত প্রণামীর অর্থে ইহারা গঞ্জিকাসেবন ও পঞ্চ "ম"-কারের সাধনা করিত। ফলে, ধর্মের গ্লানি ভীষণ আকারে দেখা দেয়। গঞ্জিকাসেবী, মদ্যপায়ী, লম্পটপ্রকৃতির হাতে ধর্মসাধনার বিকৃতি চরম হইয়া উঠিল।*

তান্ত্রিক সাধনার প্রাচুর্য সেই বিকৃতির চরম প্রকাশে সহায়তা করিল। তন্ত্রের প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সেই সময়ে এতদঞ্চলের কোন তান্ত্রিকেরই ছিল না। অন্তর্নিহিত তথ্য উপলব্ধ না হওয়াতে তান্ত্রিক সাধকেরা পঞ্চ "ম"-কারের সাধনার উদ্দাম স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। ফলে, অনাচার ও ব্যভিচার প্রবল আকারে দেখা দেয়।

বৈষ্ণব ধর্মের ধারাটিও এই সময়ে অনাচারের পঙ্কিল আবর্ত রচনা করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচার প্রবল আকার ধারণ করায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায় লাম্পট্য-লীলার লীলাভূমি হইয়া উঠে। পাঁচসিকা মাত্র ব্যয় করিয়া কণ্ঠী বদল করা চলিত। বৈষ্ণবের ভেকধারী নরনারীগণ ইহার সুযোগ পুরা-মাত্রায় গ্রহণ করিত। একটিমাত্র বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী পর্যায়ক্রমে কণ্ঠী বদল করিত। ব্যভিচার ও অনাচারের দরুন সমাজ হইতে বিতাড়িত নরনারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায়, এতদঞ্চলের বৈষ্ণব সম্প্রদায় আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে।

ধর্মসাধনার কর্ণধারবৃন্দের অবস্থা যেখানে এইরূপ হতাশাব্যঞ্জক, সেখানে সাধারণ নরনারীর জীবনও কলুষিত ও পঙ্কিল হইতে বাধ্য। সাধারণ নরনারীর মধ্যেও পানাসক্তি, গঞ্জিকাসেবন, পরস্বাপহরণ এবং ব্যভিচার প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। বহু অন্তঃপুরে ঘোমটার অন্তরালে খেমটার নাচ চলিত। বৈধব্যের বাহ্যিক আচারের অন্তরালে বিধবাগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইত। অথচ পুনর্বিবাহ করিবার আভাসমাত্র প্রকাশ পাইলে, সমাজপতিগণের সুকঠোর দণ্ড নামিয়া আসিত।

অনাচার ও ব্যভিচারের এই বীভৎস তাণ্ডবলীলার মধ্যেও প্রকৃত

---

* দ্রঃ নেড়া হরিদাস—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

ধর্মসাধনার যজ্ঞাগ্নি কিন্তু দুই-একটি ক্ষেত্রে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। বনবীরসিংহা গ্রামের বৈষ্ণব সাধক তারাচাঁদ গোস্বামী বিজন অরণ্য-ভূমির মধ্যস্থলে নামসংকীর্তনের অবলুপ্ত ধারাটি সযত্নে রক্ষা করিতে-ছিলেন, সোনামুখী গ্রামের উজ্জ্বল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মবাণী, মনোহর দাসের অশরীরী প্রভাবেও দুই-একজন সাধক প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মসাধনার নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখাটি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এজন্য তাঁহাদের দুর্ভোগেরও সীমা ছিল না। কারণ অধর্ম ও অনাচারের রাজত্বে ধর্মের গ্লানির মত ধার্মিকের পীড়নও অবশ্যম্ভাবী। ভণ্ড ধর্মগুরুগণ এই সমস্ত দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। মিথ্যা, নিন্দা ও অপপ্রচারে তাঁহাদের শাণিত জিহ্বা মুখর হইয়া উঠিত। ইঁহাদের মতানুসারী পাষণ্ড জনসাধারণ কর্তৃক প্রকৃত ধার্মিকগণ হইতেন উৎপীড়িত, তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায় হইতেন উপদ্রুত।

অধর্মের এইরূপ তাণ্ডবলীলার মধ্যেই ধর্মসংস্থাপন ও ধার্মিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। অধর্ম যখন ধর্মের উপর প্রভুত্ব করে, অধর্মাচারীর দল যখন ধার্মিকের কণ্ঠরোধ করে, তখনই স্বয়ং ভগবানের বা তাঁহার পূর্ণ বা অংশাবতারের আবির্ভাব সম্ভব হয়।[১] যে-কোন অবতারের আবির্ভাব-পূর্ব যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেই উপর্যুক্ত তথ্য প্রমাণিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বযুগে নবদ্বীপে তান্ত্রিকতার নামে পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার স্রোত বহিত, পাঠান রাজত্বকালের ম্লেচ্ছাচারে বঙ্গদেশের ধর্মীয় আবহাওয়া কলুষিত হইয়া গিয়াছিল। ধর্মের নামে অধর্মের তাণ্ডবলীলা চলিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্বযুগ ছিল জড়-সাধনার যুগ। পশ্চিমী সভ্যতার অনাচারসমূহ অন্ধভাবে অনুকৃত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যায়

১। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন :—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

ভাসিয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ কয়েকটি মাত্র সাধক ধর্মের দীপশিখাটি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। হরনাথের আবির্ভাব-পূর্ব যুগে তাঁহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে অধর্মের স্পর্ধিত শির অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল; ধর্মের গ্লানি চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই অরাজকতার পটভূমিকায় হরনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

হরনাথের জন্মলগ্ন

হরনাথের জন্মলগ্নটি তাৎপর্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। হরনাথ ভূমিষ্ঠ হন ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে। সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি। প্রভাত হইবার অল্পক্ষণ পূর্বে ভগবতী দেবী শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ-গৃহিণীর প্রাতঃকালীন কর্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তুলসীতলায়, রাধাশ্যামসুন্দর এবং সদাশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে গোলা দিয়াছেন। সহসা পদতলস্থ ভূমি মৃদু মৃদু কম্পিত হইল, গৃহের দরজা-জানালাগুলি সশব্দে নড়িয়া উঠিল। কি হইল বুঝিবার পূর্বেই ভগবতী দেবীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উদরদেশে প্রবল যন্ত্রণা অনুভূত হইল, ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিল। সহসা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল তুমুল শঙ্খধ্বনি ও নাম-সংকীর্তনের কোলাহল। এই সময়ে ভগবতী দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ইতিমধ্যে বাটীস্থ সকলেই জাগ্রত হইয়াছেন। গোয়ালঘরের পার্শ্বে ভগবতীকে ভূপতিত থাকিতে দেখিয়া বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা ছুটিয়া গিয়া সদ্যোজাত শিশুকে দেখিতে পাইলেন।

মুহূর্ত কয়েকের ভূকম্পন তখন থামিয়া গিয়াছে। হরিধ্বনির রোল উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। ভগবতী দেবীর লুপ্ত সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। চারুচক্ষু উন্মীলিত করিয়া ভগবতী দেবী পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যুগপৎ সুখী ও মুগ্ধ হইলেন। পুরাঙ্গনাদের শঙ্খধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। হরনাথের ধরাবতরণ-বার্তা দিক-দিগন্তে ঘোষিত হইল।

হরনাথের জন্মলগ্ন সকাল ৫-৪৫ মিনিট। পূর্বাচলে তখন নবারুণ আভাসিত। রাত্রির অন্ধকার শেষে আলোকের বার্তা বহন করিয়া পূর্বগগনে সূর্যোদয়ের সূচনা হইবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ ভূমিষ্ঠ হন। এই দিক দিয়া হরনাথের জন্মক্ষণটি ইঙ্গিতময়। হরনাথ-অনুরাগীর মতে লগ্নটি তাই,

"The rise of the Sun of Humanity, to dispel the darkness and gloom of the night, to spread the light of hope by the rays of His life, and to bring solace and happiness in the life of the suffering humanity by His Divine Love and inspiring precepts.*

জ্যোতিষীর গণনানুসারে হরনাথের জন্ম সন ১২৭২ সাল ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজী ১লা জুলাই ১৮৬৫, সকাল ৫-৪৫ মিনিট গতে, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথি, শনিবার, হস্তা নক্ষত্র, কন্যা রাশি, পরিখযোগ, শকুনিকরণ ও মিথুন লগ্নে। কোষ্ঠীর ফলাফল রাজযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ। ভক্তিযোগ প্রবল ও কর্মবহুল। নানাবিভূতিলাভ ও বহু-সেবকযুক্ত, উদারমতাবলম্বী বৈষ্ণব উপাসক। মিথুন ও কন্যা লগ্নে জাত ব্যক্তি ইহার দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট হইবে। জাতক নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইবেন না। পুরাতন মৃতপ্রায় ভাবকে নবজীবন দান করিবেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদের মতেও হরনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জাত ব্যক্তি বিশ্বের ত্রাণকর্তা হন।[১]

হরনাথের কোষ্ঠী প্রস্তুত হইলে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত কোষ্ঠীর ফলের সাদৃশ্য দেখিয়া জয়রাম আনন্দিত হইলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে

* Haranath the Saviour (Chapter I), Page 4.

১। "At that time the 16th Degree of Cancer (under the influence of Jupiter) was in ascendant. European Astrologers say that a man who happens to born at this conjunction is sure to become a Saviour of the World."

Sri Haranath Lilamritam (Division 1) : N. C. Ghosh, Page 4

করি। হরনাথের জন্মের কিছুকাল পূর্বে সোনামুখী গ্রামে জয়রামের বাটীতে এক সন্ন্যাসীর আগমন হয়। সন্ন্যাসী যাহা বলেন তাহার সারমর্ম এই যে, তিনি অমরনাথ গুহা হইতে আসিতেছেন এবং সেদিনের মত তিনি জয়রামের সহধর্মিণী ভগবতী দেবীর আতিথ্য প্রার্থনা করেন। ভগবতী দেবী তাঁহাকে বহির্বাটীতে যাইবার কথা বলায়, সন্ন্যাসী নবনির্মিত শিবমন্দিরে আসিয়া ধুনি জ্বালিয়া বসেন। সন্ন্যাসীর মুখে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ অমরেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হন। ভগবতী দেবী রুটি, দুধ ও মিষ্টি দিয়া অতিথি-সৎকার করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর ইচ্ছাক্রমে তাঁহার মধ্যাহ্নে রন্ধন-করা বুটের ডালও দিতে হয়। এইভাবে সন্ন্যাসীর নৈশভোজন সমাধা হইলে, শিবমন্দিরের বাহিরের দরজা তালাবন্ধ করা হয়। কিন্তু প্রাতঃকালে সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। হরনাথ-জীবনী সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই এই সন্ন্যাসীর আগমন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। হরনাথ নিজেও তাঁহার মাতার মুখে শিবমন্দিরে সন্ন্যাসীর আগমনের এই কাহিনী বহুবার শ্রবণ করিয়া-ছিলেন।[১] সুতরাং সন্ন্যাসীর আগমন-বৃত্তান্তের প্রামাণিকতার প্রশ্ন উঠে না। জয়রাম তখন কলিকাতায়। সেই রাত্রিতেই তিনি কলিকাতায় স্বপ্ন দেখেন যে, দিব্যদর্শন এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিতেছেন—'জয়রাম, তুমি আমার জন্য ভাবিও না, আমাকে যার হাতে দিয়ে এসেছ সে বহুযত্ন করেছে, আমি সেখানে পরমানন্দে আছি ও থাকিব।' এই স্বপ্নদর্শনান্তে জয়রামের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি সোনামুখী চলিয়া আসেন। সাধুর বিস্ময়কর অন্তর্ধানে চিন্তাকুলা ভগবতী দেবী স্বামীর অকস্মাৎ আগমনে বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন। জয়রাম কোন সাধুর আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবতীর বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। জয়রামের মুখে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং স্বপ্নদৃষ্ট সন্ন্যাসীর বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, তাহার নিকট আগত সন্ন্যাসীই জয়রামকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন। অপরপক্ষে ভগবতী দেবীর মুখে সন্ন্যাসীর বর্ণনা

১। শ্রীহরনাথের অপূর্ব পত্রাবলী : পঞ্চম খণ্ড : ২য় পত্র।

শুনিয়া জয়রামও উপলব্ধি করেন যে, সোনামুখীতে আগত দিব্যদর্শন সন্ন্যাসীই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীর রোমাঞ্চ হইল। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ভগবতী দেবী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এই সন্তানই হরনাথ।

এই সন্ন্যাসীর আগমনের সঠিক তারিখ ভগবতী দেবী বলিতে পারেন নাই। তবে সন্ন্যাসী যেদিন সোনামুখীতে আগমন করিয়াছিলেন, সেদিন ছিল ঝুলন পূর্ণিমা।[১] সুতরাং ভগবতী দেবী গর্ভবতী হইবার অব্যবহিত পূর্বের ঝুলন পূর্ণিমার তারিখটিই সন্ন্যাসীর আগমনের দিন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হরনাথের জন্ম হয় ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ়। ইহার পূর্ব বৎসরে ঝুলন পূর্ণিমা হইয়াছিল ৩১শে ভাদ্র তারিখে (ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। সন্ন্যাসীর আগমন খুব সম্ভব এই তারিখেই হইয়াছিল। জয়রাম ইহার পরদিনই আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হরনাথ নিজেও ইহা শুনিয়াছিলেন এবং ভাগবত মিত্রকে তাহা পত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন কলিকাতা হইতে পানাগড় হইয়া সোনামুখী আসিবার রেলপথের প্রচলন হয় নাই, অন্য কোন দ্রুতগামী যানও ছিল না। জয়রামকে পদব্রজেই আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং কমপক্ষে দুইদিন পরে জয়রামের সোনামুখী পৌঁছিবার কথা।[২] সন্ন্যাসীর আগমনের কাহিনীর মধ্যে এইটুকুই সন্দেহজনক। খুব সম্ভব জয়রামের আগমনের সঠিক তারিখ ভগবতী দেবীর মনে ছিল না। এই অংশটুকু বাদ দিয়াও কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, সন্ন্যাসীর আগমন এবং জয়রামের স্বপ্নদর্শন—এই দুই ঘটনা হরনাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক ইঙ্গিত দান করে। বেলিয়াড়া গ্রামের দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী এবং সোনামুখীতে আগত সন্ন্যাসীর ইঙ্গিত হরনাথের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ দান করে।

১। শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র হরনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণের নিকট ইহা জানিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন। দ্রঃ অমিয় হরনাথ লীলাকথা—প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৩১

২। ভাগবত মিত্র : অমিয় হরনাথ লীলাকথা—প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৯১

জীবনী

হরনাথের শৈশব

হরনাথের জন্মসময়ে তাঁহার পিতা সোনামুখীতে ছিলেন না। পুত্রলাভের সংবাদ পাইয়া তিনি সোনামুখী ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। পুত্রমুখ দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে উদিত হয়, সুদূর অতীতে মাতুলালয়ে আগত এক দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, জয়রামের পুত্রগণের মধ্যে একটি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। হরনাথের সুলক্ষণযুক্ত দেহ দর্শনে তাঁহার ধারণা হয় যে, এই শিশুই মাতুলালয়ের দৈবজ্ঞ-কথিত মহাপুরুষ। বিশেষতঃ ভগবতীর গর্ভে হরনাথের আগমনের সময় হইতেই সন্ন্যাসীর আগমন প্রভৃতি যে অলৌকিক ঘটনাসমূহ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই তাঁহার মনে প্রতীতি হইয়াছিল যে, ভগবতীর এই গর্ভে অসাধারণ কাহারও আবির্ভাব হইয়াছে। পুত্রসন্তান হওয়ায় সেই প্রতীতি দৃঢ় হইল। তথাপি সন্দেহ নিরসনহেতু তিনি জ্যোতিষীকে আহ্বান করিয়া নবজাতকের জন্মপত্রিকা রচনার ভার দিলেন।

জন্মপত্রিকা রচনা করিয়া জ্যোতিষী যখন তাহার ফলাফল ব্যাখ্যা করিলেন, তখন হিন্দু শাস্ত্রে আস্থাশীল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জয়রামের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। ভগবতী দেবীরও অন্তরে অপার আনন্দ হইল। পতি-পত্নীর এই আনন্দের অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়া নবজাত শিশু দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অন্নপ্রাশনের সময় (১৪ই ফাল্গুন ১২৭২ সাল) শিশুর নামকরণ হয় হরনাথ। হরনাথের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ, ষষ্ঠী, মার্কণ্ডেয় পূজা ইত্যাদি হইয়াছিল এবং জয়রাম গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে ও অন্যান্য জাতির লোকদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। সেই সময়ের প্রথা অনুসারে চিড়া, মুড়কি, দুধ, দধি, গুড়, রম্ভা ইত্যাদি দ্বারা পরিতোষপূর্বক সকলকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এই অন্নপ্রাশনের সংবাদ পাইয়া দূরবর্তী বহু গ্রাম হইতে বহু দীন-দরিদ্রের আগমন

হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে একসরা মুড়ি, মুড়কি, গুড় ও রম্ভা পাইয়াছিল। কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই।[১] অন্নপ্রাশনের সময় প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুর সম্মুখে নানাপ্রকারের খেলনা ও জয়রামের নিত্যপাঠের ধর্মপুস্তকগুলি রাখা হইয়াছিল—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করে দেখিবার জন্য। শিশু গীতগোবিন্দ পুস্তকখানি টানিয়া লইয়া মুখে দেয়। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে অদ্যাপি এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অন্নপ্রাশনের সময় শিশু মুদ্রা, লেখনী, পুস্তক, ক্রীড়নক প্রভৃতির মধ্যে যাহা গ্রহণ করে, তাহা দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করা হয়।[২]

Child shows the man as morning shows the day—প্রচলিত এই ইংরাজী প্রবাদ-বাক্যের কোন মূল্য থাকিলে, পল্লী-বাংলার গৃহস্থ ঘরে অনুষ্ঠিত শিশু কর্তৃক এই নির্বাচনী অনুষ্ঠানটিরও সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। অফুরন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের আকর গীতগোবিন্দ গ্রন্থখানি শিশু হরনাথ কর্তৃক গৃহীত হওয়া সবিশেষ ইঙ্গিতময় বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এতদিন পর্যন্ত জয়রাম তাঁহার জ্ঞাতিসম্পর্কে খুল্লতাত নফরচন্দ্রের গালার আড়তেই কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু হরনাথের জন্মের অব্যবহিত পরেই পৃথকভাবে নিজস্ব গালার আড়ত খুলিবার এক অভাবিতপূর্ব সুযোগ তিনি পাইলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের মধ্যস্থতায় জয়রাম মানকর-নিবাসী নিমু কুণ্ডু নামক একজন মহাজন পাইলেন। উক্ত মহাজন জয়রামকে গালার কারবারের মূলধনস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কথাবার্তা পাকা হইলে জয়রাম তাঁহার নূতন পরিকল্পনার বিষয় ব্যক্ত করায়, নফরচন্দ্র তাঁহাকে নূতন আড়ত খুলিতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার আড়তের দুই আনা অংশ দান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু গালার নূতন আড়ত খুলিবার কথা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে,

---

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা: দ্বিতীয় খণ্ড: পৃঃ ৩৩৯

২। তুলনীয়: সকল ছাড়িয়া প্রভু শচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥

জয়রাম নফরচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে পারিলেন না। ফলে, ১২৭৩ সালের ১লা বৈশাখ কলিকাতার ৪১নং বাঁশতলা লেনে জয়রামের নূতন গালার আড়তের প্রতিষ্ঠা হইল এবং সোনামুখীর রানীবাঁধ নামে পুষ্করিণীর তীরে গালা তৈয়ারির কারখানা খোলা হইল। কারখানার কাজকর্ম দেখিতেন গঙ্গানারায়ণ ও নদেরচাঁদ। গঙ্গানারায়ণ লাভের তিন আনা ও নদেরচাঁদ দুই আনা অংশ পাইতেন। নিমু কুণ্ডু ও জয়রাম কলিকাতায় থাকিয়া গালা ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। নিমু কুণ্ডু খরচ বাদে লাভের আট আনা অংশ পাইতেন এবং জয়রাম পাইতেন তিন আনা। প্রথম বৎসরে নানা কারণে খরচের পরিমাণ অধিক হইলেও, খরচ-খরচা বাদে নীট লাভ হয় তিন হাজার চারিশত টাকার মত। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসরই লাভের অঙ্ক স্ফীত হইয়াছিল। অবশ্য, জয়রাম বেশীদিন এই সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, হরনাথের জন্মের পর হইতেই ভাগ্যলক্ষ্মীও জয়রামের প্রতি প্রসন্না হইলেন। তাঁহার সংসারে পুনরায় সচ্ছলতা দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে হরনাথের বয়স এক বৎসর হইল এবং তিনি বেশ হামা দিতে শিখিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে আটক রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। সামান্য ছাড়া পাইলেই পুষ্করিণীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইতেন। কাজে ব্যস্ত থাকিলে ভৃত্য গুরুচরণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিত অথবা দাসী বিমলা হাড়িনীর জিম্মায় রাখিয়া যাইত। দেড় বৎসর বয়সে হরনাথ দাঁড়াইতে শিখেন এবং হাঁটিতে পারেন। ইহার কিছুদিন পরে (২০শে চৈত্র ১২৭৩ সাল) ভগবতী দেবীর ক্রোড়ে বগলা আসিল। নূতন আগন্তুকের পরিচর্যায় ব্যস্ত জননী হরনাথের প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। ফলে, হরনাথ এখন মাঝে মাঝে পাড়ার মধ্যে যথেচ্ছ বিহারের সুযোগ পাইতেন। পূর্ণ দুই বৎসর বয়সে হরনাথ বেতের ধামিতে করিয়া মুড়ি খাইতে খাইতে একেবারে রাসতলায় উপস্থিত হইতেন এবং রাসতলায় বসবাসকারী প্রভুহীন কুকুরদের সহিত খেলা করিতেন। নিত্য মুড়ি খাইতে পাইয়া কুকুরেরাও শিশু হরনাথকে চিনিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিয়া আনন্দে

লেজ নাড়িত। গৃহে হরনাথের অনুপস্থিতি জননীর উৎকণ্ঠার কারণ হইত। কাতরা জননীর উৎকণ্ঠা দূরীকরণার্থে হরনাথকে খুঁজিবার জন্য কমলা, শিবনারায়ণ কিংবা ভৃত্য গুরুচরণ বাহির হইত এবং সারমেয়দলের মধ্য হইতে শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনিত।

হরনাথের শৈশবলীলার আর একদল সঙ্গী ছিল—সেগুলি হইল হনুমান। হনুমানের উপদ্রবে সেকালে সোনামুখীর গৃহস্থমাত্রেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। ইহারা গৃহস্থের ঘটি, বাটি প্রভৃতি জিনিস-পত্র লইয়া পলাইত, কাপড় ছিঁড়িয়া দিত, আবার তাড়া করিলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিত। শিশু হরনাথ মুড়ি দেখাইলে, ইহারা বৃক্ষ বা গৃহচূড়া হইতে অবতরণ করিত এবং হরনাথের হাত হইতে মুড়ি খাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। হরনাথ তাহাদের ভয় করিতেন না, বরং নিতান্ত পরিচিত জনের মত তাহাদের স্কন্ধে ও গাত্রে হস্তার্পণ করিতেন। তাহারা হরনাথকে কিছু বলিত না। হনুমান-গণের সহিত হরনাথের এই সখ্য-সম্বন্ধ দর্শনে প্রতিবেশী সকলেই বিস্মিত হইত এবং কাহারও কোন দ্রব্য হনুমান কর্তৃক অপহৃত হইলে হরনাথের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিত। একদিন একটি বৃহদাকার হনুমান শিশু হরনাথকে ক্রোড়ে করিয়া শিবমন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর তুলিয়া বসাইয়া দেয়। পরম নির্ভরতায় হরনাথ তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকেন। শঙ্কিতা জননীর আর্ত চীৎকারে প্রতিবেশিগণ আসিয়া সমবেত হয়। তাহাদের আকস্মিক আগমনে ও কলরবে হনুমানটি ভীত হইয়া পলায়ন করিলে, প্রতিবেশীরা হরনাথকে মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে নামাইয়া আনে।

হরনাথের বয়স যখন আড়াই বৎসর তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে হরনাথের অলৌকিক শক্তির পরিচয় আভাসিত হয় এবং শ্রীচৈতন্যের শৈশবলীলার সহিত তাঁহার শৈশবলীলার সাদৃশ্য আংশিকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শিশু হরনাথ একদিন পাড়ার মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে হারাধন মুখোপাধ্যায় নামক একজন প্রতিবেশীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাঁহার কণ্ঠদেশে দোদুল্যমান একটি রৌপ্য পদক দর্শন করিয়া উক্ত প্রতিবেশী লুব্ধ হয় এবং

হরনাথকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে রৌপ্য পদকটি অপহরণ করে। ইহাতে শিশু হরনাথের মনে কোনরূপ বিকার হয় না। খেলিতে খেলিতে তিনি বাড়ীর পথে ফিরিয়া আসেন। পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া ভগবতী দেবী পথিমধ্যে হরনাথকে দেখিতে পাইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিরাভরণ কণ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত হইল। হনুমানেরা পদকটি ছিঁড়িয়া লইয়াছে ভাবিয়া, তিনি হনুমানদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শিশু হরনাথ তাঁহাকে আকারে-ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিয়া পশ্চিমদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। পুত্রের নির্দেশ-মত ভগবতী দেবী প্রতিবেশী হারাধনের গৃহে উপনীত হইলে, হরনাথ হারাধনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। ভগবতী দেবীর মনে তখন সন্দেহ উপস্থিত হইল। হারাধনকে তিনি পদকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হারাধন ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবতী দেবীকে কটূক্তি করিলেন। নিরাশ হইয়া ভগবতী দেবী গৃহে প্রত্যাগমন-মানসে ফিরিলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া হরনাথ জননীর ক্রোড় হইতে নামিয়া, হারাধনের গৃহের পশ্চাতে অবস্থিত আবর্জনার স্তূপটি দেখাইলেন। ইতিমধ্যে কন্যা কমলা ও প্রতিবেশীদের অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিল। সকলে মিলিয়া আবর্জনার স্তূপটি সরাইতেই হরনাথের রৌপ্য পদক বাহির হইয়া পড়িল। ভগবতী দেবী পদক লইয়া গৃহে ফিরিলেন। চৌর্যবৃত্তির জন্য প্রতিবেশিগণ হারাধনকে ধিক্কার দিতে লাগিল।[১] শৈশবে হরনাথের পদকচুরির ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের শৈশবেও ঘটে। শিশুর দেহ

১। হরনাথ জীবনীকারগণের মতে, এই ঘটনাটিই হরনাথের অলৌকিক শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটিবার সময় শিশু হরনাথ ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। অথচ ইঙ্গিতে চোর এবং চুরি-করা বস্তু লুকাইয়া রাখিবার স্থান পর্যন্ত দেখাইয়া দিলেন। ঘটনাটির মধ্যে অলৌকিকত্ব না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু অপহৃত বা লুক্কায়িত দ্রব্যাদি খুঁজিয়া বাহির করার ঘটনা হরনাথের শৈশবে এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছিল যে, বর্ণিত ঘটনাটিকে আকস্মিক বলিবার সাহস হয় না, বরং ইহাকে তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রথম পরিচায়করূপে গণ্য করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই শক্তি সম্বন্ধে হরনাথ নিজেও বলিয়াছেন। দ্রঃ Haranath Souvenir, Page 21

হইতে মূল্যবান অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মানসে চোরেরা শ্রীচৈতন্যকে স্কন্ধে করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথ মিশ্রেরই বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করে। শ্রীচৈতন্য ও হরনাথ—এই দুই প্রেমধর্ম-প্রচারকের শৈশবকালের এই দুই ঘটনার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা না গেলেও, এই দুইটি ঘটনাকেই তাঁহাদের উভয়েরই পরবর্তী জীবনের অতি-মানবত্বের এবং সেই সঙ্গে শিশু হিসাবেও তাঁহাদের অসাধারণত্বের প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

এই সামান্য ঘটনাটি হইতেই শিশু হরনাথের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সকলেই অবহিত হইল। ইহার পূর্বে যাহা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন হইতে তাহার পরিধি হইল বহু-বিস্তৃত। এখন হইতে কাহারও কোন জিনিস হারাইলেই শিশু হরনাথের শরণাপন্ন হইত। সংবাদ শুনিবামাত্র হরনাথও যেদিকে জিনিসটি থাকিত, সেইদিকে চলিতে আরম্ভ করিতেন এবং অল্পকাল মধ্যেই হারানো জিনিসটি বাহির করিয়া দিতেন। এইভাবে হারানো জিনিস খুঁজিয়া দেওয়ার ফলে পাড়া-প্রতিবেশিগণ শিশু হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারসাধন হইবে বলিয়া, লোকে শিশু হরনাথের শরণাপন্ন হইত। হরনাথও তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে অপহৃত দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া শরণাগতকে ফিরাইয়া দিতেন। কিন্তু হরনাথের শৈশব শুধু হারানো বা অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধারের অলৌকিক লীলাতেই অতিবাহিত হয় নাই। আরও এমনি একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা দ্বারা মনে হইতে পারে হরনাথ সর্বজ্ঞ ছিলেন, কোন কিছুই তাঁহার অগোচর থাকিত না। স্ত্রীর মুখে জয়রাম এই কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া নিজে হরনাথকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়েন। যে ঘটনা উপলক্ষে জয়রাম শিশু হরনাথের এই সর্বজ্ঞতার প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। কলিকাতা হইতে আসিয়া পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া জয়রাম

মুড়ি খাইতেন। হরনাথ পিতার সহিত মুড়ি খাইবার কিছু পরেই আবার মুড়ি দিবার জন্য জননীকে পীড়াপীড়ি করিতেন। কুকুর ও হনুমানকে খাওয়াইবার জন্য পুত্রকে মুড়ি দিতে ভগবতী দেবীর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। সেজন্য তিনি মুড়ি লুকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু যেখানেই তিনি মুড়ি লুকাইয়া রাখুন না কেন, হরনাথ সেই গুপ্ত স্থান জননীকে দেখাইয়া দিতেন। জয়রাম ইহাতে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, টিনের মুড়ি বস্ত্রে বাঁধিয়া হরনাথের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিবমন্দিরে লুকাইয়া রাখিয়া আসেন। কিন্তু হরনাথ সেই মুড়িগুলি কোথায় আছে দেখাইয়া দিয়া পিতাকে বিস্ময়বিমূঢ় করিলেন।

ইহার পর হইতে হরনাথকে নানা জনে নানা ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রতিটি পরীক্ষাতেই হরনাথ স্বীয় অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। পরবর্তী জীবনে হরনাথ শৈশবের এই অলৌকিক শক্তির কথা বিস্মৃত হন নাই। মহাত্মা শিশিরকুমার সম্পাদিত হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নানারূপ অলৌকিক কাহিনীর কথা অবগত হইয়া, তিনি স্বীয় শৈশবের এই অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির কথা বিবৃত করেন। হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে তাঁহার সেই উক্তি প্রকাশিত না হইলে, জনসমাজ হরনাথের শৈশবের সেই অলৌকিক শক্তির কথা জানিতে পারিত না।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে স্বয়ং অলৌকিক শক্তির কথা বিবৃত করার মূলে হরনাথের আত্মপ্রচার-স্পৃহা কিয়ৎ পরিমাণেও ছিল—অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিতে পারে। তাহা হইলে অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে হরনাথ অন্যত্র তাঁহার যে অনবধানতার কথা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই হরনাথ কর্তৃক হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে স্বীয় অলৌকিক শক্তির কথা বিবৃত করার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যাইবে এবং দেখা যাইবে, ইহার মূলে হরনাথের আত্মপ্রচার-স্পৃহার লেশমাত্র ছিল না। ছিল, অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা।

হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় ২৫০ হইতে ২৫৬ পৃষ্ঠায় হরনাথের অলৌকিক শক্তির কথা প্রচারিত হয়।[১]

এই যুগে শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে এই সমস্ত ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করা সম্ভব ছিল না। যুক্তি দ্বারা যাহা সমর্থিত হয় না তাহাই অবিশ্বাস্য ও পরিত্যাজ্য—এইরূপ একটা মতবাদ এই যুগে প্রবল আকার ধারণ করে এবং সমস্ত কিছু দৈবী বা অলৌকিক ঘটনাকে যুক্তিবাদের তীব্র ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার একটা তীব্র প্রবণতা এই যুগের শিক্ষিত জনমানসে দেখা যায়। ফলে, অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রবল আকার ধারণ করে। ইহার হয়ত প্রয়োজন ছিল। কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা দূর করিতে যুক্তিবাদের ঝটিকা-প্রবাহ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিরন্তর যুক্তির দোহাই পাড়িলে মন আবার নাস্তিক্য বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে।

খুব সম্ভবতঃ নাস্তিক্য বুদ্ধির বিনষ্টসাধন করিয়া মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই হরনাথ জনসমাজে স্বীয় অলৌকিক শক্তির কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে অবিশ্বাসীর অন্তরে প্রথমেই সন্দেহ জাগিয়াছিল, মনে হইয়াছিল জগতে এমন অনেক কিছু থাকিতে পারে, যুক্তি দ্বারা বা বুদ্ধি দ্বারা যাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। এইভাবে সন্দেহ জাগ্রত করিয়া হরনাথ বোধ হয় ধর্মপ্রচারের উপযোগী করিয়া জনমানস-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন। বহু-প্রচারিত হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় হরনাথের অলৌকিক শক্তির কাহিনী পাঠ করিয়া কেহ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিনা, তাহা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু

১। হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে হরনাথ মহাত্মা শিশিরকুমারকে লেখেন :

"What you have written in your Magazine does not surprise me. I am familiar with this gift, and came to know that I possessed it when I was not more than three or four. My mother and sister concealed things and asked me to find them out and I would do it immediately."

—***Hindu Spiritual Magazine***, November, 1907.

অলৌকিকতার প্রতি অধিকাংশ মানুষের মনে একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের বলে হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনের পাঠক-গোষ্ঠীর মধ্যে হরনাথ সম্বন্ধে সামান্যমাত্রও আগ্রহ জাগে নাই, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। বরং মহাত্মা শিশিরকুমার প্রমুখ ব্যক্তির হরনাথ-জীবনী রচনার আগ্রহ এই প্রকাশনারই ফলশ্রুতি বলিয়া মনে হয়।[১] চারি বৎসর বয়স হইতেই হরনাথের বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি রথযাত্রার দিবসে শিবনারায়ণের হাতেখড়ি হয়।

সোনামুখীর শ্যামবাজারে কায়স্থ জাতীয় তারাচাঁদ সরকার মহাশয়ের পাঠশালায় শিবনারায়ণের বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথম দিন হইতেই শিবনারায়ণের সহিত হরনাথও পাঠশালায় যাতায়াত সুরু করেন। তখন পাঠশালা বসিত সকালে ও বৈকালে। চারি বৎসর বয়স্ক শিশু হরনাথ প্রাতঃকালেই জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত পাঠশালায় যাইতেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে ছুটির সময় পর্যন্ত তাঁহার পাঠশালায় থাকা হইত না। সামান্য বেলা হইলেই বিমলা হাড়িনী হরনাথকে পাঠশালা হইতে লইয়া আসিত। জয়রাম এই বৎসর (১২৭৫ সাল) অগ্রহায়ণ মাসে জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহের কথাবার্তা পাকা করেন। শুশুনিয়া-নিবাসী উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কমলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। ১২৭৬ সালের মাঘ মাসে বিবাহের দিনস্থির হয়।[২]

১। শিশিরকুমার ঘোষ অবশ্য হরনাথ-জীবনী রচনা করিতে পারেন নাই। হরনাথের জীবনী-রচনার বহু উপাদান তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হয় নাই।

২। 'অমিয় হরনাথ-লীলাকথা'র প্রথম ভাগে ৫৩ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় ভাগবত মিত্র লিখিয়াছেন, জয়রাম ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাসে কমলার বিবাহ দিবার দিনস্থির করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ার সন্নিকট শুশুনা-নিবাসী শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিবার স্থির করেন। আবার উক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় ভাগে ৩৫২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিতেছেন—'১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসেই (১৮৬৮ সালের নভেম্বর মাসে) জয়রামের:কন্যা কমলার বিবাহের পাকাদেখা ও লগ্নপত্রমোহরাদি হয়। শুশুনা-নিবাসী শ্রীমান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মাঘ মাসে বিবাহ স্থির হয়।' একই লেখকের লেখায় এইরূপ পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্যে কোনটি সঠিক, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য আমি হরনাথের পরিবারের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি-গণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অবগত হই যে, কমলার স্বামীর নাম ছিল উমাপদ

বিবাহের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে জয়রাম কলিকাতা যাত্রা করেন। কয়েকদিন ধরিয়া জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া জয়রাম ১লা পৌষ তারিখে জ্বরাতিসারে আক্রান্ত হন। সে কারণে তিনি কলিকাতায় দুই-একদিন অপেক্ষা করেন। কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন এবং মাত্র ছয়দিন রোগভোগ করিয়া ৯ই পৌষ মৃত্যুমুখে পতিত হন।* মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর ৮ মাস ৫ দিন। সেই সময় কন্যা কমলার বয়স ছিল ৯ বৎসর ১ মাস, শিবনারায়ণের বয়স ৫ বৎসর ৭ মাস, হরনাথের বয়স ৩ বৎসর ৬ মাস এবং বগলার বয়স ছিল ১ বৎসর ১০ মাস মাত্র। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কমলা, শিবনারায়ণ ও হরনাথকে শয্যাপার্শ্বে আহ্বান করেন বোধ হয় কিছু বলিবার জন্য। কিন্তু তাহা আর বলা হইল না। না-বলা বাণী চিরদিনই অকথিত রহিল। জয়রাম মহাপ্রয়াণ করিলেন।

জয়রামের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গানারায়ণ ও নদেরচাঁদ নামক তাঁহার দুই জ্ঞাতি। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে শালি নদীর তীরে জয়রামের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইল। চিতাভস্ম ও অস্থি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞাতিগণের পরামর্শে শিবনারায়ণ গঙ্গাতীরেই জয়রামের আদ্যশ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।[১]

মুখোপাধ্যায়—তিনি শুশুনিয়া গ্রামেরই অধিবাসী। তাঁহারই সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া জয়রাম পরলোকগত হন। শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্রের 'অমিয় হরনাথ-লীলাকথা'র দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, জয়রাম কমলার বিবাহের জিনিসপত্র ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করেন এবং সেখানে জ্বরাতিসারে আক্রান্ত হন। বৈশাখ মাসে বিবাহের দিনস্থির হইলে তাড়াহুড়া করিয়া পৌষ মাসে জিনিসপত্র কিনিবার কোন দরকার থাকে না। সুতরাং শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের পরবর্তী বিবরণীই ঠিক বলিয়া মনে হয়; অর্থাৎ, ১২৭৫ সালের মাঘ মাসেই কমলার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। Haranath Souvenir গ্রন্থে Photo No. 21-এর ব্যাখ্যাকালে শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র লিখিয়াছেন, ১২৭৬ সালের মাঘ মাসে উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কমলার বিবাহ হয়। ১৩৩৬ সালের ৫ই আষাঢ় কমলা পরলোকগমন করেন। তাঁহার ৫টি পুত্রসন্তান হয়।

* কাহারও কাহারও মতে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন।

১। মতান্তরে, শালি নদীর তীরে জয়রামের পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। গঙ্গা শব্দ নদী শব্দের সমার্থক, সুতরাং যে-কোন নদীকেই গঙ্গা বা গাঙ্‌ বলা হয়।

জয়রামের মৃত্যু সমগ্র সংসারের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিলেও, সদ্যোবিধবা ভগবতী দেবী দিশাহারা হইলেন না। পতি-বিয়োগ বেদনা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া তিনি দৃঢ়হস্তে সংসারের হাল ধরিলেন। ফলে, জয়রামের গালার ব্যবসায় যেমন চলিতেছিল, তেমনিভাবেই চলিতে লাগিল এবং শিবনারায়ণ ও হরনাথের লেখা-পড়ার কোন ব্যাঘাত হইল না। কেবল কালাশৌচ বলিয়া কন্যা কমলার বিবাহ সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারিলেন না। এক বৎসরকাল-ব্যাপী কালাশৌচ কাটিলে ১২৭৬ সালের মাঘ মাসে জয়রাম-নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গেই কমলার বিবাহ দিয়া ভগবতী দেবী স্বামীর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিলেন।

জয়রামের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর ভগবতী দেবীর তত্ত্বাবধানে শিবনারায়ণ ও হরনাথ পূর্বের মত সরকার মহাশয়ের পাঠশালায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে ভগবতী দেবী শিবনারায়ণের জন্য রাত্রিতে পড়িবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় তারাচাঁদ সরকার বারুইপাড়ার গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় কয়েকটি ছাত্রকে পড়াইতে আসেন জানিতে পারিয়া, ভগবতী দেবী শিবনারায়ণকেও সন্ধ্যার সময় গঙ্গানারায়ণবাবুর বাড়ীতে প্রাইভেট পড়িতে পাঠাইতেন। দিবাভাগের মত রাত্রিতেও হরনাথ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগামী হইতেন। এই সময় একদল 'মাল'-জাতীয় সাপুড়িয়া সাপ ধরিতে আসে এবং জয়রামের শিবমন্দিরের সম্মুখের একটি গর্ত হইতে একটি বৃহদাকার গোক্ষুরা (কেউটে) সাপ ধরে এবং ধরা সাপটি লইয়া খেলাইতে থাকে। পাড়ার সকলে সাপখেলা দেখিতে সমবেত হয়, হরনাথকে কোলে লইয়া বিমলি হাড়িনীও সাপখেলা দেখিতে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সাপটি বিমলির দিকে যাইতে থাকে। ভীতা বিমলি অন্যদিকে সরিয়া যায়, সাপও সেই দিকে মুখ করিয়া অগ্রসর হয়। এইভাবে বিমলি যতবার দিক পরিবর্তন করে, সাপও ততবার দিক পরিবর্তন করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হয়। সাপকে তাহার দিকে আসিতে দেখিয়া হরনাথ বিমলির কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া সাপ ধরিবার

আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সাপটিকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হয়। শিশুর এবম্বিধ নির্ভীক আচরণে বিস্মিত হইয়া সাপুড়িয়া সাপটিকে ধরিয়া হরনাথের নিকট লইয়া যায় এবং হরনাথ সাপটিকে ধরিবার চেষ্টা করে। বিস্মিত সাপুড়িয়া মন্তব্য করে যে, এই ছেলে বড় হইলে সাপ ধরিতে পারিবে।

হরনাথ-জীবনীর একজন লেখক এই ঘটনাটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[১] তাঁহার মতে, সাপটির হরনাথের প্রতি আকর্ষণ হরনাথের অলৌকিক শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক। কিন্তু এই ঘটনাটিকে আকস্মিকতার পর্যায়ভুক্ত করিবার পক্ষেও কোন বাধা থাকে না। আর সাপ ধরিবার আগ্রহও হরনাথের নির্ভীকতার পরিচায়ক নয়—ইহা শিশুসুলভ কৌতূহল মাত্র। সুতরাং এই ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ না করাই অধিকতর সঙ্গত।

বাল্যকালে হরনাথ কর্তৃক একজন মহাপুরুষ দর্শনের ঘটনা তাঁহার জীবনী-লেখকগণ উল্লেখ করেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ রাত্রিকালে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের দশমী তিথি—শীতের শিশিরাচ্ছাদিত ম্লান-জ্যোৎস্নালোকিত পথে হরনাথ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণের সহিত রাত্রিকালীন বিদ্যাভ্যাস করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিলেন। অন্যান্য দিনের মত সেদিন ভৃত্য গুরুচরণ[২] তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাইতে আসে নাই। কারণ, পরদিন অর্থাৎ ১২ই পৌষ জয়রামের বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত থাকায়, গুরুচরণ শিবনারায়ণ ও হরনাথকে আনিতে যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

বারুইপাড়ার গঙ্গানারায়ণবাবুর বাড়ীতে শিবনারায়ণ রাত্রিকালে পাঠাভ্যাস করিতে যাইতেন। সেদিনের রাত্রিকালীন বিদ্যাভ্যাস

১। ভাগবত মিত্র—অমিয় হরনাথ-লীলাকথা, পৃঃ ৩৫৪

২। গুরুচরণ মান্না জাতিতে তিলী। ১২৭৩ সালে জয়রাম ইহাকে পেটভাতায় নিযুক্ত করেন। ইহার প্রধান কার্য ছিল হরনাথকে দেখাশুনা করা। গুরুচরণ বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। ভারতের বহু তীর্থ সে দর্শন করিয়াছিল। শিশু হরনাথ তাঁহার নিকট হইতে বহু তীর্থের বিবরণ শুনিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর মত বলিতে পারিতেন।

শেষ হইলে, শিবনারায়ণ হরনাথকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যোগী হইলেন। গঙ্গানারায়ণবাবুর ভৃত্য তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে চাহিল। কিন্তু পথিমধ্যে গুরুচরণের সহিত দেখা হইবে ভাবিয়া, শিবনারায়ণ তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। গঙ্গানারায়ণবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া শিবনারায়ণ ও হরনাথ প্রশস্ত পথ বাহিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া, একটি দ্বিতল বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া গলিপথে আসিয়া পড়িলেন। এই গলিপথে আসিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের পশ্চাতে কাষ্ঠ-পাদুকা-পরিহিত কোন ব্যক্তির পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হইল। পশ্চাদ্‌বর্তী ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য শিবনারায়ণ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দীর্ঘাকৃতি-বিশিষ্ট একজন কৌপীন ও যজ্ঞোপবীতধারী সন্ন্যাসী-সদৃশ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া ভীতচিত্তে তাঁহার প্রতি হরনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

আগন্তুককে দেখিয়া হরনাথ কিন্তু ভীত হইলেন না। তাঁহার মনে হইল, পাচক দ্বারিকানাথ[১] সন্ন্যাসী সাজিয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সম্ভবতঃ তিনি বলিয়াছিলেন, 'দ্বারিকাদাদা, আমাদের ভয় দেখাতে এসেছ?' এই বলিয়া দ্বারিকানাথের চাতুর্য ধরিবার জন্য হরনাথ সেই সন্ন্যাসী-সদৃশ আগন্তুককে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উত্তরে সন্ন্যাসীর বেশধারী আগন্তুক বলিলেন যে, তিনি হরনাথের অনুমিত দ্বারিকানাথ নহেন। তারপর তিনি হরনাথকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কে, আমাকে বল।' আগন্তুকের প্রশ্নে হরনাথ বিস্ময়-মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দেন, 'কেন আমি হরনাথ। দ্বারিকাদাদা, তুমি আমাদের চিনতে পারছ না?' উত্তরে আগন্তুক বলেন যে, জয়রামের পুত্র হিসাবে হরনাথকে তিনি চেনেন। তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া হরনাথ তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন। কারণ, তখনও হরনাথের দৃঢ়

১। দ্বারিকানাথ সিদ্ধান্ত। ১২৭৩ সালে জয়রাম ইঁহাকে পাচক নিযুক্ত করেন। জয়রামের মৃত্যুর পরেও সাত-আট মাস কার্য করিয়া দ্বারিকানাথ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। ইনি ছিলেন দীর্ঘদেহী, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেন। ইঁহার কেশরাশিও ছিল সুদীর্ঘ।

ধারণা ছিল যে, সন্ন্যাসীর বেশধারী সেই পুরুষটি দ্বারিকানাথ ব্যতীত অপর কেহই নহেন। কিন্তু হরনাথকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সন্ন্যাসী-সদৃশ সেই আগন্তুক পোকাপুকুর নামক নাতিবৃহৎ পুষ্করিণীর জলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন এবং নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া শিবনারায়ণ অতিশয় ভীত হন, হরনাথও কতকটা স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকেন।

গলিপথটির অপর পার্শ্বে একটি কুটীরে প্রসন্নময়ী[১] নাম্নী হরনাথের এক আত্মীয়া বাস করিতেন। তিনি অনতিকাল মাত্র পূর্বে কার্যোপলক্ষে শিবনারায়ণের বাড়ী হইতে আপন কুটীরে আসিয়াছিলেন। কুটীরের ভিতর হইতে হরনাথ ও রহস্যময় আগন্তুকের কথাবার্তা শুনিয়া কৌতূহলবশে তিনি কুটীর হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে যেখানে ভ্রাতৃদ্বয় দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের মুখে সব কথা শুনিয়া রহস্যময় আগন্তুককে প্রেতযোনি ভাবিয়া দুই ভাইকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিলেন।

রহস্যময় আগন্তুককে প্রসন্নময়ী যে প্রেতযোনি মনে করিয়াছিলেন, তাহার কারণ ছিল। তিনি জানিতেন যে, দ্বারিকানাথ দুই মাসকাল পূর্বে তীর্থদর্শনে গিয়াছেন এবং তাঁহার পক্ষে সেই রাত্রিতে ফিরিবার, বিশেষতঃ পুষ্করিণীর জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া অদৃশ্য হইবার, কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

যাহা হউক, প্রসন্নময়ী প্রমুখাৎ সকল বিবরণ অবগত হইয়া ভগবতী দেবী ভীতি-বিহ্বলা হইলেন এবং পুত্রদের উপর হইতে অপদেবতার কোপদৃষ্টি অপসারিত করিবার জন্য বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পরদিন হইতে মাসাধিককাল ধরিয়া গৃহে চণ্ডীপাঠ করাইবার ব্যবস্থা করেন।

সন্ন্যাসী-সদৃশ এই রহস্যময় আগন্তুককে হরনাথ-জীবনী-রচয়িতাগণ সকলেই মহাপুরুষ আখ্যা দান করিয়াছেন। স্বয়ং হরনাথও ইঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[২] সুতরাং এই রহস্যময়

১। হরনাথের আত্মীয়া। কমলা, শিবনারায়ণ ও হরনাথকে ইনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। ভগবতী দেবীর সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।
২। পাগল হরনাথ—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮০

আগন্তুক যে সত্যই একজন মহাপুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মহাপুরুষের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অবশ্য কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই। স্বয়ং হরনাথও এই বিষয়ে নীরব। তিনি জীবনে মাত্র তিনবার এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে প্রথমবার, এফ. এ. পড়িবার সময় দ্বিতীয়বার এবং ডোমেলে গভীর সমাধিস্থ অবস্থায় তৃতীয়বার তিনি মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন।

শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র মহাশয় হরনাথ কর্তৃক চারিবার মহাপুরুষ দর্শনের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, ১৮৯০ সালে কলিকাতায় বি. এ. পড়িবার সময় গঙ্গার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে স্বামী ভূতানন্দের পার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় হরনাথ আর একবার মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন।[১] শ্রী এম. রামমূর্তি মহাশয়ও এই সাক্ষাৎকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হরনাথ কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের কথা বলেন নাই।

মহাপুরুষের প্রথমবার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বয়ং হরনাথ কিছু বলেন নাই। প্রথমবার সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার সহিত মহাপুরুষের যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, সেগুলি পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, পিতৃ-পরিচয় ছাড়াও হরনাথের অপর কোন বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্যই মহাপুরুষের আগমন হইয়াছিল। 'তুমি কে আমাকে বল।'—মহাপুরুষের এই অনুরোধ বা জিজ্ঞাসার পশ্চাতে হরনাথের স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু হরনাথের বয়সের কথা বিবেচনা করিলে, এই সিদ্ধান্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হয়। সাড়ে চারি বৎসর বয়স্ক একটি শিশুকে একজন মহাপুরুষ যে স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কোন কোন জীবনী-লেখকের মতে, হরনাথের নিকট মহাপুরুষের এই প্রথমবার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হরনাথকে আশীর্বাদপুষ্ট করিবার জন্য[২] ইহাও অনুমান মাত্র। কিন্তু এই অনুমানের যৌক্তিকতা আছে।

১। হরনাথ সৌভেনীর—ভাগবতচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৩৪

২। হরনাথ সৌভেনীর—ভাগবতচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ২২

মহাপুরুষের দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরনাথ কিছু বলেন নাই, জীবনীকারেরাও নীরব। মহাপুরুষের তৃতীয়বারের অর্থাৎ ১৮৯০ সালে বি. এ. পড়িবার সময়ে আবির্ভাবের কথা হরনাথ নিজে বলেন নাই। যে জীবনীকারদ্বয় এই আবির্ভাবের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহাদের একজনের মতে, এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল, হরনাথকে স্বামী ভূতানন্দের সাহচর্য করিতে নিষেধ করা।[১] তাঁহার জীবনে মহাপুরুষের চতুর্থবার বা শেষবারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হরনাথ স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।[২] এই উদ্দেশ্য ছিল গভীর সমাধিস্থ অবস্থায় স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্থূলদেহকে ভবিষ্যৎ কর্মের উপযোগী করিয়া সংস্কৃত করা। এই সময়েই মহাপুরুষ হরনাথের নিকট তাঁহার আরও দুইটি আবির্ভাবের কথা বলেন। হরনাথ-জীবনে মহাপুরুষের ইহাই শেষবারের আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই প্রমাণ করে যে, হরনাথের জীবনে এই অজ্ঞাত-পরিচয় মহাপুরুষের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যারম্ভ

১২৭৬ বঙ্গাব্দের ১২ই মাঘ হরনাথের হাতেখড়ি[৩] হয়। শিশু হরনাথ ইহার পূর্ব হইতে সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণের সহিত পাঠশালায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিদ্যালাভ বিশেষ কিছু না হইলেও, পাঠশালা

১। The Divinity of Haranath the Crazy, Page X by Sepuri Lakshminarasayya.

২। হরনাথ-স্মৃতি—৪র্থ লহরী, পৃঃ ১৫।১৬

৩। হাতেখড়ি—বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান। শিশুর বয়স চারি বৎসর চারি মাস চারি দিন হইবার পর কোন শুভদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বা গুরুমহাশয় শিশুর হস্তে কাঠখড়ি বা চকখড়ি ধরাইয়া দেন এবং ভূমিপৃষ্ঠে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথম দুইটি অক্ষর লিখিয়া শিশুর হাত ধরিয়া উক্ত অক্ষরসমূহের উপর দাগ বুলাইতে শিক্ষা দেন। শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক সাধ্যানুসারে হাতেখড়ি-দাতাকে ভক্ষ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দান করেন এবং নগদ দক্ষিণাও দেন। চারি বৎসর সাত মাস বয়সে হরনাথের হাতেখড়ি হয়।

যাতায়াতের অভ্যাসটি তাঁহার ভালভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হাতেখড়ির পর হইতে শিশুমনে বিদ্যালাভের আগ্রহ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল। সুযোগ্য গুরুমহাশয় তারাচরণ সরকারের[১] সযত্ন তত্ত্বাবধানে শিশুমনের সেই আগ্রহ নিরন্তর বর্ধিত হইয়াছিল।

সুকুমার বালক হরনাথকে গুরুমহাশয় অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ আলোচনা করিতেন। স্নেহশীল গুরু-মহাশয় সম্বন্ধে হরনাথের মনে কোনরূপ ভীতি ছিল না। সুতরাং হরনাথ স্বচ্ছন্দে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন এবং যে-কোন বিষয়েই স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ এক আলোচনার সময় হরনাথের একটি প্রশ্নে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুমহাশয়ের মনে হরনাথের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। অতঃপর গুরুমহাশয় বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের নিকট বালক হরনাথের তত্ত্ব-বিষয়ে ধারণার বর্ণনা করিতেন। যে বালক ধর্মগ্রন্থ পাঠ তো দূরের কথা, ধর্মগ্রন্থ চক্ষেও দর্শন করে নাই, তত্ত্ব-বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণার কথা শুনিয়া বহুদর্শী গুরুমহাশয়ের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পূর্বজন্মে হরনাথ একজন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

এখানে যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময় হরনাথের বিদ্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগের বেশী অগ্রসর হয় নাই। একদিন গুরুমহাশয় উক্ত পুস্তকের 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়' প্রভৃতি অংশ পাঠদান করেন। গুরুমহাশয় উক্ত অংশ প্রথমে স্বয়ং পাঠ করিয়া হরনাথকে পাঠ করিতে নির্দেশ

১। তারাচরণ সরকার—ইঁহার পিতার নাম গোপাল সরকার। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। সোনামুখীর শ্যামবাজারে ইঁহার পাঠশালা ছিল। ইনি সোনামুখীর বারুইপাড়ার মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে থাকিতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হরনাথ, শিবনারায়ণ প্রমুখ ছাত্রদের প্রাইভেট পড়াইতেন। হরনাথ যখন পাঠশালায় ভর্তি হন, তখন সরকার মহাশয় বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে বার্ধক্যের জন্য ইনি পাঠশালার কাজ বন্ধ করেন। গুরুমহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সকল ধর্মগ্রন্থ, বেদবেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে ইঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধেও ইঁহার সুপ্রচুর জ্ঞান ছিল।

দান করিলে, হরনাথ তাঁহাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করেন—আকাশ হইতে যে বৃষ্টির জল পড়ে, পুষ্করিণী খুঁড়িলে পাতাল হইতে যে জল বাহির হয়, এই জল কাহার ?

বিস্মিত গুরুমহাশয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হরনাথ তাঁহার কথার জের টানিয়া বলিয়া চলিলেন—'বাবা বলিয়াছিলেন, এই জল আমাদের শ্যামসুন্দরের। কিন্তু কেহ তো শ্যামসুন্দরকে বলিয়া জল লয় না।' হরনাথের কথা শুনিয়া নিদারুণ বিস্ময়ে পণ্ডিতমহাশয়ের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। বালকের মুখে পরমভাগবতের কথা শুনিয়া তাঁহার নিঃসংশয় ধারণা জন্মিল যে, কালে এই বালক একজন পরম তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ হইবেন।

তারাচাঁদ সরকার মহাশয়ের পাঠশালায় হরনাথ চারি বৎসরকাল পড়িয়াছিলেন। এই চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিদ্যানুরাগ এবং তত্ত্বজ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুমহাশয়ের স্নেহপূর্ণ প্রশ্রয়ে হরনাথের তত্ত্ব আলোচনার আগ্রহ দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠে। শিশুর মুখে পরমতত্ত্বের গুহ্যরহস্য শ্রবণে বৃদ্ধ গুরু-মহাশয় সবিশেষ আনন্দলাভ করিতেন।

পাঠশালার চারি বৎসরব্যাপী অধ্যয়নের কালসীমার মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলার বিবাহ এবং কুসুমকুমারী দেবীর জন্ম হয়। এই কুসুমকুমারীই পরবর্তী কালে হরনাথের সহধর্মিণী হন।

কমলার বিবাহ ও কুসুমকুমারীর জন্ম

পাঠশালায় ভর্তি হইবার কিছুদিন পরেই হরনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলার বিবাহের দিন ধার্য হয়। এক বৎসর পূর্বে জয়রাম বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া গ্রাম-নিবাসী যে পাত্রের সহিত কমলার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, সেই পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার

হরনাথ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল সুউচ্চ। তাঁহার দুই পুত্র গোষ্ঠবিহারী এবং শরৎচন্দ্র। গোষ্ঠবিহারীর পুত্রের নাম ভূধর এবং শরৎচন্দ্রের পুত্রের নাম করুণাময়।

জন্য ভগবতী দেবী বিবাহের দিন ধার্য করিয়া বরকর্তার নিকট লোক পাঠান এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে ১২৭৬ সালের ১২ই মাঘ কমলার বিবাহ হয়। ভগবতী দেবীকেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে হয়। কারণ, জয়রাম তাঁহার উপার্জনের অধিকাংশ দেবকার্যে ব্যয় করিতেন। ফলে, মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। স্বামীর পরলোকগমনের পর ভগবতী দেবী নিজ-হস্তে সংসারের হাল ধরিয়া স্বামীর গালার কারখানা পরিচালনার এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, মাত্র এক বৎসরকালের লাভের অংশ এবং অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তির আয় হইতেই কমলার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইল। সেই কারণে কমলার বিবাহের জন্য তাঁহাকে কোথাও কোন ঋণ গ্রহণ করিতে হয় নাই।[১]

হরনাথের পাঁচ বৎসর পাঁচ মাস বয়সের সময় কুসুমকুমারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কন্দর্পসুন্দর, মাতার নাম চন্দ্রাবলী। তাঁহার পিতামহের নাম যজ্ঞেশ্বর এবং প্রপিতামহের নাম ছিল বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য। সোনামুখীর ব্রাহ্মণপাড়ায় ইঁহাদের বাস ছিল। কুসুমকুমারীর মাতামহের বাস ছিল কাঁটাবাঁধ গ্রামে, তাঁহার নাম ছিল গৌরগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

কুসুমকুমারী পিতামাতার প্রথম সন্তান। তাঁহার আরও তিনটি ভগিনী এবং পাঁচটি ভ্রাতা ছিল।[২] এই ভগিনীদের মধ্যে একজন বৈধব্যের পর হরনাথের বাড়ীতেই থাকিতেন। হরনাথ-ভক্তগণ তাঁহাকে ছোট মাসীমা বলিতেন।[৩]

১। ভগবতী দেবীর মিতব্যয়িতার খ্যাতি ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৩।১৪ বৎসরকাল তিনি গালার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ের লভ্যাংশ এবং ভূসম্পত্তির আয় হইতে সংসার চালাইয়া কন্যার বিবাহ, পুত্রদের শিক্ষা ও বিবাহ প্রভৃতি দিয়াও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া পাকা দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। পুত্রদের বিবাহে তিনি কোনরূপ যৌতুক গ্রহণ করেন নাই। মিতব্যয়ী না হইলে তাঁহার পক্ষে এত সব করা সম্ভব হইত না।

২। ভগিনীদের নাম—দামিনী, ননীবালা ও মতি। ভ্রাতাদের নাম—জ্যোতির্ময়, কালীপদ, বিনোদ, গোকুল ও গোলক।

৩। ইঁহার নাম মতিবালা, জন্ম ১২৯৫ সাল, স্বামী কালীপদ অধিকারী—অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ইনি পরলোকগমন করেন।

কুসুমকুমারীর মাতা চন্দ্রাবলী দেবী ভগবতী দেবীর মাতা দাসু ঠাকুরানীর আত্মীয়া ছিলেন। চন্দ্রাবলী দেবী ভগবতী দেবীকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং ভগবতী দেবীও তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনী জ্ঞানে স্নেহ করিতেন। উভয়ের মধ্যে এই স্নেহের বন্ধন ছিল অতিশয় প্রগাঢ়। তৎকালে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায়, স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সেই সন্তানসম্ভবা হইত। চন্দ্রাবলী দেবীও মাত্র পঞ্চদশবর্ষে গর্ভবতী হইলেন। গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইবার সংবাদে আনন্দিত হইয়া ভগবতী দেবী বালক হরনাথকে সঙ্গে লইয়া অসীম স্নেহের পাত্রী চন্দ্রাবলীকে দেখিতে গেলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন—'যদি তোমার মেয়ে হয়, তাহা হইলে আমার হরনাথের সহিত তাহার বিবাহ দিব।'[১] ভগবতী দেবীর প্রতিশ্রুতিতে চন্দ্রাবলী আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পরম কান্তিমান শিশু হরনাথকে স্নেহভরে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

দশ মাস দশ দিন গর্ভধারণ করিবার পর চন্দ্রাবলী দেবীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। দুই দিন ধরিয়া[২] প্রসববেদনা হইল, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। উপস্থিত ধাত্রীবৃন্দ ও কবিরাজগণ সকলেই চন্দ্রাবলীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রাবলী প্রথম দিনের প্রসববেদনার কথা বোধ হয় লজ্জাবশেই তেমন প্রচার হইতে দেন নাই। কিন্তু বেদনা যখন প্রবল আকার ধারণ করিল এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন নিদারুণ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া কন্দর্পসুন্দর কবিরাজদিগকে সংবাদ দিলেন। সেই সূত্রে গ্রামের সর্বত্র চন্দ্রাবলীর জীবনাশঙ্কার সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল এবং ভগবতী দেবীরও কর্ণগোচর হইল। সংবাদ শুনিবামাত্র ভগবতী দেবী কালবিলম্ব না করিয়া চন্দ্রাবলীকে দেখিতে গেলেন। হরনাথের সহিত কমলাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ভগবতী দেবীকে দেখিবামাত্র চন্দ্রাবলীর

১। প্রথম গর্ভে কন্যার জন্ম—জন্মদাতা ও জনয়িত্রীর পক্ষে শুভ এইরূপ ধারণা পল্লীবাসিনী বর্ষীয়সীদের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

২। ১২৭৭ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ হইতে ৩০শে অগ্রহায়ণ।

মন অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। 'দিদি এসেছ' বলিয়া তিনি ভগবতী দেবীকে বাচনিক অভ্যর্থনা জানাইলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার পুনরায় প্রসববেদনা জাগিল এবং মুহূর্তমধ্যে একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর কন্যাটি চোখ চাহিল না দেখিয়া, মাতার মনে আশঙ্কার সীমা রহিল না। ধাত্রীগণ তাহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিফল হইল। কৌতূহলী শিশু হরনাথ তখন আঁতুড়ঘরে প্রবেশ করিয়া কন্যার মুখের উপর ঝুঁকিয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কন্যা চোখ মেলিয়া চাহিল এবং কাঁদিয়া উঠিল। এইভাবে পৃথিবীর আলোক-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের সহিত কুসুমকুমারীর শুভদৃষ্টি বিনিময় হইল।[১]

১। "We are told that the new-born baby first opened her eyes upon Haranath."—The Life and Message of Bhagwan Sri Kusum-Haranath by Sri M. Ram Murti : Page 20

হরনাথের বাল্যজীবন, শিক্ষা ও বিবাহ

হরনাথ যে শুধু মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাহা নহে ; খেলাধূলাতেও তাঁহার সমকক্ষ তারাচরণ সরকারের পাঠশালায় আর কেহ ছিল না। কপাটি খেলা, সাঁতার কাটা, লাফ দেওয়া, দৌড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। খেলাধূলায় সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া তিনি একটি বালকদলের নায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বালকদলের সহিত অন্যান্য পাড়ার বালকদলের প্রায়ই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইত এবং অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় হরনাথের দল জয়লাভ করিত। এইরূপ জয়লাভে হরনাথের দলের এবং বিশেষভাবে হরনাথের অন্তরে অহঙ্কার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু হরনাথ কোনদিন কোনরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন বালকবৃন্দও নেতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কোনদিন পরাজিত দলের বালকবৃন্দকে কোনরূপ অপমান করে নাই। বরং হরনাথ নিজের পয়সায় মুড়ি কিনিয়া, বিজয়ী ও বিজিত উভয় দলের বালকদের সহিত পরম আনন্দে ভাগ করিয়া খাইতেন। এইভাবে হরনাথ পরাজিত পক্ষেরও অন্তর জয় করিতেন। সেই বালক বয়স হইতেই হরনাথের কোমল অন্তর শুধু যে বিজিত বালকদের পরাজয়ের বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহা নহে ; পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের ব্যথাতেও তিনি অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিতেন। চাপল্যবশে পল্লীবাসী বহু বালক পাখীর ছানাকে বাসা হইতে বাহির করিয়া কষ্ট দেয় এবং কীট-পতঙ্গের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। হরনাথ কোনদিন তাহা করেন নাই। বরং নীড় হইতে পতিত পাখীর ছানার দুঃখে তিনি অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিতেন এবং তাহাকে নীড়ে তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার স্বস্তি থাকিত না।

১২৭৭ সালে হরনাথ-জননী ভগবতী দেবী তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন এবং হরনাথ, বগলা ও গুরুচরণকে সঙ্গে লইলেন। বাটীতে রহিলেন কমলা এবং শিবনারায়ণ। তৎকালে রেলপথ ছিল না এবং এখনকারমত বাস বা ট্যাক্সিরও প্রাচুর্য ছিল না ; সুতরাং

পদব্রজে বা গোযানে আরোহণ করিয়া তীর্থদর্শনে যাইতে হইত। পথে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল বলিয়া তীর্থযাত্রিগণ দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিতেন। ১২৭৭ সালের পৌষ মাসে সোনামুখীর বহু-সংখ্যক অধিবাসী কেন্দুবিল্ব হইয়া অন্যান্য কতিপয় তীর্থদর্শনে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করেন। ভগবতী দেবী তাঁহাদের সমভিব্যাহারে তীর্থ-দর্শন-বাসনা পূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। গৃহভৃত্য গুরুচরণ কেন্দুবিল্ব তীর্থে যাইবার পথঘাট জানিত এবং গোযান চালনাতেও তাহার দক্ষতা ছিল। এদিকে কমলাও তখন গৃহিণীপনায় পাকা হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার উপর শিবনারায়ণ ও সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া ভগবতী দেবী নিশ্চিন্তমনে তীর্থদর্শনে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তাঁহারা হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী দেবী দর্শন করেন। সেখান হইতে বৈষ্ণব কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে কেন্দুবিল্ব গ্রামে যে বিরাট মেলা হয় তাহা দেখিয়া, নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান একচক্রা গ্রামে গমন করেন। একচক্রা দর্শনের পর ভগবতী দেবী ভাবুকেশ্বর শিব দর্শন করেন। সিদ্ধ কৈলাসানন্দ স্বামী বা কৈলাসপতি ভাবুকেশ্বরের জীর্ণ মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তৎকালে ভাবুকেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন। ভগবতী দেবী ও হরনাথ ভাবুকেশ্বর দর্শন করিয়া স্বামীজীকেও দর্শন করেন।

হরনাথকে দেখিয়া স্বামীজী অন্তরে এরূপ আকর্ষণ বোধ করেন যে, তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের কাছে বসান এবং মন্দির হইতে প্রসাদ আনাইয়া নিজহস্তে হরনাথকে খাওয়ান। এই কৈলাসপতি মহারাজের সহিত হরনাথের পরবর্তী জীবনেও তিনবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি হরনাথকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। হরনাথের সহিত তিনি একবার সোনামুখীতেও আসিয়া-ছিলেন। হরনাথের প্রতি তাঁহার স্নেহ এরূপ প্রগাঢ় ছিল যে, অনেকের মনে হইত হরনাথ বুঝি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভুল ধারণামাত্র।[1]

১। পাগল হরনাথ—৫ম খণ্ড (ইংরাজী অনুবাদ), পৃঃ ১৮৬

যাহা হউক, ভগবতী দেবী ভাবুক হইতে তারাপীঠে যাত্রা করেন। সেই সময় তারাপীঠে বামাক্ষেপা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৩৬ বৎসরের মত হইয়াছিল। যে সময় ভগবতী দেবী ও হরনাথ তারাপীঠে পৌঁছান, সেই সময়ে বামাক্ষেপা সিদ্ধাসনের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তারাপীঠ হইতে ভগবতী দেবী সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন। এই তীর্থ-ভ্রমণে প্রায় দুই মাস লাগিয়াছিল।

মাতার সহিত এই দুই মাসকালব্যাপী তীর্থ-ভ্রমণ হরনাথের মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গোযানে আরোহণ করিয়া এই দুই মাসকালব্যাপী ভ্রমণে হরনাথ পল্লীবাংলার বিচিত্র রূপ প্রাণ ভরিয়া দর্শন করেন। বালকের মনের উপর ইহার প্রভাব কম নয়। বিভিন্ন পল্লীগ্রাম ও শহরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবার কালে নানারূপ প্রকৃতির নরনারী দেখিবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল।

তীর্থ-ভ্রমণান্তে হরনাথ পুনরায় পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে রামলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি চট্টো-পাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল দে-পোদ্দার এবং কেদারনাথ দে-পোদ্দার প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। হরনাথ ইহাদের সহিত এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সহিত খেলাধূলা করিতেন এবং সকলকেই সমান ভালবাসিতেন। বালকেরাও হরনাথকে একদিন না দেখিলে থাকিতে পারিত না।

১৮৭২ সালে শিবনারায়ণ পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সোনামুখীর এম. ই. স্কুলে ভর্তি হন। এই বৎসরেই ভগবতী দেবী ইটের একখানি দ্বিতলবাটীর কার্য আরম্ভ করেন। গৃহ-নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিবার পর ভগবতী দেবী পুত্রদের উপনয়নের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং ১২৭৯ সালের ২০শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল, ১৮৭২) একসঙ্গে শিবনারায়ণ ও হরনাথের উপনয়ন-কার্যের অনুষ্ঠান করেন। উপনয়নের দিন প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলী দেবী তাঁহার দুই কন্যা কুসুম ও দামিনীকে সঙ্গে লইয়া ভগবতী দেবীর বাটীতে আসেন।

শিশুকন্যা দুইটি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করিতে করিতে উপনয়নে বসিবার পূর্বে হরনাথ যেখানে বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। বালিকাদের মধ্যে একজন কুসুমকে তাহার বর কোথায় জিজ্ঞাসা করায়, কুসুমকুমারী অঙ্গুলিসঙ্কেতে হরনাথকে দেখাইয়া দেন। লজ্জিত হরনাথ কুসুমকুমারীকে তিরস্কার করেন। বরের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে তিরস্কৃত হইয়া কুসুমকুমারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই ঘটনাটি হরনাথ সারাজীবন বিস্মৃত হন নাই।

১৮৭৪ সালে হরনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী বগলার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর ফলে ভগবতী দেবী অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। কমলা, শিবনারায়ণ এবং হরনাথও কনিষ্ঠা ভগিনীর পরলোকগমনে অতিশয় কাতর হন। এই সময় হইতে সোনামুখীতে গালার কাজ ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং ১৮৭৫ সালে রাঁচী জেলায় প্রথম গালার কাজের প্রতিষ্ঠা হইলে, সোনামুখীর বহু কারিগর রাঁচীতে গিয়া গালার কাজ করিতে আরম্ভ করে। জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য সোনামুখীর জঙ্গলে আর পূর্বের মত বড়াগালা জন্মাইত না, কিন্তু রাঁচী জেলার জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে বড়াগালা জন্মাইত। সেই কারণে গালার ব্যবসায় সোনামুখী শহরে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে একেবারে উঠিয়া যায় এবং রাঁচী শহরে ক্রমবর্ধমান আকারে প্রসারিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে সোনামুখীর জঙ্গলে রেশমগুটীরও ক্রমশঃ অভাব হইতে থাকে। ফলে, রেশমের কাজও বন্ধ হইয়া যায়। গালার ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকায়, ভগবতী দেবী ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতে থাকেন, কিন্তু নগদ আয়ের অপর কোন উপায় না থাকায় কালক্ষেপ করিতে থাকেন।

১২৮৩ বঙ্গাব্দের সূচনা হইতেই ভগবতী দেবীর মনে পুত্রবধূর মুখ দর্শনের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং শিবনারায়ণের বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য তিনি ঘটক নিযুক্ত করেন।

বহু স্থানে পাত্রী দেখাশুনা করেন ঘটকঠাকুর। অবশেষে বাঁকুড়া

জেলার গোঁপবাদী গ্রামের একটি কন্যাকে পছন্দ করা হয়। কন্যাটির নাম গোলাপসুন্দরী। সেই বৎসর তিনি একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে বয়সের তুলনায় কিছু অল্পবয়স্কা দেখাইত। ভগবতী দেবী এই স্থানেই শিবনারায়ণের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। ভগবতী দেবীর বিশেষ কোন দাবি-দাওয়া ছিল না। সুতরাং বিবাহের দিন স্থির করিতেও বিলম্ব হইল না। ১২৮৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ গোলাপসুন্দরী ওরফে বিহারিণীর সহিত শিবনারায়ণের বিবাহ হইয়া গেল।[১] ভগবতী দেবী একশত টাকা মাত্র বরপণস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই শিবনারায়ণ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং সংসারের গুরু দায়িত্বের কতকাংশ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া জননীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স হইতেই তিনি চাষবাস দেখাশুনা করিতে ও প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে থাকেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য কনিষ্ঠ হরনাথকে নিরন্তর উৎসাহ দিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার উৎসাহ হরনাথের অন্তরেও সঞ্চারিত হয় এবং তিনি আগ্রহের সহিত লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দে হরনাথের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হয় এবং তিনি সোনামুখী মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। পাঠশালার মত মাইনর স্কুলেও হরনাথের অসাধারণ মেধার পরিচয় দিনের পর দিন পরিস্ফুট হইতে থাকে। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। এতদিন পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার অবসরে খেলাধূলা করিয়াছেন এবং জীবে দয়া,

১ শিবনারায়ণের বিবাহের তিনটি তারিখ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র তাঁহার 'অমিয় হরনাথ-লীলাকথা' গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি তারিখ দিয়াছেন —১৩ই শ্রাবণ ১২৮৩ সাল ইং ২৭শে জুলাই ১৮৭৬, আবার উক্ত গ্রন্থের ২য় ভাগে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ১০ই শ্রাবণ ১২৮৩ ইং আগস্ট ১৮৭৬। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন লিখিয়াছেন, শিবনারায়ণের বিবাহ হইল ১৩ বৎসর বয়সে ১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে। এই তিনটি তারিখের মধ্যে ভাগবত মিত্রের প্রথম তারিখটিই সঠিক বলিয়া মনে হয়, দ্বিতীয় তারিখ আগস্ট মাসেরটি ভ্রমপূর্ণ। শ্রীযুক্ত সেন-উল্লিখিত ফাল্গুন মাস শিবনারায়ণের বিবাহের মাস নয়।

সমবয়স্কগণের প্রতি স্নেহ-প্রীতির পরিচয় দান করিয়াছেন। গুপ্ত স্থানে লুকায়িত অথবা হৃত দ্রব্যাদি খুঁজিয়া বাহির করার অলৌকিক ক্ষমতার স্ফুরণও ইতিমধ্যে তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তিনি সমবয়স্কদের সহিত সম্মিলিতভাবে রাধাগোবিন্দ নামসংকীর্তনও করিয়াছেন, কিন্তু সে কেবল ক্রীড়াচ্ছলে। সোনামুখী মাইনর স্কুলে ভর্তি হইবার পর হইতে তাঁহার এই নামসংকীর্তনের স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল এবং সমবয়স্কদের লইয়া তিনি একটি হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সন্ধ্যাকালে নামসংকীর্তন করাই হইল এই হরিসভার কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ। নামসংকীর্তন করিতে করিতে হরনাথ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া উঠিতেন এবং কখনও কখনও বাহ্য-জ্ঞানরহিত হইতেন।

অন্যান্য সময়ে কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিকতা কোনরূপেই ক্ষুণ্ণ হইত না, বরং অন্যান্য সময়ে তাঁহাকে অন্যান্য সকল বালকের চেয়ে অধিকতর প্রাণচঞ্চল বলিয়া মনে হইত এবং তাঁহার সেই প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্ত হইত বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠাভ্যাসে, ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শনে, আহার-বিহার ও বেশবিন্যাসে। জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিত। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতেই তাহার সবিশেষ পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

১। খেলাধূলার মধ্যে 'খানা ডিঙানো' নামক একরূপ খেলা হইত এবং প্রতিদিনই হরনাথ এই লেখায় জয়লাভ করিতেন। এই খেলায় চারি পয়সা করিয়া বাজি রাখা হইত। বিজয়ী দল পরাজিত দলের নিকট হইতে চারি পয়সা পাইত। হরনাথ প্রায় প্রত্যহ এই খেলায় জয়লাভ করিতেন। কিন্তু পরাজিত দলের অনেকেরই বাজির পয়সা দিবার সামর্থ্য ছিল না। হরনাথ তাহাদের নিজ তহবিল হইতে চারিটি পয়সা দান করিতেন। তারপর সকলে মিলিয়া চারি পয়সার মুড়ি কিনিয়া মহানন্দে ভোজন করিতেন। তৎকালে চারি পয়সায় প্রায় ৮।১০ সের মুড়ি পাওয়া যাইত। সুতরাং বিজয়ী ও পরাজিত উভয় দলের বালকেরা প্রত্যেকেই প্রায় পেট ভরিয়া মুড়ি খাইতে পারিত। 'খানা ডিঙানো' খেলার এই বাজি জেতাকে উপলক্ষ

করিয়া হরনাথ দরিদ্র সহপাঠী বা অনুচরদের খাওয়াইতেন। বিনা কারণে মুড়ি কিনিয়া খাওয়াইলে তাহাদের আত্মসম্মানে বাধিতে পারে বলিয়া, বাজি ধরিয়া 'খানা ডিঙানো' খেলার ছলনার আশ্রয় লইতেন। দরিদ্র অনুচরদিগকে খাওয়ানোর জন্য নিজস্ব সঞ্চয় হইতে ব্যয় করা বালক হরনাথের করুণাঘন অন্তরের ও মহানুভবতার পরিচয়ই প্রদান করে।

২। একদিন হরিসভা হইতে নামসংকীর্তন করিয়া ফিরিবার পথে হরনাথ একটি কুটীরের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিলেন। সেই কুটীরাভ্যন্তর হইতে এক মুমূর্ষুর কাতরোক্তি ভাসিয়া আসিতেছিল। ইহা শুনিয়া হরনাথ কুটীরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। পথচারিগণ তাহা দেখিয়া হরনাথকে কুটীরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। কারণ, লোকটি ছিল ভয়ানক কাশরোগে আক্রান্ত। কিন্তু আর্তকে পরিত্যাগ করা হরনাথের ধর্ম নয়। তিনি সেই নিদারুণ কাশরোগাক্রান্ত রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং মধুরস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে তাহার উত্তপ্ত মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে লোকটির রোগ-যন্ত্রণা কমিয়া গেল। লোকটি ঘুমাইয়া পড়িলে হরনাথ কুটীরের বাহিরে আসিলেন। সেই দিন হইতে সেই লোকটির নিকট কিয়ৎকাল বসিয়া থাকা ও তাহার সেবা করা হইল হরনাথের নিত্য কর্মসূচীর অন্তর্গত। সেই লোকটি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। কিন্তু হরনাথ নিদারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হইলেন। অসুস্থতাজনিত তাঁহার যে নিদারুণ কষ্ট, তাহা নিবারণ করিবার জন্য জননী বৈদ্যের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বৈদ্যেরা হরনাথের অবস্থার কোনরূপ উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইলেন না। হরনাথের অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর শীর্ণ হইল এবং ক্ষুধা ও হজমশক্তি কমিয়া গেল। এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিয়া যাওয়ার পর একদিন সেই ব্যক্তিটি শিবনারায়ণের সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সম্পূর্ণভাবে তাহার রোগমুক্তি ঘটিয়াছে। রোগ আরোগ্যের জন্য সে হরনাথকে তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন

করিতে উপস্থিত হইয়াছে। জীর্ণ বস্ত্রের অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া আনিয়াছে মিছরীর একটি খণ্ড। লোকটির নিকট সমস্ত শুনিয়া ভগবতী দেবী ও শিবনারায়ণ উভয়েই হরনাথের কাশরোগের উৎপত্তির কারণ কি, তাহা বুঝিলেন এবং তীব্র তিরস্কারে তাহাকে জর্জরিত করিয়া তুলিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হরনাথ কক্ষমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন এবং জননী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে লোকটিকে তিরস্কার করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তাহার নিকট গিয়া তাঁহার জন্য কোনরূপ কিছু খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, লোকটি জীর্ণ বস্ত্রের অঞ্চল-প্রান্ত হইতে এক টুক্‌রা মিছরী বাহির করিয়া দিল। মিছরীর টুক্‌রা মুখে ফেলিয়া হরনাথ একটি আরামসূচক শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার রোগ দ্রুতগতিতে উপশম হইতে লাগিল।

এই ঘটনাটিকে হরনাথের কোমল অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি বলা চলে। রোগীর কুটীরে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে গমন করিয়া তিনি তাহার সেবা করেন এবং সেই রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া বাড়ীতে আসিলে জননী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার তিরস্কার হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করেন। তৎকর্তৃক আনীত উপহার সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রহণ করাও তাঁহার অপরিসীম করুণারই পরিচায়ক।

৩। হরনাথের করুণার অফুরন্ত প্রস্রবণ যে মানুষের ক্ষেত্রেই উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা নহে; সেই বাল্যকালে পশু-পক্ষীও তাঁহার করুণালাভে ধন্য হইয়াছিল। একদা গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে হরনাথ অপরাপর বালকবৃন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় একটি তালবৃক্ষ হইতে একটি পক্ষীর নীড় ভূপতিত হয়। নীড়ের মধ্যে কতিপয় পক্ষি-শাবককে দেখিয়া অপরাপর বালকেরা তাহাদের লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে পক্ষি-শাবকদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। ইহা দেখিয়া হরনাথের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয় এবং তিনি সহচরদিগের নিকট হইতে নীড়সমেত উক্ত পক্ষি-শাবককুল কাড়িয়া লইয়া সেই সুদীর্ঘ তালবৃক্ষের শীর্ষদেশে যেখানে তাহাদের বাসাটি ছিল, সেখানে রাখিয়া আসেন। এই সামান্য ঘটনাটিতে হরনাথের অপরিসীম করুণার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে।

পশু-পক্ষী বা আর্ত মানুষের প্রতি হরনাথের করুণা শতধারায় উৎসারিত হইলেও, একটি ক্ষেত্রে তাহার অভিব্যক্তি প্রায়ই দেখা যাইত না। তাহা হইল কুসুমকুমারীর ক্ষেত্রে। কুসুমকুমারী বালিকা বয়স হইতেই হরনাথকে তাঁহার 'বর' বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু বর সম্বন্ধে উল্লেখে কন্যার যে লজ্জাবোধ হইবার কথা, তাহার স্বরূপ তিনি জানিতেন না। বালিকাসুলভ কৌতূহলবশেই কুসুম-কুমারী তদীয় বর হরনাথের সহিত খেলা করিতে আসিতেন। খেলা-ধূলায় দক্ষ হরনাথের নিকট বালিকা কুসুমকুমারীর অদক্ষতা ও অপটুত্ব বিরক্তির কারণ হইত। তিনি তাঁহাকে নানাভাবে বিব্রত করিতেন। কখনও মুখে কালি লেপিয়া দিয়া, কখনও বা কাপড় ছিঁড়িয়া দিয়া বালক হরনাথ কুসুমকুমারীকে কাঁদাইতেন। হরনাথ কর্তৃক উপহসিত ও অত্যাচারিত হইয়াও কিন্তু কুসুমকুমারী হরনাথের সঙ্গলাভের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং কখনও মাতা চন্দ্রাবলীর নিকট বরের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন নাই। হরনাথের পীড়নে বা উপহাসে তাঁহার আয়ত আঁখিযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিলে, বস্ত্রাঞ্চলে সেই অশ্রু সযত্নে মুছিয়া তিনি জননীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইতেন। মুখে কালির দাগ বা ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল দেখিয়া জননী কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা সযত্নে বরের দোষ চাপিয়া রাখিতেন এবং পরদিন যথারীতি বরের সহিত খেলা করিতে বাহির হইতেন। নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও হরনাথের সাহচর্যলাভের জন্য বালিকা কুসুম-কুমারীর আগ্রহ বিন্দুমাত্রও কমিত না। ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার সুগভীর আকর্ষণ। তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায় যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম মুখ পুড়িলেও ছাড়া যায় না। মুখে কালি মাখাইলেও কুসুমকুমারী তাই হরনাথকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইতিমধ্যে হরনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া সোনামুখীর মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন (১৮৭৩ সালে)। এখন হইতে পড়ার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় খেলাধূলার সময়টা কিছু কম হইল, কিন্তু হরিসভার সংকীর্তন অধিকতর উৎসাহে চলিতে লাগিল।

মাইনর স্কুলে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পরে[১] শিক্ষকমহাশয়গণ চারি মাইল দূরবর্তী ধানশিমলা গ্রামে গ্রামদেবতা শ্রীশ্রীগঙ্গাধর জিউর গাজন দেখিতে যান এবং হরনাথ ও অপর কয়েকজন ছাত্র তাঁহাদের সমভিব্যাহারে গমন করেন। ধানশিমলা গ্রাম হইতে ফিরিতে তাঁহাদের রাত্রি হইয়া যায়। সোনামুখী হইতে ধানশিমলা পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে গভীর জঙ্গল। গাজন দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনকারী হরনাথের দলের সম্মুখে সহসা একটি বন্য ব্যাঘ্রের আবির্ভাব ঘটে। সমস্ত দলটি নিদারুণ আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ব্যাঘ্রপ্রবরও তাঁহাদের সম্মুখে পথের উপর বসিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহাদের নিরীক্ষণ করিতে থাকে। সহসা হরনাথ তাঁহার ছাতাটি মেলিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে ধরিয়া ঘুরাইতে থাকেন। ঘূর্ণায়মান ছত্রদর্শনে ব্যাঘ্রপুঙ্গব হতচকিত হইয়া অরণ্যমধ্যে পলায়ন করে। সমস্ত দলটি হরনাথের সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হয়।

হরনাথের এই সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধির কাহিনী শুনিয়া শিক্ষক-মহাশয়েরা সকলেই প্রীত হন এবং তাহার পর হইতে হরনাথ তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইতে থাকেন। ছাত্রগণের মধ্যে হরনাথের জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি দ্রুত প্রসারলাভ করে। সকলের স্নেহ ও প্রীতিভাজন হরনাথ নবতর উৎসাহে পড়াশুনা করিতে থাকেন এবং প্রতি বৎসর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৮৭৯ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই বৎসর সোনামুখী বিদ্যালয়ে তাঁহার শেষ বৎসর বলিয়া, শিক্ষকমহাশয়গণ পরিপূর্ণ উৎসাহে হরনাথকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। শিক্ষকমহাশয়দের প্রেরণায় হরনাথও অপরিসীম উৎসাহে পড়াশুনা করিতে থাকেন। ফলে, এই বৎসরের শেষের দিকে মাইনর পরীক্ষায় হরনাথ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা হইল কুসুমকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ।

১। সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে। কারণ, ধানশিমলা গ্রামের গঙ্গাধরের গাজন সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতেই হইত। অদ্যাপি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের মধ্যেই উক্ত গাজন হয়।

হরনাথ ও কুসুমকুমারীর বিবাহের কথাবার্তা উভয়ের জননী দুইজনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল কুসুমের জন্মের পূর্ব হইতেই। প্রথম গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রাবলীর নিকট ভগবতী দেবী এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, গর্ভে যদি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে কনিষ্ঠ পুত্র হরনাথের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। উভয়ের সখিত্ব-বন্ধনকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিবার জন্যই যেন চন্দ্রাবলীর প্রথম গর্ভে কুসুমকুমারী জন্মগ্রহণ করিলেন। কুসুম-কুমারীও যে জ্ঞানোন্মেষের পর হইতেই হরনাথকে তাঁহার বর বলিয়া জানিতেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভগবতী দেবী তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন কিনা, চন্দ্রাবলীর মনে এই সংশয় জন্মিতে থাকে। তাহার কারণ, সুপরিচালনার গুণে ভগবতী দেবীর সাংসারিক সচ্ছলতা দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। ইতিমধ্যে তিনি একটি ইষ্টক-নির্মিত দ্বিতল বাসভবনের নির্মাণ-কার্যও প্রায় সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যদিও গালার ব্যবসায়ের আয় ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল, তথাপি জমিজমার আয় হইতে ভগবতীর সংসার ক্রমশঃই সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল। সমৃদ্ধিশালী সংসারে কন্যাদানের আশা হয়তো পূর্ণ হইবে না, দরিদ্র গৃহিণী চন্দ্রাবলীর অন্তরে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এই আশঙ্কা জাগিয়াছিল। তাই, ভগবতী দেবী যখন সামনের মাঘ-ফাল্গুনেই কুসুমকুমারীর সহিত হরনাথের বিবাহ দিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন, তখন অপ্রত্যাশিত আনন্দে চন্দ্রাবলীর অন্তর পরিপূর্ণ হইল। পরক্ষণেই আবার আশঙ্কা জাগিল। ভগবতী দেবী যদি হরনাথের জন্য খুব বেশী বরপণ দাবি করিয়া বসেন কিংবা তাঁহার সাধ্যাতিরিক্ত যৌতুকাদি চাহেন, তবে চন্দ্রাবলী তাহা কিরূপে মিটাইবেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া ভগবতী দেবী একজোড়া শাঁখা, পঞ্চম, অঙ্গুরীয়ক ও নগদ একশত এক টাকা বরপণ দাবি করিলেন। ফলে, চন্দ্রাবলীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার বহু-পোষিত বাসনা পরিপূর্ণ হইল। হরনাথকে তিনি জামাতারূপে লাভ করিলেন; ১৮৭৯ সালের ২৯শে

জানুয়ারি[1] হরনাথের সহিত কুসুমকুমারীর শুভপরিণয় কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহকালে হরনাথের বয়স হইয়াছিল ১৩ বৎসর ৭ মাস। কুসুমকুমারী তখন অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিয়া নবম বর্ষাভিমুখে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বিবাহের অব্যবহিত পরদিন হইতেই হরনাথ আবার যথানিয়মে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং ১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মিডিল্ ইংলিশ স্কলারশিপ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বিভাগে স্থানলাভ করেন। হরনাথের এই সাফল্যে শিক্ষক-মহাশয়গণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। জননী ভগবতী দেবীর চক্ষে আনন্দাশ্রু নামিয়া আসিল, আর কুসুমকুমারীর অন্তর স্বামীর সাফল্যে পুলকিত হইয়া উঠিল। আনন্দের আতিশয্য কমিয়া আসিলে শিবনারায়ণ কুচিয়াকোলের হাই স্কুলে হরনাথকে পড়াইতে মনস্থ করিয়া জননীর সম্মতি চাহিলেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া জননী পাষাণে বুক বাঁধিয়া শিবনারায়ণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

কুচিয়াকোলে হরনাথ

মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য হরনাথকে কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হইল এবং কুচিয়াকোল হাই স্কুলের বোর্ডিং হাউসে থাকিয়া পড়াশুনা করিবার জন্য হরনাথ সোনামুখী হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এতদিন পর্যন্ত সোনামুখীর রাঙ্গামাটি ও অরণ্যের ঘনশ্যাম পরিবেশে হরনাথের কৈশোর লীলা চলিতেছিল, জননীর সহিত তীর্থ-দর্শনে যাওয়ার কয়েক মাস ছাড়া হরনাথ এযাবৎ কাল সোনামুখী পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান নাই। আবাল্যের সেই অতি-পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়া কুচিয়াকোল যাইবার প্রাক্কালে হরনাথের

১। কোন কোন জীবনী-লেখক ফাল্গুন মাসে হরনাথের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ লেখক বিবাহের তারিখ ১৮৭৯।২৯ জানুয়ারি লিখিয়াছেন এবং যতদূর জানা যায়, হরনাথের বিবাহ মাঘ মাসে হইয়াছিল।

কিশোর মনে তাই এক অননুভূতপূর্ব বেদনার সঞ্চার হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের। বিদ্যানুরাগী হরনাথ শীঘ্রই আত্মসংবরণ করিলেন এবং অশ্রুমুখী জননী ও পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া কুচিয়াকোল যাত্রা করিলেন।

সোনামুখী হইতে কুচিয়াকোল পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য কোন যানবাহন তৎকালে ছিল না। দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া পদব্রজে বা গোযানে যাইতে হইত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মুটিয়ার মাথায় চাপাইয়া, হরনাথ পদব্রজেই কুচিয়াকোল যাতায়াত করিতেন। সোনামুখী হইতে কুচিয়াকোলের দূরত্ব ১৪।১৫ মাইলের কম নয়। পথের এই বিরাট দৈর্ঘ্যের জন্য বড় বড় ছুটি ছাড়া হরনাথের বাড়ী আসা সম্ভব হইত না।

কুচিয়াকোলের নূতন পরিবেশেও হরনাথের বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। এখানেও তিনি বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে হরিসভার কর্ম-সূচী পূর্ববৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া, সমাজ-সেবা কার্যেও এই সময় হইতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ছাত্রাবাসে হরনাথ সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুঠাম দেহ, কোমল স্বভাব, সচ্চরিত্রতা এবং ভগবদ্‌ভক্তির জন্য ছাত্র-সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে একটা স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়।

কুচিয়াকোলে চারি বৎসরব্যাপী অধ্যয়নকালের মধ্যে হরনাথের জীবনে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অভিযোগ ও দ্বিতীয়টি বৈদান্তিকের মানসিক পরিবর্তন সাধন।

প্রথম ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ছাত্রাবাসের অপরাপর ছাত্রদের ষড়যন্ত্রের ফলে। ছাত্রেরা যে পুষ্করিণীতে প্রত্যহ স্নান করিত, সেই পুষ্করিণীতে তাহাদের স্নানের ঘাটের পার্শ্বেই স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাট ছিল। বাঁশের দরমা দিয়া এই ঘাটটি ঘেরা ছিল। কিন্তু দরমা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীদের পরস্পর সন্দর্শনের বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। একদিন বৈশাখ মাসের প্রাতঃকালীন স্কুলের ছুটির পর স্নানরত ছাত্রদের মধ্যে একটি দুষ্ট-প্রকৃতির ছাত্র দরমার ফাঁক দিয়া স্নানরতা এক যুবতীর গাত্রে জল

ছিটাইয়া দেয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যুবতী তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে গমন করিয়া, তাঁহার স্বামীকে ছাত্রটির অপকীর্তির কথা বলিয়া দেন। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া যুবতীর স্বামী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-মহাশয়ের নিকট আগমন করিয়া ছাত্রটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ভীত হইয়া ছাত্রগণ প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং যুবতীর স্বামী অপরাধকারীর অনুসন্ধানে ছাত্রাবাসে আগমন করিলে, সকলেই একবাক্যে হরনাথের নাম উচ্চারণ করে। তদনুসারে যুবতীর স্বামী প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের নিকট হরনাথের নামে অভিযোগ করেন। হরনাথের নাম শুনিয়া প্রধান শিক্ষকমহাশয় আশ্চর্যান্বিত হন এবং যুবতীর স্বামীকে এই বিষয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে জানান। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক দৃঢ়তার সহিত হরনাথের নামোচ্চারণ করেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া প্রধান শিক্ষকমহাশয় উক্ত বিষয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী প্রতিপন্ন হইলে, হরনাথকে যথোপযুক্ত শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

হরনাথের নামে অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়া ছাত্রের দল একটু আমোদ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার এইরূপ সুকঠিন পরিণতি দর্শনে তাহাদের আশঙ্কা জন্মিল। অতঃপর প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের শাস্তি হইতে হরনাথকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা যত্নবান হইল। তাঁহার নামে অভিযোগের কথা শুনিয়া হরনাথ স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। তিনি নিত্যদিনের কর্মসূচী অনুসারে আহারাদি করিয়া পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর গ্রামের মধ্যে ভীষণ কোলাহল উঠিল। যে যুবতীর স্বামী হরনাথের নামে অভিযোগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাসগৃহে আগুন লাগিয়াছে। অগ্নি-নির্বাপণমানসে ছাত্রেরা ছাত্রাবাস হইতে দ্রুত বহির্গত হইল। হরনাথ তাহাদের অগ্রগামী হইলেন এবং গৃহের চালের উপর উঠিয়া অগ্নি-নির্বাপণ কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তাপে তাঁহার সুঠাম দেহ ঝলসিয়া যাইতে

লাগিল, কিন্তু অবিচলিতচিত্তে চালের খড় ওলট-পালট করিয়া তিনি জল ঢালিতে লাগিলেন। যুবতীর স্বামী ইহা দর্শন করিয়া এই পরোপকারী মহানুভব হরনাথের নামে অভিযোগ করার জন্য আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ছাত্র ও গ্রামবাসীদের সম্মিলিত চেষ্টায় অগ্নি শীঘ্রই আয়ত্তাধীন হইল এবং অনতিকাল মধ্যেই নির্বাপিত হইল।[১] সেই যুবক তখন পুনরায় প্রধান শিক্ষক কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় সকাশে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকালের অভিযোগ প্রত্যাহার করেন এবং স্বয়ং হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করেন।

এই ঘটনাটিতে হরনাথের সমাজ-সেবা ও পরোপকার-প্রবৃত্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নামে যুবতীর স্বামী যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না। কিন্তু মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে তিনি মুখর হইয়া উঠেন নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, তাহাদের মধ্যে কেহ-না-কেহ নিশ্চয়ই এই অপরাধ করিয়াছে নতুবা যুবতী বা তাঁহার স্বামীর ক্রুদ্ধ হইবার কারণ ছিল না। প্রকৃত অপরাধীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার নাম প্রকাশ করিয়া আত্মদোষ স্খালনও তিনি করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহা ছিল তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অগ্নিকাণ্ডের ফলে হরনাথের মহত্ত্বদর্শনে যুবতীর স্বামীর ভ্রান্ত ধারণার নিরসন না হইলে, মিথ্যা অভিযোগের জন্য প্রধান শিক্ষকমহাশয়-প্রদত্ত দণ্ডও তিনি হয়তো হাসিমুখে গ্রহণ করিতেন।

কুচিয়াকোলে পড়িবার সময় হরনাথ সুযোগ পাইলেই হরিসভায় নামসংকীর্তন করিতেন। কয়জন সহপাঠীও তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইত। তাঁহাদের সুমধুর নামসংকীর্তনে গ্রামস্থ মহিলাগণও আকৃষ্ট হইতেন এবং সংকীর্তনে যোগদান করিতেন। এই সমস্ত মহিলাগণের মধ্যে কয়েকজন একজন বৈদান্তিকের শিষ্যা ছিলেন। তাঁহারা হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় মন্ত্র-বিক্রেতা বৈদান্তিকের আর্থিক

১। হরনাথ চরিতামৃত : অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্ষতি হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদান্তিক হরনাথের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু ইহাতে নিবৃত্ত না হইয়া, হরনাথ তাঁহার দলবলসমেত নিম্নশ্রেণীর নরনারী-অধ্যুষিত অঞ্চলেও নামসংকীর্তন করিতেন। বৈদান্তিক তখন হরনাথের জননীকে এই সংবাদ দান করেন এবং ইতর সাধারণের মধ্যে নামসংকীর্তন করিলে হরনাথকে জাতিচ্যুত করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন। বৈদান্তিকের ভীতি-প্রদর্শনে উদ্বিগ্না জননী হরনাথকে গৃহের বাহিরে নামসংকীর্তন করিতে নিষেধ করেন। মাতৃভক্ত সন্তান মাতার আদেশ শিরোধার্য করেন। এইভাবে হরনাথকে নামসংকীর্তন হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৈদান্তিক অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। অনতিকাল মধ্যেই তিনিই হরনাথের প্রদর্শিত পথানুসারী হইয়া উঠেন।

বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী একটি দেবালয়ে একদিন সংকীর্তন করিবার জন্য হরনাথ জননীর অনুমতি গ্রহণ করেন। সেখানে বৈদান্তিক মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। হরনাথের অদৃশ্যপ্রভাবে বৈদান্তিক ধীরে ধীরে প্রভাবিত হইয়া উঠেন এবং পরিশেষে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। মূর্ছান্তে তিনি হরনাথকে তাঁহার শিরোদেশে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই সময় হইতে তিনি হরনাথের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে হরনাথের অকৃত্রিম অনুরাগী হইয়া উঠিলেন।[১]

হরনাথের কলেজ-জীবন

১৮৮৫ সালে হরনাথ কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইন্‌স্টিটিউশন হইতে সসম্মানে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইলেন। জননী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণ হরনাথের এই সাফল্যের সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আনন্দের

১। Life and Message of Bhagawan Sri Kusum-Haranath by M. Sri Rammurti : Page 31

আতিশয্য প্রশমিত হইবার পর মাতা-পুত্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, হরনাথকে আরও উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দান করিতে হইবে। সুতরাং First Arts পড়িবার জন্য তাঁহারা হরনাথকে বর্ধমান রাজকলেজে ভর্তি করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে হরনাথের নিজের তেমন উৎসাহ ছিল না। হরনাথ তাই রাজকলেজে ভর্তি হইবার প্রস্তাবে পূর্বের মত উৎসাহবোধ করিলেন না। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও জননীর অন্তরে ব্যথা দিতেও তাঁহার মন চাহিল না। তাই, তিনি বর্ধমান রাজকলেজে ভর্তি হইয়া F. A. পড়িতে গেলেন।

পরীক্ষায় পাস করিবার এক বৎসর পূর্বে সস্ত্রীক হরনাথ তাঁহাদের কুলগুরু সিতিকণ্ঠ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৮৮৪ সালের ১৭ই মার্চ)। এযাবৎ কাল হরনাথের ভগবৎ-প্রেম আপনার অন্তরের নির্দেশেই উৎসারিত হইত। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র তাঁহার হৃদয়ের উর্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া দ্রুতবেগে বর্ধিত হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতেছিল। অর্থাৎ, গুরুনির্দিষ্ট বিধান অনুসরণ করিয়া হরনাথ অতঃপর অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তর পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, স্কুল-কলেজের পুঁথিগত বিদ্যা ঈশ্বরপ্রেম লাভের পথে কোনরূপ সাহায্যই করে না, বরং এই বিদ্যা বস্তুজগতের প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর করিয়া ঈশ্বরপ্রেম লাভের পথে বিঘ্ন ঘটায়। কলেজে ভর্তি হইবার প্রস্তাবে তাই তিনি কোনরূপ উৎসাহবোধ করেন নাই। যাঁহাকে জানিলে সমস্ত কিছুই জানা যায়, যাঁহাকে লাভ করিলে কোন কিছুই অলভ্য থাকে না, যিনি সর্ব জ্ঞান, কর্ম, আনন্দের অধীশ্বর, সেই ঈশ্বরকে জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহই কলেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্যের কারণ। কিন্তু পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়াও ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা করিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব, গার্হস্থ্য জীবনে করণীয় সমস্ত কিছুই তাঁহাকে করিতে হইবে।

বাল্য হইতে যৌবনার্ধ অবধি বিদ্যার্জন, তৎপরে অর্থোপার্জন এবং পরিণত বয়সে উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধূর হস্তে সংসারভার অর্পণ করিয়া নির্বিঘ্নে ঈশ্বরচিন্তা—সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এই কর্তব্যপালনের পথে আশা-নিরাশা, সাফল্য ও অসাফল্য, মুখর জগতের নিন্দা-প্রশংসা, জন্ম-মৃত্যুর আনন্দ-বেদনা এবং লাভ-ক্ষতির সুখ-দুঃখ প্রভৃতির তরঙ্গ-তাড়নায় অস্থির হওয়া সংসারী গৃহস্থের বিধি-লিপি। প্রতিটি আঘাত হৃদয়ের তটে কম্পন জাগায়—সেই কম্পন মানুষের মনে এমন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে যে, তাহাতেই সে মাতিয়া উঠে—আত্মবিস্মৃত হয়। সংসারে থাকিয়াও যিনি সংসারের এই নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গাঘাতে অবিচল থাকিয়া অন্তরকে ঈশ্বরের চরণে নিবিষ্ট রাখিতে পারেন, সংসারের পাঁক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—পাঁকাল মাছের মতই পাঁকের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার দেহ পঙ্কলিপ্ত হয় না। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও চিন্তা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া যিনি আপনাকে যন্ত্রীর যন্ত্রের মত মনে করিয়া কাজ করিয়া যান, ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের সিংহাসনে চির-বিরাজমান। ঈশ্বরবিমুখ জগৎকে স্বীয় জীবন-দৃষ্টান্তে এই শিক্ষাদানের জন্যই হরনাথের আবির্ভাব। সুতরাং সংসার-জীবনের সকল কর্তব্য পালন তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। গার্হস্থ্য জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে যথাসাধ্য বিদ্যার্জন তাঁহাকে করিতে হইবে। সাফল্যের আনন্দের সহিত জাগতিক প্রশংসা ও অসাফল্যের বেদনায় জাগতিক নিন্দা-সমালোচনা যে অপরিহার্য, তাঁহার জীবনে ইহাও দেখাইতে হইবে। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জাগতিক বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে, তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। যে পরস্পর-বিরোধী ভাব জড় ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের মধ্যে বিরাজিত, তাহা দূর করিয়া সংসারীকে অধ্যাত্ম জগতে লইয়া যাইবার সহজ পথ দেখানোই যে তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রেম যাঁহার হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, তাঁহার পক্ষে জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অতিশয় কঠিন কাজ। হৃদয়ের গভীরে থাকিয়া যে ভগবান আমাদের দিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্যসমূহ সম্পন্ন করাইয়া

লইতেছেন, সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনবহিত। দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে যাঁহার অবস্থিতি, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের চেতনার একান্তই অভাব। ইহাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে হৃদি-পদ্মাসনে তাঁহার আনন্দময় অবস্থিতির সামান্য-তম আভাসও যদি কেহ পান, তাহা হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইবেন। সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তাঁহার নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সূর্যের দীপ্ত কিরণের নিকট যেমন অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মিও ম্লান হইয়া যায়, তেমনই সেই পরমানন্দ মাধবের সামান্যমাত্র আভাস এমন আনন্দমধুর যে, তাহার তুলনায় সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ যে আনন্দ তাহাও বেদনাবিধুর হইয়া উঠে। সেই অপরূপ আনন্দ রূপই তখন মানুষের একমাত্র ধ্যান হইয়া উঠে। সেই সচ্চিদানন্দ ভাবে তাঁহার অন্তর সদাসর্বদাই বিভোর হইয়া উঠে। এই অপরিসীম এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ তাঁহার কর্ম, বাক্য, চিন্তা, সমস্ত কিছুতেই অভিব্যক্ত হইয়া তাঁহার সাহচর্যকেও আনন্দদায়ক করিয়া তুলে।

হরনাথের ভগবৎ-প্রেমিক অন্তর ইতিমধ্যেই সেই অপূর্ব আনন্দের সুমধুর আস্বাদ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং গার্হস্থ্য জীবনের জাগতিক কর্তব্য পালন করা তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে যতই অপরিহার্য হউক না কেন, জাগতিক বিষয়বস্তুতে ঔদাসীন্য এবং সাংসারিক ব্যাপারে অনাসক্তি চাপিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিত। এইরূপ অবস্থায় সাংসারিক কোন কর্তব্য নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন করা কোনমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং হরনাথের পড়াশুনায় ফাঁকি পড়িতে লাগিল।

এদিকে পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতে লাগিল। মাতা ও শিবনারায়ণের নিকট হইতে পড়াশুনার খোঁজখবরের তাগিদ লইয়া পত্র আসিতে লাগিল। ধ্যানের জগৎ হইতে হরনাথ কঠোর বাস্তবের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, পরীক্ষা পাসের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। সুতরাং, তিনি সেই বৎসর

পরীক্ষা দান হইতে বিরত থাকিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জননীর ও শিবনারায়ণের কথাও সেই সময়ে তাঁহার মনে উদয় হয়। তাঁহাদের আশাভঙ্গ করিতে হরনাথের ইচ্ছা হইল না। সুতরাং অনেক ভাবনার পর হরনাথ পরীক্ষা দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।[১] তিনি যথাসময়ে F. A. পরীক্ষাও দিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, হরনাথ F. A. পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বৎসরই হরনাথের প্রথমা কন্যা ইন্দুমতীর জন্ম হয় (১৮৮৭ সালে)। ইন্দুমতীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের পাসের খবর পাইয়া জননী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার আনন্দের সীমা রহিল না।

শিবনারায়ণ নিজে বেশীদূর পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কনিষ্ঠকে যতদূর সাধ্য উচ্চশিক্ষা দানের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। সুতরাং মাতাপুত্রের পরামর্শ-সভা আবার বসিল এবং স্থির হইল যে, হরনাথকে B. A. পড়াইতে হইবে। কলিকাতা ছাড়া তখনকার দিনে B. A. পড়িবার উপায় ছিল না। সুতরাং স্থির হইল, কলিকাতায় গিয়া পড়িতে হইবে। পড়াশুনা সম্বন্ধে হরনাথের উৎসাহ আরও অধিক পরিমাণে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গতবারের ন্যায় এবারেও আদেশ অমান্য করিয়া জননী ও জ্যেষ্ঠের মনে আঘাত দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য তিনি কলিকাতায় যাত্রা করেন এবং মেট্রোপলিটান কলেজে B. A. পড়িবার জন্য ভর্তি হন।

কলিকাতায় হরনাথের আহার ও বাসস্থানের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়, এ সম্বন্ধে ভগবতী দেবী চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ, পূর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে তিনি কলিকাতায় তাঁহার গালার আড়ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।[২] জ্ঞাতি সম্পর্কে হরনাথের এক

১। কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে হরনাথ দ্বিতীয়বার সেই মহাপুরুষকে দর্শন করেন এবং তিনি অবশ্য নিজেও এই সাক্ষাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

২। জয়রামের মৃত্যুর পর ভগবতী দেবী ১৭ বৎসরকাল গালার কারবার পরিচালনা করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন কর্মচারী সোনামুখীর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পাতাগালা সংগ্রহ করিতেন এবং অম্বিকাচরণ

খুল্লতাতের কলিকাতায় গালার আড়ত ছিল। ভগবতী দেবীর অনুরোধে তিনিই কলিকাতার ৭নং বসাক লেনে অবস্থিত তাঁহার গালার আড়তে হরনাথের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদনুসারে হরনাথ তাঁহার খুল্লতাতের গালার আড়তে থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন।

হরনাথের B. A.-এর পাঠ্য-তালিকার মধ্যে দর্শনশাস্ত্র ছিল। দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া হরনাথের অন্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। দর্শনশাস্ত্রের অনুসন্ধিৎসা তাঁহার অন্তরে প্রবল অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে এবং তিনি উন্মত্তের মত হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদ তিনি ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুসন্ধিৎসা দর্শনানুসারী যুক্তির পথে অগ্রসর হইল না, রাগানুগ ভক্তিমার্গে তাঁহার দ্রুত অগ্রগতি ঘটিতে লাগিল। যেখানেই নাম-সংকীর্তন হইত, সেখানেই হরনাথের উপস্থিতি অবধারিত। কলেজে গিয়াও তিনি সেই প্রেমময়ের চিন্তায় এমনই বিভোর হইয়া উঠিতেন যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত না। সুতরাং অধ্যাপকমণ্ডলীর বক্তৃতার বিন্দুমাত্রও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না এবং কলেজ ছুটি হইয়া গেলেও তিনি নিজের আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। কলেজের বেয়ারাগণ শ্রেণীকক্ষের দ্বার বন্ধ

রায় নামক একজন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কলিকাতার গালার আড়ত পরিচালিত হইত। ব্যবসায়ে মোটামুটি লাভ ভালই হইত। কিন্তু ১৮৭৫ সালে রাঁচীতে গালার কারবার চালু হইবার পর সোনামুখীর গালার ব্যবসায় ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সোনামুখীর জঙ্গলেও রেশমগুটি ও বড়াগালার জন্ম অপ্রচুর হইতে থাকে। ফলে, ধীরে ধীরে বড়াগালা ও রেশমের কারবার সোনামুখী হইতে লুপ্ত হইতে থাকে। তাহার উপর সোনামুখীর বড়াগালার সংগ্রাহক কর্মচারী লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হইলে, সুযোগ বুঝিয়া কলিকাতায় আড়তের তত্ত্বাবধায়ক অম্বিকাচরণ বহু টাকা চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করে। এজন্য ভগবতী দেবীকে বহু টাকার জন্য দায়ী হইতে হয়। তাঁহার নিজেরও প্রায় ষাট বৎসর বয়স হইয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শিবনারায়ণ গৃহ ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া আড়তের কার্য চালাইতে অসম্মত হন। ফলে, বাধ্য হইয়া ভগবতী দেবীকে গালার ব্যবসায় বন্ধ করিতে হয়। মানকর-নিবাসী নিমু কুণ্ডু ইহার পর হইতে তাঁহার নিজের নামে গালার আড়ত পরিচালনা করেন। ৪১নং বাঁশতলা লেনে এই গালার আড়ত ছিল।

করিতে আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইলে, অভিভূতের মত তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া হরনাথ বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। এই অবস্থায় পড়াশুনা তাঁহার কিছুই হইল না, শুধু কলেজে যাওয়া-আসাই চলিতে লাগিল। ফলে, ১৮৮৯ সালে B. A. পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হইলেন।

অকৃতকার্য হওয়ার ফলে আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা ও সমালোচনা মুখর হইয়া উঠে, কিন্তু হরনাথের অন্তরে তাহা কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাঁহার ভগবৎচিন্তা, নামসংকীর্তন পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। সংসারে তাঁহার ঔদাসীন্যও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তথাপি জননীর ঐকান্তিক ইচ্ছাকে শিরোধার্য করিয়া হরনাথ দ্বিতীয়বার B. A. পরীক্ষা দিবার জন্য সিটি কলেজে পড়িতে লাগিলেন। এবার নিমু কুণ্ডুর গালার আড়তে তাঁহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পাঠে মনোনিবেশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। ভগবৎপ্রেমের যে মধুর আস্বাদ তিনি ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মনের এই অবস্থায় পাঠ্য-বিষয়ে মনোনিবেশ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। উদাস অন্তরে তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পুরী হইতে আগত শঙ্কর ভক্তস্বামী ভূতানন্দের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। ভোলা মহেশ্বরের পরমভক্ত স্বামী ভূতানন্দের উদাস বৈরাগী রূপ দর্শন করিয়া হরনাথের মনে নিদারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি সদাসর্বদাই এই সন্ন্যাসীর সাহচর্য করিতে লাগিলেন।

স্বামী ভূতানন্দের অলৌকিক শক্তির খ্যাতি কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সর্বদাই নানা ধরনের নরনারী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। সেই সমস্ত নরনারী স্বামীজীর চরণে নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। কিন্তু দর্শনলাভ করিবার মুহূর্ত হইতে হরনাথ আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। একজন প্রকৃত বৈরাগীর সন্ধান পাইয়া তাঁহার অন্তরে সংসার-

বৈরাগ্য এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি গৃহ-সংসার, কলেজের পড়াশুনা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর কথা বিস্মৃত হইলেন, এমনকি শরীর-ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আহার ও নিদ্রার কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। এমনিভাবে দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে স্বামীজী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। এইদিন ভাগবত মিত্র নামক একজন বিংশতিবর্ষীয় তরুণ স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়া হরনাথকে দেখিয়া বিস্মিত হন এবং তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। যতদূর সম্ভব অল্পকথায় ভাগবতের কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া হরনাথ পুনরায় স্বামীজীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময় তিনি বোধ হয় সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ভজন সমাপনান্তে স্বামীজী হরনাথের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর বাক্যে ও ব্যবহারে হরনাথের অন্তরে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা তীব্রতর হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীজীকে স্বীয় সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে আর একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। সন্ন্যাসীর সাজ ছাড়া তাঁহার মধ্যে এমন কোনরূপ বিশেষত্ব ছিল না, যাহা দ্বারা তাঁহাকে অসাধারণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। স্বামী ভূতানন্দ তখন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সাধারণ সন্ন্যাসীর বেশধারী আগন্তুক কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি সোজাসুজি হরনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিত হরনাথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে তাকাইয়া মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিলেন—'হর! তুমি এখানে কেন?'

এই বলিয়া সন্ন্যাসী হরনাথকে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত হরনাথ তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বাচনভঙ্গী ও গতিভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা হরনাথের মনে তাঁহার শৈশবে দৃষ্ট মহাপুরুষের স্মৃতি জাগ্রত করিল। সন্ন্যাসীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার কথা তাঁহার মনে উদয় হইবামাত্র সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে

ফিরিয়া চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের সমস্ত সংশয় দূর হইল। সেই মহাপুরুষই সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহাকে গঙ্গার ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের আত্ম-বিস্মৃতি বিদূরিত হইল। তিনি বুঝিলেন, সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য তিনি আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। উপলব্ধি হইবামাত্র সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার পূর্বেই সন্ন্যাসী পুনরায় গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া অদৃশ্য হইলেন—অনেক অনুসন্ধান করিয়াও হরনাথ তাঁহাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না।*

হরনাথ পুনরায় ৪১নং বাঁশতলা লেনে নিমু কুণ্ডুর গালার আড়তে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভালভাবে পরীক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন আর সময় নাই। পরীক্ষার সময় আগতপ্রায়। সুতরাং অকৃতকার্য হইবেন জানিয়াও হরনাথ পরীক্ষায় বসিলেন এবং এবারেও আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা ও সমালোচনা তাঁহার উপর প্রবলবেগে বর্ষিত হইল।

এই সময়ে সোনামুখীতে আসিয়া হরনাথ একটি হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার নাম 'সাগরমাতার আশ্রম'। অনুরাগী গোকুলানন্দ বাবাজীর শিষ্য হরিদাসকে প্রতিষ্ঠিত করাই এই হরিসভার উদ্দেশ্য।†

কিন্তু সোনামুখীতে ইতিমধ্যে একটি আনন্দজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, কুসুমকুমারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন (১৮৬০ সালের ২৩শে এপ্রিল)। হরনাথের পুত্রমুখ দর্শনে ভগবতী দেবী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তাই, হরনাথের অসাফল্যের সংবাদ এবার তাঁহার মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সমস্ত শুনিয়া তিনি হরনাথকে পুনরায় পড়াশুনা করিতে এবং আর একবার ভালভাবে পরীক্ষা দিবার জন্য আদেশ দান করিলেন। কিন্তু

---

* এই সাক্ষাৎকারের কথা হরনাথ স্বীকার করেন নাই। ভাগবতচন্দ্র মিত্র এবং শ্রী এম. রামমূর্তি প্রমুখ জীবনীকার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ইহা অবগত হইয়াছিলেন।

† হরনাথ সৌভেনির, পৃঃ ৩৩

এবারে হরনাথ জননীর আদেশপালনে তেমন তৎপরতা দেখাইলেন না। কারণ, তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছিলেন, পাঠ্য-পুস্তকে মনঃসংযোগ করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার নয়। পরম সুখের প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার মন তখন মাতোয়ারা, সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি নাই। পার্থিব যশ, অপযশ, খ্যাতি, অখ্যাতি, সাফল্য, অসাফল্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। সুতরাং জননীর আদেশ সত্ত্বেও হরনাথ কালহরণ করিতে লাগিলেন। খুব সম্ভব তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কিছুকাল এইরূপে গত হইলে জননীর আর তাঁহাকে B. A. পড়িতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন না।

এই সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থাও বেশ ভাল ছিল না। সর্দি-কাশি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ীও ছিলেন। উৎকণ্ঠিতা জননী তখন পুত্রের আরোগ্যলাভের জন্য কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিশেষ ফলোদয় না হওয়ায়, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে হরনাথ নিজেই সমস্যার সমাধান করিলেন। কবিরাজের ঔষধ আনিতে নিষেধ করিয়া কুলদেবতা শ্যামসুন্দরের নিকট তাঁহার আরোগ্যের প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি মাতাকে অনুরোধ করিলেন। এই কথা শুনিয়া শ্যামসুন্দরের নিকট মাতা হরনাথের আরোগ্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, তাহার পর হইতে হরনাথের শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবতী দেবী তাঁহাকে পুনরায় B. A. পড়িতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। জননীর ঐকান্তিক অনুরোধে হরনাথ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৃতীয়বারের জন্য B. A. পড়িতে গেলেন।

এবারেও হরনাথ সিটি কলেজে ভর্তি হইলেন। এবারে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে প্রতাপ রায় (মজুমদার) নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে একটি মেসে করিলেন। সেই মেসে

থাকিয়া রাধাগোবিন্দ বিশ্বাস নামক একজন যুবক পড়িতেন। তাঁহার সহিত হরনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মে। হরনাথের কলেজ-জীবনে মাত্র এই একজনই ছিলেন, যিনি হরনাথের অন্তরের প্রকৃত সংবাদ রাখিতেন। পরবর্তী জীবনে এই ভদ্রলোক বাঁকুড়ার একজন খ্যাত-নামা উকিল হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

কলেজে পড়িবার সময় হরনাথ আপন ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিতেন, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিতেন না। এইজন্য সুদীর্ঘ কলেজ-জীবনে তাঁহার একটিও বন্ধুলাভ হয় নাই। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের মেসে আসিয়া রাধাগোবিন্দ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার প্রকৃত বন্ধুত্ব হইল। এই সময়ে মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজা-রচিত পদাবলী গানসমূহের প্রতি হরনাথ আকৃষ্ট হন। এই সমস্ত পদাবলীর গান পাঠ করিতে ও গাহিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। মুসলমান কবির প্রতি হরনাথের মত ব্রাহ্মণযুবকের এতাদৃশ আকর্ষণ দর্শনে বন্ধু রাধাগোবিন্দবাবু প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। স্মিতহাস্যে হরনাথ বন্ধুকে নিবৃত্ত করিতেন। কিন্তু বন্ধুর অসন্তোষ ক্রমাগত বাড়িতে থাকায়, হরনাথ তাঁহাকে একদিন বলিলেন, 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'। মুসলমান হইলেও সৈয়দ মর্তুজা বৈষ্ণব—রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী তাঁহার সঙ্গীতের উপজীব্য বিষয়। যুবক হরনাথের মনে সৈয়দ মর্তুজার সঙ্গীত তাই সবিশেষ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল।

এমনিভাবে বৈষ্ণব পদাবলী গাহিয়া, কৃষ্ণকথা কহিয়া ও সংকীর্তনা-নন্দে মাতিয়া হরনাথের দিন কাটিতে লাগিল। পড়াশুনা কিছুই হইল না। এদিকে পরীক্ষার সময় দ্রুত নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কিন্তু হরনাথের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে পরীক্ষার দিন সমাগত হইল। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হইয়াও হরনাথ তৃতীয়বারের জন্য B. A. পরীক্ষা দিলেন (১৮৯২ সালে)। ফলে, এবারেও তিনি অকৃতকার্য হইলেন।

পরীক্ষাদানের পর হরনাথ সোনামুখী বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্বের মত হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া মহানন্দে নামগান করিতে

লাগিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হরিসভায় নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন অবধৌত নন্দী, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হরিসভায় দিবারাত্র নামসংকীর্তন চলিত। তাহা ছাড়া, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ের নিয়মিত আলোচনা এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী সমবেত বা একক কণ্ঠে গীত হইত। এককথায়, হরিকথা আলোচনা, হরিনাম ও হরিগুণগানে সেই হরিসভা প্রতিনিয়তই মুখরিত হইত এবং যোগদানকারী সকলেই হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলের অন্তরকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইবার পর উদ্যোক্তা চারিজনের মধ্যে তিনজন একে একে হরিচরণাশ্রয় করিলেন। হরিসভা উঠিয়া গেল। হরনাথ মধুমাখা হরিনাম ছাড়িলেন না। নূতন কয়েকজন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আপন বাটীতেই তিনি মহানন্দে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। এবার তাঁহার আপন বাটী হরিপ্রেমে পাগলের দলে ভরিয়া গেল। সকলে মিলিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নিত্য-নিয়মিত সংকীর্তন করিতেন ও মহাজন পদাবলী গাহিতেন। সকলেই হরিনামে উন্মত্তপ্রায়—কেহ বাজায়, কেহ নাচে, কেহ গায়, আত্ম-পর, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বিসর্জন দিয়া সকলে হরিনাম ও হরিগুণগানে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের হরিপ্রেমে সকলেই চমৎকৃত হইত।

একমাত্র হরনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণের ইহা ভাল লাগিল না। তাহার একমাত্র কারণ—হরনাথের নির্বিকার ও উদাসীন ভাব। লেখাপড়া ছাড়িয়া উপার্জনের বা সংসারযাত্রা নির্বাহের চিন্তা না করিয়া হরনাথ যে শুধু নিশ্চিন্তমনে হরিনাম করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের নিকট ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া, নিজ বাটীতে উচ্চ-নীচ সকল জাতির লোকের সহিত দিবারাত্র নৃত্য-সহকারে নামসংকীর্তন এবং আহার-বিহারে কোনরূপ বাছ-বিচার না করা শিবনারায়ণের মর্মদাহের আর একটি কারণ। শিবনারায়ণের আন্তরিক বিরক্তির আভাস পাইয়া হরনাথ পুনরায় গৃহের বাহিরে

অন্যত্র নামসংকীর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। ফলে, গৃহমধ্যে কল-কোলাহল বন্ধ হইল বটে, কিন্তু শিবনারায়ণের বিরক্তির কারণ দূর হইল না। এতদিন গৃহমধ্যে থাকায়, হরনাথের স্নানাহার অপর সকলের সহিত নির্দিষ্ট সময়ে হইত। কিন্তু এখন হইতে উক্ত দুইটি বিষয়েও সময়ের কোনরূপ স্থিরতা রহিল না। উপরন্তু সান্ধ্য সংকীর্তন সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিতে অধিকাংশ দিনই রাত্রির মধ্যযাম অতিক্রান্ত হইত। ইহাতে শিবনারায়ণ আরও বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কথায়-বার্তায় এই বিরক্তি সদাসর্বদাই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

জননী ভগবতী দেবীর মনে কিন্তু এই সময়ে নিদারুণ শঙ্কা জাগিল। পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য এবং হরিনামাসক্তির প্রাবল্য শঙ্কিতা জননীর নিদারুণ উদ্বেগের কারণ হইল। নানামতে তিনি পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং রাশ একটু টানিয়া ধরিবার জন্য পুত্রবধূ কুসুমকুমারীকে সদাসর্বদাই উপদেশ দান করিতে লাগিলেন।

স্বামীর সম্বন্ধে কুসুমকুমারীর অন্তরেও নিদারুণ আশঙ্কা জাগিয়াছিল। তিনি হরনাথের বুকভরা ভালবাসা পাইলেও, তাঁহার উদাস ভাব দেখিয়া মনে মনে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের স্বভাবই বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না—কুসুমকুমারীর অবস্থা তাহাই হইয়াছিল।[১] তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, হরনাথ বুঝি সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন। এই আশঙ্কায় তিনি মধ্যে মধ্যে এত অধীর হইয়া উঠিতেন যে, নীরবে অশ্রুপাত করিতেন। বাস্তবিকই হরনাথের আচার-আচরণ এই সময়ে বৈরাগ্যের চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল। সাধারণ লোকের মনেও আশঙ্কা হইত, তিনি বুঝি শ্রীচৈতন্যদেবের মত সংসারত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এই সময়ের মানসিক অবস্থা দর্শনে কুসুমকুমারী দেবীর মনে যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল, কাশ্মীর হইতে কুসুমকুমারীকে লিখিত হরনাথের পত্রেও তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা : ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৪

যায়।[১] হরনাথের ক্রমবর্ধমান সংসার-বৈরাগ্য দর্শনে উৎকণ্ঠিতা ভগবতী দেবী তাঁহার মন সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্নবতী হইলেন। এতদিন পর্যন্ত সংসার পরিচালনা ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁহার নির্দেশানুসারেই শিবনারায়ণ আংশিকভাবে সাংসারিক দায়িত্বসমূহ পালন করিতেন।

ইহার পর ভগবতী দেবী বার্ধক্যের অজুহাতে সমস্ত দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং পুত্রদ্বয়ের উপরে সংসারের সকল ভার সমর্পণ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়া হরনাথের মন সংসারমুখী হইবে। জননীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া হরনাথও কিছুদিনের জন্য বৈরাগ্য ভাব গোপন রাখিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সংসারী হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। শিবনারায়ণ ও ভগবতী দেবী অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু কুসুমকুমারী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। এই সময়ে হরনাথ গভীর রাত্রে বড় ভাই শিবনারায়ণ ঘুমাইলে, বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেন এবং ভোরবেলা দাদা জাগ্রত হইবার পূর্বে বাড়ীতে ফিরিতেন। কিন্তু কুসুমকুমারী একদিনও এ-কথা মুখ ফুটিয়া শাশুড়ী বা জাকে বলিতে পারেন নাই। কুসুম-কুমারী মনে মনে ভাবিতেন, পাছে তাঁহার স্বামী হরনাথ মায়ার শিকল কাটিয়া উড়িয়া যান। আরও ভাবিতেন, যদি ইহাই তাঁহার স্বামীর বাসনা ছিল, তাহা হইলে নিরপরাধী বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে মজানো কেন?

অনুরাগিণী পত্নীর অন্তর্বেদনা হরনাথের হৃদয়তটে আঘাত হানিল। রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্টা উৎকণ্ঠিতা পত্নীর কাতর মুখখানি দেখিয়া হরনাথের অন্তরে সুতীব্র বেদনার সঞ্চার হইল। সেই মুহূর্তে তিনি পুনরায় সচেতন হইলেন। গৌতমবুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যদেবের মত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, অন্তরের গভীরে তিনি ইহা অনুভব করিলেন।

১। ১৮৯৪ সালে কুসুমকুমারী দেবী কর্তৃক লিখিত পত্রের উত্তরে লিখিত হরনাথের পত্র।

সংসারী মানুষের মধ্যে থাকিয়া পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিয়া হরিপ্রেম লাভের পথ প্রদর্শন করাই যাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার অনলে পত্নীকে তিলে তিলে দগ্ধ করা তো তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী। পরিণীতা পত্নীর সহিত সমস্ত সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্মসাধনা ও ধর্মপ্রচার করার দৃষ্টান্ত জগতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে বিরল নয়। সংসারী হইয়া ধর্ম সাধনা করা ও ধর্মসাধনায় গৃহস্থ নরনারীকে অনুপ্রাণিত করার দৃষ্টান্তই বরং ধর্মজগতের ইতিহাসে সুলভ নয়। হরনাথের সাধনা সেই দুর্লভ সাধনা। সুতরাং অনুরাগিণী পত্নীকে কাঁদাইয়া, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ভাবাইয়া, জননীর অন্তর আশঙ্কায় ও জ্যেষ্ঠের হৃদয় বিরক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া ঐকান্তিকতার সহিত ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার চিরাচরিত পন্থা পরিহার করিয়া, সম্পূর্ণ অভিনব পথের অভিযাত্রী হইবার সাধনায় হরনাথ অতঃপর আত্মনিয়োগ করিলেন। মায়ার আগারে সংসারের সহিত সৌহার্দ্যের গ্রন্থি বন্ধন করিয়া, হরনাথ সংসারের সার পরমপুরুষের প্রেমলাভে এবং লব্ধ প্রেম অপরকে বিলাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ফলে, কুসুমকুমারীর অন্তরের সমস্ত আশঙ্কা দূর করিয়া তিনি তাঁহার সহিত আবার নূতন খেলায় মাতিয়া উঠিলেন। ভ্রাতার বিরক্তি ও জননীর উৎকণ্ঠা অপনোদনমানসে কর্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারী জীবনের নিখুঁত অভিনয়ে সকলেরই হৃদয়ের ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়িল। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ইহা দেখিয়া হরনাথের অধর কৌতুক হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অভিনয়ের সাফল্যে তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই অভিনয়ের কারুকৌশলে আত্মীয়-স্বজন সকলকে মুগ্ধ করিয়া তিনি নিভৃতে নির্জনে ভগবৎপ্রেমাস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া উঠিতেন। কিন্তু বাহিরের জগৎ সে সংবাদ পাইত না। সেজন্যই অনেকের মনে অদ্যাবধি একটা ধারণা আছে যে, হরনাথ বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। হরনাথকেও কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল। তারপর তিনি সেই

পরম আনন্দময়ের প্রেমলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যকালে নামসংকীর্তন, জীবে দয়া এবং পরোপকার প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্য দিয়া এই সাধনার সূত্রপাত, কৈশোরে ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরানুসন্ধানের মধ্য দিয়া ইহার বিকাশ। গুরুদেব-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়া যৌবনে সেই পরম প্রেমময়ের স্বরূপ দর্শনে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রথম অনুভূতি তাঁহাকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া তুলে। আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিতা কুসুমকুমারীর মলিন মুখখানি দর্শনে সেই আত্মহারা ভাব প্রশমিত হয় এবং তিনি আত্মস্থ হন। আত্মস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মচিন্তা জাগ্রত হয়। সেই আত্মচিন্তার আলোকে তিনি আপনার কর্মপন্থা দেখিতে পান এবং তদনুসারে ভবিষ্যতের কর্মসূচীর একটা খসড়া প্রস্তুত করেন।

কাশ্মীরে অবস্থানকালে সেই কর্মসূচীকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেন; অর্থাৎ, কাশ্মীরে তাঁহার সাধনা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রেমের পরিপূর্ণ মূর্তিরূপে প্রতিভাত হন। সহধর্মিণী কুসুমকুমারীকে কাশ্মীর হইতে লিখিত পত্রে তাঁহার এই পরিপূর্ণ প্রেমলাভের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'কাশ্মীরে আসিয়া মিলিয়াছে নূতন জীবন, নূতন প্রেম।'*—গভীরভাবে অনুধাবন করিলে হরনাথের এই উক্তিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কাশ্মীরে অবস্থানকালে তাঁহার ভালবাসা, প্রেম ও ঐশী শক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। পরম প্রেমময়ের যে প্রেমের আভাস মাত্র লাভ করিয়া তিনি ইতিপূর্বে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাশ্মীরে আসিয়া সেই প্রেমের অমৃতধারা আকণ্ঠ পান করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই কাশ্মীরে গমনের পর হইতে তাঁহাকে আর আত্মহারা হইতে দেখা যায় না। পরমপ্রাপ্তির পরিপূর্ণতা তাঁহাকে ধীরস্থির করিয়াছিল। এতদিন পর্যন্ত ছিল তাঁহার পূর্বরাগের পালা—কাশ্মীরে আসিবার পর মহামিলন হইল। পরমাত্মার সহিত নিত্য রমণানন্দ উপভোগ করিয়া তিনি বুঝিলেন, রাসঘরের খেলা খেলিবার জন্যই এইবারে তাঁহার আবির্ভাব। এ খেলা নিতান্তই আপনজনের

* পাগল হরনাথ: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৮১

সহিত খেলা। নিরাবরণ ও নিরাভরণ হইয়া পরম প্রিয়তমের সহিত প্রিয়তমার হৃদয়-বিনিময়ের খেলা। বাহিরের জগতে এই খেলার প্রকাশ নাই। কল্পনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বাহির-বিশ্ব ইহার আভাসমাত্র পাইতে পারে। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অন্তরতমের সহিত এই নিবিড় হৃদয়াবেগের খেলার সঙ্গী শুধুই তুইজন। সেই তুইজনের নিভৃত মিলনের মহানন্দে ভাবেরও কোন অভিব্যক্তি নাই। অন্তরের গভীরে অনুভূত হইয়া অন্তরেরই অন্তঃস্থলে তাহা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখাবেশে হৃদয় ভরিয়া রাখিবে। কিন্তু প্রত্যাশী বহির্বিশ্ব তো আছে। আপনার পরিপূর্ণতার আনন্দে আত্মমগ্ন হইলে, সকলকেই মুঠি ভরিয়া দিতে স্বতঃই ইচ্ছা জাগে। পরম প্রেমময়ের পরিপূর্ণ প্রেমলাভের চরম আনন্দে ভরপুর হরনাথ তাই সংসারী মানুষের মুঠি ভরিয়া দিতে উন্মুখ হইলেন। সংসারী মানুষের প্রতি হরনাথের সুকোমল হৃদয়ে সহানুভূতির প্লাবন ডাকিয়াছে। সুতরাং রাসমণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি না পাইলেও, সেই অপূর্ব লীলার অপরিসীম আনন্দের আভাস দিয়া সংসারী নরনারীকে ধন্য করিতে তিনি কোনরূপ কার্পণ্য করিলেন না। প্রিয়তমার করুণাধন্য নরনারীর প্রতি সেই রাসবিহারীর করুণাও তাই অযাচিতভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল। তাই হরনাথ-নির্দিষ্ট অতি সহজ পন্থা অনুসরণ করিয়া সংসারী এবং বিষয়াসক্ত নরনারীও সংসারের সার কৃষ্ণধন লাভ করিয়া কৃষ্ণের আপনজনে পরিণত হইতে লাগিলেন।

সুগভীর কৃষ্ণানুরক্তি-রঞ্জিত হৃদয় হইতে উৎসারিত হরনাথের হৃদয়াভিব্যক্তির তরঙ্গ সুকঠিন হৃদয়তটেও কম্পন জাগাইয়া নরনারীর অন্তরের গভীরে সুপ্তপ্রেম জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই নবোদ্গত প্রেমের অমৃতধারায় অবগাহন করিয়া শুচি-স্নাত হইয়া সংসারী নরনারী সেই পরম প্রেমময়ের প্রেমাস্পদ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইভাবেই হরনাথের ধর্মপ্রচার আরম্ভ হইল।

হরনাথের কর্মজীবন

হরনাথ বলিয়াছেন, 'আমার জীবন একটি প্রহেলিকা'। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে এই উক্তির প্রমাণ সর্বত্রই পাওয়া যায়। প্রহেলিকার কার্যকারণ-সম্বন্ধ রহস্যাবৃত। হরনাথের জীবনের বহু ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধও সুগভীর রহস্যের যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত। বাল্যাবধি তাঁহার নামানুরক্তির অব্যাহত গতি সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়সে সর্বপ্রথম বাধার সম্মুখীন হইল এবং এইরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে, বাধা পাইয়া উক্ত অনুরক্তির প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সকল বাধাকে অপসারিত করিবে। ইহার বিপরীত হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা সুনিশ্চিত জানিয়াও যাঁহার নামানুরক্তি বিন্দুমাত্র কমে নাই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মুখর সমালোচনা যে অনুরাগের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, জ্যেষ্ঠের বিরক্তি, জননীর আশঙ্কা ও স্ত্রীর উৎকণ্ঠায় তাহার একেবারে পরিসমাপ্তি ঘটিবে—ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বাহ্যিক আচরণে হরনাথের নামানুরাগের উন্মাদনা এই সময় হইতে হঠাৎ যেন প্রশমিত হইল। এই সময় হইতে গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি যেন বিশেষভাবে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার অপূর্ব নামানুরাগ দৃশ্যতঃ অভিব্যক্ত হইত না। বরং উপার্জনের জন্য কর্মানুসন্ধান বা সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে তিনি এমন উৎসাহী হইয়া উঠিলেন যে, সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। শাসনে ফল হইয়াছে—ভাবিয়া শিবনারায়ণ মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। জননী ভগবতী দেবীর অন্তর হইতেও পুত্রের সম্বন্ধে আশঙ্কা দূরীভূত হইল। কেবল কুসুমকুমারীর মন হইতে তখনও সম্পূর্ণরূপে উৎকণ্ঠা দূর হইল না। কিন্তু স্বামীর বাল্যবন্ধু রসিকলাল দে-র চেষ্টায় হরনাথ যখন সোনামুখী হাই স্কুলে[১] একটি শিক্ষকের পদ লাভ করিলেন, তখন

১। ১৮৮৬ সালে সোনামুখী মাইনর স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়। হরনাথের বাল্যবন্ধু রসিকলাল দে এই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। এই রসিক

হইতে কুসুমকুমারীর অন্তর হইতেও উৎকণ্ঠার কালোমেঘ ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। সাময়িকভাবে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার স্বামী আর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী হইবেন না।

এইভাবে হরনাথ সকলের মন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে পোষিত উৎকণ্ঠা ও বিরক্তির ভাব দূর করিয়া বাহ্যতঃ পরিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নবলব্ধ চাকুরির দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া, সংসারের দৈনন্দিন কর্তব্যসমূহ ত্রুটিহীনভাবে সম্পন্ন করিয়া হরনাথের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পূর্ণ গোপনে তিনি তাঁহার পরম প্রিয়তমের নামগান করিতে ও তাঁহার প্রেমসুধা আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে হরনাথের দৈনন্দিন জীবন দুইটি খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটিতে অর্থাৎ বাহ্যিক আচারে তিনি পরিপূর্ণ সংসারাসক্ত অপরটিতে অর্থাৎ অন্তরে তিনি সম্পূর্ণ সংসার-বিরাগী। এই দুই কূল রক্ষা করিতে শ্রীরাধার মত তাঁহাকেও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জগতের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। জল আনিবার ছলে গৃহ হইতে বাহির হইয়া শ্রীরাধা যেমন গোপনকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন, তেমনি বিষয়কুম্ভ ভরণের ছলে গৃহের বাহিরে আসিয়া হরনাথ নির্জন স্থানে নিশ্চিন্তমনে নামগানে বিভোর হইতেন এবং হৃদিস্থিত হৃষীকেশের প্রেমাস্বাদন করিতেন।

ভাবে বিভোর হইয়া কোন কোনদিন গৃহ-প্রত্যাবর্তনে রাত্রি গভীর হইত। কিন্তু নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ও জননী সে সংবাদ জানিতে পারিতেন না। সরলা কুসুমকুমারীর মনেও প্রথম প্রথম এই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। এইভাবে সংসারের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া কিছুকাল যাবৎ হরনাথের নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন হরিভজনা চলিল। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, সংসার-রঙ্গমঞ্চে সংসারীর সাজে অভিনয় করিতে গেলে এই দ্বৈত জীবনযাপন

মাস্টারের চেষ্টাতেই হরনাথ এই স্কুলে একটি শিক্ষকের পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হরনাথ এই স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

অপরিহার্য এবং এই দ্বৈত জীবনযাপনের জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই। পরবর্তী কালে এই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় হরনাথ তাঁহার অনুরাগীদের উপদেশ দিয়াছিলেন—'সংসারে থাকিয়া হরিভজন করিতে গেলে চাতুরী চাই।'[১]

এইভাবে সংসারের সহিত চাতুরী করিয়া হরনাথ দ্বৈত জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চাতুর্যের ফলে সকলেরই সন্তুষ্টিবিধান হইল। একমাত্র কুসুমকুমারীর মনে পুনরায় উৎকণ্ঠা জাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি, হরনাথের গৃহ-প্রত্যাগমনে রাত্রি গভীর হইলেও, কুসুমকুমারীর মনে প্রথম কয়েকদিন কোনরূপ সন্দেহ জাগে নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে হরনাথের গৃহ-প্রত্যাগমনের সময় যখন রাত্রির মধ্যযাম অতিক্রম করিতে লাগিল, তখন তাঁহার মনে পুনরায় আশঙ্কা জাগিল। এবারেও হরনাথ চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সন্ধ্যা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকলের সঙ্গে আহারাদি সমাপন করিয়া, রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্বেই শয্যাগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে, কুসুমকুমারী কতকটা আশ্বস্ত হইলেও, তাঁহার সন্দেহের নিরসন হইল না এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার সন্দেহ নিরর্থক নয়। গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে, হরনাথ শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিতেন এবং অতি প্রত্যূষে সকলের গাত্রোত্থানের পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় শয্যাগ্রহণ করিতেন। কুসুমকুমারী ব্যতীত বাটীর কাহারও মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইত না যে, হরনাথ রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর গৃহের বাহিরে কাটাইয়া আসিয়াছেন। কুসুমকুমারীই ছিলেন এই বিষয়ের একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু তিনি ইহা লইয়া কোনও দিন স্বামীর নিকট কোন অনুযোগ করেন নাই কিংবা শাশুড়ী বা জায়ের নিকট ঘুণাক্ষরেও কোনদিন এই বিষয়ের আভাস দেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনে নিরতিশয় উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। এই উদ্বেগ কিন্তু পূর্বের উদ্বেগের মত নয়। কারণ, তাঁহার স্বামী যে সংসারের মায়া

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড : ৩৬শ পত্র

কাটাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন—এই আশঙ্কা কুসুমকুমারীর আর ছিল না। স্বামীকে তিনি চিনিয়াছিলেন। কাহারও মনে কোনরূপ ব্যথা দেওয়া হরনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সকলের অন্তরের উদ্বেগ, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্যই তাঁহার এই কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা।

পূর্ণ গৃহস্থ সাজিয়া সংসারের সকলের মনে তৃপ্তি দান করিয়া নিভৃতে গোপনে ঈশ্বরের সাধনা করিবার জন্যই যে হরনাথ সকলের সঙ্গে এবং কুসুমকুমারীরও সহিত চাতুরী করিতেছেন—ইহা উপলব্ধি করিয়া কুসুমকুমারীর অন্তর এক অনির্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং কায়মনোবাক্যে স্বামীর সাধনার সহায়তা করিবার জন্য কুসুমকুমারী কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হরনাথও বুঝিলেন, তাঁহার চাতুরী কুসুমকুমারীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। তিনি ধরা পড়িয়াছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহার মনে বিশেষ ভাবনা হইল না। কারণ, কুসুমকুমারীকে তিনিও চিনিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্বামীর প্রতি সুগভীর অনুরাগের জন্যই কুসুমকুমারী তাঁহার নৈশ অভিসারের কথা মাতা, ভ্রাতা বা ভ্রাতৃজায়ার নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন না, বরং উপযাচিকা হইয়া তাঁহার সাধনার সহায়তা করিবেন। বস্তুতঃ হইলও তাহাই। অতঃপর কুসুমকুমারী স্বামীর সাধনার পথে সহায়তা করিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞ হরনাথ প্রতিদানে তাঁহাকে মধুময় রাধাগোবিন্দ নামামৃত আস্বাদ করাইলেন। এইভাবে সকলের অগোচরে স্বামী-স্ত্রী মহাসুখে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। সোনামুখী হাই স্কুলে হরনাথের অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইল। হরনাথের মনে এজন্য কোনরূপ বিকার দেখা দিল না। তিনি ইতস্ততঃ চাকুরির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু চেষ্টার মধ্যে তেমন আন্তরিকতা ছিল না। বাল্যবন্ধু রসিক মাস্টার শিবনারায়ণকে অযোধ্যা স্কুলে একটি চাকুরির সন্ধান দিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ হরনাথকে উক্ত চাকুরির সম্বন্ধে সন্ধান লইতে বলেন।

হরনাথ চাকুরির জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করা ছাড়া আর কিছু করেন নাই। এই ঔদাসীন্যের জন্য শিবনারায়ণ অতিশয় বিরক্ত হইলেন

এবং একদিন হরনাথকে তীব্র তিরস্কারে জর্জরিত করিলেন। জ্যেষ্ঠের অকারণ তিরস্কারে হরনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলেন এবং সেই রাত্রি অনাহারে যাপন করিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যায় গিয়া রসিক মাস্টার-কথিত চাকুরিটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সঙ্কল্প করিয়া অনাহারী হরনাথ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রত্যূষে নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে, পূর্ব রাত্রির সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য হরনাথ শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিতেই একজন অপরিচিত লোক তাঁহার হস্তে একটি পত্র দিল। আবরণ উন্মোচন করিয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া হরনাথ বুঝিলেন যে, সেখানি একটি নিয়োগপত্র। তিনি অযোধ্যার এম. ই. স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। হরনাথ সেইদিনই অযোধ্যা যাত্রা করিলেন এবং পরদিন হইতে কার্যে যোগদান করিলেন। ইহা ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা।

অযোধ্যা এম. ই. স্কুলের চাকুরি
(অক্টোবর ১৮৯২ হইতে জুন ১৮৯৩)

দারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত অযোধ্যা বাঁকুড়া জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ব্রাহ্মণপ্রধান এই গ্রামখানি যাঁহার চেষ্টায় সকল দিক দিয়াই উন্নতির পথে পদক্ষেপ করিতেছিল, তাঁহার নাম রায় বাহাদুর গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।[১] অযোধ্যার মাইনর স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য তিনি সুযোগ্য শিক্ষকের সন্ধান করিতেছিলেন। সোনামুখীর রসিক মাস্টারের সহিত আলাপ-পরিচয় থাকায়, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া

১। ইনি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ৩১শ পুরুষ। হরনাথ, শিবনারায়ণ প্রভৃতি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ৩৯শ পুরুষ। ইনিও বোবা ঋষি গোপীনাথের (সপ্তবিংশতিক্রম) বংশধর। এই হিসাবে শিবনারায়ণ ও হরনাথের সহিত ইঁহার জ্ঞাতি সম্পর্ক।

সংবাদ দিতে অনুরোধ করেন। সেই সময় হরনাথ সোনামুখী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। তাঁহার পদটি অস্থায়ী ছিল বলিয়া, রসিকবাবু রায় বাহাদুরকে হরনাথের কথা বলেন। হরনাথের বংশ-পরিচয় পাইয়া রায় বাহাদুর বুঝিলেন যে, শিবনারায়ণ ও হরনাথের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা আছে। সুতরাং, হরনাথকে তাঁহার স্কুলে শিক্ষকতা করিবার জন্য তিনি রসিকবাবুর মারফত শিবনারায়ণকে অনুরোধ জানাইয়া পাঠাইলেন। সোনামুখী স্কুলে হরনাথের অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদ সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইলে, শিবনারায়ণের নির্দেশমত হরনাথ অযোধ্যা স্কুলে শিক্ষকতার জন্য একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই পূজাবকাশ পড়ায়, তাঁহার নিয়োগপত্র সঙ্গে সঙ্গেই আসে না।

বিলম্বের জন্য শিবনারায়ণ অধৈর্য হইয়া উঠেন এবং অযোধ্যায় গিয়া রায় বাহাদুরের সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি হরনাথকে পরামর্শ দান করেন। জ্যেষ্ঠকে হরনাথ অতিশয় মান্য করিতেন এবং কদাচ তাঁহার আদেশ বা উপদেশে অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। কিন্তু এই সময়ে খুব সম্ভব দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির জন্য অযোধ্যা গমন করিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হয়। বোধ হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন, কালীপূজার পর বিদ্যালয়ের পূজাবকাশ শেষ হইলে অযোধ্যায় গিয়া রায় বাহাদুরের সহিত দেখা করিবেন। হরনাথের এই অযথা কালহরণ শিবনারায়ণ কিন্তু অন্যভাবে গ্রহণ করিলেন। ইহাকে তিনি হরনাথের ঔদাসীন্য বলিয়া ধারণা করিলেন এবং সেই কারণে একদিন সন্ধ্যায় তিনি হরনাথকে তীব্র তিরস্কারে জর্জরিত করেন। জ্যেষ্ঠের অকারণ তিরস্কারে হরনাথের তীব্র অভিমান হইল। তিনি সেই রাত্রি অনাহারে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে অযোধ্যা যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে পূজাবকাশের পর স্কুল খোলার দিন হইতেই হরনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকমারফত হরনাথের নিকট নিয়োগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। সেইজন্য হরনাথ যেদিন অযোধ্যা যাত্রার সঙ্কল্প করিলেন, সেইদিন প্রভাতেই অযোধ্যা স্কুলে শিক্ষকতা করার

জন্য তাঁহার নিয়োগপত্র আসিল। বেতন হইল মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র।

অযোধ্যা স্কুলে যোগদান করিয়া হরনাথ প্রথমেই যে সমস্ত সহকর্মিগণের সহিত পরিচিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেডমাস্টার রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও তদীয় ভ্রাতা রামকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

রামনারায়ণবাবু কলিকাতার ডফ্ স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাস করিবার পর বাঁকুড়া-নিবাসী তাঁহার একজন আত্মীয় রামনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় আগ্রা গভর্নমেণ্ট কলেজে (তৎকালে এই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল এবং রামনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন) F. A. পড়িবার সুযোগ লাভ করেন। যথাসময়ে F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রামনারায়ণবাবু নিজ গ্রাম বামিরায় (বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অধীন) ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে একটি এম. ই. স্কুল স্থাপন করেন। কিছুদিন চলিবার পর এই বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। তখন তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে অযোধ্যা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং কিছুদিন পরে স্বীয় ভ্রাতা রাম-কিশোরকে উক্ত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। অযোধ্যা স্কুলে আসিয়া হরনাথ এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট-সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করেন। রামনারায়ণবাবু ছিলেন একজন উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সাধক। কিন্তু হরনাথ যে একজন পরম বৈষ্ণব—এই সংবাদ তিনি জানিতেন না। কারণ, অযোধ্যা স্কুলে চাকুরি লইবার পর হইতে হরনাথ স্বীয় ধর্মমত গোপন রাখিতেন।

অযোধ্যার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে হরনাথ প্রধানতঃ গণিতশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। শিক্ষাদান-পদ্ধতির চমৎকারিত্বে তিনি অচিরেই ছাত্র-সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন এবং শিক্ষক-সমাজেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেন। তাঁহার সুমধুর স্বভাবের জন্য গ্রামবাসী সকলেও তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত। হেডমাস্টার রামনারায়ণ-

বাবু ও তদীয় ভ্রাতা রামকিশোরবাবু* হরনাথকে এত ভালবাসিতেন যে, সান্ধ্য ভ্রমণকালে বা দারকেশ্বর নদীতে স্নান করিবার সময়েও তাঁহারা হরনাথকে সঙ্গে লইতেন। অর্থাৎ, সদাসর্বদাই হরনাথের সাহচর্য লাভ করিবার জন্য উভয় ভ্রাতার অন্তরে সুতীব্র আগ্রহ জাগিত। একদা স্নান করিবার জন্য তাঁহারা তিনজনে দারকেশ্বর নদীর উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। স্নানের ঘাটে যাইতে হইলে নদীর তীরের উপর দিয়া কিছুটা পথ অতিক্রম করিতে হইত। উক্ত পথিপার্শ্বস্থ শ্মশানে হরনাথ একটি সদ্যোজাত শিশুকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাবৃত মৃত শিশুটির নিকটে গিয়া বস্ত্র উন্মোচন করিয়া শিশুটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে থাকেন। রামনারায়ণবাবু হরনাথের এই কার্য দেখিয়া হরনাথকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'তুমি কি তান্ত্রিক সাধক হবে না কি?' হরনাথ উত্তরে বলেন, 'তাহাতে দোষ কি?'[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামনারায়ণবাবু একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং অনেক অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। বাহ্যিক আচরণে স্বীয় ধর্মমত সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশ না করিলেও হরনাথ যে একজন উচ্চস্তরের বৈষ্ণব সাধক, রামনারায়ণবাবু তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই, হরনাথকে মৃতদেহ নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। হরনাথের মত একজন পরম বৈষ্ণব যে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন, তাঁহার মনের নিভৃত কোণেও এই ধারণা জাগে নাই।

* রামনারায়ণবাবু মৃত্যুর (১৯২৮ সালে) তিন বৎসর পূর্বে একবার সোনামুখীতে হরনাথের বাড়ী আসেন এবং হরনাথের সহিত দুইদিন যাপন করেন। রামকিশোরবাবু পরবর্তী কালে কলিকাতার কুমারটুলির ৩৮-বি, বনমালী স্ট্রীটে বাস করিতেন।

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা—প্রথম ভাগ (পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫) গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঘটনায় বর্ণিত হরনাথের আচরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর একটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। সমাজের দণ্ড এড়াইবার জন্য অনেক সময় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কুমারী ও বিধবার গর্ভজাত অবৈধ সন্তান পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ স্থলে সদ্যোজাত শিশুর দেহে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। হরনাথের বোধ হয় ধারণা হয়

তথাপি মৃত শিশুর শবদেহ নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া তিনি হরনাথকে এরূপভাবে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে হরনাথ যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি তখনও হরনাথকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। হরনাথের মতে, সাধন-পদ্ধতির সবগুলিই সমান—কোনটিতেই কোনরূপ দোষ নাই। যিনি পরবর্তী জীবনে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণবতার মধ্যে যোগসূত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এতাদৃশ উত্তর নিতান্তই স্বাভাবিক।

অযোধ্যার মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার সময় ক্ষুদিরাম নামক আর একজন শিক্ষকের সহিত হরনাথের নিবিড় সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল বলিয়া হরনাথ জীবনী-বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন রচিত "হরনাথ চরিতামৃত" এবং সেপুরী লক্ষ্মীনরসহায় রচিত "The Divinity of Haranath the Crazy" গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি হরনাথের জীবদ্দশাতেই রচিত ও মুদ্রিত হয় এবং পরে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া হরনাথকে শোনানো হয়। এই গ্রন্থে যে ক্ষুদিরামের নাম পাওয়া যায়, তিনি কলেজে পড়ার সময় হরনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি জাতিতে সূত্রধর। তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্নমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার হইলেন। অযোধ্যা স্কুলে তাঁহার যোগদানের কারণ হরনাথের সাহচর্য লাভের আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষার বিষয় অবগত হইয়া হরনাথ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া অযোধ্যা স্কুলের

যে, শিশুটি তখনও জীবিত। সেইজন্য তিনি শিশুটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে-ছিলেন।

এই ঘটনায় বর্ণিত হরনাথের আচরণ সম্বন্ধে অপর কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। হরনাথ মৃতের পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা চলে যে, অযোধ্যা গ্রামে হরনাথ এইরূপ কোন অলৌকিক কার্য করেন নাই। কারণ, অযোধ্যা গ্রামে এইরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার নায়ক হইলে, হরনাথ অযোধ্যা হইতেই প্রচারিত হইতেন। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই।

প্রধান শিক্ষকের পদে ক্ষুদিরামকে নিযুক্ত করাইলেন। ক্ষুদিরামের বেতন নির্দিষ্ট হইল মাসিক একশত টাকা।

হরনাথের মত ক্ষুদিরাম দাসও কৃষ্ণপ্রেমিক ছিলেন। সুতরাং, ক্ষুদিরামকে পাইয়া হরনাথের কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের বিশেষ সুবিধা হইল। শ্রীযুক্ত সেন তারপর কৃষ্ণানুরাগী দুই বন্ধুর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগের বিভিন্ন অভিব্যক্তির জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন এবং পরিশেষে ক্ষুদিরামের নিকট ছয় মাস পরে কাশ্মীর যাত্রার বিষয়ে হরনাথের ভবিষ্যদ্বাণীরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছয় মাস পরে হরনাথ যখন সত্যসত্যই কাশ্মীর যাত্রা করিলেন, তখন হরনাথের বিরহে তিনি এতই কাতর হইলেন যে, কাশ্মীরে পৌঁছিয়া হরনাথ টেলিগ্রামে সংবাদ পাইলেন, "Khudiram dead."।[১]

হরনাথের জীবিতকালে রচিত অপর কোন গ্রন্থে, বিশেষতঃ ভাগবত মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থদ্বয়ে, ক্ষুদিরাম দাসের উল্লেখ নাই। অথচ ভাগবত মিত্র মহাশয়ই হরনাথ-জীবনীর বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার এবং হরনাথকে কেন্দ্র করিয়া অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়াছেন। খ্যাতনামা মহাপুরুষদের সম্বন্ধে বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচারিত হয়। হরনাথের সম্বন্ধেও এইরূপ প্রচার তাঁহার জীবিতকালেই হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনার সবগুলি যে হরনাথের গোচরে আসিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। ভাগবত মিত্র মহাশয় এই জাতীয় বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়া, হরনাথকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এবং অন্যান্য বহু যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিয়া হরনাথের জীবন-কাহিনীতে বর্ণিত বহু ঘটনার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। যুক্তিবাদের শাণিত কুঠারে এই সমস্ত ঝোড় কাটিয়া ভাগবতবাবু শিব বাহির করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে, জনসাধারণের মনে হরনাথ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে এবং হরনাথের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হইয়াছে। এইজন্য হরনাথ ভাগবত মিত্র মহাশয়কে 'ঝোড়-কাটা ভাগবত' আখ্যা দিয়াছিলেন।

হরনাথের দেওয়া এই উপাধি শিরোভূষণ করিয়া ভাগবত মিত্র

১। হরনাথ চরিতামৃত : শ্রীসত্যচরণ সেন, পৃঃ ৫৭—৬১

মহাশয় উৎসাহসহকারে ঝোড় কাটিতে কাটিতে কিন্তু শিবেরই মাথায় আঘাত হানিয়াছেন; অর্থাৎ, তিনি নিজেই হরনাথ সম্বন্ধীয় বহু তথ্যকে অল্পাধিক বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। নামসংকীর্তনে হরনাথের বীতরাগের কথা তাহার একটি উদাহরণ।* ভাগবত মিত্র মহাশয় স্বীকার করিতে চাহেন নাই যে, হরনাথও নামসংকীর্তনে বিশেষরূপে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেও সত্য যে অপ্রকাশিত থাকে না, সত্যচরণ সেন মহাশয়ের গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বীয় সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ভাগবত মিত্র মহাশয় তাঁহার 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা' এবং অন্যান্য গ্রন্থে হেডমাস্টার ক্ষুদিরামের উল্লেখ করেন নাই।[১] কারণ, তাঁহার উল্লেখ থাকিলেই নামসংকীর্তনের প্রতি হরনাথের অনুরাগের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ভাগবতবাবুর সিদ্ধান্তের অসারত্ব প্রতিপন্ন হয়। তাই মিত্র মহাশয়ের মতে, অযোধ্যা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলেও, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের হেডমাস্টারি অব্যাহত ছিল।

সাময়িকভাবে হইলেও, রামনারায়ণবাবুর পক্ষে স্থায়িভাবে হাই স্কুলের হেডমাস্টারি করা সম্ভব ছিল না। অযোধ্যা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় ১৮৯২ সাল হইতে। এই উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে (এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারেও) একজন সুযোগ্য হেডমাস্টার নিয়োগ করা অপরিহার্য ছিল। ১৮৯৩ সাল হইতে যদি বিদ্যালয়টিতে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য ছাত্র-ভর্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বৎসরের জানুয়ারি মাস হইতেই আর একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। কারণ, ১৮৯২ সালে অযোধ্যা স্কুলে মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য হরনাথকে লইয়া মাত্র তিনজন শিক্ষক ছিলেন। রায় বাহাদুর গদাধরচন্দ্র এবং সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

* দ্রঃ অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃঃ ১৯৭-৯৮

১। হরনাথ সৌভেনির গ্রন্থের ৭৪নং ছবির ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র একজন ক্ষুদিরাম বসুর উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজে হরনাথের ধ্যানস্থ ভাব প্রত্যক্ষ করেন।

সুতরাং নূতন শিক্ষক নিয়োগের সময় হাই স্কুল চালাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে তাঁহারা হেডমাস্টাররূপে নিযুক্ত করিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। বি. এল. উপাধিধারী এবং গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের হেডমাস্টার ক্ষুদিরামবাবুর আবেদনপত্র পাইয়া, তাই তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাকে হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং, ১৮৯৩ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাস হইতেই ক্ষুদিরামবাবু অযোধ্যা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের কার্যভার গ্রহণ করেন।

গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের হেডমাস্টারি ছাড়িয়া ক্ষুদিরামবাবুর অযোধ্যা আগমনের কারণ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা না গেলেও, হরনাথের সাহচর্য লাভের লোভেই যে তাঁহার অযোধ্যায় আগমন— সত্যচরণ সেন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু ভ্রমাত্মক। তাঁহার মতে, কলেজে পড়িবার সময় ক্ষুদিরামবাবু হরনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন; কিন্তু কোন্ কলেজের সহাধ্যায়ী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ক্ষুদিরামবাবু যখন বি. এল. পড়িতেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই কলিকাতাতেই তাঁহার কলেজী শিক্ষা হইয়াছিল এবং অনুমান করা যায়, বি. এ. পড়িবার সময়েই তিনি হরনাথের সহধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ প্রথমবার বি. এ. পরীক্ষায় পাস করিতে পারেন নাই, আর ক্ষুদিরাম পাস করিয়াছিলেন (১৮৮৯ সালে)। সুতরাং, ১৮৯২ সালের পূর্বে বা মধ্যে বি. এল. পাস করিয়া গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে হেডমাস্টারি করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়। বি. এল. পাস করিয়া ক্ষুদিরামবাবু আইন-ব্যবসায় না করিয়া শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের দুইটিমাত্র উত্তর হইতে পারে। প্রথম, প্রতিষ্ঠালাভ না করা পর্যন্ত আইন-ব্যবসায়ে অর্থাগমের আশা অনিশ্চিত এবং প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কতকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহাও অনিশ্চিত। অনিশ্চিতের এই আলেয়ার পিছনে না ঘুরিয়া নিশ্চিত আয়ের আশায় তিনি চাকুরি গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়, ছাত্র হিসাবে বুদ্ধিমান হইলেও, প্রতিষ্ঠাবান আইন-ব্যবসায়ী হইতে হইলে যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, সেগুলি তাঁহার ছিল না। ফলে,

আইনজ্ঞ হইয়াও আইন-ব্যবসায় করিতে ক্ষুদিরামবাবুর সাহস হয় নাই।

আমাদের অনুমান, ক্ষুদিরামের শিক্ষকতা-গ্রহণের পশ্চাতে উপরি-উক্ত দুইটি কারণই সমানভাবে কার্য করিয়াছিল। খুব সম্ভব তাঁহার তেমন সাংসারিক সাচ্ছল্যও ছিল না এবং আইন-ব্যবসায়ের জন্য যে দৃঢ়তা, কূট কৌশল প্রভৃতির প্রয়োজন, তাঁহার মধ্যে সেগুলিও ছিল না। সত্যচরণ সেন মহাশয়-বর্ণিত ক্ষুদিরাম-চরিত্রে ইহার আভাস পাওয়া যায়। আইন-ব্যবসায়ের অন্ধকার দিকটার কথা বিবেচনা করিয়াই ঈশ্বরানুরাগী ক্ষুদিরাম আইন-ব্যবসায় না করিয়া, শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া, অযোধ্যার প্রস্তাবিত হাই স্কুলের কার্যভার গ্রহণ করেন। গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের হেডমাস্টারের বহুমুখী দায়িত্ব তাঁহার ঈশ্বরাধনার পথে বাধা জন্মাইত। সেইজন্য তিনি পল্লীগ্রামের নিভৃত পরিবেশে নামেমাত্র দায়িত্বপূর্ণ হেডমাস্টারের চাকুরি গ্রহণ করিলেন। বেতনের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। তৎকালে পল্লী-অঞ্চলে মাসিক একশত টাকা বেতন আশাতিরিক্ত ছিল বলিয়াই আমাদের ধারণা।

গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের চাকুরি ছাড়িবার পশ্চাতে আরও একটি কারণ ছিল। তাহা হইল তাঁহার ক্ষীণস্বাস্থ্য। হরনাথের সহিত তাঁহার কথোপকথনের যে বর্ণনা শ্রীযুক্ত সেন দিয়াছেন, তাহাতেই দেখা যায়—বেশীদিন বাঁচিয়া থাকার সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ভগ্নস্বাস্থ্যই এই উদ্বেগের কারণ এবং এই অনুমান সত্য হইলে, হরনাথের কাশ্মীর গমনের অব্যবহিত পরেই হরনাথের বিরহে না হউক, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই তাঁহার মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।

ক্ষুদিরামবাবুর কথা আর একটি গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গ্রন্থটি আধুনিক কালে রচিত এবং ইহাতে বর্ণিত হরনাথ-জীবনীর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ, বিশেষতঃ সত্যচরণ সেন মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে।

সেন মহাশয়ের গ্রন্থে বহু ঘটনার সাল-তারিখে যে ভুল আছে, তাহা আংশিকভাবে সংশোধন করিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন কৃতিত্বের দাবি এই গ্রন্থের রচয়িতা করিতে পারেন না। কারণ, সেন মহাশয়ের গ্রন্থে বর্ণিত হরনাথের জীবনের ঘটনাসমূহ এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত শ্রীযুক্ত সেনের বর্ণনার সামান্য পার্থক্য আছে—তাহা হইল ক্ষুদিরামবাবুর পদবী। শ্রীযুক্ত সেনের মতে, ক্ষুদিরাম-বাবুর পদবী ছিল দাস, তিনি জাতিতে ছিলেন সূত্রধর। কিন্তু সেপুরী লক্ষ্মীনরসহায়ের মতে, ক্ষুদিরামের পদবী বসু। কিন্তু তিনি ক্ষুদিরাম-বাবুর জাতি উল্লেখ করেন নাই এবং সেইজন্য মনে হয় ভুলক্রমে তিনি দাসকে বসু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

যাহা হউক, পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় প্রমাণ হইল যে, ক্ষুদিরাম দাস নামক বি. এল. উপাধিধারী এক ব্যক্তি গভর্নমেণ্ট স্কুলের হেড-মাস্টারের পদ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যা স্কুলে মাসিক একশত টাকা বেতনে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। তিনি হরনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার অন্তরে ছিল সুগভীর কৃষ্ণানুরাগ। অযোধ্যা স্কুলে আসিয়া প্রেমময় হরনাথের সংস্পর্শে তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর অনুরাগ স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। উভয় বন্ধু মিলিয়া সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল ধরিয়া মহানন্দে ঈশ্বরালোচনা করেন। হরনাথ কাশ্মীর যাত্রা করিবার পর ক্ষুদিরামের পরলোকগমন হয়।

অযোধ্যার স্কুলে হরনাথের শিক্ষকতার কালসীমা সাত-আট মাসের বেশী নয়। খুব সম্ভব, জুন মাসের শেষের দিকে তিনি কাশ্মীর হইতে একটি নিয়োগপত্র পাইলেন। এই নিয়োগপত্র-প্রাপ্তির একটি কারণ ছিল। হরনাথ যে সময়ে নামসংকীর্তনে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন, সেই সময়ে শিবনারায়ণ তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইতেন। শিবনারায়ণের বিরক্তির জন্য হরনাথ

১। প্রকাশকের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমাদের সিদ্ধান্ত যথার্থ। ভূমিকা লেখক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ঘরশাস্ত্রী মহাশয়ও আমার ধারণাকেই সমর্থন করিয়াছেন।

কিছুদিনের জন্য সোনামুখী ছাড়িয়া অন্য স্থানে বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু অন্য স্থানে বাস করিতে গেলে জীবনধারণের জন্য এবং দৈনন্দিন ব্যয়-নির্বাহের জন্য কিছু সম্বল থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য হরনাথ দূরবর্তী কোন স্থানে একটি চাকুরি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন।

এই সময়ে কাশ্মীর রাজ্যের Reception Department-এর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ছুটি লইয়া তাঁহার মানকর গ্রামের বাসভবনে আসিয়া সোনামুখীতে সম্পত্তি তদারক করিতে আসেন। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া হরনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বাস মহাশয়ের কর্মস্থল কাশ্মীর দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। এই অভিলাষ জ্ঞাপনেই হরনাথের চাকুরির দরখাস্ত হইয়া গেল। যথাসময়ে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্বাস মহাশয় হরনাথের চাকুরির জন্য কাশ্মীর রাজ্যের দেওয়ান জানকী প্রসাদ মহাশয়কে অনুরোধ জানাইলেন। বিশ্বাস মহাশয়ের উপর দেওয়ানজীর এতাদৃশ আস্থা ছিল যে, তিনি তাঁহার কথামতই হরনাথকে কাশ্মীর রাজ্যের ধর্মার্থ অফিসের হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করিয়া নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দেওয়ান জানকী প্রসাদ-স্বাক্ষরিত সেই নিয়োগপত্র মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় হরনাথের সোনামুখী বাটীর ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠাইলেন। কারণ, হরনাথের অযোধ্যা স্কুলের চাকুরির কথা তিনি জানিতেন না। হরনাথও মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট তাঁহার অনুরোধের বিষয় প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি কিছুটা বিস্মিত হইয়াই শিবনারায়ণ কর্তৃক প্রেরিত পত্রটির আবরণ উন্মোচন করিলেন। পত্র পাঠ করিয়া কাশ্মীর রাজ্যের ধর্মার্থ অফিসের প্রধান করণিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া, মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট তাঁহার পূর্বকৃত অনুরোধের কথা মনে পড়িল এবং সেই অনুরোধের এতাদৃশ শুভ পরিণাম দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে হরনাথের চাকুরি পাওয়ার সংবাদ শিক্ষকমহলে

প্রচারিত হইল। ক্ষুদিরামও এই সংবাদ শুনিলেন। হরনাথ কাশ্মীর রাজ্যে চাকুরি পাইয়াছেন জানিয়া ক্ষুদিরাম যারপরনাই আনন্দিত হইলেন; কিন্তু হরনাথ অযোধ্যা স্কুল ছাড়িয়া যাইবেন এবং তাঁহার সাহচর্যলাভে অতঃপর তিনি বঞ্চিত হইবেন—এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন। দুই-একদিন পরে যখন হরনাথ তাঁহার নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন, তখন হেডমাস্টার ক্ষুদিরামবাবুর চক্ষে বেদনার অশ্রু-বন্যা প্রবাহিত হইল। ক্ষুদিরামের ভালবাসায় হরনাথও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং ক্ষুদিরামের সহিত আসন্ন-বিচ্ছেদের চিন্তায় তিনিও ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহারও চক্ষে ধারা বহিল। আসন্ন-বিচ্ছেদের আশঙ্কা-নিঃসৃত বেদনার অশ্রুজলে হরনাথের যাত্রাপথ আলিম্পন-চিত্রিত হইল।

যে মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের চেষ্টায় হরনাথ কাশ্মীরে চাকুরি পাইলেন, সেই মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কারণ, মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের চেষ্টাতেই হরনাথের কাশ্মীর রাজ্যে চাকুরি হয় এবং চাকুরির জন্য তাঁহাকে কাশ্মীর গমন করিতে হয়। এই কাশ্মীরেই তাঁহার ঐশী শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তাহার পারিপার্শ্বিকতার ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা হরনাথের মানসলোকে ভাব-গম্ভীর এক অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগায়। তাঁহার এই পদটিও নিয়তই সাধু মহাত্মাদের সাহচর্যলাভের সুযোগ করিয়া দেয়। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাদের নিকট-সংস্পর্শ লাভ করার ফলে হরনাথ ধর্ম-সম্বন্ধীয় নানারূপ মত ও পথ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আলোচনা করিবার অগাধ সুযোগ লাভ করেন। ধর্মগুরুর জীবনে হরনাথ যে সকল ধর্ম ও সকল মতের মধ্যে সহজ সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রস্তুতি এইখানেই হয়। তাহা ছাড়া, কাশ্মীর রাজ্যের মনোহর পরিবেশে হরনাথ তাঁহার পরম প্রিয়তমের সহিত নিভৃত-মিলনের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করেন। সংসারবাসী তথাকথিত আপনজনের এখানে কোনরূপ বাধা দিবার উপায় ছিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে লোকনিন্দার ভয় ছিল না। বাধা-বন্ধনহীন হরনাথ

এখানে আপন ইচ্ছামত ভগবচ্চিন্তা বা ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে পারিতেন —তাঁহার সহিত নিভৃত-মিলনের আনন্দ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেন। ফলে, এই সময়ে তাঁহার ঐশী শক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। অন্তরে অনুভূত সেই পরমানন্দ তাঁহার সর্বদেহে পরিস্ফুট হয়। তাঁহার হাবভাব, কথাবার্তা, এমনকি চক্ষুর দৃষ্টির মধ্যেও নিত্যানন্দ ভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে। সেই সদানন্দ ভাবে বিভোর মানুষটির নিকট তখন যিনিই আসিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইতেন। তাহার ফলে, তিনি নিখিল ভারতে প্রচারিত হন। কাশ্মীরে আসিবার অব্যবহিত পর হইতেই অপূর্ব পত্রাবলী লিখিবার জন্য তিনি তাঁহার অমর লেখনী ধারণ করেন। ফলে, একদিকে তিনি যেমন অনুরাগী-জনকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারাও তেমনি তাঁহাকে ব্যাপকভাবে নিখিল ভারতে প্রচারিত করেন। সুতরাং কাশ্মীর হরনাথ-মন্দাকিনীর হরিদ্বার—আর কাশ্মীরে তাঁহাকে যিনি আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় হরনাথরূপ ভাবগঙ্গার ভগীরথ। এই হিসাবে হরনাথ-জীবনী গ্রন্থে মহেশবাবুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মহেশবাবু কাশ্মীর রাজ্যের একটি দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কাশ্মীর রাজদরবারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নতুবা তাঁহার মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া দেওয়ান জানকীপ্রসাদ সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হরনাথকে ধর্মার্থ অফিসের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেন না। বহুদিন ধরিয়া কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থান করিয়া বাঙ্গালী হইয়াও মহেশবাবু কাশ্মীর রাজ্যের একজন স্থায়ী অধিবাসীর মতো হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণও কাশ্মীর রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস শ্রীনগরের টেলিগ্রাফ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট ছিলেন, অপর পুত্র শরৎচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন কাশ্মীর রাজ্যের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শরৎবাবুর পুত্র অতুলচন্দ্র বিশ্বাস এম. এস-সি. পাস করিয়া পি. আর. এস. হইয়াছিলেন এবং কাশ্মীর রাজ্যের অপর একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহেশবাবুর পুত্র-পৌত্র

সকলেই কাশ্মীর রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হইয়াছিলেন। তথাপি দেশের সহিত ইঁহাদের সকলেরই নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এইরূপ মার্জিত ও শিক্ষিত পরিবারের কর্তা মহেশচন্দ্র বিশ্বাস যে কাশ্মীর রাজ্যের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইবেন, সে সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সুতরাং বিশ্বাস মহাশয়কে চিনিত না, শ্রীনগরে এমন ব্যক্তি দুর্লভ ছিল।[১] মানুষ হিসাবে মহেশবাবু ছিলেন সজ্জন। আতিথেয়তা ও আশ্রিতবাৎসল্যের জন্য তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি ছিল। শিশুর মতো সরল ছিল তাঁহার অন্তর।*

সদাহাস্যময় এই মানুষটিকে ছোট-বড় সকলের সহিত মেলামেশা করিতে ও হাস্য-পরিহাস করিতে দেখিলে মনে হইত না যে, তিনি কাশ্মীর রাজ্যের একজন প্রভাবশালী রাজপুরুষ। তাঁহার অমায়িকতার খ্যাতি শুনিয়াছিলেন বলিয়াই হরনাথ তাঁহার নিকট কাশ্মীর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। মহেশবাবু কাহাকেও মিথ্যা আশ্বাস দিতেন না। হরনাথের শিক্ষা-দীক্ষা ও সচ্চরিত্রতার কথা তিনি জানিতেন এবং ইহাও জানিতেন যে, শুধুমাত্র কাশ্মীর-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিবার জন্য হরনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। সেই মুহূর্তেই হরনাথের আন্তরিক ইচ্ছাটি তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন এবং হরনাথের মত যুবককে উপযুক্ত বেতনে কাশ্মীর রাজ্যের কোন একটি বিভাগে নিযুক্ত করিতে পারিবেন—এই

১। ১৯২৫।২৬ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বিবরণী অনুসারে এই বিষয়গুলি লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র মহাশয়ের হরনাথ সৌভেনির গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় মহেশচন্দ্র বিশ্বাসকে ব্যানার্জী বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে, মহেশবাবু সোনামুখীর যে কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি ভগবতী দেবীর আত্মীয়া। কিন্তু তিনি ভগবতী দেবীর জ্ঞাতি নহেন। কারণ, মহেশবাবু ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়া হইতে পারেন। সোনামুখীতে সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি পদবীধারী কায়স্থ অদ্যাপি বর্তমান।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মহাশয়ের মতেও, মহেশচন্দ্র বিশ্বাস হরনাথের আত্মীয় ছিলেন। সেপুরী লক্ষ্মীনরসহায় মহাশয় সেইজন্য মহেশবাবুর উপাধি দিয়াছেন বিশ্বাস-বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাহা নয়। মহেশবাবু ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার বংশধরদের কেহ কেহ এখনও মানকরে বর্তমান রহিয়াছেন।

* স্বামী বিবেকানন্দের কাশ্মীর ভ্রমণের বিবরণীতেও মহেশবাবুর নাম পাওয়া যায়। দ্রঃ ভারতে বিবেকানন্দ (১৪শ সং, ১৩৭০), পৃষ্ঠা ৪২২—৪২৫

বিশ্বাস তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি হরনাথের ইচ্ছা পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের পরিচায়ক। এই সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের উৎসমূল, ভগবানের উপর সুগভীর বিশ্বাস। সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিবার মত মানসিক গঠন তাঁহার ছিল। কাশ্মীরে পৌঁছিয়া চাকুরি করিয়া দিবার জন্য হরনাথ যখন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তো উপলক্ষমাত্র। কৈলাসপতির দর্শন-সুখ তোমার অদৃষ্টে আছে, সে অদৃষ্ট ফলের অন্যথা কে করিবে?"[১] এই উক্তিই তাঁহার আত্মপ্রচার-বিমুখতার উদাহরণ।

কাশ্মীর যাত্রা

ভূস্বর্গ কাশ্মীর—হরনাথের বহুকাল-পোষিত আকাঙ্ক্ষা কাশ্মীর-দর্শন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের পক্ষে দেশভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের আশা স্বপ্নের মত। বিশেষতঃ পিতৃ-পিতামহ-উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ্ হইতে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া যদি দেশ-ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহার অনুকূল, তাঁহার পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাঁহার অহেতুকী করুণায় মূক মুখর হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়! সেই পরম করুণাময়ের ইচ্ছা হইলে কোন্ দিক দিয়া যে কি হয়, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বরের অহেতুকী কৃপায় মহেশচন্দ্র বিশ্বাস উপলক্ষ হওয়ায় কাশ্মীরে হরনাথের কর্ম-সংস্থান হইল। তাঁহার কাশ্মীর দর্শন করিবার পক্ষে আর কোন বাধা রহিল না। ঈশ্বরের প্রতি হরনাথের অগাধ বিশ্বাস এবং অপরিসীম প্রেম ছিল। সেই কারণে জীবনে কোন ঘটনাই অসম্ভব বা অবাস্তব রূপে তাঁহার পক্ষে প্রতিভাত হয় নাই। বরং যিনি জগতের সব-কিছুই কৃষ্ণের বলিয়াই জগৎকে ভালবাসিতেন, তাঁহার নিকট সকল কর্মই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-প্রণোদিত বলিয়া তিনি মানিয়া লইলেন।

১। হরনাথ চরিতামৃত : সত্যচরণ সেন : পৃষ্ঠা ৬৭

কাশ্মীরে কর্মপ্রাপ্তির সংবাদ আকস্মিক হইলেও ইহার জন্য হরনাথের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না। ইহাকে তিনি ভগবানের ইচ্ছা বলিয়াই মনে করিলেন। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাবা, কাশ্মীরেও কে যেন আমায় নিয়ে গিয়েছিল।'

কাশ্মীর গমন সম্বন্ধে হরনাথের এই উক্তি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হরনাথ-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে কাশ্মীরবাসের একান্তই প্রয়োজন ছিল এবং সেইজন্যই হরনাথকে কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। অথবা কেহ যেন তাঁহাকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়াছিল—"এই অনন্ত বরফ-আবৃত পর্বতে, অনন্ত স্থানে ঈশ্বরের কান্তলীলা দেখিয়া বিভোর হইবার জন্য"[১], আবার কখনও বা "মহাপ্রলয়ের রূপ চাক্ষুষ দেখাইয়া নারায়ণের বিরাট মূর্তি দেখাইয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করিবার জন্য।" কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমনের পথেই হাতরাস স্টেশনের হেড বুকিং ক্লার্ক অটলবিহারী নন্দী মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ক্ষণিকের এই পরিচয় বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো অটলবিহারীর অন্তরলোক উদ্ভাসিত করে এবং অটলবিহারী হরনাথের অনুরাগী হইয়া উঠেন। এই অটলবিহারীর লেখনীমুখেই মহাত্মা শিশিরকুমার-সম্পাদিত হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় হরনাথের বহু অলৌকিক কাহিনী প্রকাশিত হইয়া বৃহত্তর জনসমাজে হরনাথকে প্রচারিত করে। ফলে, নিখিল ভারতের নরনারী হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অটলবিহারীকে যদি হরনাথ-লীলার অদ্বৈত হিসাবে মনে করি, তাহা হইলে বলিতে হয় চাকুরিব্যপদেশে হরনাথের কাশ্মীর আগমনই এই অদ্বৈতচাঁদের সহিত পরিচয়ের যোগসূত্র। অন্যভাবেও তিনি যে অটলবিহারীর নিকট-সংস্পর্শে আসিতে পারিতেন না, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, হরনাথের মত পরমভাগবত যেখানেই থাকিতেন, লীলার প্রয়োজনে যাঁহাকে আবশ্যক তাঁহাকেই কাছে আনিতে পারিতেন এবং অটলবিহারী উদ্যোগী না হইলেও তাঁহার ব্যাপক প্রচার নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা, সেখানে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ ঘটিত, হয়ত কার্যকারণ-সম্পর্কযুক্ত নরলীলা হইত না।

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড : পৃঃ ৪৮

হরনাথ নরলীলা করিয়া গিয়াছেন—সুখ-দুঃখে ভরা এই পৃথিবীতে তিনি আশা-নিরাশায় ও হাসি-কান্নায়-ভরা সাধারণ গৃহস্থের জীবন যাপন করিয়াছেন—তাই সাধারণ গৃহস্থেরই মতো তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য চাকুরির সন্ধান এবং চাকুরি করিতে হইয়াছে। তাই বাহ্যিকভাবে ও কার্যকারণ-সম্পর্কযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। যদিও একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিবামাত্র তাঁহার যে-কোন সাধারণ কার্যের মধ্যেও অসাধারণত্বের আভাস সহজেই পরিস্ফুট হয়, সাধারণ গার্হস্থ্য ধর্মীর চেষ্টার মধ্যেও অসাধারণত্ব বা ঐশ্বরিক শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়, মনুষ্যবুদ্ধির ভস্মাচ্ছাদনে ঈশ্বর-বুদ্ধির বহ্নি প্রকাশমান হয়। কিন্তু বাহ্যিক আচারে একজন গৃহস্থের সাধ্যাতিরিক্ত কোন কিছু করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। এ-সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই একটি উক্তি আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রযুক্ত হইতে পারে—'স্বয়ং ঈশ্বরও যখন মানুষ হয়ে আসেন তখন মানুষের মত সকল ভোগাভোগের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।'

হরনাথের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, চাকুরি উপলক্ষে কাশ্মীর গমনই নিখিল ভারতে হরনাথের প্রচারিত হইবার প্রধান সোপান। কাশ্মীরে বিশ বৎসরের চাকুরি-জীবনের কালসীমার মধ্যে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করে এবং অগণিত নরনারী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হয়। সুতরাং কাশ্মীর গমন যেমন ধর্মগুরু হিসাবে হরনাথের জীবনে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তেমনই বাংলা তথা ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

হরনাথের ব্যক্তিজীবনেও কাশ্মীর যাত্রা একটি স্মরণীয় ঘটনা। তৎকালে পর্বতসঙ্কুল পথ বাহিয়া সুদূর কাশ্মীর রাজ্যে গমন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ছিল এবং পথিমধ্যে যে-কোন মুহূর্তে জীবনাবসান ঘটিবার আশঙ্কাও ছিল। হরনাথের জীবনে প্রথম কাশ্মীর যাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায়, পাঠকের মনে ভয়, বিস্ময়, উদ্বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার পক্ষে তাহার তুলনা নাই। ইহার পরেও হরনাথ কতবার কাশ্মীর গিয়াছেন বা কাশ্মীর হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু

প্রথমবারের যাত্রার পথে তাঁহার যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, তাহা বহুদিনব্যাপী তাঁহার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হইয়া ছিল এবং কৌতূহলীর প্রশ্নে সে কাহিনী মনে পড়িলে বহুদিন পরেও আনন্দ এবং ভয়ে তাঁহার হৃদয় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত।[১]

গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুল খুলিতে হরনাথ অযোধ্যায় যান, কিন্তু ২।১ দিনের মধ্যেই কাশ্মীরের চাকুরির নিয়োগপত্র পাইয়া অযোধ্যা স্কুলে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া, হরনাথ সোনামুখী বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং জায়া, জননী ও জ্যেষ্ঠকে তাঁহার নূতন চাকুরিপ্রাপ্তির সংবাদ বলিলেন। স্কুল মাস্টারির চেয়ে এই নূতন চাকুরির বেতন পরিমাণে প্রায় দ্বিগুণ জানিয়া সকলেই সবিশেষ আনন্দলাভ করিলেন, কিন্তু চাকুরির জন্য হরনাথকে একাকী দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া দূরদেশে যাইতে হইবে জানিয়া উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার সীমা রহিল না। সেইজন্য ভগবতী দেবী প্রথমে আপত্তি করিলেন। প্রমাদ গণিয়া তাঁহাকে বহু প্রকারে প্রবোধ দান করিয়া হরনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট কাশ্মীর যাত্রার অনুমতি পাইলেন। জননীর অনুমতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠের অনুমতিও পাওয়া গেল। পরিশেষে অশ্রুমুখী কুসুমকুমারীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া হরনাথ কাশ্মীর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন।

হরনাথ ঠিক কবে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। পরবর্তী কালে এ-সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "জুলাই মাসে কাশ্মীর পৌঁছি বোধ হয়, জুন মাসে বাড়ী হইতে বাহির হই। উল্টারথ দেখে কাশ্মীর যাই মনে আছে।" এই মন্তব্যের মধ্যেই হরনাথের কাশ্মীর যাত্রার সঠিক তারিখের রহস্য নিহিত আছে। সাধারণতঃ জুন মাসের শেষের দিকে উল্টারথ হয়। মনে হয়, ১৮৯৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর অযোধ্যা স্কুল খোলা হয় রথযাত্রার পরদিন। গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুলের কার্যে যোগদান করিয়াই হরনাথ সোনামুখী হইতে শিবনারায়ণ-প্রেরিত চিঠি পান এবং চিঠিতে

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ৭

নিয়োগপত্র দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর যাইতে মনস্থির করেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ হরনাথের আত্মীয় ছিলেন। পদত্যাগের জন্য যে অন্ততঃপক্ষে এক মাসের নোটিশ দিতে হয়, তাহা দিতে হয় নাই। সুতরাং, উল্টারথের তিন-চারিদিন পূর্বেই হরনাথকে সোনামুখীতে আসিয়া কাশ্মীর যাত্রার সকল আয়োজন করিতে হয়। সাধারণতঃ রথযাত্রার পর সাতদিন বাদে উল্টারথ বা পুনর্যাত্রা হয়। ১৮৯৩ সালে অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দে সোনামুখীতে পুনর্যাত্রা বা উল্টারথ হইয়াছিল ১০ই আষাঢ় বা ২৪শে জুন। সুতরাং সোনামুখী হইতে হরনাথের প্রথম কাশ্মীর যাত্রার তারিখ ২৫শে জুন বা ১১ই আষাঢ়। কাশ্মীর যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে হরনাথের উপরোক্ত উক্তিটিও আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে।[১] খুব সম্ভব হরনাথের যাত্রার পরদিন সুবাসিনীর (হরনাথের কন্যা) জন্ম হয় এবং এই সংবাদ উরিতে টেলিগ্রামে জানানো হয়।

কাশ্মীর যাত্রার ব্যাপারে হরনাথসম্বন্ধীয় কয়েকটি পুস্তকে ভুল সন-তারিখ দেওয়া আছে। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মহাশয়ের মতে, হরনাথ ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গিয়া ধর্মার্থ অফিসের চার্জ (Charge) লইলেন ১৯০৩ সালে। হরনাথের স্বমুখের উক্তিই এই তারিখের বিপক্ষে। সুতরাং এ-সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। কাশ্মীরের কর্মপ্রাপ্তির সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত সেন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন ছয় মাস পূর্ব হইতে। সদাসর্বদা সকলের নিকট ভবিষ্যৎ দর্শনজাতীয় অলৌকিক শক্তির পরিচয়

১। জ্যোতিষের গণনায়, ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ়ে শুক্লাদ্বিতীয়া পড়ে এবং ২রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার হয়। আবার উক্ত গণনায় ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার হয়। কিন্তু বৈশাখ মাসের দিনসংখ্যা ৩০-এর কম হয় না, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন-সংখ্যা ৩১-এর কম হয় না। এই হিসাবে আষাঢ়ের ১লা তারিখে ১৪ই জুন পড়া সম্ভব নয়। খুব সম্ভব তিথির আরম্ভ হয় বুধবার সন্ধ্যায়, স্থিতিকাল বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। সেইজন্য ইংরাজী তারিখের গণনায় একদিন কম হইতেছে। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে, ১৮৯৩ সালের ১৬ই জুন রথযাত্রা হয়। সাধারণতঃ রথযাত্রার পরদিন পল্লী-অঞ্চলে গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুল খোলা হয়। সুতরাং ১৭ই জুন হরনাথ অযোধ্যা গমন করেন। ১৮।১৯ তারিখে কাশ্মীরের নিয়োগপত্র পাইয়া ২০।২১ তারিখে সোনামুখী আসেন এবং ২৫।২৬ তারিখে কাশ্মীর যাত্রা করেন।

প্রদানের জন্য যে হরনাথের আবির্ভাব নয়, শ্রীযুক্ত সেন ইহা বোধ হয় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। হরনাথ-লীলার মূল রহস্যটি সম্বন্ধে অবহিত হইলে যত্র-তত্র এবং অপ্রয়োজনে হরনাথের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দান করিবার কাহিনী অবান্তর বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ, হরনাথ কখনও নিজের প্রয়োজনে বা অপরের অপ্রয়োজনে তাঁহার অলৌকিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সুহৃদ্ ক্ষুদিরামের নিকট সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে ছয় মাসকাল পরে কাশ্মীরে কর্মলাভ করিবার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেন নাই। ইহা চরিতামৃত লেখকের স্বকলোল-কল্পিত। তাহা ছাড়া, হরনাথ নিজেও জানিতেন না যে, মহেশবাবুর নিকট কাশ্মীর দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপনের ফলে কাশ্মীর রাজ্যে তাঁহার কর্মপ্রাপ্তি ঘটিবে। শিবনারায়ণও মহেশবাবুর নিকট হরনাথের কর্ম-সংস্থানের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অবশ্য বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রামসম্পর্কে আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া যাঁহারা বিশ্বাস মহাশয়কে বিশ্বাস-বন্দ্যোপাধ্যায়ে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা খুব বেশী নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আর মহেশবাবুর নিকট শিবনারায়ণ আবেদন করিয়া থাকিলেও, হরনাথ সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। কারণ, এই আবেদনের কথা যাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মতে হরনাথ তখন 'সাগরমাতার হরিসভা' আশ্রমে প্রতিনিয়ত হরিকথা আলোচনায় আত্মহারা।

যাহা হউক, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মহাশয়ের ছয় মাস পরে হরনাথের কাশ্মীর যাত্রার ভবিষ্যদ্বাণীর কাহিনী কিন্তু অযোধ্যা স্কুলে ক্ষুদিরামের আগমন সময় সম্বন্ধে একটু আভাস দেয়। সত্যবাবুর মতে, অযোধ্যা স্কুলে হরনাথের চাকুরির কাল ছয় মাসমাত্র। কিন্তু অক্টোবরের শেষের দিকে হইলেও অর্থাৎ পূজাবকাশের পর ১৮৯২ সালে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে স্কুল খুলিলেও এবং অক্টোবর মাসের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন গণনায় না ধরিলেও, নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত সময় হয় আট মাসকাল। সুতরাং সত্যবাবুর উক্তির মধ্যে সত্যের আভাস পাইতে হইলে অনুমান করিতে হয় যে, অযোধ্যা স্কুলে ক্ষুদিরামের সহিত হরনাথের অবস্থানের কালসীমা ছয় মাস

মাত্র। অর্থাৎ, ক্ষুদিরামবাবু অযোধ্যা স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসিয়াছিলেন ১৮৯৩ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাস হইতে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিস্তৃত আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আর একটি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে হরনাথ কাশ্মীর যাত্রা করেন। এই গ্রন্থের রচয়িতাও কল্পনার অবাধ পক্ষ বিস্তার করিয়া ক্ষুদিরামবাবুর দাস পদবীকে বোসে এবং মহেশবাবুর বিশ্বাস পদবীর সহিত ব্যানার্জি যোগ করিয়াছেন। সুতরাং কাশ্মীর যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে হরনাথের উক্তিটি যে ইঁহার নজরে পড়ে নাই, পড়িলেও তিনি গ্রাহ্য করেন নাই, একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে।

অপর একজন হরনাথ-জীবনীকারের মতে, হরনাথের কাশ্মীর যাত্রার সময় ১৮৯২ সালের জুলাই মাস। কিন্তু ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে হরনাথ সোনামুখী স্কুলে শিক্ষকতার কার্য করিতেছিলেন। এই সময়েই হরনাথের কর্মজীবনের শুভারম্ভ। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে হরনাথ কাশ্মীর যাত্রা করেন। সুতরাং এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

হরনাথের বাণী সম্বন্ধীয় একটি অতি আধুনিক গ্রন্থেও (প্রকাশ-কাল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬২) হরনাথের কাশ্মীর যাত্রার সাল ও তারিখে মারাত্মক ভুল আছে। এই গ্রন্থের সম্পাদকের মতে কাশ্মীর যাত্রার তারিখ ১৮৯২ সালের জুলাই মাস।[১] অথচ আশ্চর্য এই যে, এই লেখকেরই সম্পাদনায় কাশ্মীর যাত্রার সাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হরনাথের পত্রটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভ্রমাত্মক সন-তারিখ-সমন্বিত গ্রন্থটির সম্পাদনাকালেও উক্ত পত্রের অনুবাদটি তাঁহার নিকট ছিল বলিয়া মনে হয়। উক্ত পত্রের অনুবাদে পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে—

১। "Here he stayed just a few months, and was called to a job in Kashmir about July, 1892."—Precepts of Sri Haranath : Introduction : Page 5

"In the later part of 1893, I went to Kasmir.[১] In July, I reached Kasmir, perhaps in June I left home."

এই পত্রটি লিখিত হয় সোনামুখী হইতে এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যতিক্রমের মতো এই পত্রটি সন-তারিখযুক্ত।[২]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, হরনাথের জীবনী লেখক ও সংকলনকারিগণ তাঁহার জীবনের বহু ঘটনার সঠিক তারিখ, এমন কি বৎসর সম্বন্ধেও অবহিত নহেন। একজনের বর্ণিত বিবরণ অপরজন কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়াই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে, নির্ভুল সন-তারিখযুক্ত হরনাথের জীবনী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। ঘটনা বা ঘটনাকাল সম্বন্ধীয় এইরূপ ভুল দেখিয়া বোধ হয় হরনাথ তাঁহার জীবিতকালে রচিত ও প্রকাশিত দুই-একটি গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় বা উল্লিখিত তারিখ যে ভ্রমাত্মক, সে সম্বন্ধে স্বমুখেই মন্তব্য করিয়াছিলেন।

একমাত্র শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র মহাশয় সন-তারিখ নির্ণয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং হরনাথের জীবনের কতকগুলি ঘটনার প্রকৃত সাল ও তারিখ উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার ভ্রম হয় নাই, এরূপ মনে করা অসমীচীন। বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনিও মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে হরনাথের রাওলপিণ্ডি পৌঁছিবার তারিখ। তাঁহার মতে, হরনাথ রাওলপিণ্ডি পৌঁছিয়াছিলেন ২৭শে জুলাই তারিখে।[৩] রাওলপিণ্ডি হইতে হরনাথ কাশ্মীর পৌঁছান বোধ হয় ২৫ দিনের পর।[৪] তাহা হইলে কাশ্মীরে হরনাথের প্রথম আগমন হয় ২০শে কিংবা ২১শে আগস্ট। এইরূপ হিসাব করিয়াই শ্রীযুক্ত মিত্র লিখিয়াছেন, 'হরনাথ

১। Pagal Haranath : Part V : A. R. Shastri : Page 32

২। ২৩।৮।২০ তারিখে লিখিত

৩। Haranath Souvenir-এ মুদ্রিত Photo No. 85-এর পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "Haranath reached Rawalpindi on 27th July 1893" (Page 37)

৪। রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর বোধ হয় ২৫ দিনের পর পঁহুছি, তার মধ্যে ৮।৯ দিন রাওলপিণ্ডিতেই কাটে। ভাগবত মিত্রকে লিখিত হরনাথের পত্র (২৩।৮।২০ তারিখে লিখিত)।

১৮৯৩ সালের আগস্ট মাসে শ্রীনগরে পৌঁছান।' তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা'র ১৬৭ পাতায় হরনাথের স্বহস্তলিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।[১] কিন্তু যে পত্রখানি অমিয় হরনাথ লীলাকথার ১৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে, তাহার মধ্যে কাশ্মীর যাত্রার সালটি ছাড়া মাস বা তারিখের কোন উল্লেখ নাই।[২] সুতরাং এই পত্রখানির প্রমাণে শ্রীযুক্ত মিত্র কিভাবে ১৮৯৩ সালের আগস্ট মাসে হরনাথের কাশ্মীর গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অথচ উক্ত লেখকেরই প্রশ্নের উত্তরে অপর এক পত্রে হরনাথ সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, তিনি জুলাই মাসে কাশ্মীর পৌঁছেন। সোনামুখী হইতে কাশ্মীর যাত্রার মাস সম্বন্ধে তিনি 'বোধ হয়' ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু জুলাই মাসে কাশ্মীর পৌঁছানো সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহই ছিল না। জুলাই মাসে কাশ্মীর পৌঁছানোর কথা তিনি ভাগবত মিত্রকে ২৩।৮।২০ তারিখে লিখিত পত্রে পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন।[৩] তাহা সত্ত্বেও ভাগবত মিত্র মহাশয়ের মতে, হরনাথ ১৮৯৩ সালের আগস্ট মাসে কাশ্মীর পৌঁছেন। আশ্চর্যের কথা বটে!

আর একটি দিক দিয়া হিসাব করিলেও, শ্রীযুক্ত মিত্রের উল্লিখিত হরনাথের রাওলপিণ্ডি পৌঁছানোর তারিখটি অবাস্তব বলিয়া বোধ হয়। সোনামুখী হইতে কাশ্মীর যাত্রার মাস সম্বন্ধে হরনাথের মনে সন্দেহ ছিল। সাতাশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা কোন্ মাসে ঘটিয়াছিল, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে না থাকিবারই কথা। কিন্তু কাশ্মীর যাত্রা হরনাথের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং এখানে তিনি প্রমোদ-ভ্রমণ করিতে যান নাই, চাকুরি করিতে গিয়াছিলেন। কাশ্মীরে

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা : দ্বিতীয় ভাগ : পৃষ্ঠা ৩১০

২। তারপর ১৮৯৩ শেষে কাশ্মীর যাই, 'বাবা, কাশ্মীরেও আমায় কেউ নিয়ে গিয়েছিল।' ভাগবত মিত্রকে লিখিত হরনাথের পত্র। পত্রে তারিখ নাই। পত্রখানি পাগল হরনাথ—পঞ্চম খণ্ডে এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদ নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। জুলাই মাসে কাশ্মীরে পঁহুছি, বোধ হয়, জুন মাসে বাড়ী হইতে বাহির হই।—পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ৮

গিয়া কোন্ তারিখে ধর্মার্থ অফিসের চার্জ গ্রহণ করেন, তাহার স্মৃতি ম্লান হইবার নয়। যতদূর জানা যায়, শ্রীনগরে পৌঁছিয়া মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে পাঁচ-ছয় দিন বিশ্রাম করিয়া তিনি ধর্মার্থ অফিসের কর্মভার গ্রহণ করেন, খুব সম্ভব আগস্ট মাসে। সুতরাং জুলাই মাসের ২৬শে।২৭শে নাগাদ হরনাথ যে কাশ্মীরে পৌঁছিয়াছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

সোনামুখী হইতে কাশ্মীর যাইতে হইলে প্রথমে পানাগড়ে[১] আসিয়া ট্রেন ধরিতে হইত। পানাগড় হইতে রেলপথে রাওলপিণ্ডি পর্যন্ত যাইতে অধিকপক্ষে সাত দিনের বেশী লাগিবার কথা নয়। হরনাথ পুনর্যাত্রা অর্থাৎ উল্টারথ দেখিয়া সোনামুখী হইতে বাহির হন। রথযাত্রা বা পুনর্যাত্রার পরদিনই যাত্রার পক্ষে শুভদিন বলিয়া প্রচলিত বিশ্বাস। সুতরাং হরনাথ ২৫শে জুন সোনামুখী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পানাগড়ে আসিয়া ট্রেন ধরেন। পানাগড় হইতে রাওলপিণ্ডি পর্যন্ত তিনি ট্রেনেই গমন করেন।[২] সুতরাং ১লা বা ২রা জুলাই তারিখে তিনি রাওলপিণ্ডি পৌঁছান। রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর যাইতে হরনাথের পঁচিশ দিন লাগিয়াছিল। সুতরাং তিনি কাশ্মীরেও পৌঁছান ২৬শে।২৭শে জুলাই তারিখে। এই দিক দিয়াও হরনাথের রাওলপিণ্ডি পৌঁছানোর উপরি-লিখিত তারিখটি (১লা বা ২রা জুলাই) সমর্থনযোগ্য। কারণ, এই তারিখটি হরনাথের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটিকে (পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য) সকল দিক দিয়া সমর্থন করে।

কাশ্মীরের পথে

প্রথমবার কাশ্মীর যাত্রা হরনাথের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাহার পর তিনি আরও অনেকবার কাশ্মীর গিয়াছেন। কিন্তু প্রথমবারে কাশ্মীরে গমনের পথে তিনি এমন কতকগুলি ঘটনার

১। পানাগড় স্টেশন খোলা হয় ১৮৯৬ সালে (Vide : History of East Indian Railways by G. Hudderston)

২। "He travelled by rail as far as Rawalpindi." (The Divinity of Haranath the Crazy by Sepuri Lakshminarasayya : Page XI)

সম্মুখীন হন, সুদীর্ঘ কাল পরেও সেগুলির স্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে যুগপৎ ভয়ে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করিত।

প্রথমবারে তিনি একাকীই কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সোনামুখী হইতে পানাগড় পর্যন্ত বাড়ীর গরুর গাড়িতে আসেন। কারণ, কাশ্মীরের মতো শীতপ্রধান অঞ্চলের উপযুক্ত শীতবস্ত্রাদি ও বিছানাপত্র সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। খুব সম্ভব বাড়ীতে আহারাদি করিয়াই তিনি বাহির হইয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণের দিকে পানাগড়ে আসিয়া পৌঁছেন। পানাগড় হইতে ট্রেনে চড়িয়া তিনি রাওলপিণ্ডি অভিমুখে গমন করেন। পথে বহুবার ট্রেন বদল করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রার ৬।৭ দিন পরে তিনি রাওলপিণ্ডিতে পৌছান। রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর যাইবার জন্য রেলপথ নাই। যতদূর মনে হয়, সে সময়ে পায়ে হাঁটিয়া রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর যাইতে হইত। রাওলপিণ্ডিতে হরনাথকে ৮।৯ দিন বাস করিতে হইয়াছিল। ইহার কোন কারণ তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই এবং জীবনীকারগণও রাওলপিণ্ডিতে এই কালক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু হরনাথের ২৩।৮।২০ তারিখের পত্রে জানা যায় যে, রাওলপিণ্ডি হইতে কোহালা পর্যন্ত গিয়া ঝিলাম নদীর উপর সেতু অদৃশ্য হওয়ায়, তাঁহাকে ৩।৪ দিনের জন্য কোহালার পোস্ট-মাস্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং রাওলপিণ্ডিতে হরনাথের কালহরণের কারণ প্রবল বর্ষাগম। সময়টাও আষাঢ়ের ১৮ই।১৯শে তারিখ। প্রচণ্ড বারিবর্ষণের পরিপূর্ণ সম্ভাবনাযুক্ত কালসীমা। সুতরাং প্রচণ্ড বারিবর্ষণের ফলে রাওলপিণ্ডি হইতে কোহালার পথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছিয়া এই সংবাদ পাইয়া হরনাথ কোহালার পথ যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান করিতে মনস্থ করেন এবং স্থানীয় কালীবাড়ীর পুরোহিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের আতিথ্য স্বীকার করেন। হরনাথের পরিচয় পাইয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ও সানন্দে হরনাথকে আতিথ্য দান করেন এবং কালীবাড়ীর একটি কক্ষ তাঁহার বসবাসের

জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের অতিথি-বাৎসল্যে হরনাথের হৃদয় এমনভাবে অভিভূত হয় যে, পরে তিনি যখনই রাওলপিণ্ডি আসিতেন, তখনই ভট্টাচার্য মহাশয়কে দর্শন না দিয়া যাইতেন না। ভট্টাচার্য মহাশয় বহুদিন ধরিয়া রাওলপিণ্ডিতে বাস করিতেছেন; সুতরাং এতদঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এজন্য তাঁহারই পরামর্শক্রমে হরনাথ রাওলপিণ্ডির কালীবাড়ীতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ৮।৯ দিন অবস্থান করিলেন এবং কোহালার পথে যানবাহন চলাচল আরম্ভ হইলে, তিনি টাঙ্গায় করিয়া রাওলপিণ্ডি হইতে কোহালা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে মুরী এবং মুরী হইতে ফাগুয়ারী হইয়া দুইদিনে কোহালায় পৌঁছিয়া হরনাথ দেখিলেন ঝিলাম নদীর সেতু অদৃশ্য হইয়াছে। সুতরাং ঝিলাম নদী পারাপারের কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোহালায় অবস্থান করা ছাড়া অপর কোন গতি নাই। এজন্য হরনাথ আশ্রয়ের সন্ধান করিতে কোহালার পোস্ট-অফিসে আসিলেন। পরিচয় পাইয়া পোস্ট-মাস্টার মহাশয়[১] হরনাথকে তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। হরনাথ সানন্দে সম্মতি দিলেন।

ঝিলাম নদীর সেতু বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায়, কাশ্মীরের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। সেইজন্য ঝিলাম ভ্যালী রোডের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ কে. সি. বণিক ঝিলাম নদীর উপর একটি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কয়েক দিনের চেষ্টায় বিফল হইলে, রাজ্যের চীফ ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল ডি. ই. বুরবল, ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ অ্যাটকিন্‌সনকে ঝিলামের উপর অস্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য প্রেরণ করেন। হরনাথ যেদিন কোহালায় পৌঁছিলেন, তাহার পরদিন মিঃ অ্যাটকিন্‌সন ঝিলামের উপর অস্থায়ী একটি সেতু নির্মাণের জন্য কোহালায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ঝিলাম নদীর বন্যার বেগ তখন কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত

১। পোস্ট-মাস্টার ছিলেন একজন পাঞ্জাবী। হরনাথ তাঁহার নামধাম বলিতে পারেন নাই।

হইলেও, নদীর ভিতর খুঁটি পুঁতিবার উপায় ছিল না। সেইজন্য কাষ্ঠ-নির্মিত সেতু নির্মাণ অসম্ভব দেখিয়া মিঃ অ্যাটকিন্‌সন নদীর উপর দিয়া একটি রজ্জুপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এক স্থানে নদীর এক তীরে একটি বৃহদাকার বৃক্ষ অপর তীরস্থ একটি বৃক্ষের সামনাসামনি অবস্থিত ছিল। সেই বৃক্ষ দুইটিকে সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত করিয়া প্রথমে একটি রজ্জুপথ (ropeway) নির্মিত হইল। তারপর সেই রজ্জুপথ ও একটি বেতের ঝোড়া দোদুল্যমান অবস্থায় এক তীর হইতে অপর তীরে টানিয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। রজ্জুপথে ঝোড়াটিকে দুই দিক হইতেই টানিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে মিঃ অ্যাটকিন্‌সনের তিনদিন সময় লাগিল।

এদিকে পোস্ট-মাস্টার মহাশয়ের আতিথ্যে হরনাথেরও কোহালায় চারিদিন কাটিয়া গেল। মনে মনে তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং পারাপারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া, তিনি পোস্ট-মাস্টার মহাশয়ের নিকট বিছানাপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখিয়া[১] নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন পরীক্ষামূলকভাবে পারাপার করিয়া রজ্জুপথের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার আয়োজন চলিতেছিল। প্রথমবার মানুষ না চাপাইয়া, ঝোড়াটিতে পাথর চাপাইয়া রজ্জু-নির্মিত সেতুপথে পারাপারের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিতেছেন জানিয়া, হরনাথ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ অ্যাটকিন্‌সন সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরীক্ষা-মূলক পারাপারে ঝোড়ায় পাথরের পরিবর্তে তাঁহাকে চাপাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মিঃ অ্যাটকিন্‌সন প্রথমে হরনাথের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু হরনাথ যখন তাঁহাকে বারে বারে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন এবং সম্ভাবিত বিপদের সকল দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইতে সম্মতি দান করিলেন, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ অ্যাটকিন্‌সন তাঁহাকে ঝোড়ায় চাপিয়া বসিবার অনুমতি দান করিলেন। বেতের ঝোড়ায় হরনাথ উঠিয়া বসিলে, নদীর অপর

১। এই সমস্ত দ্রব্যাদি হরনাথ আর ফিরিয়া পান নাই, পোস্ট-অফিস হইতে সমস্ত কিছুই চুরি হইয়া যায়।

তীরের লোকেরা ঝোড়ার কড়ায়-বাঁধা দড়ি ধরিয়া টান দিল। ঝোড়া ধীরে ধীরে অপর তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অনতিকাল পরে অপর তীরে আসিয়া পৌঁছিল। হরনাথ নিরাপদে অপর তীরে পৌঁছিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং স্বীয় গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।[১]

ঝিলামের অপর তীর হইতেই কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা আরম্ভ। বহির্জগতের সহিত কাশ্মীরের যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্যই ঝিলামের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া ঝিলাম ভ্যালী রোডকে কোহালার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং Craddle-এ Jhelum Pass করিয়াই হরনাথ Kashmir territory*তে পৌঁছিলেন। কিন্তু প্রবল বারিবর্ষণে ঝিলামের সেতুর সঙ্গে ঝিলাম ভ্যালী রোডের কিয়দংশও ভাসিয়া গিয়াছিল। সুতরাং পথচিহ্নহীন পর্বত বাহিয়া হরনাথকে কিছুদূর অগ্রসর হইতে হইল। সেই বিজন পার্বত্য পথে যানবাহন তো দূরের কথা, একজন পথচারীর সাক্ষাৎও মিলিল না। সুতরাং হরনাথকে একাকীই গমন করিতে হইল।

এইভাবে পদব্রজে তুলাই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন যে, রাস্তাটি এক স্থানে ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এইবার হরনাথের সমস্যা হইল। কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন ভাবিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তা দ্বারা সমস্যার সমাধান হইল না। কারণ, তিনটি পথই তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল এইভাবে গত হইবার পর সহসা একজন সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে দেখিয়া হরনাথ পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই

১। কেহ কেহ হরনাথের ঝিলাম নদী পারাপারকালে রজ্জুপথের এক স্থানে কর্তিতবৎ চিহ্ন ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রজ্জু উক্ত স্থানে ছিন্ন হইলে ঝোড়াটি আরোহীসমেত নদীগর্ভে বিলীন হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া উভয় তীরবর্তী কর্মীবৃন্দ ও সমবেত জনতা নিদারুণ উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু হয় রজ্জুর তথাকথিত কর্তিত অংশটিতে কর্তনের দাগ মাত্র ছিল, প্রকৃতপক্ষে কোন কর্তন থাকে নাই কিংবা রজ্জুটির এক অংশ নামমাত্র কর্তিত ছিল। যাহা হউক, ঝোড়াসমেত আরোহী নির্বিঘ্নে অপর তীরে পৌঁছিয়াছিলেন।

* ইংরাজী শব্দসমূহ হরনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

সাহেব তাঁহাকে গন্তব্যপথ বলিয়া দিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সাহেব বলিলেন যে, সম্মুখের পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং ঐ পথে আর অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন। তদুত্তরে হরনাথ তাঁহাকে অভয়দান করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। হরনাথ কিন্তু সেই পথ ছাড়িতে রাজী হইলেন না। ফলে, সাহেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সাহেব কর্তৃক সহসা পরিত্যক্ত হওয়ায় হরনাথ প্রথমে একটু ভীত হইলেন। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত মানসিক দুর্বলতাকে দমন করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তিনি চকোটি ও রামপুরের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় উপস্থিত হইয়া পথের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। উত্তুঙ্গ পর্বতরাজি চারিদিক রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। সেই পর্বতের যে খাঁজের ভিতর দিয়া পথটি নির্মিত হইয়াছিল, সেই খাঁজের উপর এক বিরাট ফাটল দেখা গিয়াছে। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়। উন্নত গিরিশ্রেণীর হিমশীতল নিস্তব্ধ পরিবেশে বিপজ্জনক পার্বত্য ফাটলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরনাথ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। পর্বতের ফাটলের পরিসর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল। নিশ্চিত মৃত্যু বিরাট মুখ-ব্যাদান করিয়া বিদেশী পথিককে গ্রাস করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর সম্মোহিতের মতো দণ্ডায়মান হইয়া হরনাথ নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা পর্বতশীর্ষ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব ভাষায় এক চীৎকার শুনিয়া হরনাথ উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, একজন পাহাড়িয়া বৃদ্ধা দুর্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বৃদ্ধা হস্তসঙ্কেতে পথনির্দেশ করিয়া হরনাথকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তদনুসারে হরনাথ সেই বৃদ্ধা কর্তৃক প্রদর্শিত পথে পর্বতারোহণ করিতে

লাগিলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর পশ্চাতে উত্থিত এক মহাঘোর শব্দ শুনিয়া হরনাথ দেখিলেন, যে স্থানে তিনি কয়েক মুহূর্ত পূর্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থান হইতে পর্বতটি ধ্বসিয়া গিয়া ঘোররবে গড়াইতে গড়াইতে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনি বুঝিলেন যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন এবং যে বৃদ্ধার জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষা পাইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দ্রুতবেগে বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে শান্ত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধাকে অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই হরনাথ চকোটির ডাকবাংলা দেখিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ পরেই হরনাথ চকোটির ডাকবাংলাতে উপস্থিত হইলেন এবং সেই রাত্রির মতো সেখানে অবস্থান করিয়া তৎপরদিন ডোমেলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহার পরদিন ডোমেল হইতে গারি এবং তথা হইতে উরি পৌঁছিলেন।[১] উরি পৌঁছিয়া হরনাথ কয়েকটি টেলিগ্রাম পান[২] এবং ৩।৪ জন কাশ্মীরী পণ্ডিতের সঙ্গ পান।

ইঁহাদের সঙ্গে উরি হইতে পদব্রজে গমন করিয়া হরনাথ বরমূলায়

১। এ-সম্বন্ধে হরনাথ বলিয়াছেন, 'যে স্থানে পাহাড়ে সাহেবটি অদৃশ্য হয় এবং আমাকে কোন অজানিত শক্তি রক্ষা করে এবং বৃদ্ধাবেশে আমাকে পাহাড়ের উপর ডাকিয়া লয় সে স্থানটি রামপুর ও চকোটির মধ্যস্থল।'—পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ৭

কিন্তু রামপুর ও চকোটির মধ্যস্থলে উরি নামক স্থান পড়ে। উরিতে পৌঁছিবার পর হরনাথ ৩।৪ জন কাশ্মীরী পণ্ডিতের সঙ্গ পান। তাঁহাদের সঙ্গে তিনি শ্রীনগর পর্যন্ত যান, তন্মধ্যে উরি হইতে বরমূলা পর্যন্ত পদব্রজে এবং বরমূলা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত নৌকায়। সুতরাং উপরি-লিখিত ঘটনার কাল উরি পৌঁছিবার পূর্বে। হরনাথ পার্বত্য পথে অগ্রসর হইয়া চকোটি ও রামপুরের মধ্যস্থলে যে স্থানে পৌঁছেন সেখানে পাহাড় ধ্বসিয়া যায়। পরে বৃদ্ধার সাহায্যে চকোটির ডাকবাংলায় ফিরিয়া আসেন। তারপর পুনরায় ডোমেল ফিরিয়া গিয়া ডোমেল হইতে উরি পৌঁছেন। পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ার জন্য রাস্তা বন্ধ হওয়ায় ঐরূপ করিতে হইয়াছিল।

২। উরিতে টেলিগ্রাম পাই 'পৃঃ ৬'। কিন্তু কোথা হইতে টেলিগ্রাম পান তাহা জানান নাই। এখানে মনে হইতে পারে, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন বর্ণিত

উপনীত হন। বরমূলা হইতে বোটে করিয়া দুইদিন পরে শ্রীনগর পৌঁছান। হরনাথের বোট যখন শ্রীনগরে পৌঁছে, তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। এই গভীর রাত্রিতে মহেশবাবুর বাসায় পৌঁছিলে তাঁহাকে বিব্রত করা হইবে ভাবিয়া, হরনাথ রাত্রির মতো বোটেই অবস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে মহেশবাবুর বাসায় পৌঁছিলেন।

মহেশবাবুর বাসায় তখন কৈলাসপতি অবস্থান করিতেছিলেন। শৈশবে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে হরনাথ কৈলাসপতিকে দেখিয়াছিলেন এবং কৈলাসপতিও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ছিল ক্ষণিকের দেখা। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই সামান্য মাত্র কালের সাক্ষাতের স্মৃতি ম্লান হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কৈলাসপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন এবং কাশ্মীরে তাঁহার কর্মপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

হরনাথকে দেখিয়া মহেশবাবু অতিশয় আনন্দিত হইলেন। দেশের সংবাদ পাইবার পর মহেশবাবু অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-ছয় দিন তাঁহার বাসায় বিশ্রাম করিবার জন্য হরনাথকে পরামর্শ দিলেন। মহেশবাবুর পরামর্শমতো হরনাথ তাঁহার বাসায় পাঁচ-ছয় দিন বিশ্রাম করিলেন। ইতিমধ্যে দেওয়ান জানকী প্রসাদকে হরনাথের আগমনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচ-ছয় দিন পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া হরনাথকে নিজের বাটীতে লইয়া যান এবং যত্ন করিয়া তাঁহার নিকটেই রাখেন।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে টেলিগ্রামে জানানো হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছিয়া বর্ষার ভীষণতাহেতু রাস্তার অগম্যতার কথা শুনিয়া বোধ হয় তিনি শ্রীনগরে মহেশবাবু কিংবা জানকী প্রসাদকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। চাকুরিতে যোগদানে বিলম্ব হইবার আশঙ্কাতেই খুব সম্ভব তিনি এই টেলিগ্রাম করেন এবং চাকুরিতে যোগদানের তারিখ পরিবর্তিত করিবার অনুরোধ জানান। তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াই বোধ হয় উরিতে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বাড়ী হইতে যাত্রার পরদিনে কন্যা সুবাসিনীর জন্ম হয় (২৬শে জুন ১৮৯৩)। সেই জন্ম-সংবাদও টেলিগ্রামে জানানো হয়।

কাশ্মীরে হরনাথ

হরনাথ বারে বারে বলিয়াছেন, 'My inner and outerselves are different.'[১] তাঁহার জীবন-কাহিনী পর্যালোচনা করিলে এই উক্তির যথার্থতা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। আভ্যন্তরীণ জীবনে হরনাথ একজন অতিশয় উচ্চমার্গের ভগবৎ-প্রেমিক। ভগবৎ-সাধনাই তাঁহার একমাত্র ব্রত, ভগবৎ-প্রেম লাভই তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা, আর আপামর সাধারণকে সেই ঈশ্বরপ্রেম লাভের পথ প্রদর্শনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার বাহ্যিক আচারে তিনি পরিপূর্ণ গৃহী-গার্হস্থ্য ধর্মের সজীব প্রতিমূর্তি। রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া তিনি রক্তমাংসের দেহধারী স্বজন-পরিজনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখানে তাঁহাকে সংসারের সকল কর্তব্যই সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইয়াছিল। গার্হস্থ্য ধর্মের নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে বাল্যে বিদ্যার্জন, যৌবনে সংসারধর্ম পালন ও সংসার-পোষণের নিমিত্ত অর্থোপার্জন করিতে হয় এবং অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে চাকুরি গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে আগমন করিতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি ধারার মধ্যে সৎ ভাবের একান্তই অভাব। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে অধ্যাত্ম-সাধনার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে নূতন নয়। বেদ ও উপনিষদের যুগ হইতেই এই ধারা ভারতে প্রবাহিত এবং ভারতীয় গৃহস্থ-সমাজে সবিশেষ আদৃত। সেই জনপ্রিয় পথে পদসঞ্চার করিয়া হরনাথ তাঁহার জীবনে সাধনা ও সংসার, সাধক ও গৃহস্থ এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরে আসিয়াই সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, কাশ্মীরে আসিয়া একদিকে যেমন সাধক হরনাথ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি গৃহী হরনাথও দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে অনুসরণযোগ্য সাংসারিক জীবনের এক উচ্চ আদর্শ

১। Birthday Message : Puri : 1921 (Sri Haranath—His Play and Precepts : Vithaldas Nathavai Mehta : Page 54)

প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৃহের সকল সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হরনাথ নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ভগবৎ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া, পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিভৃত-মিলনের সুখাবেশে বিভোর হইবার পরম সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। আবার কাশ্মীর আসিবার পর হইতেই হরনাথ সম্বন্ধে জননী, জ্যেষ্ঠ ও জায়ার আশঙ্কা দূর হইয়াছিল।

দূরপ্রবাসী হরনাথের মনে গৃহ-সংসারের চিন্তাও যে জাগিয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হয় কুসুমকুমারীকে লিখিত পত্রাবলীতে। জননীর প্রতি যে অকৃত্রিম ভক্তির স্রোত এতদিন তাঁহার অন্তরে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হইত, কাশ্মীরে আসিয়া তাহা প্রকাশিত হইল। এইভাবে কাশ্মীর প্রবাস সাধক হরনাথ ও গৃহী হরনাথ—এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিল।

কাশ্মীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সাধক হরনাথের মন বিমোহিত হইত। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অপরূপ সুন্দর পটভূমিকায় হরনাথের সাধক অন্তর পরমসুন্দরের ধ্যানে আত্মহারা হইত ও প্রিয়মিলনের অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপ্লুত হইত। পরমপুরুষের প্রতি পরমাপ্রকৃতি ভাবে ভাবুক হরনাথের অন্তরে ইতিপূর্বে যে পূর্বরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, অনন্ত সৌকর্যময়ী শ্রীনগর তাহার মধুমিলনের পরিবেশ রচনা করিল। সেইজন্যই কাশ্মীরের কথা বলিতে গিয়া তিনি আনন্দে গদগদকণ্ঠে বলিয়াছেন—'কাশ্মীরে আসিয়া মিলিয়াছে নূতন জীবন, নূতন প্রেম।'[১]

গৃহী হরনাথের নিকট কাশ্মীর প্রবাস কিন্তু মোটেই আনন্দদায়ক ছিল না। জননী ও জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জন ছাড়িয়া কাশ্মীরের মতো সুদূর দেশে গমন করিতে হইলে সাধারণ গৃহী মানুষের অন্তর যেমন পীড়িত হয়, সেই মর্মপীড়া গৃহী হরনাথও অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন।[২] তাহা ছাড়া, হিমালয়ের তুষারশীতল বক্ষ বাসস্থান হিসাবে হরনাথের মতো সামান্য বেতনের রাজকর্মচারীর পক্ষে কোনরূপেই প্রীতিপদ হইতে পারে না। কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে আহার্য, পরিধেয় ও বাস-

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ২৩৪

২। Unpublished Letters (Part I), Page 56

স্থানের মান যেরূপ উন্নত হওয়া প্রয়োজন, হরনাথের মতো সামান্য বেতনভোগী মানুষের পক্ষে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কল্পনায় দেখা কাশ্মীরের সহিত বাস্তবে কাশ্মীরবাসের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বাস্তবের অকরুণ পরিবেশের সহিত প্রতিনিয়ত সংঘাতে সযত্ন-পালিত কল্পনা, আবাল্যপোষিত ধারণা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। সেইজন্যই কাশ্মীর সম্বন্ধে, এমনকি কাশ্মীর ভ্রমণ সম্বন্ধে, তিনি বারে বারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন,—

'মহাশয় দূর হতে কাশ্মীর যা মনে করেন আমরা তার ঠিক বিপরীত মনে করি। বাল্যকালে ভূগোলে 'কাশ্মীর ভূস্বর্গ' শুনিয়া আমাদের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়াছে, তাই আজকাল অনেকেই লোভে পড়িয়া এখানে আসিতেছে ও অর্থ ও শরীর নষ্ট করে চলিয়া যাইতেছে। মহাশয় এ জগতে সুখ এক অর্থের উপর নির্ভর। যাহার অর্থ আছে সে সাহারার ভিতরেও হিমালয়ের সুশীতল বাতাস অনুভব করিতেছে। যার অর্থ নাই সে হিমালয়ের গর্ভেও আগুনে পুড়িতেছে। সেইজন্য নিবেদন, যেদিন খুব অর্থ হবে বাড়ীতে আর রাখবার স্থান হবে না, সেইদিন কাশ্মীর আসিবার চেষ্টা করিবেন।'[১]

বিত্তহীনের পক্ষে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মতো এমন নিরানন্দময় স্থান আর নাই। কাশ্মীরের অধিবাসী দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সমস্ত মানুষ চাকুরি বা ব্যবসায় করিবার জন্য কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সৌন্দর্য তাঁহাদের নিকট অপ্রকাশিত না হইলেও, সেই সৌন্দর্য উপভোগের জন্য তাঁহাদিগকে চরম মূল্য দান করিতে হইত। কাশ্মীরের মহার্ঘ আহার্যদ্রব্য ও হিমশীতল বায়ু তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য-সম্পদকে নিঃশেষে শোষণ করিয়া ফেলে। ফলে, তাঁহাদিগকে হয় ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে হয় নতুবা মৃত্যুবরণ করিতে হয়। কাশ্মীর সম্বন্ধে গৃহী হরনাথের উপরিলিখিত উক্তিতে এই সকরুণ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে লিখিত পত্র। দ্রঃ পাগল হরনাথ: তৃতীয় খণ্ড: পৃঃ ৮২

অফিসের কাজ

হরনাথ কাশ্মীরের ধর্মার্থ অফিসের চার্জ গ্রহণ করেন ১৮৯৩ সালের আগস্ট মাসে। অফিসে কাজের চাপ তেমন বেশী ছিল না। কাশ্মীরের পথে অমরনাথ তীর্থে যে সকল যাত্রী গমন করিতেন, ধর্মার্থ অফিস হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত, সঙ্গতিহীন তীর্থযাত্রীদিগকে প্রয়োজনমতো অর্থ দেওয়া হইত, কেহ কোন কষ্টে পড়িলে তন্নিবারণের ব্যবস্থা করা হইত, তীর্থযাত্রীদিগকে আশ্রয় দান করা হইত, আহার্য দিয়া পরিতৃপ্ত করা হইত—ধর্মার্থ অফিসের এই সকল করণীয় ছিল। এই সকল কাজ করিবার জন্য আরও কয়েকজন সহকারী ছিল। সুতরাং অফিসের কাজ বলিতে হরনাথকে বিশেষ কিছুই করিতে হইত না। সুতরাং নিভৃতে ঈশ্বর-চিন্তা করিবার প্রচুর অবসর তাঁহার ছিল। এখানে গৃহের বন্ধন, জ্যেষ্ঠের শাসন প্রভৃতি কিছুই ছিল না। অফিসের কাজ করিতে যেটুকু সময় ব্যয়িত হইত, সেই সময়টুকু ছাড়া সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইতেন। এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কৈলাসপতি এবং ঋষি, পীর প্রমুখ মুসলমান দরবেশগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাহা ছাড়া, তিনি নিয়মিতভাবে শ্রীনগরের সন্নিহিত অরণ্যমধ্যে গমন করিতেন। মুসলমান পীর ফকিরেরা সময়ে সময়ে অরণ্যমধ্যে আসিয়া হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হইতেন। অন্যান্য সময়ে হরনাথ অরণ্যমধ্যে গভীর তপস্যায় নিরত হইতেন। এইরূপে ধ্যানমগ্ন থাকার সময় একদিন একটি বৃহদাকার সর্প হরনাথের দেহ বেষ্টন করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পুনরায় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহা ছাড়া, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি ধ্যানমগ্ন হরনাথের নিকট আসিত এবং নির্ভয়ে তাঁহার স্কন্ধে ও ক্রোড়ে উপবেশন করিত। ক্রমে ক্রমে আরণ্য পশু-পক্ষীদের সহিত হরনাথের এতাদৃশ আত্মীয়তা জন্মে যে, তিনি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নানাবিধ পক্ষী সানন্দ কলরবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইত এবং

বানরাদি পশুকুল অঙ্গভঙ্গিসহকারে লম্ফঝম্ফ করিয়া হরনাথ-দর্শনে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিত। কথিত আছে, ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র জন্তুর সহিতও হরনাথের নিবিড় সখ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে নিজে মাতিয়া এবং অপরকে মাতাইয়া হরনাথ কাশ্মীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চাকুরি করার ফাঁকে ফাঁকে এই প্রেমের খেলা হরনাথের অন্তরে এমন আনন্দের সাড়া জাগাইত যে, তিনি প্রবাসের দুঃখও বিস্মৃত হইতেন। চাকুরি জীবনের এই আনন্দের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে চিরদিন অমলিন ছিল। প্রেমের যে তপস্যা প্রিয়মিলনের শুভলগ্নকে নিকটতর করিয়া তোলে, শ্রীনগরে অবস্থানকালে হরনাথ ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সহিত প্রেমের সেই তপস্যা করিবার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেইজন্য পরবর্তী কালে তিনি লিখিয়াছিলেন—'চাকরীও ঐরকমই করিতাম তবে নিজের অধীন হয়ে পরমানন্দে নিজের কর্তব্য করিতে পাইয়াছিলাম, তখন আর দাদার তাড়নার ভয় থাকে নাই।'

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর শীতকালে তুষারে আবৃত হইয়া যায় বলিয়া, শীতকালে কাশ্মীরের রাজধানী জম্মুতে স্থানান্তরিত হইত। এই যাত্রায় দশ হইতে পনের দিন সময় লাগিত।[১] টাঙ্গায় গেলেও এই যাত্রা অতিশয় কষ্টদায়ক ছিল।[২] হরনাথ অবশ্য শ্রীনগর হইতে জম্মু পর্যন্ত বরাবর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তায় যাইতেন না। তিনি রাওলপিণ্ডি দিয়া ওয়াজিয়াবাদ হইয়া জম্মু যাইতেন। তাহাতে পথকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইলেও, পার্বত্য পথে ১০।১৫ দিন টাঙ্গায় আরোহণ-জনিত কষ্ট তাঁহাকে অবশ্যই সহ্য করিতে হইত। এই পথশ্রমের কষ্ট ছাড়া হরনাথের চাকুরির অপর কোন কষ্ট ছিল না।

১। "The journey from Jammu to Kashmir takes ten to fifteen days."—Unpublished Letters : Part I : (Guntur) Sree Kusum-Haranath Seva Samiti : Page 110.

২। "Dear brother, a long and difficult road again stares me in the face, I am proceeding to Kashmir once more. Such comings and goings seem very irksome to me. I can hardly endure the hardship."—Unpublished Letters : Part I : Page 133.

শ্রীনগর হইতে জম্মু গমন করিবার সময় হরনাথ দুই-একদিন রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান করিতেন। ফিরিবার পথেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। রাওলপিণ্ডিতে তিনি প্রথমেই কালীবাড়ীর পূজারী কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেন। সেই কালীবাড়ীতে রাওলপিণ্ডি-প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায় আসিতেন। তাঁহাদের সহিত হরনাথ ধীরে ধীরে পরিচিত হন। প্রথমে কালী-বাড়ীর সভাপতি, রাওলপিণ্ডির একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের[১] সহিত হরনাথের আলাপ হয় এবং তাহার পর হইতে তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে হরনাথ রাওলপিণ্ডিতে আসিলেই শশিভূষণবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতে থাকেন। শশিভূষণবাবুর ভ্রাতা রায়সাহেব প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন রাওলপিণ্ডি ডিভিসনের মিলিটারী এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি এক্জামিনার। ক্রমে ক্রমে গোপাল দাস, ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্ত, নীরদবিহারী বসু, বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রাওলপিণ্ডিবাসী বিশিষ্ট বাঙ্গালী সমাজে হরনাথ প্রচারিত হইতে থাকেন। রাওলপিণ্ডিতে হরনাথের তৃতীয়বার[২] গমনের পর হইতেই পরিচয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

তাঁহার প্রথমবার রাওলপিণ্ডি আগমনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয়বার রাওলপিণ্ডি আগমন হয় ১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে। এইবারও তিনি কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ব্যতীত অপর কাহারও সহিত পরিচিত হন নাই বলিয়াই মনে হয়। শশিভূষণবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় খুব সম্ভব ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে। জম্মু হইতে শ্রীনগরে যাইবার পথে রাওলপিণ্ডিতে অবস্থানকালে প্রথম দর্শনের পর হইতেই শশিভূষণবাবু হরনাথের একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহে হরনাথ সেবার তাঁহার বাটীতে গমন করেন এবং ইহার পর রাওলপিণ্ডি আসিলেই তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।

ধর্মার্থ অফিসের চাকুরি এক বৎসর করিবার পর হরনাথ বাড়ী

১। রাওলপিণ্ডিতে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নামে একটি রাস্তা ছিল।

২। ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসের পর হইতে।

যাইবার জন্য দুই মাসের ছুটি পাইয়া ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে রাওলপিণ্ডিতে নামিয়া আসেন এবং দুই-একদিন অবস্থান করিয়া সোনামুখী গমন করেন। নভেম্বর মাসে সোনামুখী হইতে ফিরিয়া তিনি বরাবর জম্মু গমন করেন।

১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে হরনাথ পুনরায় রাওলপিণ্ডিতে আগমন করেন। এইবারে ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্তের বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হরিসভার অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন এবং কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। সাধারণতঃ রবিবারে হরিসভার অধিবেশন হইত। কিন্তু এই সময় হইতে হরনাথের রাওলপিণ্ডিতে অবস্থান-কালের প্রত্যেকটি দিনই হরিসভার অধিবেশন বসিত। হরনাথের আগমনে রাওলপিণ্ডির হরিসভাটি বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। কীর্তনানন্দে যোগদান করিয়া হরনাথ হরিসভায় উপস্থিত সমস্ত সদস্য-দের শুধু যে মাতাইয়া তুলিতেন তাহা নয়, তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে বহু গান গাহিয়াও তিনি সকলকে বিমোহিত করিতেন। এইভাবে রাওল-পিণ্ডি-প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের হৃদয়ে হরনাথের আসন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগরে পৌছিয়া হরনাথ পূর্বের প্রথামতো অফিস, নির্জনে সাধনা ও সাধু মহাত্মাদের সহিত ধর্মালোচনা করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কন্যা রাইমতীর জন্ম-সংবাদ* আসিলে তিনি ছুটির আবেদন করেন। তদনুসারে হরনাথকে দুই মাসের ছুটি দেওয়া হয়। এই বৎসর ছুটি পাইয়া হরনাথ বরাবর বাড়ী গেলেন না। একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে অমরনাথ তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন।

হিমালয়ের এক দুর্গম অঞ্চলে অমরনাথ গুহা অবস্থিত। বহু শ্রম ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অমরনাথ যাইতে হয়। সকলের ভাগ্যে ইহা সম্ভব হয় না। শ্রীনগর হইতে ছয়-সাত দিন ধরিয়া দুরারোহ পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া হরনাথ সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে অমরনাথ

* রাইমতীর জন্ম ১৮৯৫ সালের ৯ই জুন, বাং ১৩০২ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ।

পৌঁছিলেন পূর্ণিমার দিন। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনেই অমরনাথের পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গমূর্তি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়।

নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া অমরনাথ গুহায় প্রবেশ করেন।[১] সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত হরনাথও নগ্নদেহে অমরনাথ গুহায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার পর, শ্বেত কপোতযুগলের বহির্গমনের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। হর-পার্বতী এই কপোত-মিথুনের রূপ ধারণ করিয়া অমরনাথ গুহামন্দিরে অবস্থান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই কপোতযুগল গুহামন্দির হইতে বহির্গত হইলে, তীর্থযাত্রিগণ গুহা প্রবেশের অনুমতি পান। কপোতযুগল গুহামন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলে অপরাপর সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত হরনাথ অমরনাথ গুহায় প্রবেশ করেন।

ভারতের প্রাচীনতম গুহাতীর্থ অমরনাথ। কৈলাসের মতো এই তীর্থও হর-পার্বতীর আবাসভূমি। চন্দ্রের মতো অমরনাথের তুষার-লিঙ্গ শুক্লপক্ষের প্রত্যেক তিথিতে এক কলা করিয়া বর্ধিত হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিভাত হন। আবার, কৃষ্ণপক্ষের প্রত্যেক তিথিতে এক-এক কলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হন। অমরনাথে শিবলিঙ্গের গৌরীপট এবং গণেশ, কার্তিক প্রভৃতির তুষারমূর্তি বিরাজিত। এই সমস্ত দেবদেবীর পরম পবিত্র মূর্তি দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীর সকল পরিশ্রম সার্থক হয়, জীবন ধন্য হয়। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহাভাবে আপ্লুত হইয়া হৃদয় এক অননুভূতপূর্ব ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। পার্থিব বাসনা, কামনার বন্ধন হইতে মানসমুক্তি ঘটে, সেইজন্যই অমরনাথকে স্বর্গদ্বার হিসাবে গণ্য করা হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই অমরনাথে আসিয়াই কুকুরবেশী ধর্মরাজের সাহচর্য লাভ করেন।

শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে স্বয়ম্ভু অমরনাথের পূর্ণাবয়ব লিঙ্গমূর্তি দর্শন করিয়া সাধুগণ-সমভিব্যাহারে হরনাথ শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বার হাজার তিনশত ফুট উচ্চে অবস্থিত অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে হরনাথকে নিদারুণ শারীরিক কষ্ট স্বীকার

১। আধুনিক যুগে এই নিয়ম প্রচলিত নাই।

করিতে হইয়াছিল এবং বহু-আকাঙ্ক্ষিত ছুটির পনের দিন ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অমরনাথ তীর্থযাত্রায় হরনাথের অন্তরে যে অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। তাঁহারই ভাষাতে আমরা তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। "১৫ দিন সেই পরম পবিত্র হিমালয়ে সাধু সমাবেশে বাস করা যে কি আনন্দ তা বলিবার কাহারও শক্তি নাই। সেখানে ভয়ানক বদ্ধজীবও মুক্তের মত চিন্তাশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাই স্থান মাহাত্ম্য।"[১] এবং সেইজন্যই বোধ হয় সহধর্মিণী কুসুমকুমারীকে লইয়া তিনি ১৯০৪ সালে পুনরায় অমরনাথ দর্শন করেন।

হরনাথ ও অটলবিহারী

শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া হরনাথ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বৃন্দাবন হইয়া সোনামুখী আসিবার মানসে কয়েক দিন পরে হাতরাস জংশনে উপস্থিত হইলেন। হাতরাস জংশনে তখন হেড বুকিংক্লার্ক ছিলেন অটলবিহারী। এই অটলবিহারীর নিকটেই হরনাথের অলৌকিক শক্তি এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে, ঘোর নাস্তিক্যবাদী অটলবিহারী পরম আস্তিকে পরিণত হন এবং হরনাথের একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়া, হরনাথকে নিখিল ভারতে প্রচারিত করিয়া হরনাথ-অনুরাগীদের নিকট হরনাথ-লীলার অদ্বৈত-চাঁদরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

হাতরাস স্টেশনে পৌঁছিয়া হরনাথ অবগত হইলেন যে, সেদিনের বৃন্দাবনগামী শেষ ট্রেন কিছুকাল পূর্বে চলিয়া গিয়াছে এবং আট-নয় ঘণ্টার মধ্যে বৃন্দাবনগামী অপর কোন ট্রেন পাওয়া যাইবে না। তখন রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। হরনাথ স্টেশনের অনতিদূরে এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিধানে ময়লা কোট-পেণ্টালুন, মাথায় একটা কদর্য টুপি, দাড়ির বাহারও তদনুরূপ। সেই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, আকৃষ্ট হইবার বা কাহারও মনে ভক্তির উদয়

১। পাগল হরনাথ: তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪

হইবার কথা নয়। তথাপি কোন অজ্ঞাত কারণে কয়েকজন যাত্রী ও স্টেশনের কর্মচারী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে হরনাথ তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-সারেই ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর ও মনোহর বাচনভঙ্গীর গুণে উপস্থিত শ্রোতাগণ সকলেই মুগ্ধ হইল এবং আরও অনেকে আসিয়া সমবেত হইল। হরনাথ আপনমনে বলিয়া চলিয়াছেন, জনতার ক্রমবর্ধমান পরিসরের দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। জনতা দেখিয়া হেড বুকিংক্লার্ক অটলবিহারী বিরক্ত হইলেন এবং জনতাকে অপসারিত করিবার জন্য নিকটে আসিয়া উপদেশদানরত হরনাথকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রূঢ়ভাবে হরনাথের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। প্রত্যুত্তরে হরনাথ তাঁহার দিকে চাহিয়া মধুরভাবে হাস্য করিলেন এবং পূর্বের উপদেশের জের টানিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও অপূর্ব বাচনভঙ্গী অটলবিহারীকে আকর্ষণ করিল এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তিনি হরনাথের উপদেশামৃত পান করিয়া ধন্য হইলেন। সেই সঙ্গে ক্ষণপূর্বের রূঢ় আচরণের জন্য তিনি বিশেষভাবে লজ্জিত হইলেন। এইভাবে হরনাথের সহিত অটলবিহারীর প্রথম পরিচয় হইল।

কিন্তু এই পরিচয় ক্ষণিকের পরিচয়মাত্রেই পর্যবসিত হইয়া অটল-বিহারীর অন্তরের অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইত, যদি ক্ষণকালমাত্র পরে তিনি আর একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন না হইতেন।

হরনাথের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া অটলবিহারী তাঁহার দৈনন্দিন কর্তব্য-সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। সহসা হরনাথ আসিয়া টিকিট-কাউন্টারে বৃন্দাবনের টিকিট চাহিলেন। অটলবিহারীর একজন সহকারী বলিলেন যে, বৃন্দাবনের শেষ ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, আগামী আট-নয় ঘণ্টার মধ্যে আর কোন ট্রেন নাই। হরনাথ ইহাতে বিন্দুমাত্র নিরুদ্যম হইলেন না। ট্রেন এখনি আসিবে বলিয়া তিনি আবার টিকিট চাহিলেন। বিরক্ত কর্মচারীটি তাঁহার সহিত বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া স্বীয় কার্যে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরনাথ পুনরায় টিকিট চাহিলেন। এইবার

অটলবিহারীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। জানালার কাছে আসিয়া ময়লা কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত যে ব্যক্তিকে এতক্ষণ প্ল্যাটফরমে উপদেশ দিতে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে এবার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না যে, আগন্তুকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। সুতরাং, আবার তিনি রূঢ়ভাবে হরনাথকে পুনরায় পাগলামি করিতে নিষেধ করিলেন। প্রত্যুত্তরে হরনাথ বলিলেন যে, তিনি মোটেই পাগল নহেন, এখনই তাহার প্রমাণ মিলিবে এবং দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, যেহেতু ট্রেন আসিতেছে সুতরাং এখন না হউক, ক্ষণকাল পরেও তাঁহাকে বৃন্দাবনের টিকিট দিতে হইবে।

এইরূপ পাগলকে কিরূপে বুঝানো যায় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অটলবিহারীর বিরক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল এবং তাঁহার ভাষাও ক্রমে ক্রমে রূঢ় হইতে রূঢ়তর হইতে লাগিল। সেই সময়ে অফিসের ভিতরে টেলিগ্রাফের গ্রাহকযন্ত্রে সাঙ্কেতিক শব্দ ধ্বনিত হইল। বড়বাবুকে পাগলের সহিত পাগলামিতে রত দেখিয়া, একজন সহকারী বুকিংক্লার্ক টেলিগ্রাফের সংবাদ লইতে লাগিলেন। সংবাদগ্রহণ শেষ হইলে ভদ্রলোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া, অটলবিহারী দ্রুতপদে অফিসের ভিতর আসিয়া গৃহীত সংবাদ পাঠ করিয়া নিদারুণ বিস্ময়ে ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ক্ষণকাল পরে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইবার পর সহকারিগণকে বৃন্দাবনের টিকিট দিতে আদেশ দান করিয়া, অটলবিহারী বাহিরে আসিয়া হরনাথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হরনাথের তখন টিকিট কেনা হইয়া গিয়াছে। অটলবিহারীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অটলবিহারীর রূঢ়তা তখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই। অতর্কিত বিস্ময়ের ধাক্কায় তাঁহার তীব্রতা কিয়ৎ পরিমাণে স্তম্ভিত হইয়াছে মাত্র। হরনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে একজন বড় গণৎকার বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনি হাত দেখিতে জানেন?'

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণহস্তের তালু হরনাথের সম্মুখে

প্রসারিত করিতে উদ্যত হইলে, হরনাথ অটলবিহারীকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন যে, অতীত জীবনের কথা বলিতে তাঁহার হস্তরেখা বিচারের প্রয়োজন হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই হরনাথ অটলবিহারীর অতীত জীবনের এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, যাহাতে অটলবিহারীর মনে হইল, তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহ তিনি যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।[১] অটলবিহারীর যে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল, তিনি যে দিল্লী গাজিয়াবাদে ছিলেন এবং সেখানেই যে তাঁহার শূলবেদনার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং বর্তমানে তিনি যে শূলবেদনায় অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন—অটলবিহারীর জীবনের এই সমস্ত ঘটনা হরনাথ অবলীলাক্রমে বলিয়া চলিলেন। বিস্ময়বিমূঢ় অটলবিহারী এইবার ক্ষণপূর্বের রূঢ়তার কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সহসা তিনি হরনাথের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা তথা কৃপা প্রার্থনা করিলেন। করুণাময় হরনাথ অটলবিহারীর হাত ধরিয়া সস্নেহে উঠাইলেন এবং 'রাধাগোবিন্দ' নাম করিতে উপদেশ দিলেন। রাধাগোবিন্দ নামের মাহাত্ম্যে অচিরেই রোগমুক্তি ঘটিবে, এই আশ্বাস দান করিয়া হরনাথ অপেক্ষমান ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন।

হরনাথের নির্দেশমতো অটলবিহারী রাধাগোবিন্দ নামমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দুরারোগ্য শূলব্যাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। দৈহিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া রাধাগোবিন্দ নাম ও নামমন্ত্র-দাতার প্রতি অটলবিহারীর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জাগিল। অতঃপর তিনি দ্রুতগতিতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। স্বামীর অন্তরে ঈশ্বরপ্রেমের উন্মেষ সহধর্মিণীকেও আকৃষ্ট করিল। সুতরাং অটলবিহারীর সহধর্মিণী সারী নিষ্ঠাবতী ঈশ্বর-প্রেমিকা হইয়া উঠিলেন এবং হরনাথের প্রতি তাঁহারও প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস জন্মিল।

কিন্তু একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আধ্যাত্মিকতার পথে নবীন পথিক অটলবিহারীর এই আত্যন্তিক উৎসাহের স্রোতে ভাটা পড়িল। যেমন প্রবলবেগে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে তাঁহার অগ্রগতি

১। হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অটলবিহারীর পত্রাংশ।

ঘটিতেছিল, ঘটনাটির পর হইতে ততোধিক দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাদপসরণ ঘটিতে লাগিল। ঘটনাটি হইল এক বিধবা ধনবতী মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও তাঁহার কন্যার সহিত পত্র-বিনিময়ের ও হৃদয়-বিনিময়ের ঘটনা। হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে অটলবিহারী ঘটনাটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"এইবার আমি আমার জীবনের পরিবর্তন-সাধক এক অতি প্রধান ঘটনার বর্ণনা করিব। জগদীশ্বরকে ভক্তি এবং ধর্মময় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য ঠাকুর আমায় উপদেশ দিয়াছিলেন। আমিও তদনুসারে কার্য করিতে চেষ্টা পাইতাম। এই সময় জনৈকা মহিলা তীর্থ-দর্শনসঙ্কল্পে হাতরাসে আমার নিকট আগমন করেন। আমি জানিতাম না যে, এ মহিলা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, কারণ দীনাহীনা ভিখারিণীর বেশে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং আমিও সেই কারণে যথাশক্তি তাঁহার দুঃখ দূর করিতে প্রয়াস পাই। আমার সেই যৎসামান্য পরিচর্যাহেতুই আমার উপর তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হন এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া আমায় একটি স্নেহপূর্ণ পত্র লেখেন। সেই পত্রের সহিত কতকগুলি দ্রব্যও উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি আমার নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বালবিধবা কন্যার হস্তলিখিত। যাহা হউক, সেই মহিলা তখন হইতে আমাকে নিয়মিত পত্র লিখিতে লাগিলেন এবং আমিও উত্তর দিতে থাকিলাম। সকল পত্রই লিখিয়া দিতেন তাঁহার সেই বালবিধবা কন্যা। প্রথম প্রথম মায়ের হইয়াই পত্রগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তরুণীর পত্রের উত্তর দিতে লাগিলাম। ফলে, আমাদের উভয়ের মধ্যে পত্র-বিনিময় হইতে হইতে আমরা ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। এই অনুরাগ শেষে নূতন প্রেমের মাদকতায় পরিণত হইল। তরুণী একখানি পত্রে লিখিলেন—তাঁহার মাতা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, তিনি তাঁহার একমাত্র দুহিতা, আমি যদি তাঁহার নিকট গমন করি, তাহা হইলে তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব এমনকি স্বদেহ অবধি আমায় অর্পণ করিতে প্রস্তুত।

পত্র পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহাকে পাইবার স্বপ্নে আমি বিভোর ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমি চাকুরি করি, ছুটির জন্য দরখাস্ত করিলাম। বিনাবাধায় ছুটি মঞ্জুর হইয়া গেল। এখন ভয় শুধু ঠাকুর হরনাথের জন্য। মনে করিলাম কোন-না-কোন উপায়ে এ ব্যাপার তাঁহার নিকট লুকাইতে পারিব। যাহা হউক, আমি ছুটি লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছি, ছুটি ফুরাইলে আসিব—এইরূপভাবে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলাম। পত্রপাঠ মাত্র নাছোড়বান্দা ঠাকুর আমার কেন আমি সহসা ওরূপে স্থানান্তরে যাইতেছি এবং ব্যাপারটি কি সবিস্তারে জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি নানা কথাই লিখিলাম, কেবল মূল বিষয়টি গোপন করিলাম। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অন্তর্যামী ঠাকুরের আমার এই উত্তর পাঠে তৃপ্তি বোধ হইল না। তাঁহার শেষ পত্রে খুলিয়া লিখিলেন, আমি তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে চেষ্টা পাইতেছি ও অধঃপতনের পথে ছুটিয়া চলিয়াছি, যাহা হউক তবুও তিনি আমায় ছাড়িবেন না আমার পাছু পাছু দৌড়াইবেন ও আমায় রক্ষা সাধন করিবেন।

এইরূপভাবে সাবধান করিয়া দিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। কিশোরী-সঙ্গের লোভে ও সঙ্গে সঙ্গে অতুল ঐশ্বর্য-প্রাপ্তির চিন্তায় আমি তখন আর প্রকৃতিস্থ নাই। নরকে যাইতেও আমি অম্লানবদনে প্রস্তুত। ঠাকুরকে এতই বা ভয় কিসের। তাঁহার নিকট হইতে আমি যখন শত শত মাইল দূরে চলিয়াছি তখন কিরূপেই বা তিনি আমার অনুসরণ করিবেন ও আমায় খুঁজিয়া বাহির করিবেন, মনের এইরূপ অবস্থায় আমি গৃহত্যাগ করিয়া নরকের পথেই চলিলাম।

আমাকে দেখিয়া তরুণীর জননীর আনন্দের সীমা রহিল না। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়াদিসহযোগে আমি সৎকৃত হইলাম। সর্বোৎকৃষ্ট কক্ষটি আমার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাটী কিন্তু ভোগের লোক নাই। চাকর-বাকরদের ছাড়িয়া দিলে, মানুষের মধ্যে আমাকে লইয়া তিনজন মাত্র, মা, মেয়ে এবং আমি। এতক্ষণে আমার আশা মিটিবার সূচনা হইল। যাঁহাকে পাইবার

জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলাম তাঁহাকে পাইলাম। রাত্রি হইলে কিশোরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। এখনও সতীধর্মে জলাঞ্জলি দেন নাই—আমিই কি উহার পতন ঘটাইব ?

দেবতার মহিমা বুঝে, সাধ্য কার। কে জানিত, অচিন্ত্য উপায়ে এই সূত্রে আমাদের উভয়েরই পরম মঙ্গল সিদ্ধ হইবে। কিশোরীকে কাছে পাইয়া মনে কেমন একটা বেদনাবোধ জন্মিল। মেয়েটির মা, আমার উপর একতিল সন্দেহ না করিয়া পুত্রের ন্যায় আমার যত্ন করিতেছেন, এইরূপে তাঁহার গলায় ছুরি বসাইয়া আমি কি সেই বিশ্বাসের প্রতিশোধ দিব ? তাহা ছাড়া ধরা পড়িবার খুব ভয় হইতেছিল। এ চাকরগুলো ও মা যদি সব বুঝিয়াই থাকে, তাহা হইলে কি উপায় হইবে ? মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দুয়ার সব বন্ধ হইয়াছে, তিনি বলিলেন হইয়াছে। আমি কিন্তু তাঁহার কথায় নির্ভর না করিয়া, সাবধানের বিনাশ নাই ভাবিয়া নিজে একটা আলো লইয়া তাঁহার সঙ্গে দুয়ারগুলি সব আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। এইবার নিশ্চিন্ত মনে দুজনে খাটে আসিয়া বসিলাম। কিন্তু বসিবামাত্র জানালার কাছে কি একটা শব্দ হইল। আমরা যে কক্ষে বিরাজ করিতেছিলাম সে কক্ষটি দ্বিতলে, এজন্য জানালা বন্ধ করা আবশ্যক মনে করি নাই। শব্দ শুনিয়া জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। কি ভয়ানক ব্যাপার! দেখিলাম যে, ঠাকুর হরনাথ সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বোধ হইল, যেন তিনি শূন্যে প্রলম্বিত রহিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে হাতরাস হইতে কাশ্মীরে আমি তাঁর জন্য একটি পিরিহান প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম, সেই পিরিহানটি তাঁহার গায়ে। বুঝিলাম, আমার অধঃপতনে বাধা দিতে সত্য সত্যই তিনি উপস্থিত। আমি অনেক কথা অল্প সময়ের মধ্যে ভাবিয়া লইলাম। শেষে কিন্তু তাঁহার প্রতি বিরক্তি জন্মিল। তিনি যে আমার গুরুদেব, এবং আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন,

বিরক্তির ফলে সেই কথা ভুলিয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, আপনাকে তো কেহ ডাকে নাই, আপনি এখানে কেন? আমার কথা শুনিয়া বালিকাটির আশ্চর্য বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, কাহার সহিত কথা কহিতেছি। আমি বলিলাম, দেখিতেছ না, কে ওখানে দাঁড়াইয়া আছে? বালিকাটি জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঠাকুর কিন্তু অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বালিকা আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিল, কাহার সহিত কথা কহিতেছিলাম। আমি বলিলাম, সে সব পরে বলিব, উনি আমার গুরুদেব। উহারই কথা পূর্বে তোমায় বলিয়াছি। এখন এস, জানালাটা বন্ধ করি।

জানালাটা বন্ধ করার উদ্দেশ্য পুনরায় যেন কোন বাধা না পড়ে। নরকে যাইতে তখন যেন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি। শিকার হাতে পাইয়া কিছুতেই ছাড়িব না। জানালা বন্ধ করিয়া আবার আমি খট্বাঙ্গের উপর বসিতে গেলাম। কিন্তু ইহাতেও ঠাকুরের নিবৃত্তি নাই। আমার উদ্ধারের জন্য তিনিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি দয়াময় ও প্রেমময়। তা না হলে পশুপক্ষী অবধি তাঁহাকে ভালবাসে কেন? বনের বানর তাঁহার অনুসরণ করে কেন? জানালা ছাড়িয়া এবার তিনি দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলেন। এমন জোর ধাক্কা যে মনে হইল ঘরটা বুঝি পড়িয়া যায়। আমাদের ভয়ানক ভয় হইল। চাকরেরা সব জাগিয়া উঠিল। মেয়েটির মাও জাগিয়া উঠিলেন। মেয়ের মা দ্রুতগতিতে আমার কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। মেয়ে সেখানে কেন আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, সে মিথ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, এই গোলযোগ শুনিয়াই সে অল্পক্ষণ পূর্বে আসিয়াছে। সকলেই চমৎকৃত হইল ব্যাপার কি? চোর না ভূত? এইরূপভাবে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল। কর্ত্রী বলিলেন, তিনি খুব ঘুমাইয়া ছিলেন, শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছেন, যাহা হউক সে রাত্রি আমাকে একা শুইতে দিতে সম্মত হইলেন না। একজন চাকরের উপর আদেশ হইল। সে যেন আমার ঘরে থাকে। মেয়ে মায়ের কাছে গেল, আমি আমার ঘরে রহিলাম। দুজনের কেহই আর সে রাত্রে ঘুমাই নাই। মনে এমন একটা ভাব পরিবর্তন ঘটিল

যে, তুজনেই সমস্ত রাত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া কাটাইলাম। প্রভাত হইলে আমি আর সে মানুষ নাই। পাপ প্রবৃত্তি তখন আমার নিঃশেষে বিলুপ্ত এবং পাপের করাল কবল হইতে আমি উদ্ধারপ্রাপ্ত। আমার গুরুদেবের মহিমা ও প্রভাবের বিষয় মেয়েটিকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম। সকালে দেখিলাম, তাঁহার আমাপেক্ষাও অধিক পরিবর্তন হইয়াছে। 'জানি না, কি মোহবশে নরকের পথে চলিয়াছিলাম' বালিকাটি বলিলেন, 'ধন্য ঠাকুর হরনাথের দয়া, আজ হইতে আমাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলাম, তিনি আমার ভগবানকে মিলাইয়া দিন।' এইরূপভাবে তিনি সব কথা কহিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার বর্তমান সময়ের পবিত্র জীবন যেন স্বর্গের শোভায় শোভাময়।

সেদিন হইতে আমার পাপের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। রিপু সকল বশে আনিতে পারিয়াছি বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু ঠাকুর হরনাথ সবই দেখেন, সবই জানিতে পারেন এবং সর্বদাই খোঁজ রাখেন। সুতরাং আমাকে সৎপথে থাকিতে হয়। কর্মস্থলে ফিরিয়া কিছুদিন পরে ঠাকুরের সহিত দেখা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, সেদিন সে সময় কে আমায় ওরূপভাবে বাধা দিয়াছিল? তিনি হাসিয়া বলিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ! আমি বলিলাম, কিন্তু তিনি দেখিতে ঠিক আপনারই মত, এমন কি আমার দেওয়া জামাটি অবধি তাঁহার গায়ে ছিল। তিনি বলিলেন 'তুই আমায় ভালবাসিস, তাই সর্বত্র দেখিতে পাস। ভালবাসার একটা লক্ষণই এই'।"*

ইহার পর হইতে অটলবিহারী ও সারীর (হরনাথ-জগতের সারী মা) একনিষ্ঠ ভাগবত-চর্চায় হাতরাস জংশন মহাতীর্থে পরিণত হইল। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সুমধুর নামসংকীর্তনে হাত-

* এই পত্রোল্লিখিত ঘটনার স্থান, কাল ও পাত্রীর নাম অনুল্লিখিত। যতদূর মনে হয়, পত্রাবলী প্রথম খণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী যে ভক্তিমতী মহিলাকে হরনাথ পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি এই গল্পের নায়িকা। প্রথম খণ্ড পত্রাবলীর প্রকাশকাল ১৯০৪-০৫ সালে এবং হরনাথের সহিত অটলবিহারীর পরিচয় ১৮৯৫ সালের শেষভাগে। সুতরাং যতদূর মনে হয়, ১৮৯৬-৯৭ সালে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। খুব সম্ভব ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসের পূর্বেই এই ঘটনা ঘটে।

রাসের জংশন স্টেশন মুখরিত হইয়া উঠিল। স্বামী-স্ত্রী মহানন্দে ভগবৎ প্রেমাস্বাদন করিয়া সুগভীর আনন্দের সায়রে নিরন্তর ডুবিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরের ন্যায় দুই-একটি করিয়া ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল। অটলবিহারীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং যে মহাপুরুষের ক্ষণিক সংস্পর্শ এই অত্যাশ্চর্য সাধনে সক্ষম হইয়াছে, সেই পরম পরিত্রাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অটলবিহারীর পরিবর্তন এইভাবে হাতরাসের ভক্তগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করায় হরনাথের প্রচার সুরু হইল।

অটলবিহারীর পরে হাতরাস জংশনের যে সমস্ত ব্যক্তি হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সহকারী বুকিংক্লার্ক ক্ষীরোদ-কুমার ভট্টাচার্য, সহকারী স্টেশন-মাস্টার হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রসাদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রায় সকলেই হরনাথের অহেতু কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন এবং পরম নিষ্ঠাভরে হরনাথের সাহচর্য করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদকুমার ভট্টচার্য মহাশয় হাতরাসের অপরাপর ভক্তবৃন্দের সহিত মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রায় হরনাথের অনুগমন করিয়াছিলেন এবং মথুরা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবার সময় হরনাথের সহিত একাকী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

অটলবিহারীকে লিখিত পত্রাবলী পাঠ করিয়া হরিমোহন মুখোপাধ্যায় হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কালক্রমে হরনাথের নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হন ও হরনাথের সহিত পত্র-বিনিময় করিতে আরম্ভ করেন। একবার একটি পত্রে হরনাথ হরিমোহনকে আসন্ন একটি বিপদের আভাস দান করেন। তাহা হইল ইঞ্জিনের লাইনচ্যুতি হওয়ার বিপদ। এই সময়ে হরিমোহনবাবু কর্তব্যরত ছিলেন ; সুতরাং ইঞ্জিনের লাইনচ্যুতি-জনিত বিপদের দায়িত্ব তাঁহারই। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দয়াময় কৃষ্ণ অগ্রেই সুবিধা করিয়া রাখিয়াছিলেন—'এই পত্রের পাঁচদিন পরে বড় অফিস হইতে সংবাদ আসিল, তিনি নির্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন।'

হরিমোহনবাবুর প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিপদের পটভূমিকাতেই তাঁহার প্রতি হরনাথের অহেতু কৃপা বারে বারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। হরিমোহনবাবুকে লিখিত পত্রাবলীতে হরনাথ আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে তাঁহাকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও যখন বিপদ আসিয়াছে, হরনাথের করুণায় তাহার তীব্রতা বহু পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে এবং তিনি বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের ও কন্যা চারুশীলার অসুস্থতার সংবাদ হরনাথ পূর্বাহ্নেই জানাইয়াছিলেন এবং হরনাথেরই উপদেশে হরি-মোহনবাবু উভয় বিপদ হইতেই মুক্তিলাভ করেন।

অটলবিহারীবাবু হরনাথকে প্রায়ই পত্র লিখিতেন। এই সমস্ত পত্রের একটি লিখিবার সময় সহকারী স্টেশন-মাস্টার জ্যোতিপ্রসাদের আগমন হয় এবং উক্ত পত্রে জ্যোতিপ্রসাদ ঠাকুরকে তাঁহার প্রণাম জানাইবার কথা লিখিতে অটলবিহারীকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে অটলবিহারী তাঁহার পত্রে জ্যোতিপ্রসাদের প্রণাম জানিবেন লিখিয়া দেন। অন্তর্যামী ঠাকুর জ্যোতিপ্রসাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পত্রোত্তরে জ্যোতিপ্রসাদকে সর্বদাই সর্ষপ তৈল মর্দন করিয়া প্রত্যহ স্নান অভ্যাস করিতে ও মধুর কৃষ্ণনাম লইতে নির্দেশ দান করিলেন। জ্যোতিপ্রসাদ তখন জ্বরে ভুগিতে-ছিলেন। .তৎসত্ত্বেও ঠাকুরের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া তিনি তৈল-মর্দনান্তে স্নানাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে ছয়দিন গত হইলে তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল এবং তিনি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অষ্টবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালেও কোন পুত্র-কন্যার জননী হইতে সক্ষম না হওয়ায়, জ্যোতিপ্রসাদের পত্নীর অন্তরে নিদারুণ ক্ষোভ ছিল। তিনি মনোবাসনা পূরণের জন্য ঠাকুরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। হরনাথ প্রথমে তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদের পত্নী ইহাতে হতাশ না হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আবেদন জানাইলে, হরনাথ তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন, তিন মাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন।

তিন মাসের মধ্যেই জ্যোতিপ্রসাদের পত্নীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিল এবং অচিরকাল মধ্যেই তিনি বহু পুত্র-কন্যার জননী হইলেন।

হাতরাস স্টেশনের ভক্তমণ্ডলী বিশেষভাবে হরনাথের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। বিচিত্র উপায়ে বহু দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিদান করায়, হাতরাশ স্টেশনের রেলকর্মচারীবৃন্দ হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এইভাবে হরনাথের প্রাথমিক প্রচারকার্য সুরু হইল। কালক্রমে হাতরাস স্টেশন হরনাথ-ভক্তদের নিকট তীর্থ-স্থানে পরিণত হইল। কারণ, হরনাথের সাহচর্য করিতে বা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে কাশ্মীর গমন করিতে হইলে, হাতরাস জংশনে প্রত্যেককেই আসিতে হইত। সুতরাং এইখানে আসিয়া হরনাথ-ভক্তমণ্ডলীর সহিত সাহচর্য করিয়া হরনাথের লীলা-কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে অবহিত হইয়া তাঁহাদের কাশ্মীর গমন করিতে হইত। এইরূপ ভক্তের সংখ্যা বেশী না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। হরনাথও মধ্যে মধ্যে হাতরাসে অবস্থান করিতেন। ফলে, হাতরাস স্টেশনে হরনাথের ভক্তসংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিল এবং হরনাথের অভিনব ধর্মোপদেশ প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে বহু-বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

হরনাথের দেহান্ত ও নবকলেবর লাভ

কাশ্মীরে কর্মরত অবস্থায় হরনাথের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কিন্তু ঘটনাটির বিবরণ বহু-আলোচিত এবং তাহা স্বয়ং হরনাথের সাক্ষ্যে সমর্থিত। সেইজন্য ঘটনাটির বর্ণনা না করিলে হরনাথ-জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিবার সম্ভাবনা। ইহা হইল হরনাথের দেহান্ত ও নবকলেবর লাভের ঘটনা। এই ঘটনায় তাঁহার মধ্যে এক আধিভৌতিক পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনের বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার দেহবর্ণে। তাঁহার দেহের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছিল।

এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল জম্মু হইতে শ্রীনগর গমনের পথে ডোমেল নামক স্থানে ১৮৯৬ সালের ৩রা এপ্রিল (১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ) তারিখে, অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়। ১৮৯৬ সালের মার্চের শেষের দিকে হরনাথের জম্মুতে অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন শ্রীনগর যাইবার জন্য মহারাজের হুকুম বাহির হইল। হুকুম বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগর যাইবার জন্য তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন। হরনাথ একাকী থাকিতেন, তাঁহার আসবাব-পত্রও তেমন কিছু ছিল না। সুতরাং দেওয়ান বাহাদুরকে বলিয়া তিনি সেইদিনই শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। টাঙ্গায় যাইতে ১৬।১৭ দিন লাগিত বলিয়া, হরনাথ জম্মু হইতে বরাবর শ্রীনগর যাইতেন না। তিনি রাওলপিণ্ডি, মারীপাহাড়, ফাগুয়ারী, কোহালা, ঢুলাই, ডোমেল, গারহি, চকোটি, উরি, রামপুর ও বরমূলা হইয়া মোট ছয়-সাত দিনের পথে যাতায়াত করিতেন।[১] পথিমধ্যে অবশ্য রাওল-

---

১। দুইটি পথে জম্মু হইতে শ্রীনগর যাওয়া চলিত। প্রথমটি দিয়া জম্মু হইতে বরাবর শ্রীনগর পৌছানো যাইত, আর দ্বিতীয় পথটি দিয়া রাওলপিণ্ডি, মারী, কোহালা, গারহি, উরি, রামপুর ও বরমূলা হইয়া শ্রীনগর যাইতে হইত। প্রথম পথটিতে জম্মু হইতে শ্রীনগর পৌছিতে ১৬।১৭ দিন লাগিত, আর দ্বিতীয় পথটিতে লাগিত ছয়দিন মাত্র। সময়-সংক্ষেপহেতু পথকষ্ট কম হইত বলিয়া, হরনাথ দ্বিতীয় পথটি দিয়াই জম্মু হইতে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর হইতে জম্মু যাতায়াত করিতেন। ১৯১৮ সালের পূর্বে এই পথ দুইটির কোনটিতে মোটরযান চলাচল

পিণ্ডিতে দুই-একদিন এবং অন্যান্য দুই-এক স্থানেও কিছুকাল বিশ্রাম করিতেন বলিয়া, জম্মু হইতে শ্রীনগর পৌঁছিতে তাঁহার দশ-বারদিন লাগিত। এইবারেও রাওলপিণ্ডিতে আসিয়া দুই-একদিন বিশ্রাম লইয়া, তিনি টাঙ্গায় শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইলেন। প্রথমদিন

করিত না, টাঙ্গাতেই পথ অতিবাহন করিতে হইত। নির্দিষ্ট দূরত্বের পর টাঙ্গার ঘোড়া বদল হইত। এইরূপ ঘোড়া বদলের স্থানকে Stage বলা হয়। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত ১১টি প্রধান Stage ছিল। তাহা ছাড়া, কুড়িটি অপ্রধান Stage-ও ছিল—এই সমস্ত স্থানে ঘোড়া বদল করা হইত। বিশ্রাম গ্রহণ করার ও রাত্রি যাপন করার ব্যবস্থাও এই সমস্ত Stage-এ ছিল।

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত এগারটি Stage-এর নাম, উচ্চতা, দূরত্ব এবং পৌঁছিবার সময় নিম্নলিখিতরূপ :—

	স্টেজের নাম	উচ্চতা (ফিটে)	মাইল	অতিবাহন কালসীমা
	রাওলপিণ্ডি	১৬৭০	—	—
১।	রাওলপিণ্ডি হইতে সানিব্যাঙ্কমারী	৬৫০০	৩৬	১ দিন
২।	মারী হইতে ফাগুয়ারী	৪২০০	১৬	—
৩।	ফাগুয়ারী হইতে কোহালা	১৮০০	১৫	১ দিন
৪।	কোহালা হইতে দুলাই	২০৫০	১২	—
৫।	দুলাই হইতে ডোমেল	২২৩০	১১	—
৬।	ডোমেল হইতে গারহি	২৬৩০	১৩	১ দিন
৭।	গারহি হইতে চকোটি	৩৮০০	১২	—
৮।	চকোটি হইতে উরি	৪৪৫০	১৪	১ দিন
৯।	উরি হইতে রামপুর	৪৭৮০	১৫	—
১০।	রামপুর হইতে বরমূলা	৫২০০	১৬	১ দিন
১১।	বরমূলা হইতে শ্রীনগর	৬২১৪	৩৪	১ দিন
			১৯৪ মাইল	৬ দিন

মোট ১৯৪ মাইল পথ ছয়দিনে অতিক্রম করা যাইত। পথের প্রকৃতি অনুসারে অপ্রধান Stageগুলি চারি হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। একটি অশ্বতর টাঙ্গা বহন করিত। এক Stage হইতে অপর Stage-এ পৌঁছাইয়া নূতন অশ্বতর যোজনা করিয়া টাঙ্গা চলিত। পথিমধ্যে মোটামুটি-ভাবে চারিবার টাঙ্গাও বদল করিতে হইত। একত্রিশটি Stage অতিক্রম করিতে কমপক্ষে পনের-ষোলবার অশ্বতর বদল করিতে হয়। ১৯১৮ সাল হইতে এই পথে মোটরগাড়ি ও বাসের চলাচল আরম্ভ হয়। মোটরগাড়ির পথে নয়টিমাত্র Stage ছিল। মোটরগাড়িতে ভাড়া লাগিত ৪৫ হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত। রাওলপিণ্ডি হইতে মোটরগাড়িতে শ্রীনগর পৌঁছিতে দশ হইতে বারো ঘণ্টা সময় লাগিত। বাসের ভাড়া ছিল আট-দশ টাকা মাত্র।

রাওলপিণ্ডি হইতে মারীপাহাড় পৌঁছিলেন এবং তথায় রাত্রিযাপন করিয়া দ্বিতীয়দিন ফাগুয়ারী হইয়া কোহালায় পৌঁছিলেন। কোহালায় রাত্রিযাপন করিয়া তৃতীয়দিন হরনাথের টাঙ্গা গারহি অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং মধ্যাহ্নের পূর্বেই তুলাই নামক স্থানে উপনীত হইল। এখানে মধ্যাহ্নকালীন আহারাদি সমাপন করিবার পর হরনাথ পুনরায় টাঙ্গায় উঠিলেন, টাঙ্গা ধীরে ধীরে ডোমেল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাহাড়ের উপর দিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া টাঙ্গা কয়েক মাইল অগ্রসর হইবার পর কয়েকবার ভেদবমির মতো হইল এবং ক্লান্তিতে হরনাথের ঘুম আসিতে লাগিল। তিনি টাঙ্গায় হেলান দিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আরামবোধ না হওয়ায় তিনি টাঙ্গাওয়ালাকে থামিতে বলিলেন। তদুত্তরে টাঙ্গাওয়ালা তাঁহাকে জানাইল যে, অনতিদূরে ঘোড়া বদলাইবার Stage-এ থামাই সুবিধাজনক।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে টাঙ্গাওয়ালা কোহালা হইতে গারহির অন্তর্বর্তী ডোমেলের নিকট উপস্থিত হইয়া হরনাথ নামিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। নতুবা সে কালবিলম্ব না করিয়া গারহি স্টেজের দিকে রওনা হইবে এবং সেখানে রাত্রিতে বিশ্রাম করিবে। হরনাথ তাহাকে একখানা খাটিয়া আনিতে বলিলেন এবং কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে খাটিয়া আনিলে, হরনাথ উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। তখন হরনাথের নির্দেশক্রমে টাঙ্গাওয়ালা ও তাহার সঙ্গী দুইজনে ধরাধরি করিয়া হরনাথকে খাটিয়ার উপর শোওয়াইয়া দিল এবং সহসা তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কি হইয়াছে?' তাহার পরের অবস্থার কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে হরনাথ বলিয়াছেন, "তাদের কথা কানে গেল, কিন্তু উত্তর দিবার শক্তি ছিল না, কথা বলার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলাম না। মনে হইল বলি, শেষ সময়—মৃত্যু। কিন্তু পারিলাম না। তারা তিনজন লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়াইয়া কি বলাবলি করিতেছিল, হাত-মুখ নাড়িতেছিল, দেখিতে দেখিতে সব অন্ধকার হয়ে গেল, ও সঙ্গে

সঙ্গে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়িলাম—সেখানকার আর কোন সংবাদই জানি না।”[১]

বেলা তিনটার সময় এই ঘটনা ঘটে। এইরূপে ঘুমাইয়া পড়ার সময় কোনরূপ কষ্ট বা যন্ত্রণা বোধ হয় নাই, কেবল লম্বা হইয়া পা ছড়াইয়া শুইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। হরনাথের মতে, “এই ইচ্ছাই বোধ হয় মৃত্যুকে বাধা দিয়াছিল। মুমূর্ষু ব্যক্তির কাহাকেও দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হলে, সে যতক্ষণ না তাহাকে দেখে, ততক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, আর যেই তাকে দেখে তারপরই সে চিরনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ে। ইহাও ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ঘটে, ইহা আমরা অনেক সময় দেখি, কিন্তু কারণ নির্ণয় করিতে পারি না। ইচ্ছার যে কত বড় শক্তি তা আমাদের জানা নাই বলে এ-সব বিষয় বুঝি না।”[২]

হরনাথ দশ ঘণ্টাকাল অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। দশ ঘণ্টা অচৈতন্য বা স্তম্ভিত থাকার পর “হঠাৎ মারীপাহাড় হইতে পেটা-ঘড়িতে ১টা বাজিতে শুনিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কতরকমের দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, আমার বাকি কাজের চিত্রাবলীও দেখিলাম, পূর্বদিক হইতে আমার পা পর্যন্ত একটি সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি আসিয়া লাগিল, তারপর সেই রশ্মিসূত্র অবলম্বন করিয়া আমার পূর্ব-পরিচিত যাঁহাকে ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম—সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে আসিতে দেখিলাম, তিনি আমার পায়ের নিকট দাঁড়াইয়া আমাকে নাম সম্বোধনে বলিয়াছিলেন, হর তুমি মরিয়াছ! আমি তাঁকে বলিলাম, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। স্থূলদেহের সহিত যুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বাহির হইব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি—আমাকে স্থূলদেহের বাহিরে আসিতে বলিলেন।”

স্থূলদেহের বাহির হইয়া—সূক্ষ্মদেহী হরনাথ নানারকমের দৃশ্য

১। হরনাথ-স্মৃতি : চতুর্থ লহরী, পৃঃ ১১

শ্রীনগরের পথে দেহান্ত ও নবকলেবর প্রাপ্তির সময় হরনাথের মানসিক অবস্থার বর্ণনা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, হরনাথ হেতমপুরের রাজার ম্যানেজার হরিবাবুকে এই বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলেন, ভাগবত মিত্র কর্তৃক তাহা অনুলিখিত হয়। হরনাথ-স্মৃতি—চতুর্থ লহরীর প্রকাশকাল অবশ্য ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

২। হরনাথ-স্মৃতি : চতুর্থ লহরী, পৃঃ ১৩

দেখিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার মৃতদেহ দেখিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত কিছুই কাচবৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। এই সময়ে তিনি সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন। এই বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, "নিকটেই টাঙ্গাওয়ালারা তিনজনে ঘুমাইতেছিল দেখিলাম—তাদের দেহের মধ্যে রক্ত-চলাচল দেখিলাম—দেহের মধ্যে অসংখ্য প্রাণী দেখিলাম—ঐ অসংখ্য প্রাণীদের[1] ভীষণ যুদ্ধ দেখিলাম—একটি জীবাণু অন্য জীবাণুকে ধরিয়া উদরস্থ করিতেছে আবার এই প্রাণীটিকে অন্য জীবাণু উদরস্থ করিল—জীবাণু সকল ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করিতেছে আর ঐ লোকেরা জীবাণুগণের গতাগতির কোন সংবাদ না পাইয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত। সম্মুখের পাহাড় আমার দৃষ্টিকে রোধ করে নাই, যেন, কাচের পাহাড়, পাহাড়ে কত জীবজন্তু দেখিলাম, সমস্ত পৃথিবীটা যেন পূর্ণচন্দ্র দ্বারা আলোকিত—চন্দ্র দেখিতে পাইলাম না কিন্তু কোথা হইতে আলোক আসিতেছে বুঝিতে পারিলাম না, শিকড় সহিত বৃক্ষলতা দেখিলাম, সন্তানেরা যেভাবে মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করে, সেইভাবে বৃক্ষসকল পৃথিবী হতে রস আকর্ষণ করিতেছে আর ঐ রস নৃত্য করা গতিতে ডালে পাতায় যাইতে দেখিলাম, একটি গর্ভিণী হরিণীর উদরে হরিণশিশু দেখিলাম, তার সকল অঙ্গই পূর্ণতা লাভ করেছে—মনে হইল যে দু'চার দিনের মধ্যেই মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবে—ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া বহুক্ষণ দেখিলাম—যতই দেখিতে লাগিলাম ততই প্রভুর মাতৃস্নেহের কৌশল দেখিয়া প্রভুর প্রেমে বিভোর হইলাম। ঐ হরিণশিশুটি মাতৃজঠরে আনন্দে খেলা করিতেছে, মা যেমন সন্তানকে স্তন পান করাইবার সময় স্নেহে হস্ত দ্বারা স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দেয় সেইভাবে গর্ভ-ভিতরের শিশুকে শিরাপ্রশিরা সঙ্কোচ বিকার দ্বারা পাম্প করার মতন, সর্ব শরীর হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শিশুকে দিতেছে।"[2]

এই সমস্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি তন্ময় হইয়াছিলেন। এমন

১। প্রাণী বলিতে এখানে শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবাণুসমূহ বুঝিতে হইবে

২। হরনাথ-স্মৃতি : চতুর্থ লহরী, পৃঃ ১৫

সময় মহাপুরুষ বলিলেন, "তোমার এখনও অনেক কাজ বাকী আছে, এই বাকী কাজের চিত্র তোমার মৃতদেহ দেখার সময় দেখিয়াছ, তোমার অন্যত্র যাওয়া হবে না, আমি তোমার দেহটির সংস্কার করিয়া দিতেছি, তোমাকে পুনরায় ঐ দেহে প্রবেশ করিতে হইবে।"

তিনি মেস্‌মেরিজম্‌ করার মতো তাঁহার দুই হস্ত হরনাথের মৃতদেহের উপর চালনা করিলেন, হস্তচালনামাত্র দেহটি ৬৪ খণ্ডে বিভক্ত হইল। শিবের স্কন্ধে গৌরীর (দক্ষকন্যা সতী) দেহকে বিষ্ণু ৫২ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু হরনাথের দেহটি কেন ৬৪ খণ্ডে বিভক্ত হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, উক্ত মহাপুরুষ অতঃপর হরনাথের দেহের প্রত্যেকটি বিভক্ত অংশ উঠাইতে লাগিলেন এবং ঝাড়িয়া মলিন অংশ বাদ দিয়া মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন—স্থাপন করিবামাত্র ঐ সমস্ত অংশ যুক্ত হইতে লাগিল শেষে তিনটি অংশ কম পড়িল, খুব সম্ভব নাভি, লিঙ্গ ও গুহ্যদেশ। অন্য পদার্থ দ্বারা তিনি অংশত্রয় পূরণ করিলেন। তাহার পর উক্ত সংস্কৃত দেহে হরনাথকে পুনঃপ্রবেশ করিবার নির্দেশ দান করিয়া মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্যকরতঃ পূর্বদিকে চলিয়া গেলেন। হরনাথ তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অদৃশ্য হইবামাত্র সমস্ত কিছুই ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল এবং হরনাথের চৈতন্যলোপ হইল। তিনি বুঝিলেন যে, এই চৈতন্য হওয়া ও লোপ হওয়া তাঁহার শক্তির বাহিরে—ইহা প্রভুর নিজের হাতে।

কিছুক্ষণ অচৈতন্য থাকার পর হঠাৎ তিনি চেতনা লাভ করিলেন। তখন তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, তিনি খাটিয়ায় শয়ন করিয়া আছেন ও টাঙ্গার লোকেরা অদূরে ঘুমাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে মারীপাহাড় হইতে ২টা বাজিতে শুনিলেন। এই সময় তাঁহার মূত্রত্যাগ হইল এবং তাহা খাটিয়ায় উপবিষ্ট ব্যক্তির দেহে লাগিল। তাঁহার নড়াচড়া দেখিয়া একজন টাঙ্গার লোকের ভয় হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল তিনি ভূত হইয়াছেন। সে ভয়ে তাহার সঙ্গীদের ডাকিল। সকলে তাঁহার নিকট আসে এবং তিনি ভাল হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে। তৃষ্ণায় হরনাথের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি চা তৈয়ারি করিতে

আদেশ দান করিলেন। চা পান করিয়া রাত্রির অবশিষ্ট অংশ ডোমেলেই কাটাইয়া, পরদিন প্রাতে তিনি শ্রীনগর যাত্রা করিলেন। তিনি যখন টাঙ্গায় উঠিতেছিলেন, তখন টাঙ্গাচালক তিনজন তাঁহার দিকে অবাক হইয়া দেখিতেছিল। প্রথমে তিনি কিছু বুঝিতে পারেন নাই। অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল, 'আপনার গায়ের রং সাহেবদের মতন হইল কেমন করিয়া ?' তখন হরনাথ তাঁহার হাতের বর্ণ দেখিলেন। দেখিলেন, "সত্যই ধপধপে সাদা রং। শ্রীনগরে পৌঁছিয়া কেবল আমি আমার রং দেখিতাম, ইচ্ছা হত সকলকে আমার গায়ের রং দেখাই। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে রং মলিন হতে লাগিল। তাই ছুটি লইয়া আমার রং দেখাইবার জন্য দেশের দিকে আসিলাম।"[১]

প্রথমেই তিনি অটলবিহারীর নিকট গমন করেন। অটলবিহারী প্রথমে হরনাথকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি অবাক হইয়া হরনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, হরনাথ তাঁহাকে ও তদীয় সহধর্মিণী সারীকে দেহান্তর-প্রাপ্তির ঘটনা বিবৃত করেন। সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিলে, হরনাথের মাতা ভগবতী দেবী অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে হরনাথের দেহান্ত ও নবকলেবর প্রাপ্তির ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, হরনাথকে চিনিতে তাঁহার অসুবিধা হইল না। তিনি নবকলেবরধারী হরনাথের পুনরায় উপনয়ন দিয়াছিলেন।

হরনাথের দেহ-বিভাজন ও সংস্কার

হরনাথের জীবনীকারমাত্রেই তাঁহার দেহান্ত ও নবকলেবর-প্রাপ্তির ঘটনার যথাসম্ভব বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণের প্রায় সমস্তগুলিই অসম্পূর্ণ ও পরস্পর-বিরোধী তথ্যে পরিপূর্ণ। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ঘটনাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যথা—হরনাথের স্থূলদেহ বিভাজন ও সংস্কার সম্বন্ধে হরনাথের জীবনীপ্রমুখ রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই নীরব। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা হরনাথের স্বমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। হরনাথ

১. হরনাথ-স্মৃতি : চতুর্থ লহরী, পৃঃ ১৯

দুইবার এই দেহত্যাগের ও পুনর্জীবনলাভের ঘটনা নিজ মুখে বিবৃত করিয়াছেন এবং ভাগবত মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ মিত্র—এই দুইজন বিদগ্ধ ভক্ত কর্তৃক হরনাথ-বর্ণিত বিবরণ অনুলিখিত হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, বর্ণিত বিবরণের অনুলিপি হরনাথ কর্তৃক সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। সুতরাং বিশ্বাস করা যতই অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, দেহান্ত ও নবকলেবর লাভের ঘটনার মতো দেহ-বিভাজনের ঘটনারও উল্লেখ করা এবং এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মতবাদ আলোচনা করাও সমীচীন মনে করি।

হরনাথ বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেহকে ৬৪ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মহাপুরুষ ইহার প্রত্যেকটি খণ্ডকে মালিন্যমুক্ত করিয়া পুনরায় সংযোজিত করিবার কালে লক্ষ্য করেন যে, তিনটি অংশ কম পড়িতেছে। এই তিনটি অংশের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সূক্ষ্ম-দেহী হরনাথ তাঁহাকে উক্ত প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। কারণ, সেই সময়ে তিনি স্থূলদেহে পুনঃপ্রবেশ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন। তিনি বলেন যে, উক্ত তিনটি প্রত্যঙ্গ না থাকিলেও তাঁহাকে চিনিয়া লইতে তাঁহার জননীর কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। কিন্তু মহাপুরুষ তাঁহার কথা না শুনিয়া অন্যান্য পদার্থ দ্বারা উক্ত অংশত্রয় নির্মাণকরতঃ হরনাথের স্থূলদেহে সংযুক্ত করিলেন। এইভাবে হরনাথের পূর্ণাবয়ব দেহ নির্মাণ করিয়া মহাপুরুষ তন্মধ্যে সূক্ষ্মদেহী হরনাথকে প্রবেশ করিবার নির্দেশ করিয়া পূর্বদিকে গমনকরতঃ অদৃশ্য হইলেন।

হরনাথ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তদীয় দেহের নবনির্মিত অংশগুলির প্রত্যেকটিই বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই সঙ্কেতবাণীকে দিগ্‌দর্শন করিয়া কোন বিশিষ্ট ভক্ত হরনাথের দেহের তিনটি অংশকে প্রাকৃত বলিয়া চিহ্নিত করেন। এগুলি হইল নাভি, লিঙ্গ ও গুহ্যদেশ। তাঁহার মতে, হরনাথের শরীরের অবশিষ্ট অংশ অপ্রাকৃত। এই মতের সমর্থনলাভের জন্য তিনি হরনাথকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, হরনাথ তাঁহাকে স্পষ্ট কোন উত্তর দেন নাই। সুতরাং নবজীবন লাভের পর হরনাথের শরীরটাকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আর একজন বিশিষ্ট ভক্তের একটি জিজ্ঞাসাও আমাদের এই ধারণার সমর্থন করে। হরনাথের দেহের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন: "How an Aprakrita body gets a Prakrita son and how an Aprakrita body leaves behind Prakrita ash and bone after cremation ?"[১]

দেহ-বিভাজন ও সংস্কার সম্বন্ধে হরনাথের জীবিতকালে রচিত গ্রন্থসমূহের লেখকগণ বিস্ময়করভাবে উদাসীন। এই বিষয়ে তাঁহাদের অখণ্ড নীরবতা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বিষয়টি সম্বন্ধে মোটেই অবহিত ছিলেন না। কিন্তু তাহা নয়। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বিষয়টি তাঁহাদের অগোচর ছিল না।[২] তৎসত্ত্বেও এই বিষয়ে তাঁহাদের নীরবতা দর্শনে মনে হয়, তাঁহারা ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেন নাই। দেহান্ত ও নবকলেবর লাভের ঘটনা হরনাথ কর্তৃক সর্বপ্রথম বিবৃত হয় অটলবিহারীর নিকট। হরনাথের নিকট হইতে শ্রুত ঘটনাটি অটলবিহারী কর্তৃক সম্পাদিত পাগল হরনাথ (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের 'পাগল হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী' শীর্ষক পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়, কিন্তু দেহ-বিভাজনের ঘটনাটি ইহাতে অনুপস্থিত।[৩] মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হরনাথ-জীবনের এই বিস্ময়কর ঘটনাটিতেও দেহ-বিভাজনের অংশটি অনুল্লিখিত।[৪] নারায়ণচন্দ্র ঘোষের গ্রন্থে ঘটনাটির বর্ণনা থাকিলেও দেহ-বিভাজনের উল্লেখ নাই।[৫]

১। ভাগবতচন্দ্র মিত্র—দ্রঃ হরনাথ সোভেনীর, পৃঃ ৪৪

২। "In this connection many devotees and admirers of the Lord, such as Atal Behary Nandy, Sisir Kumar Ghosh, Kaviraj Satya Charan Sen, Bhagabat Mitra and many others enquired about the incident. Some have learnt that His body was divided into several parts and that His body was purified by the Mahapurusha."—Haranath Souvenir : P. 3.

৩। পাগল হরনাথ: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ছ

৪। Hindu Spiritual Magazine: December, 1907: Pages 150—156. দেহান্ত হওয়ার ব্যাপারটাকে মহাত্মা শিশিরকুমার 'fit of trance' বলিয়াছেন।

৫। Sri Haranath Lilamritam: The Mission of Haranath: Page 228.

কবিরাজ সত্যচরণ সেন মহাশয়ও এই বিষয়ে ব্যতিক্রম নহেন। তাঁহার মতে, মহাপুরুষের নির্দেশমত বাহিরে আসিবার পর কিরূপ-ভাবে কি হইল, কেহই জানিতে পারিল না। রাত্রি ৩টার সময় হরনাথ সজীব হইয়া উঠিলেন।[১] এম. শ্রীরামমূর্তি নামক আর একজন বিদগ্ধ লেখকের গ্রন্থেও বিষয়টি অনুলিখিত। তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী মহাপুরুষ হরনাথকে দেহ হইতে বাহির হইবার নির্দেশ দান করিবার পর—"Nothing more could be heard, and silence reigned again. At the end of a quarter of an hour the body of Haranath grew luminous and gradually the luminosity faded and dark brown complexion of Haranath became fair and so it remained throughout the rest of his life. Then Haranath once again became alive."[২]

দেহ-বিভাজনের কাহিনী সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে ভিজিয়ানা গ্রামের Sri Kusum-Haranath : the Supreme নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে।[৩] যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় হরনাথ-অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণমানসে উক্ত পত্রে এই বিষয়ক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার বহু পূর্বে তিনি স্বয়ং হরনাথের মুখে এই ঘটনার বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুলিপি হরনাথকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইয়াছিলেন।[৪] হরনাথ কর্তৃক বর্ণিত বিবরণের আর একটি অনুলিপি ভাগবত মিত্র মহাশয়

১। হরনাথ চরিতামৃত : পৃঃ ১২২

২। The Life and Message of Bhagawan Sri Kusum-Haranath by M. Sri Rammurti, Page 53

৩। ১৯৩৮ সালের মার্চ সংখ্যা

৪। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসের ২০শে তারিখের লিখিত পত্রে লেখক স্বয়ং হরনাথ-বর্ণিত তাঁহার দেহান্ত ও নবকলেবর লাভের বিবরণের অনুলিপি স্বহস্তে সংশোধন করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানান। তাহা ছাড়া, এই পত্রটিতে কয়েকটি প্রশ্নও ছিল। হরনাথ যতীন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত বিবরণটি পুরাপুরি অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন ও তাঁহার প্রশ্নের উত্তরও স্বহস্তে লিখিয়াছেন। পত্রটির অবিকল নকল উক্ত লেখকের হরনাথ-জীবনীর পাণ্ডু-লিপিতে দেওয়া আছে। দ্রঃ শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পাণ্ডুলিপি : পৃঃ ৩৯

করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা হরনাথ কর্তৃক সংশোধিত হয় নাই এবং এই বর্ণনাটিও প্রকাশিত হয় তাঁহার তিরোধানের পরে। ঘটনার স্থানের নাম ছাড়া হরনাথের স্বাক্ষরিত বিবরণটির সহিত ইহার মধ্যে অপর কোন পার্থক্য দেখা যায় না এবং ইহাতে হরনাথের দেহ-বিভাজনের বিবরণ আছে। এই বর্ণনা অনুসারে ঘটনার স্থান ডোমেল। দেহান্ত হইবার পূর্বে হরনাথের দুই-তিনবার ভেদবমি হওয়ার কথাও এই বিবরণে নাই। কিন্তু জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আদেশক্রমে সূক্ষ্মদেহে বাহির হইয়া আসিবার পর উক্ত মহাপুরুষকে তাঁহার দেহ ৬৪ খণ্ডে বিভক্ত করিতে, বিভক্ত অংশের প্রত্যেকটিকে মালিন্যমুক্ত করিয়া সংযোজিত করিতে এবং অন্যান্য বস্তু দ্বারা হারাইয়া-যাওয়া দেহাংশের অভাব পূরণ করিতে সূক্ষ্মদেহী হরনাথ দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

হরনাথের এই দেহান্ত ও নবকলেবর লাভের বিজ্ঞান-সম্মত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে স্বয়ং হরনাথই অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার মতে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁহাকে এই অলৌকিক ঘটনার নায়ক করিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তিনি জানিতেন না।

দেহে পরিপূর্ণ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত সাধারণ ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায়, তাহার দেহে পরিপূর্ণ মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং তাহাকে মৃত স্থির করিয়াই তাহার দেহ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য আনীত হইবার কিছুক্ষণ পরেই তাহার হৃৎপিণ্ড পুনরায় সচল হইয়া উঠে এবং সে জীবিত হয়।[১] যদিও ইহা গল্পমাত্র, তবুও বাস্তব জীবনেও যে এরূপ ঘটনার অপ্রতুলতা নাই, জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার 'অব্যক্ত জীবন' প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন। মৃত বলিয়া ঘোষণা করিবার পর সমাধিস্থ করিবার জন্য কবরভূমিতে আনীত হইবার পর স্পেন দেশীয়

১। জীবিত ও মৃত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালিকাটি কফিনের বাক্সের ডালা খুলিয়া বাহিরে আসিয়াছে, তাহাও মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনলাভের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[১]

ভারতীয় সাধকবৃন্দের জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করিলেও, দেহ পরিপূর্ণ মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। সমাধিস্থ অবস্থায় সে দেহে প্রাণলক্ষণ থাকে না। সাধক হরিদাসের পরীক্ষাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। যতদূর জানা যায়, সমাধিস্থ অবস্থায় রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধকের দেহে জীবনের স্পন্দন দেখা যাইত না। যোগিগণ সাধনাবলেও দেহে মৃত্যুলক্ষণ পরিস্ফুট করিতে পারিতেন। যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী তাঁহার একজন চিকিৎসক-শিষ্যের সম্মুখে দেহে পরিপূর্ণ মৃত্যুলক্ষণ পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। পরে দেহে আবার জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর শিষ্যের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন, "স্থূল জগতের বাহিরে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম লোকের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যই আমাদের জানবার রয়েছে। তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞান তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে যেখানে যেতে পারে না ভারতীয় সাধকদের যোগশক্তি কিন্তু অবলীলায় সেখানেই পৌঁছুতে পারে।"[২]

হরনাথের জীবনের এই আশ্চর্য ঘটনাটি সম্বন্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য হইতে পারে। মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত হইবার পরে হরনাথের দেহে জীবনলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার মতো বর্ণ-পরিবর্তনের ঘটনাটিকেও অলৌকিক ঘটনা বলা যাইতে পারে। এই ঘটনাটিরও বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তবে ভারতীয় সাধকদের জীবনে সে পরিবর্তনের ঘটনাও দুর্লভ নয়। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ প্রমুখ পণ্ডিতের মতে, কোন অবতারের আবেশ হইলে দেহে সেই অবতারের বিশেষ লক্ষণসমুহ প্রকাশিত হয়। বর্ণ-পরিবর্তনের ঘটনাকে হরনাথের ভক্তবৃন্দ তাঁহার দেহে গৌরাঙ্গদেবের আবেশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হরনাথের উক্তিই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয়।

১। অব্যক্ত জীবন—জগদানন্দ রায়
২। ভারতের সাধক : প্রথম খণ্ড : শঙ্করনাথ রায়

হরনাথের মতে, তাঁহার সংস্কৃত স্থূলদেহে তাঁহারই সূক্ষ্মশরীর প্রবিষ্ট হইয়াছিল।[১]

ভারতীয় সাধকবৃন্দের দেহ-পরিবর্তনের ঘটনার উল্লেখ কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার 'কায়কল্পতরু' গ্রন্থে দেহ-পরিবর্তনের ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। সাধক-প্রবর রামঠাকুর হিমালয়ের একজন মহাযোগীর কায়া-পরিবর্তন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া একটি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।[২]

এই সমস্ত ঘটনাগুলির সত্যতা যাচাই করিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি ইহাদের মধ্যে কোন সত্য থাকে, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যোগবিভূতির শক্তি অসামান্য এবং যোগবিভূতির অধিকারী সাধকের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। সাধারণ জীবনে যাহা অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, যোগশক্তির নিকট তাহা অতি সহজ ও সাধারণ ঘটনা।

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৯
২। ভারতের সাধক : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ২২৮—২৩০

গৃহী হরনাথ

নবকলেবর লাভ করিবার কিছুদিন পরে হরনাথ ছুটি লইয়া সোনামুখীতে আসিলেন। তাঁহার দেহান্ত ও নবকলেবর-প্রাপ্তির ঘটনা ভগবতী দেবী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া, গাত্রবর্ণের পরিবর্তন সত্ত্বেও পুত্রকে চিনিতে তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা হইল না। সুতরাং নবকলেবরধারী হরনাথকে দেখিয়া জননী নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নবকলেবর-প্রাপ্তিহেতু হরনাথের দ্বিতীয়বার উপনয়ন দানের আয়োজন করিলেন। যথাকালে নব উপবীত ধারণ করিয়া হরনাথ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমোদ-আহ্লাদে ছুটির দিনগুলি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। হরনাথের গাত্রবর্ণের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া সকলে মনে মনে বিস্ময়বোধ করিলেও, কেহ কোনরূপ কিছু সন্দেহ করিলেন না। কারণ, গাত্রবর্ণ ছাড়া হরনাথের আকার, প্রকার, বাক্য ও আচরণ পূর্বের মতোই ছিল। সুতরাং শীতপ্রধান দেশে বাস করার জন্য হরনাথের কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে, সাধারণ্যে প্রচলিত এই ধারণাই সকলে পোষণ করিতে লাগিলেন। কুসুমকুমারীর মনেও কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল না। কারণ, তিনি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, গাত্রবর্ণের বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখাইবার জন্যই সেবারে হরনাথ আসিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সানন্দে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং প্রাণ ঢালিয়া স্বামীর সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভগবতী দেবীর প্রচেষ্টায় হরনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতীর বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়াছিল। পাত্র সোনামুখীরই সিদ্ধান্তপাড়া-নিবাসী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৩০৩ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়া হরনাথ শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীনগরে আসিয়া হরনাথ পূর্বের মতো ধর্মার্থ অফিসের কাজের অবসরে নির্জন অরণ্যে গমন করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন সদাসর্বদাই উদাসীন হইয়া যাইত। অফিসের কাজের সময়ও তিনি সময়ে সময়ে এরূপভাবে আত্মমগ্ন হইয়া পড়িতেন

যে, তাঁহাকে তখন সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রস্তরপুত্তলি বলিয়া মনে হইত।

১৮৯৭ সালে শ্রীনগরে অবস্থানকালে একদিন হরনাথ ফতে-কাদালের নিকটবর্তী পরম রমণীয় আরণ্য ভূমির মনোহর নির্জন পরিবেশে নিশ্চিন্তমনে ভগবচ্চিন্তা করিবার জন্য গমন করেন। একমনে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে তিনি এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন যে, দিবা অবসান হইলেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। সহসা কতকগুলি পক্ষী ও বানরের আর্ত চীৎকারে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। চারুচক্ষু উন্মীলন করিয়া তিনি দেখিলেন যে, কতিপয় ব্যক্তি সতর্ক-ভাবে নিকটবর্তী একটি পর্বতশিখরে আরোহণ করিতেছে। উহাদের দেখিয়া পক্ষী ও বানরকুল আর্ত চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। বানর ও পক্ষীকুলের আকুলতা দর্শনে হরনাথ বুঝিলেন যে, শীতকালের জন্য উহারা যে সমস্ত খাদ্য পর্বত-কন্দরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, পর্বতারোহিগণ তাহা অপহরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

শীতকালে সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশ তুষারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেই সময় জীবনধারণোপযোগী কোনরূপ খাদ্য সংগ্রহ করা পক্ষী ও বানরগণের পক্ষে সম্ভব হয় না। জীবনধারণের স্বাভাবিক তাগিদে তাই তাহারা গ্রীষ্মকালে শীতের খাদ্য সঞ্চয় করিয়া, পর্বত-কন্দরে বা বৃক্ষ-কোটরে লুক্কায়িত রাখে। এই সমস্ত খাদ্য অপহৃত হইলে, শীতকালে খাদ্যাভাবহেতু তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য। এইজন্য রাজ-সরকারে বানর বা পক্ষীকুলের সঞ্চিত খাদ্য অপহরণকারীদিগকে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে। বানর ও পক্ষীকুলের আর্ত চীৎকারে হরনাথের দয়ার্দ্র হৃদয় বিগলিত হইল। দুর্বৃত্তদের নিবারণ উদ্দেশ্যে তিনি পর্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। হরনাথ নিকটবর্তী হইলে, দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে রাজকর্মচারী বলিয়া চিনিতে পারে এবং দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে পর্বতের পাদদেশস্থ নদীর অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করে। অতঃপর তাহারা প্রস্তুত হইয়া হরনাথের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে এবং নিকটে

আসিবামাত্র তাহারা হরনাথকে একযোগে আক্রমণ করে। যদি সেই দুর্বৃত্তত্রয়ের সহিত হরনাথকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে পার্বত্য নদীর অতল গহ্বরে জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়া ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ভগবানের লীলা বিচিত্র! হরনাথের অঙ্গ স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তড়িতাহতের মতো হইয়া এক ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইয়া সশব্দে পার্বত্য তটিনীর অতল গহ্বরের দিকে দ্রুত গড়াইয়া যাইতে থাকে এবং অপর ব্যক্তি ভগ্নপদ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিয়া উঠে। সঙ্গীদ্বয়ের এইরূপ আকস্মিক পরিণতি দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ভীত হইয়া স্থান ত্যাগ করে। আহত ব্যক্তি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কাতরোক্তি করিতে থাকিলে, হরনাথের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যাকালে ঐ ব্যক্তিকে লইয়া পর্বত হইতে অবরোহণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, তাঁহার স্থান-ত্যাগের অব্যবহিত পরেই পলায়মান সঙ্গী ফিরিয়া আহত ব্যক্তিকে তাহার গৃহে লইয়া যাইবে এবং অপর ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ অন্তরে হরনাথ বাসায় ফিরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।[১]

এই সমস্ত কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি স্ত্রীর কাছে ইহা ব্যক্ত করায়, তাঁহার স্ত্রী হরনাথ সম্বন্ধে অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং ভগবতী দেবীকে একটি পত্রে সমস্ত জানাইয়া, কুসুমকুমারীকে অবিলম্বে শ্রীনগরে পাঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, একমাত্র কুসুমকুমারীই হরনাথকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ। কুসুমকুমারী না থাকিলে, হরনাথের সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পত্র পাইয়া ভগবতী দেবী অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং শিবনারায়ণের সহিত পরামর্শ করিলেন। সংসার বিষয়ে হরনাথের ঔদাসীন্য শিবনারায়ণ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং মহেশবাবুর স্ত্রীর পত্রের বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহারও দুশ্চিন্তার

১। হরনাথ সৌভেনীর, পৃঃ ৪৬

অবধি রহিল না। মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া অবশেষে কুসুমকুমারীকে হরনাথের নিকট প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে কুসুমকুমারীকে হরনাথের নিকট পাঠাইবার আয়োজন করা হইতে লাগিল। এই সময়ে হরনাথের অফিস জম্মুতে আসিয়াছিল। সুতরাং বিশ্বস্ত একজন লোকের সহিত কুসুমকুমারীকে জম্মুতে পাঠানো হইল। ইহাই কুসুমকুমারীর প্রথম কাশ্মীর যাত্রা।[1] তাঁহার সহিত অনুকূল, সুবাসিনী ও রাইমতী গমন করিয়াছিল।

কুসুমকুমারীর জম্মু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হরনাথকে বাসার ব্যবস্থা করিতে হইল। এতদিন পর্যন্ত তিনি একক জীবন যাপন করিতেন। কুসুমকুমারী আসিবার পর নূতন ঘরে তাঁহাকে বাসা বদল করিতে হইল। নূতন বাসার সর্বময়ী কর্ত্রী কুসুমকুমারী এইবার পরিপূর্ণরূপে স্বামীসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি পরিপূর্ণরূপে স্বামীর সাহচর্য লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। জম্মুতে আগমনের পর হইতে স্বামীসেবার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

এপ্রিল মাসে জম্মুর অফিস শ্রীনগরে উঠিয়া গেলে, কুসুমকুমারীও হরনাথের সহিত শ্রীনগরে গমন করেন। শ্রীনগরের হাবাকাদাল সেতুর এলাকায় একটি ভাড়াটে ঘরে হরনাথের বাসা ছিল। এই বাসায় এতদিন পর্যন্ত ইলেকট্রিক বিভাগের নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত হরনাথ বাস করিতেন। কুসুমকুমারী আগমন করিলে, নলিনাক্ষবাবু বাসার বেশীর ভাগ অংশ তাঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। নলিনাক্ষবাবুর এই সৌজন্যে কুসুমকুমারী মুগ্ধ হইলেন। অনুকূল, সুবাসিনী ও রাইমতীসহ তিনি হাবাকাদালের বাসায়

১। ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে হরনাথ বাড়ী আসেন এবং ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে জম্মুতে ফিরিয়া যান। তাঁহার শ্রীনগর গমনের অব্যবহিত পরেই মহেশবাবুর স্ত্রীর পত্র আসে। পত্র পাইয়া উদ্যোগ আয়োজন করিতে জানুয়ারি মাস অতিবাহিত হয়। সুতরাং যতদূর মনে হয়, ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে কুসুমকুমারীকে জম্মু পাঠানো হয়। সোনামুখী হইতে জম্মু যাইতে ১৪।১৫ দিন লাগিত। সুতরাং ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই কুসুমকুমারী জম্মু পৌছান।

নূতন সংসার পাতিয়া বসিলেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বাসায় স্বল্প-পরিসরে পুত্রকন্যাদের সহিত বসবাস করিবার অসুবিধা দেখিয়া, হরনাথ নূতন একটি বাসার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এইভাবে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য ভগবতী দেবীর চেষ্টা কিয়দংশে সফল হইল, কাশ্মীরে কুসুমকুমারীর আগমনের পর হইতে। এখন হইতে হরনাথ আর যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে পারিতেন না। বিদেশে একাকিনী কুসুমকুমারী বাসায় তাঁহার বিলম্বিত প্রত্যাগমনে দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিবেন ভাবিয়া, হরনাথের বাসায় আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় নিয়মিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নূতন সংসারের দায়িত্ব পালন করিতেও কিছু সময় কাটিয়া যাইত। ফলে, ইতিপূর্বে শ্রীনগরে নিকটবর্তী বিজন অরণ্যের যে সমস্ত স্থানে গমন করিয়া তিনি নিশ্চিন্তে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইতেন, সেই সমস্ত স্থানে তাঁহার যাতায়াত কমিতে লাগিল। অর্থাৎ, সংসারের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন—হরনাথের বাহ্যিক লক্ষণে এই ভাব অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। মহেশবাবুর স্ত্রীর পত্রে এই বিষয় অবগত হইয়া ভগবতী দেবী অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রবধূর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। এইভাবে হরনাথ পরিপূর্ণ গৃহস্থের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অফিস এবং গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন কর্তব্যসমূহ নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিয়া হরনাথ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইতেন। কিন্তু তাহা লোকচক্ষুর অগোচরেই রহিল। প্রতিবেশী সকলেই তাঁহাকে একজন ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ বলিয়া মনে করিতেন। কুসুমকুমারীর শ্রীনগরে আগমনের পর হইতে আহারাদি সম্বন্ধে সমস্ত অসুবিধা দূর হইল এবং গৃহিণীর তত্ত্বাবধানে বেশ-বিন্যাসেও উদাসীন ভাব দূরীভূত হইল। সুতরাং তাঁহাকে সাধু অপেক্ষা বাবু প্রকৃতির একজন সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া মনে করাই অধিকতর সঙ্গতবোধ হইত।

এই বাহ্যিক ছদ্মাবরণের পশ্চাতে হরনাথের ঈশ্বরচিন্তা ও ভগবৎ-প্রেমাস্বাদ অব্যাহতগতিতে চলিতে লাগিল। সুযোগ পাইলেই তিনি

পূর্বের মতো নির্জন অরণ্য প্রদেশে গিয়া একাকী ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইতেন। এইভাবে নিয়ত ঈশ্বরচিন্তার ফলে হরনাথের ভালবাসা ও প্রেম অপার্থিব আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার সর্ব অঙ্গ এমনভাবে লাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িত, তাঁহার চোখের দৃষ্টিতেও অপার্থিব প্রেমের পুলক বিচ্ছুরিত হইত। এই অপার্থিব প্রেমের উৎসরণ শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা —সকলের প্রতিই সমানভাবে উৎসারিত হইত। আবার যাহারা পাপী, তাপী, দুর্বৃত্ত—যাহারা তাঁহার প্রাণনাশ পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এই অপার্থিব প্রেমের ধারা তাহাদের প্রতিও সমানভাবে উৎসারিত হইত।

হরনাথের নিভৃত চারণা কুসুমকুমারীর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তিনি সব জানিয়াও না-জানার ভাণ করিতেন। স্বামীর ঈশ্বরচিন্তায় কোনরূপ বাধা দিবার চিন্তা তিনি স্বপ্নেও করিতেন না। উপরন্তু, স্বামীর ঈশ্বর-প্রেমাস্বাদনের যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, তাহার জন্য তিনি সদাসর্বদাই চেষ্টা করিতেন। হৃদয়ের নিভৃত গোপনে এইরূপ ইচ্ছা ছিল বলিয়াই, কুসুমকুমারীর প্রতি হরনাথ অতিশয় সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেন। তাই দেখা যায়, তাঁহাদের জীবনে দাম্পত্য কলহ বা মত-বিরোধের স্থান নাই। যে অপরিসীম শক্তি কুসুমকুমারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল, তাহা অভিব্যক্ত হইত কুসুমকুমারীর অসীম সহ্যশক্তির মাধ্যমে। হরনাথের সংসার-বৈরাগ্য ও ভগবৎ-প্রেমোন্মাদনা যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখনও তিনি কোনদিন স্বামীকে নিষেধ করেন নাই। মহেশবাবুর স্ত্রীর পত্র পাইয়া যখন ভগবতী দেবী পুত্রের মন সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কুসুমকুমারীকে কাশ্মীরে প্রেরণ করিলেন, তখনও কুসুমকুমারী কোনদিন হরনাথকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আকারে-ইঙ্গিতেও কোন চেষ্টা করেন নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, হরনাথের লক্ষ্য যে পরম প্রেমিকের সাহচর্য লাভ, তাঁহারও লক্ষ্য সেই এক এবং অভিন্ন। পার্থক্য শুধু এই যে, হরনাথ পাগল পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের

জন্য এবং তিনি পাগলিনী কৃষ্ণপাগল হরনাথের জন্য। কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়া হরনাথ পরিতৃপ্ত হইলে, তাঁহার সুখের তাই সীমা থাকিত না এবং সেইজন্যই হরনাথের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততা তাঁহাকেও হরনাথ-প্রেমে উন্মাদিনী করিয়াছিল এবং পরিশেষে হরনাথের মধ্য দিয়াই সেই পরমস্বামীর প্রেম আস্বাদন করিয়া, তিনি কৃষ্ণ ও হরনাথের একাত্মতা অনুভব করিলেন এবং সেই পরম অনুভূতির শুভ মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করিলেন হরনাথ ও তিনি উভয়েই অভিন্ন একই সত্ত্বার দুইটি অভিব্যক্তি। একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি। বাহ্য দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু অনুভূতির গভীরে দুইয়ে মিলিয়া এক এবং অভিন্ন। একজন সংখ্যা, অপরজন শূন্য। সংখ্যা ব্যতীত শূন্য মূল্যহীন, আবার শূন্য ব্যতীত সংখ্যা সংখ্যামাত্র। যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে সংখ্যার মূল্য যেমন দশগুণ বৃদ্ধি পায়, যথাযথ উপলব্ধি হইলে তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি পরমপুরুষ বা পরমাপ্রকৃতির বোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়। হরনাথ ও কুসুমকুমারী পরস্পরকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি।

এই উপলব্ধির উপায় যাহা, তাহাই হরনাথ-লীলার মূলতত্ত্ব। সুগভীর প্রেম ব্যতীত যথার্থ উপলব্ধি হয় না। যে প্রেম আপনাকে ভুলাইয়া দিয়া অপরের জন্য পাগল করে, সেই প্রেমই হরনাথ-তত্ত্বে মহাযোগিনীর তপস্যা। এই প্রেমের বোধ যাহার অন্তরে জাগ্রত হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে রবিকরস্পর্শে জাগ্রত নির্ঝরিণীর মতো অসীমের সন্ধানে উত্তত হয়—বংশীধ্বনি শ্রবণে উন্মাদিনী রাধার মতো কৃষ্ণাভিসারে বহির্গত হয়। এই প্রেমের আলোক আপন অন্তরকে যেমন আলোকিত করে, অপরের অন্তরকেও তেমনি আলোকিত করে। তাই প্রেমের আলোকে আপনাকে তথা অপরকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ইহা আপনাকে মাতাইয়া অপরকে মাতায়। সুতরাং সঞ্চারিত প্রেমের আলোকে অপরেও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সুযোগ পায়। হরনাথ ও কুসুমকুমারীর হৃদয়ের নিভৃতে পরস্পরের প্রতি এই অপার্থিব প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহমানা ছিল। তাই তাঁহারা পরস্পরকে যথাযথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই, বাহ্যিক

আচার-ব্যবহারে যাহাই হউক না কেন, অন্তরে তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহারা এক এবং অভিন্ন, শাশ্বত প্রেমিক ও শাশ্বত প্রেমিকা। এই পরম ভাবে উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা চিরকিশোর ও চিরকিশোরী। সেইজন্যই অনুরাগীর দৃষ্টিতে তাঁহারা কৃষ্ণ-রাধা। অথচ বাহ্যিক আচারে তাঁহারা পরিপূর্ণ গৃহস্থ। তাঁহাদিগকে দেখিলে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই মনে হইত। কুসুমকুমারীর চওড়াপাড় শাড়ি এবং দুই-তিন সেট চুড়ি দেখিয়া দর্শনপ্রার্থিগণ নিরাশচিত্ত হইতেন। গৃহকর্ত্রী হিসাবে কুসুমকুমারী অতিশয় নিপুণা ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে সমস্ত কিছুই এমন শ্রী ও শৃঙ্খলামণ্ডিত হইয়া উঠিত যে, সকলেই তাঁহাকে স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরানী মনে করিত। তাঁহার সুষ্ঠু পরিচালনাগুণে সংসারে এমন একটি শ্রী, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি ভাব আসিল, হরনাথের উপার্জিত অর্থে যাহা সম্ভব হইত না। সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় তিনি স্বয়ং তদারক করিতেন। পরবর্তী কালে যখন হরনাথ-ভক্ত ও অনুরাগীদের সংখ্যা অগণিত হইয়া উঠে, তখনও তিনি তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। এমনকি কে কোন্ জিনিসটি খাইতে ভালবাসে, তাহাও তাঁহার নখদর্পণে ছিল এবং সেইজন্য হরনাথের নিকট আগত প্রত্যেকটি নরনারী তাঁহার মধ্যে অপরিসীম স্নেহ-শালিনী এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি দর্শনে অভিভূত হইতেন।

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীনগরে ফিরিয়া হরনাথ ফতে-কাদাল সেতুর এলাকায় একটি ভালো বাড়ীর সন্ধান পাইলেন। বাড়ীখানি দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইবামাত্র তিনি উহা ভাড়া করিলেন এবং ১৮৯৯ সালে উক্ত বাসায় বসবাস করিতে লাগিলেন। কুসুমকুমারী নবীন উৎসাহে নূতন বাসা সাজাইতে লাগিয়া গেলেন এবং তাঁহার শ্রীহস্তস্পর্শে ফতেকাদালের বাসাটি অবিলম্বে শ্রী ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের যে স্থানেই হউক, রাজকর্মচারীদের এবং তাঁহাদের পরিবার-বর্গের একাদিক্রমে সারা বৎসর বাস করা চলিত না। পর্যায়ক্রমে ছয় মাস অন্তর জম্মু ও শ্রীনগরে বাসা বদল করিতে হইত। সেইজন্য

জম্মু শহরেও হরনাথের একটি বাসা নির্দিষ্ট ছিল এবং প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যখন শ্রীনগর হইতে জম্মু যাইতেন, তখন কুসুমকুমারীও কন্যাপুত্রগণসমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত জম্মু যাত্রা করিতেন। এই বৎসর জম্মুতে আসিবার এক মাসকাল পরে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ১৮৯৯ সালের ২০শে অক্টোবর যথাকালে নবজাত পুত্রটির নাম রাখা হইল কৃষ্ণদাস।

এই সময়ে হরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূলের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সুতরাং অনুকূল ও ভ্রাতুষ্পুত্র গোকুলকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা দুইজনে পাঞ্জাবের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। এপ্রিল মাসে শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিবার পর কুসুমকুমারী শ্রীনগরের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শালিমার বাগ দর্শন করিয়া তিনি ইহার রমণীয় সৌন্দর্যে এরূপ মোহিত হন যে, কিছুকাল পরে আর একবার এই পরম রমণীয় উদ্যানে আগমন করেন।

১৯০২ সালের আগস্ট মাসে ছুটি লইয়া হরনাথ সস্ত্রীক দেশের দিকে যাত্রা করেন। একটানা রেলযোগে পানাগড় স্টেশনে আসিতে ছেলেমেয়েদের এবং কুসুমকুমারীর কষ্ট হইবে ভাবিয়া, হরনাথ প্রথমে হাতরাসে আসিয়া অটলবিহারীর বাসায় ৪।৫ দিন থাকেন। ইতিপূর্বে কোনবারেই হরনাথ এত দীর্ঘকাল ধরিয়া অটলবিহারীর বাসায় অবস্থান করেন নাই। এবারের চারি-পাঁচদিন কালব্যাপী অবস্থানের ফলে অটল ও সারীর সহিত হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। হরনাথের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমতী সেই সময় হইতেই অটলের স্ত্রী সারীর একান্ত অনুরক্তা হইয়া উঠে। রাইমতীকে দেখিয়া সারীর অন্তরের মাতৃস্নেহও শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাই হরনাথ ও কুসুমকুমারী যখন চারি-পাঁচদিন পরে হাতরাস হইতে পানাগড়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, তখন সারী রাইমতীকে হাতরাসে তাঁহার কাছে রাখিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। রাইমতীও সারীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। কিন্তু সপ্তমবর্ষবয়স্কা কন্যাকে একাকী রাখিয়া যাইতে কুসুমকুমারীর

মন সরিল না। তাই স্থির হইল, যখন তাঁহারা দেশ হইতে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিবেন, তখন হইতে রাইমতী তাঁহাদের নিকট থাকিবে। কুসুমকুমারী এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে পুনরায় কাশ্মীরে আসিবার সময় তিনি রাইমতীকে সারীর নিকট রাখিয়া যান। এই সময় হইতে বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত (সম্ভবতঃ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত) রাইমতী সারীর নিকটেই ছিল। হরনাথ অটলবাবুর স্ত্রীকে সারী বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া, রাইমতী তাঁহাকে সারী-মা বলিয়া ডাকিত।

দেশে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী ভয়ানকরূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই অসুস্থতা ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করে এবং ১৩০৯ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকে ইন্দুমতীর অকালমৃত্যুতে ভগবতী দেবী শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে হরনাথ ও কুসুমকুমারী কন্যার বিয়োগব্যথাজনিত শোক অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া, ভগবতী দেবীকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। ছুটির মেয়াদ শেষ হইলে মাতার তত্ত্বাবধানের জন্য স্ত্রীকে দেশে রাখিয়া হরনাথ একাকী কাশ্মীরে ফিরিয়া গেলেন। শোকাহতা হইলেও কুসুমকুমারী কায়মনোবাক্যে ভগবতী দেবীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন, কিন্তু ভগবতী দেবীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল। তৎসত্ত্বেও শিবনারায়ণ, গোলাপসুন্দরী বা কুসুম-কুমারী কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, আকস্মিকভাবে তাঁহার দেহান্ত ঘটিবে। বিশেষতঃ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে তাঁহার শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় সকলেই আশা করিয়াছিলেন, এবারের মতো তিনি সারিয়া উঠিলেন। তাঁহারা কেহই ভাবিতেও পারেন নাই যে, নিভিবার আগে প্রদীপ সহসা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ভগবতী দেবীর ক্ষেত্রেও তাহাই হইল এবং ১৯০৩ সালের ৫ই মার্চ সজ্ঞানে তাঁহার মহাপ্রয়াণ হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর।

ভগবতী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শিবনারায়ণ বা কুসুমকুমারী

কেহই হরনাথকে পূর্বাহ্ণে কোনরূপ সংবাদ দিতে পারেন নাই। তাঁহার দেহান্ত ঘটিবার পর শিবনারায়ণ হরনাথকে টেলিগ্রাম করিলেন। হরনাথ তখন জম্মুতে অবস্থান করিতেছিলেন। টেলিগ্রাম পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটি লইয়া তিনি সোনামুখীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন বলিয়া হরনাথ ভগবতী দেবীর অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং মাতার প্রতি হরনাথের ছিল অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা। জননীশূন্য গৃহে আসিয়া হরনাথ শিশুর মতো ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জননীর জন্য তাঁহার কাতর ক্রন্দনে সকলের অন্তর বিগলিত হইল। অবশেষে শিবনারায়ণের তাড়নায় হরনাথ অশৌচকালের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিলেন। যথাকালে সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য হরনাথ ও শিবনারায়ণ এমন অকৃপণ আয়োজন করিলেন যে, চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিবার কিছুকাল পরে হরনাথ কুসুমকুমারীসমভিব্যাহারে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন এবং হাতরাস হইয়া শ্রীনগরে গমন করিলেন। এই সময় হইতে রাইমতী সারীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। কুসুমকুমারী মধ্যে মধ্যে রাইমতীকে নিজের কাছে আনাইতেন। অমরনাথ যাত্রার সময় রাইমতী কুসুমকুমারীর কাছে ছিল বলিয়া জানা যায়।*

১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় সস্ত্রীক অমরনাথ গুহা পরিদর্শন করিতে যাইবার সঙ্কল্প করেন এবং সস্ত্রীক হরনাথকে তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। হরনাথ সানন্দে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন এবং কুসুমকুমারীকে অমরনাথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। স্বামীর নির্দেশ পাইয়া তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে পুত্রকন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য কুসুমকুমারী চেষ্টা করিতে থাকেন,

* দ্রঃ হরনাথ সৌভেনীর: ভাগবতচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৪৭

কিন্তু কোন ব্যবস্থাই তাঁহার মনঃপূত হয় না। অবশেষে নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার চাপরাশী কালিদাস উপযাচক হইয়া অনুকূল, কৃষ্ণদাস ও রাইমতীকে তাঁহাদের নিকট রাখিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, কুসুমকুমারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অমরনাথ যাত্রার আয়োজন করিলেন। হরনাথ পূর্বে একবার অমরনাথ গিয়াছিলেন। সুতরাং এবার তিনিই তাঁহার দলের পথপ্রদর্শক হইলেন। বহুকষ্টে দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া হরনাথ কুসুমকুমারীর সহিত আর একবার অমরনাথ দর্শন করিলেন। হরনাথের ক্রটিহীন পথ-প্রদর্শনের ফলে অমরনাথ যাত্রীদলটি নিরাপদে শ্রীনগরে ফিরিয়া আসেন। অমরনাথ হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুকাল পরে রাইমতী সারীর নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য জিদ ধরায়, শ্রীনগরে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য হরনাথ অটলবিহারীকে লিখেন। তদনুসারে অটলবিহারী রাইমতীকে লইতে আসেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত হরনাথের পত্রাবলী মুদ্রিত করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া এই বিষয়ে হরনাথের অনুমতি চাহেন। হরনাথ প্রথমে অটলবিহারীর প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেন, কিন্তু অটলবিহারীর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না দেখিয়া, হরনাথ অবশেষে অটলবিহারীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

হরনাথের সম্মতি পাইয়া অটলবিহারীর উৎসাহের সীমা রহিল না। তিনি এখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা হরনাথের পত্র সংগ্রহ করিয়া সংকলন করিতে লাগিলেন। সংকলন-কার্য শেষ হইলে, পত্রাবলীর পরিশিষ্টে 'ঠাকুর হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী' অংশ সংযোজিত করিয়া[১] অটলবিহারী উক্ত পাণ্ডুলিপিখানির মুদ্রণ-ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে শ্রীমৎ হরনাথ ঠাকুরের পাগলামি প্রকাশিত হইল

১। পাগল হরনাথ: প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযোজিত হরনাথ-জীবনীর উপাদান অটলবিহারী সংগ্রহ করেন। সেই উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনী রচনা করেন ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য ও অনুকূল মুখোপাধ্যায় নামক হরনাথ-ভক্তদ্বয়।

(১৯০৫ সালে)। এইভাবে অপূর্ব পত্রাবলীর প্রচারের মাধ্যমে পাগল হরনাথের প্রচার আরম্ভ হইল। ইতিপূর্বে তাঁহার প্রচার পরিচিত কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যতদূর জানা যায়, ১৯০৩ সালের পূর্বে রাওলপিণ্ডি ও হাতরাস স্টেশনের মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সাধু হিসাবে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাওলপিণ্ডির কালীবাড়ীর পুরোহিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, কালীবাড়ীর সভাপতি শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এবং হাতরাসের অটলবিহারী নন্দীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ সালের মধ্যে হরনাথের অপূর্ব পত্রাবলীর অনেকগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ১৯০৪ সালে হরনাথের প্রচারের সীমানা আরও কিছুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল ধরা চলে। কিন্তু ১৯০৫ সালে পাগল হরনাথের পত্রাবলী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচারের সীমানা নিখিল ভারতে বিস্তৃত হয়।

হরনাথের প্রচার

হরনাথের পত্রাবলী এইভাবে নিখিল ভারতের সর্বত্র এবং বহির্বিশ্বেরও বহু স্থানে প্রচারিত হওয়ায়, পাগল হরনাথ অতি অল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয় ধর্মগুরুরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। ফলে, সমসাময়িক কালের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অপরজন রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের এই দুই মহান্ চিন্তানায়ক হরনাথের এমন অনুরাগী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের অমর লেখনীমুখে পাগল হরনাথের লীলা-কাহিনী প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় নানারূপ অলৌকিক কাহিনী প্রকাশ করিতে-ছিলেন। অটলবিহারী নন্দী মহাশয় সেই সমস্ত কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হরনাথের কতকগুলি অলৌকিক লীলা-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া মহাত্মা শিশিরকুমারকে এক পত্র লিখেন। পত্র-বর্ণিত ঘটনার অলৌকিকতা দর্শনে মহাত্মা শিশিরকুমার হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে উহা প্রকাশ করেন[১] এবং হরনাথের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছায় পত্র-বিনিময় করিতে থাকেন। তাঁহার আগ্রহের আন্তরিকতা উপলব্ধি করিয়া, হরনাথ তাঁহার জীবনের বহু অলৌকিক কাহিনীর বিবরণ মহাত্মা শিশিরকুমারকে প্রেরণ করেন। সেই সমস্ত কাহিনী পাঠ করিয়া হরনাথের প্রতি মহাত্মা শিশিরকুমার এতাদৃশ আকৃষ্ট হইয়া উঠেন যে, তিনি তাঁহার 'অমিয় নিমাই-চরিত' নামক গ্রন্থের মতো এক সুবিস্তৃত হরনাথ-জীবনী রচনা করিতে মনস্থ করেন এবং সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য উপাদান-সংগ্রহে যত্নবান হন। কিন্তু অকস্মাৎ পরলোকের ডাক আসায়, তাঁহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই।

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরও হরনাথের সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া

১। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা।

উঠেন। হরনাথকে তিনি 'পাগল বাবা' বলিয়া ডাকিতেন এবং কলিকাতায় হরনাথ যতদিন অবস্থান করিতেন, দীনেশবাবু ততদিন ঐকান্তিক আগ্রহে হরনাথের সাহচর্য করিতেন। মহাত্মা শিশির-কুমারের মতো তিনিও হরনাথ-লীলার একটি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পও কার্যে পরিণত হয় নাই। পাগল বাবার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসা দীনেশবাবুর স্বলিখিত কয়েকটি গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে, হরনাথ-জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন প্রভৃতির গ্রন্থের মুখবন্ধে এবং হরনাথ গোষ্ঠীতে 'পাগল ভাই' নামে পরিচিত শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন সেন বিরচিত 'নামের মালা' প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই দুইজন ছাড়া আরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সময়ে হরনাথের সবিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইহাদের মধ্যে চুঁচুড়ার নন্দলাল পাল ও গোষ্ঠবিহারী শীলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল পাল মহাশয় অটলবিহারীর মুখে লীলা-কাহিনী শুনিয়া হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহাদের সেই আকর্ষণ এমন প্রবল হইয়া উঠে যে, তিনি গোষ্ঠবিহারীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনগরে হরনাথের বাসায় গমন করেন[১] এবং তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে হরনাথও কিছুদিন পরে চুঁচুড়ায় নন্দলাল পালের বাটীতে আগমন করেন। ইহাই ধর্মগুরুরূপে বাংলা দেশে হরনাথের প্রথম আগমন। নন্দলাল পাল মহাশয়ের বাটীতেই হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভাগবত মিত্র মহাশয়[২] এবং তাঁহার মুখে শুনিয়া নারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। দীনবন্ধু দাসের সহিতও পাগল হরনাথের যোগসূত্র রচিত হয় এই নন্দলালবাবুর বাটী হইতেই। ইহার পর

১। ১৯০৮ সালের আগস্ট মাস

২। ইনি হিন্দু স্পিরিচুয়্যাল ম্যাগাজিনে (September, 1908 সংখ্যায়) হরনাথের অলৌকিক শক্তির কাহিনী পাঠ করিয়া পরিচিত হইবার জন্য হরনাথকে পত্র লিখেন, পত্রোত্তরে হরনাথ চুঁচুড়ায় নন্দলাল পালের বাড়ীতে শীঘ্র মধ্যে তাঁহার আসিবার কথা লিখেন। পরে নন্দলালবাবুর বাড়ীতে আসিলে (সম্ভবতঃ অক্টোবর ১৯০৮) ভাগবত হরনাথকে দর্শন করেন।

হইতে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে পাগল হরনাথের নাম দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে কবিরাজ নিত্যনিরঞ্জন সেন, সত্যচরণ সেন, রামরাখাল ঘোষ, শরৎচন্দ্র দে, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি হরনাথের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। কবিরাজ নিত্যনিরঞ্জন সেন সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং রামরাখাল ঘোষ মহাশয় পরিচালিত 'গৃহস্থ' পত্রিকায় হরনাথের লীলা-কাহিনী ও উপদেশামৃত প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা তথা নিখিল বাংলার জনসমাজে হরনাথের নাম ব্যাপকভাবে প্রচার করিল।

কর্মস্থল শ্রীনগরেও হরনাথের নাম ইতিপূর্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যে কাশ্মীরের মহারাজার অধীনে তিনি চাকুরি করিতেন, সেই কাশ্মীরের মহারাজার গুরুদেব সুবিখ্যাত কৈলাসপতি মহারাজ হরনাথের এতাদৃশ অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, নৃপশিষ্যের রাজপ্রাসাদ ও রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ এক সামান্য বেতনের কর্মচারী হরনাথের সাহচর্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার বাস-ভবনে কালাতিপাত করিতেন। তাহা ছাড়া, দেওয়ান জানকী প্রসাদ, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজদরবারের বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি পাগল হরনাথের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়া উঠেন।[১] এইভাবে অধীনস্থ কর্মচারী হইলেও, উর্ধ্বতন কর্মচারিগণ হরনাথের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ধন্য হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া একজন নিষ্ঠাবান হরনাথ-ভক্ত তাই যথার্থই লিখিয়াছেন, "He worked in Kashmir State as a servant but his boss was his subordinate."[২] হাতরাসের জনসমাজেও হরনাথের অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছিল। ১৯০৬ সালে গৃহীত এক আলোক-চিত্রে হরনাথের সঙ্গে

১। The Divinity of Haranath the Crazy : S. Lakshmi-narasayya : Pages XVI & XXIII

২। Bhagabandas Ranchhordas Modi (Vide : Sovenir on the Hundreth Birthday Celebration of Pagal Thakur Sri Sri Haranath : Swargadwar, Puri : Page 7 : Vol. 2)

যে সমস্ত বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দকে দেখা যায়, তাঁহাদের সকলেই প্রায় হাতরাসের অধিবাসী।[১]

রাওলপিণ্ডির জনসমাজেও ধর্মগুরু হিসাবে হরনাথের জনপ্রিয়তা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই রাওলপিণ্ডির প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে গোপালবাবু, বরদাবাবু, শশীবাবু, নীরদ-বিহারী, ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন।[২] ইঁহারা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সুতরাং রাওলপিণ্ডির সাধারণ বাঙ্গালীগণের মধ্যেও হরনাথ অনতিবিলম্বে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

কটকে সর্বপ্রথম হরনাথের কৃপাধন্য হন কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের অধ্যাপক নদীয়া জেলার শান্তিপুর-নিবাসী গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। ভক্তের আগ্রহে হরনাথ খুব সম্ভব ১৯০৯ সাল হইতেই কটকে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। কটকে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল 'কাঠজুরি' নদীর ধারে। পাগল হরনাথ মধ্যে মধ্যে কটকে তাঁহার বাটীতে আসিতেন। ১৯১১ সালের বৈশাখ মাসে কটকের জমিদার জ্যোতিষচন্দ্র রায়চৌধুরী হরনাথের আরোগ্যদায়িনী শক্তির কথা অবগত হন এবং তাঁহার মুমূর্ষু স্ত্রীকে আরোগ্যদানের জন্য প্রার্থনা জানাইতে গোপালবাবুর বাটীতে আগমন করেন। তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া এমন ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে ব্যাটারী দ্বারা দুগ্ধ পান করাইতে হইত। এজন্য কটকের মেডিকেল স্কুলের একজন শিক্ষক ডাক্তার সনৎকুমার বরাট নিযুক্ত ছিলেন।[৩]

কিন্তু রোগিণীর অবস্থার দিনের পর দিন অবনতি হইতে থাকায়, জ্যোতিষবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং পাগল হরনাথের রোগ

১। ইঁহাদের নাম অটলবিহারী নন্দী, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্র-নাথ ঘোষ, ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণচন্দ্র দে, কেশব চট্টোপাধ্যায়। দ্রঃ হরনাথ সোভেনীর : চিত্রসংখ্যা ১০৬

২। হরনাথ চরিতামৃত : পৃষ্ঠা ৭৬। গোপালবাবু—গোপালচন্দ্র দাস, বরদা-কান্ত চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, নীরদবিহারী বসু, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩। হরনাথ-স্মৃতি : দশম লহরী, পৃঃ ৬৭

আরোগ্যের ক্ষমতার বিবরণ অবগত হইয়া, গোপালবাবুর বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাতর প্রার্থনা জানান। হরনাথ প্রথমে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু জ্যোতিষবাবুর আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে জ্যোতিষবাবুর স্ত্রীকে দেখিবার জন্য গমন করিতে হয়। সুতরাং স্টেশনে যাইবার পথে জ্যোতিষবাবুর বাড়ীর নিকট গাড়ি হইতে নামিয়া, তিনি ত্বরিতপদে অন্দরমহলে গমন করেন এবং অতি-পরিচিত জনের মতো জ্যোতিষবাবুর স্ত্রীর শিয়রে উপনীত হইয়া বলেন, 'মা তুমি ভাল হইয়া গিয়াছ।' তারপর আর ক্ষণকালমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি গাড়িতে ফিরিয়া আসেন এবং স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরেন। ট্রেন ছাড়িবার সময় জ্যোতিষবাবুকে তিনি বলেন, 'বাবা বাড়ী যাও, গিয়া দেখিবে, মা আমার ভাত খাইতেছেন।'

বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান জ্যোতিষচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, হরনাথের কথাই ঠিক। তিনি দেখিলেন, বহুকাল যাবৎ যিনি অন্নব্যঞ্জনের নাম পর্যন্ত মুখে আনেন নাই, তাঁহার সেই রুগ্না সহধর্মিণী সত্যই অন্নব্যঞ্জন লইয়া ভোজন করিতে বসিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতে জ্যোতিষচন্দ্র এবং তদীয় ভ্রাতা টহলপ্রসাদ হরনাথের পরম ভক্তে পরিণত হইলেন এবং তাঁহাদের বাসভবনে 'হরনাথ হরিসভা' স্থাপন করিলেন। এই 'হরনাথ হরিসভা'র অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া কটকের স্কুল বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর যোগেশচন্দ্র ঘোষও হরনাথের একজন নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হইলেন।

১৯১১ সালের জুন মাসে ডাক্তার সনৎকুমার বরাট কটক হইতে বদলি হইলেন। তাঁহার কার্যভার যিনি আসিয়া গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পাগল হরনাথ কর্তৃক জমিদার জ্যোতিষবাবুর স্ত্রীর কঠিন রোগ-মুক্তির বিবরণ ডাক্তার বরাটের মুখে শুনিয়া, দেবেন্দ্রবাবু হরনাথের দর্শনাভিলাষী হইলেন এবং জ্যোতিষবাবুর শরণাপন্ন হন। কিছুকাল পরে কটকে হরনাথের আগমন হইলে, মহানন্দে হরিসভার অধিবেশন চলিতে লাগিল।

লোকমুখে এই সংবাদ পাইয়া ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ হরনাথ-দর্শন-মানসে জ্যোতিষচন্দ্রের বাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে তিনি বহু-জনের সমাবেশ দেখিলেন এবং বহুজনকে একত্র হইয়া কীর্তন করিতেও দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর বেশধারী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। জনতার মধ্যেই দুই-একজনকে (ঠাকুর) হরনাথের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা যাঁহাকে হরনাথ বলিয়া চিহ্নিত করিলেন, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথের চক্ষে তিনি বাবুরূপেই প্রতিভাত হইলেন। স্বামী শ্রীমদ্ ভোলানাথ গিরি মহারাজের শিষ্য ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ সাধু-সন্ন্যাসীর স্থলে বাবুবেশধারী ভদ্রলোককে দেখিয়া নিরাশচিত্তে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেই, হরনাথ ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে দেবেন্দ্রবাবু নিকটে আগমন করিলে, হরনাথ তাঁহার কণ্ঠদেশ বাহুবেষ্টিত করিয়া গাহিয়া উঠিলেন, 'বঁধু তোমার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারি রূপে।'

বালেশ্বরে হরনাথ প্রথম পরিচিত হন বালেশ্বরের জমিদার রাধা-চরণ দাসের সহিত। রাধাচরণবাবুর মুখে পাগল ঠাকুর হরনাথের কথা শুনিয়া কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত হরনাথের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং কালক্রমে একজন প্রবল অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। বালেশ্বরে হরনাথের অনুরাগী আরও অনেকে ছিলেন। কারণ, একাকী হরনাথের দর্শনলাভের আশায় উপেন্দ্রনারায়ণ যখনই যাইতেন, তখনই তিনি হরনাথকে বহু অনুরাগী ভক্তজন-পরিবৃত অবস্থায় দেখিতেন।[১]

এইভাবে পাগল হরনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পুরী, এলাহাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রচার হইল। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া,

১। 'তখন শ্রীশ্রীঠাকুর রাধাচরণবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছেন—বৈকালে কখনও কখনও বাগানে বেড়াইতে থাকেন। কিন্তু প্রায়ই এত লোক থাকে যে, সুযোগ হয় না।'—উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত লিখিত হরনাথ চরিতামৃতের পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১৬।

মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, মৈমনসিংহ ও বরিশাল প্রভৃতি জেলায়, ব্যাপকভাবে তাঁহার প্রচার হইল। বিহারের গয়া, পাটনা, মুঙ্গের, জামসেদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইলেন। এককথায়, ভারতের এমন কোন স্থান রহিল না, যেখানে পাগল হরনাথের অনুরাগী-ভক্ত ছিল না। বিশেষতঃ ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও কর্মকেন্দ্রগুলি প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পাগল হরনাথের নামসংকীর্তনে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ভারতের বিশাল জনসমাজে ধর্মগুরু হিসাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, হরনাথের স্বাভাবিক জীবনধারায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটিল না। তিনি পূর্বের ন্যায় কাশ্মীর রাজদরবারে কার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্ত ও অনুরাগীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিতে তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। আবার ছুটির মেয়াদ শেষ হইলে তিনি কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিতেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সংসারের দায়িত্বও বাড়িয়াছিল। কনিষ্ঠা কন্যা রাইমতী বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ায়, হরনাথ পাত্রের অনুসন্ধান করেন এবং পাত্র মনোনীত হইলে, রাইমতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। ১৯০৮ সালে অটলবিহারীকে লিখিত পত্রে জানিতে পারা যায় যে, উক্ত বৎসরের আষাঢ় মাসে অনুকূল ও গোকুলের বিবাহ দিবার আয়োজনও চলিতেছিল।[১] ১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূলের বিবাহ দেন। অনুকূলের জন্য পাত্রী নির্বাচিত হয় কোচডিহি গ্রাম-নিবাসী উচ্চ কুলমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের কন্যা সন্তোষকুমারী। মহাসমারোহে এই বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল। দূর-দূরান্ত হইতে দলে দলে ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ সোনামুখী গ্রামে আসিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অকৃপণ অর্থব্যয়ে রাজোচিত সমারোহে অনুকূলচন্দ্রের বিবাহকার্য নিষ্পন্ন হইল। এই সময় হইতে হরনাথকে প্রতিদিন অনেকগুলি করিয়া পত্র লিখিতে হইত। হরনাথ প্রতিদিন স্বহস্তে এই সমস্ত পত্র লিখিতেন। পত্রসমূহ প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় লিখিত হইত, কিন্তু ইংরাজী ভাষায়

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড—পত্রসংখ্যা ২২ (ইংরাজী অনুবাদ)

লিখিত পত্রসংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তাহা ছাড়া, হিন্দী ও উর্দু ভাষাতে লিখিত পত্রও পাওয়া যায়।[১] এই পত্রসমূহ বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠায়, এইগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হয় এবং সেই সমস্ত পুস্তকের চাহিদা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। ইহা লক্ষ্য করিয়া কলিকাতাবাসী কতিপয় ভক্তের উদ্যোগে ১৯০৮ সালে 'হরনাথ বুক কমিটি' স্থাপিত হয়। হরনাথের উপদেশাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রণ ও প্রচার করাই ছিল এই 'বুক কমিটি'র প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য হরনাথ সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীর যৎসামান্যমাত্র মূল্য স্থির করা হয়। তৎসত্ত্বেও এই সমস্ত পুস্তকাবলীর বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিন সহস্র টাকার মতো হয়।[২] ধর্মোপদেশ-সমন্বিত পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ এই অর্থের পরিমাণই পুস্তকগুলির জনপ্রিয়তার পরিচয় দান করে।

পাগল হরনাথ—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অটলবিহারী কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম খণ্ড 'পাগল হরনাথ' গ্রন্থে হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বহু ভ্রমপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়। ইহার জন্য অটলবিহারী এই পুস্তকদ্বয় আর নিজের হাতে রাখিতে অনিচ্ছুক হইলে, হরনাথ পুস্তক দুইখানি ভাগবতের হাতে দিতে নির্দেশ দান করেন। হরনাথের নির্দেশ অনুসারে অটলবিহারী ভাগবতের হাতে এই পুস্তক দুইটি সমর্পণ করেন। 'হরনাথ বুক কমিটি'র মাধ্যমে ভাগবত এই পুস্তক দুইটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। পরে এই বুক কমিটি হইতে পাগল হরনাথের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এবং 'উপদেশামৃত' প্রকাশিত হয়। এই বুক কমিটিই পরে 'হরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সমিতি' ও তৎপরে 'হরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সভা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৩]

১৯০৯ সালে হরনাথ রথযাত্রা উপলক্ষে রথে জগন্নাথদেবের নবকলেবর দর্শনমানসে পুরীধামে গমন করেন। কতিপয় অন্তরঙ্গ

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড—পত্রসংখ্যা ১০
২। অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃঃ ২০০
৩। অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃঃ ২০০

ভক্ত এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলাদেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধাবিনোদিনী হরনাথের সহিত পুরীধামে গমন করেন। এই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে পাঁচ লক্ষাধিক যাত্রী সমাগম হয়। এই যাত্রীদের ভিড়ে কমলা ও বিনোদিনী হারাইয়া গেলে, হরনাথ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সমাগত ভক্তগণ সকলেই প্রাণপণে অনুসন্ধান করিয়াও কমলাদেবী ও বিনোদিনীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইলে, হরনাথ নিদারুণ দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠেন। তাঁহার অস্থিরতা দর্শনে ভাগবত মিত্র উক্ত মহিলাদ্বয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য হরনাথের অনুমতি লইয়া বহির্গত হন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিনোদিনী ও কমলাদেবীকে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করেন। এই ঘটনায় হরনাথ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়া ভাগবত মিত্রের মস্তকে হস্তার্পণপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলেন যে, তাঁহার পাঁচশত টাকা বেতন হউক। সেই সময় ভাগবত মিত্র মাত্র চল্লিশ টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু হরনাথের আশীর্বাদে তাঁহার চাকুরির অবস্থার ক্রমশঃই উন্নতি হইতে থাকে এবং ১৯২০ সালে ভাগবত পূর্ণ পাঁচশত টাকা ছাড়াও, মাসিক একশত পঁচিশ হইতে একশত পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইতে থাকেন। এই ভাগবত মিত্র হরনাথের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন; তাহাদের কতকাংশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আবার এই ভাগবত মিত্রের চেষ্টাতেই পুরীধামে 'হরনাথ অনাথ আশ্রম' প্রতিষ্ঠার জন্য জমি সংগৃহীত ও রেজেস্ট্রীকৃত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠাকার্যেও ভাগবত মিত্রের অবদান অবিস্মরণীয়।

রথযাত্রার সময় হরনাথ ভক্তবৃন্দসহ পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট দীননাথ দে-র বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভক্তদের মধ্যে সোনামুখী-বাসিনী একটি মহিলার কলেরা রোগ হইলে, আশ্রয়দাতা ম্যাজিস্ট্রেট দীননাথ দে ভয় পাইয়া মহিলাটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। হাসপাতালে নিরাশ্রয়া মহিলাকে দেখাশুনা করিবার কেহই ছিল না বলিয়া, দয়ার্দ্রহৃদয় ভাগবত মিত্র দৈনিক ৩।৪ বার হাসপাতালে গমন করিয়া মহিলাটির দেখাশুনা করিতেন ও যথাসম্ভব সেবাশুশ্রূষা

করিতেন। কিন্তু ভাগবতের হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডে যাতায়াত ম্যাজিস্ট্রেট দীননাথ দে-র অবিদিত রহিল না। কলেরার জীবাণুর তাঁহার বাটীতে সংক্রমণের আশঙ্কা করিয়া, তিনি ভাগবতকে কঠোর তিরস্কারে জর্জরিত করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে ভাগবত কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অতিশয় দুঃখ হইল। ভক্তবৎসল হরনাথের নিকট ভাগবতের মর্মপীড়া অবিদিত রহিল না। ভক্তের অপমান তাঁহার বুকে বাজিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন।

হরনাথের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কারণ, অনতিবিলম্বেই হরনাথের পরম ভক্ত জগন্নাথ মোক্তার নামক একজন উৎকলবাসী আইন-ব্যবসায়ী রথযাত্রা উপলক্ষে আদালত বন্ধ থাকার জন্য দ্বিপ্রহরেই হরনাথের চরণদর্শন করিতে আগমন করিলেন। মোক্তার আসিয়া পদবন্দনা করিয়া উপবেশন করিতে না করিতেই গাত্রোত্থান করিয়া হরনাথ সদলে মোক্তারের বাড়ীতে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অযাচিতভাবে হরনাথের কৃপালাভ করায়, মোক্তার আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং সযত্নে পথপ্রদর্শন করিয়া হরনাথ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে স্বীয় আলয়ে লইয়া চলিলেন। অতঃপর হরনাথ যে কয়দিন পুরীতে ছিলেন, সেই কয়দিন মোক্তারের বাড়ীতেই বাস করিলেন।

এই ঘটনার পর হরনাথ ভক্তদের এক সম্মেলনে পুরীধামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। পুরী-ধামের মতো তীর্থস্থানে প্রতি বৎসর বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। অপরিমিত জনসমাবেশের ফলে বহু নরনারীর সংক্রামক ব্যাধি-প্রপীড়িত হইবার আশঙ্কাও থাকে। আত্মীয়-বন্ধুগণ এই ব্যাধি-প্রপীড়িত নরনারীদের আশ্রয়দানে সম্মত হয় না। একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে, ইহাদের আশ্রয়লাভের সম্ভাবনা থাকে এবং সেবা-কার্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই হরনাথের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী ভক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ইহার জন্য জমি

সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং পুরীধামে তাঁহাকে রাখিয়া, হরনাথ কাশ্মীর এবং ভক্তমণ্ডলী আপনাপন কর্মক্ষেত্রে গমন করিলেন।

ইহার পর ভাগবতের জীবনে আসিল দুর্যোগের ঘনান্ধকার। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন। প্রাণসংশয়কর এই পীড়ায় যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়াও চিকিৎসকেরা ভাগবতের জীবনের সম্বন্ধে সকল আশা পরিত্যাগ করিলেন। ভাগবতের সহধর্মিণী ব্যাকুলচিত্তে স্বামীর পীড়ার কথা জানাইয়া হরনাথকে একটি প্রিপেড টেলিগ্রাম করিলেন। সেই টেলিগ্রামের উত্তরে হরনাথ মিত্র-গৃহিণীকে জানাইলেন যে, তাঁহার স্বামীকে প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা বেতন পাইতে হইবে। হরনাথের এই উত্তর পাইয়া মিত্র-গৃহিণী আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, তাঁহার সিঁথির সিন্দুর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহার ধারণা সত্য হইল, ক্রমে ক্রমে ভাগবত সারিয়া উঠিলেন। আরোগ্যলাভের অব্যবহিত পরে ভাগবত নিয়মিত অফিসে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিপরবশ হইয়া অফিসের বড়সাহেব তাঁহাকে অ্যাকাউণ্টাণ্টসিপ পরীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে ভাগবত জানিতে পারিলেন যে, তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যথাকালে ভাগবত উপযুক্ত কার্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর বড়সাহেব তাঁহাকে নৈনিতালে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে পুরী আশ্রমের জন্য নানা স্থানে চাঁদা উঠিতেছিল। হাতরাসের অটলবিহারী নন্দী এই কার্যের জন্য বহু টাকা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু আশ্রমের জন্য জমি তখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হইল না। জমি সংগ্রহ করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় পুরীতে পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এক বৎসরকাল মধ্যে কোনও জমি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না দেখিয়া,

হরনাথ বিরক্ত হইয়া যখন জনসাধারণের অর্থ জনসাধারণকে ফিরাইয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ভাগবত মিত্র হরনাথের পদবন্দনা করিয়া জমি সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হরনাথের অনুমতি লাভ করিয়া ভাগবত প্রথমে অফিসে গেলেন এবং নৈনিতালে যাত্রার আদেশ পুরীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইবার ব্যবস্থা করিয়া পুরীতে গমন করিলেন এবং কয়েকদিন অক্লান্ত চেষ্টার পরে স্বর্গদ্বারের নিকটে একটি জমির ব্যবস্থা করিলেন। ঠিক সেইদিনই টেলিগ্রামে আদেশ আসিল যে, ভাগবত মিত্রকে অবিলম্বে নৈনিতালে গমন করিয়া কার্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাম পাইয়া ভাগবত মিত্র সবিশেষ চেষ্টা করিয়া সেইদিনেই জমি রেজেষ্ট্রী করিয়া লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং যথাসময়ে নৈনিতালে গমন করিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৯১০ সালের ৩রা মে তারিখে এই জমি রেজেষ্ট্রী করা হয়। পুরী মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে এই জমি আশ্রমের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লওয়া হয়[১] এবং ১৯১২ সালের ১৫ই মে (৩১শে বৈশাখ) পুরী আশ্রমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে অটলবিহারী, রাধাচরণ, নন্দলাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের সহিত আরও অনেকে গিয়াছিলেন। হরনাথ এই উৎসবে পুরী গমন করেন নাই।[২] এই বৎসর হইতে লিখিত পত্রের প্রত্যেকটিতে হরনাথ পুরী আশ্রমের কথা লিখিয়াছেন। একটি পত্রে জানা যায়, পুরী আশ্রমের জন্য ভাগবত মিত্র কর্তৃক গৃহীত জমি ছাড়া ঘরবাড়ী-সমন্বিত আর একটি জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা চলিতেছে। অপর একটি পত্রে জানা যায়, আশ্রমের জন্য ইষ্টক-নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে এবং ভাটিতে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে।[৩] পুরীর আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য হরনাথের অন্তরে যে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, একটি পত্রে প্রকাশিত আশ্রমের পরিকল্পনায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।[৪] এইরূপ আর একটি পত্র হইতে

১। ভাগবত মিত্র রচিত অমিয় হরনাথ লীলাকথা : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩১
২। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড—৬৩নং পত্র (ইংরাজী অনুবাদ)
৩। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড—৫৬নং পত্র (ইংরাজী অনুবাদ)
৪। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড—৬২নং পত্র (ইংরাজী অনুবাদ)

জানিতে পারা যায়, ১৩১৯ সালের রথযাত্রার দিন (১৯১২ সালে) পুরী আশ্রমের কূপ খনন ও ভিত্তি খনন হইবে।[১]

ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরীর আশ্রম প্রতিষ্ঠাকার্য হইয়া গিয়াছে। ইহার পর পূর্ণোদ্যমে আশ্রমগৃহ নির্মাণকার্য চলিতে লাগিল এবং ভক্তবৃন্দের অকাতর পরিশ্রমে ও সহায়তায় পুরীর আশ্রম-গৃহ নির্মিত হইল—ইহার নাম রাখা হইল 'হরনাথ অনাথ আশ্রম'। ইহাই হরনাথের নামাঙ্কিত সর্বপ্রথম আশ্রম ; নামকরণের মধ্য দিয়াই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। কলেরা রোগাক্রান্ত যে স্ত্রীলোকটির সেবাশুশ্রূষা করায় ভাগবত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তিনিই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ ; কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতো অনাথা এবং অনাথেরা যাহাতে পুরীধামের মতো জনবহুল তীর্থে আশ্রয়, আহার্য ও রোগে সেবা পাইতে পারে, তাহারই জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, যতদিন হরনাথ অনাথ আশ্রম থাকিবে ততদিন ইহার সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে এবং সেই সঙ্গে বিজড়িত থাকিবে হরনাথের সেই সমস্ত অনুরাগীর নাম যাঁহাদের অকৃপণ সাহায্যে ভক্তবৎসল ও করুণার অনন্ত প্রস্রবণ ঠাকুর হরনাথের এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছিল।

সিমলায় হরনাথ

পুরীতে 'হরনাথ অনাথ আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আপনাদের ধর্মগুরুর নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হইল এবং সকল স্থানের ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

ইতিমধ্যে হরনাথের পারিবারিক জীবনে একজন নূতন আগন্তুকের আগমন হইয়াছিল। ১৩১৮ সালের ১১ই ফাল্গুন অনুকূলের পত্নী

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড—৬৭নং পত্র (ইংরাজী অনুবাদ)

সন্তোষকুমারীর প্রথম গর্ভে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।[১] এই কন্যাটির নাম রাখা হইল মেনকারানী। মেনকারানী জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ পিতামহের আসনে উন্নীত হইলেন; অর্থাৎ, গৃহস্থ হিসাবে তাঁহার ভূমিকার যতটুকু অপূর্ণতা ছিল, এইবার তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিল। পৌত্রীর মুখদর্শন করিয়া হরনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই আনন্দ অভিব্যক্ত হইল ভক্তবৃন্দকে লিখিত পত্রসমূহে। গৃহস্থ ধর্মাবলম্বী ভক্তবৃন্দ গৃহস্থ ধর্মগুরুর পত্রের মাধ্যমে এই আনন্দের সংবাদ লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। হাসি ও কান্না, আনন্দ ও বেদনা, মিলন ও বিরহ, সংযোগ ও বিয়োগ সংসারের রীতি। ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইলেও, সংসারবাসীরা এই সমস্ত ঘটনার হাত এড়াইতে পারে না। স্বীয় জীবনে হরনাথ ইহা প্রতি পদে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই, যাঁহার মুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রভাবে চল্লিশ টাকা বেতনের কেরানীর ছয়শত টাকা বেতন হয়, আত্মীয়া দুইজন জনতার ভিড়ে হারাইয়া যাওয়ায় তিনিই দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া উঠেন। আবার, যিনি পুত্রকন্যাদিগকে ভ্রান্তির ধ্বজা বলিয়া অভিহিত করেন, পৌত্রীর জন্মগ্রহণে তিনিই আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিভিন্ন ভক্তকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহাই দ্বৈতত্ব। এই পরস্পর-বিরোধী দুইটি সত্তার অস্তিত্ব হরনাথের বৈশিষ্ট্য। অন্তরে তিনি সর্বপ্রকার সাংসারিক আসক্তি হইতে মুক্ত, পরমপুরুষের প্রেমে আত্মহারা প্রেমিক। বাহিরে তিনি পরিপূর্ণ গৃহস্থ —অপরাপর গৃহস্থের যতই সংসারের সুখ-দুঃখের দোলায় তিনি দোদুল্যমান।

যাহা হউক, পুরী আশ্রমের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের অল্পদিন পরে হরনাথকে সিমলাবাসী ভক্তদের আহ্বানে সাড়া দিতে হইল। এ পর্যন্ত সিমলাবাসীরা বারে বারে তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছেন, তাঁহাদের ডাকে হরনাথ সাড়াও দিয়াছেন। কিন্তু সিমলায় গমন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করা এ-যাবৎকাল তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ১৯১২ সালে হরনাথকে তাঁহাদের মধ্য পাইবার

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৫৬ (ইংরাজী অনুবাদ)

জন্য সিমলাবাসীদের আগ্রহ অত্যুগ্র হইয়া উঠিল। ইহার প্রধান কারণ হরনাথের কনিষ্ঠ জামাতা, রাইমতীর স্বামী নরেশচন্দ্র। তিনি তখন সিমলায় চাকুরি করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে হরনাথের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হইয়া সিমলাবাসিগণ এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, একবার তাঁহাদের মধ্যে হরনাথকে পাইবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে তীব্র আগ্রহ জন্মে। ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে হরনাথকে কুসুমকুমারীসহ সিমলায় আসিবার জন্য বারে বারে অনুরোধ জানাইতে থাকেন। ভক্তবৎসল হরনাথকে তাই কুসুমকুমারীসহ ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে সিমলায় শুভাগমন করিতে হইল।

হরনাথকে পাইয়া সিমলাবাসিগণ আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। সিমলায় বাঙ্গালী সমাজে মহোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল, আর সে মহোৎসবে যোগদান করিলেন উচ্চ পদবীধারী রাজকর্মচারী হইতে সামান্য কেরানী পর্যন্ত। সিমলায় তখন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ভারত সরকারের দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে ইঁহারা সকলেই ঠাকুর-ঠাকুরানীরূপে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া রাজকীয় সমারোহে ঠাকুর ও ঠাকুরানীকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। এই সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের অভ্যর্থনার আন্তরিকতায় হরনাথ মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু নিম্নপদস্থ করণিককুল যখন কেরানী ব্যারাকের মধ্যে হরিসভার প্রতিষ্ঠা করিয়া হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে সেই হরিসভার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন, তখন হরনাথের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। মহানন্দে তিনি সেই হরিসভায় যোগদান করিয়া সুমধুর নামগানে ও সুললিত উপদেশে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্তে কেরানী ব্যারাকে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হইল। তুচ্ছ কেরানী ব্যারাক মহাতীর্থে পরিণত হইল। উচ্চপদস্থ যে সমস্ত রাজকর্মচারীর কোনদিন কোনও কারণে কেরানী ব্যারাকে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, কেরানী ব্যারাক তাঁহাদের পক্ষে পরম বাঞ্ছিত স্থান হইয়া উঠিল। অফিসের সময়টুকু কোনমতে কাটিলেই হরনাথ-কুসুমকুমারীর শ্রীচরণযুগল দর্শনার্থে

তাঁহারা সপরিবারে কেরানী ব্যারাকে ছুটিয়া আসিতেন এবং হরনাথের সহিত নামসংকীর্তনে যোগদান করিয়া ও হরনাথের সুমধুর উপদেশাবলী অন্তরে ধারণ করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইতেন। সিমলার অবাঙ্গালী জনসাধারণও এই মহোৎসবের আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিল না। আনন্দের পরিপূর্ণ আধার হরনাথ যেখানে, সেখানে কেহই নিরানন্দে থাকিতে পারে না। সিমলার পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী জনসাধারণ প্রথমে কৌতূহলবশে হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে দর্শন করিতে আসিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ধীরে ধীরে হরনাথের অনুরাগী ও কালক্রমে নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হইলেন। হরিনামের বন্যাধারায় সমগ্র সিমলা প্লাবিত হইয়া উঠিল এবং সে প্লাবনে ভাসিয়া গেল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বিহারী, উড়িয়া ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সকলে একমন ও একপ্রাণ হইয়া ঠাকুর হরনাথের পরম অনুরাগী ভক্তে পরিণত হইলেন।

সিমলায় উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ অফিসের তারাপ্রসন্ন ঘোষ, তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং গুরুপদ মুখোপাধ্যায়, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে রায় সাহেব), শিক্ষা-বিভাগের চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের হেমচন্দ্র দে, পররাষ্ট্র বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মাখনলাল ঘোষ, মিলিটারী অ্যাকাউণ্টটেণ্ট জেনারেল অফিসের কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সিভিল ফাইন্যান্স বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব হরিদাস গুপ্ত, কিউ. এম. জি. অফিসের রায় বাহাদুর শম্ভুনাথ দত্ত এবং ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, পররাষ্ট্র দপ্তরের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে মাখনবাবুর ভাগিনেয় যতীশ বিশ্বাস (পরবর্তী কালে রায় বাহাদুর), প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসের সন্তোষ রায় (পরবর্তী কালে রায় সাহেব), পররাষ্ট্র বিভাগের ক্ষীরোদকুমার রায়, সিভিল ফাইন্যান্স বিভাগের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্মি বিভাগের নারায়ণচন্দ্র দাস ও নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

হরনাথের আগমনে সিমলাবাসিগণের মধ্যে আনন্দের সাড়া জাগিয়াছিল। হরনাথ ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তর জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে কোন ভেদাভেদ ছিল না। হরনাথের নিকটে আগমন করিলে, সামাজিক মর্যাদা বা পদমর্যাদার কথা কাহারও স্মরণপথে উদিত হইত না। হরনাথ সকলেরই প্রাণের ঠাকুর—সকলেই তাঁহার মধ্যে এক পরম প্রিয়জনকে দর্শন ও অনুভব করিয়া আত্মহারা হইত। সেইজন্য হরনাথ যেখানে যতদিন থাকিতেন, সেখানের নরনারীগণ যতক্ষণ পারিতেন তাঁহার সঙ্গসুখ ভোগ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে ব্রজগোপীগণ যেমন সংসার, সমাজ—সমস্ত কিছুর বন্ধন অস্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিতেন, হরনাথের সংস্পর্শে একবার আসিলে নরনারীগণের সেইরূপ অবস্থা হইত। তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে আর কাহারও মন উঠিত না। তাই সিমলা হইতে যখন বিদায়-গ্রহণের লগ্ন আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন নরনারী সকলের অন্তর আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় বেদনার্ত হইয়া উঠিল। অবুঝের যাইতে না দিবার আকূতি অজস্র অশ্রুবর্ষণের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। শীঘ্র মধ্যে পুনরায় আসিবার আশ্বাস দান করিয়া হরনাথ সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

সিমলাবাসিগণের ঐকান্তিক আগ্রহে হরনাথকে পুনরায় সিমলা গমন করিতে হইল। এই বৎসরের প্রাপ্য ছুটি অক্টোবর মাস হইতে আরম্ভ হওয়ায়, হরনাথ অক্টোবর মাসেই কুসুমকুমারীসহ সিমলায় গমন করেন। ইতিমধ্যে সিমলাবাসিগণ বৃন্দাবনে 'হর-কুসুম কুঞ্জ' নামে একটি আশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই এক হাজার সাতশত টাকা সংগ্রহ করিলেন।[১] এই কুঞ্জ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিমলাবাসিগণ এতদূর

১। চাঁদাদাতাগণের নাম হরনাথ সোভেনীর-এর ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। হরিদাস গুপ্ত ২০০, শৈলেশ্বর ব্যানার্জী ২০০, তারাপ্রসাদ ঘোষ ১৫০, কালিদাস ব্যানার্জী ১৫০, মাখন ঘোষ ১৫০, যতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস মুখার্জী, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু দত্ত—প্রত্যেকে ১০০, হেম দে ৬০, সতীশ

আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, কুলনারীগণ পর্যন্ত দান সংগ্রহ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন।[১] হরনাথ নিজেও এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। হরনাথ-জগতে সুপরিচিতা 'তমালিনী মা'র পিতা তারাপ্রসাদ.ঘোষকে লিখিত এক পত্রে তিনি বৃন্দাবনধামস্থ আশ্রমের নামকরণের জন্য অনুরোধ জানান।[২]

সিমলাবাসিগণ কর্তৃক একটি গৃহ আশ্রমের জন্য নির্বাচিত হইল। গৃহটি মথুরার পথের পার্শ্বে বৃন্দাবনের মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাহিরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু মাত্র এক হাজার তিনশত টাকা মূল্য নির্ধারিত হওয়ায়, আদায়ীকৃত চাঁদার টাকাতেই গৃহটি ক্রয় করা ও প্রয়োজনীয় সংস্কারাদি কার্য করা সম্ভব হইবে বলিয়া, সিমলাবাসিগণ এই স্থানটিই ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। বিস্তৃত পরিসর-সমন্বিত এই গৃহটির নির্জন পরিবেশও আশ্রম স্থাপনের পক্ষে অনুপযোগী ছিল না। কিন্তু চোর-ডাকাতের ভয়ে অটলবিহারী এই স্থানটিতে আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন এবং পুরোহিত-পাড়ায় একটি গৃহ দুই হাজার তিনশত টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অটলবিহারী তখন জীবনের অবশিষ্ট কাল বৃন্দাবনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং বৃন্দাবনে 'হর-কুসুম কুঞ্জ' স্থাপনের জন্য স্থান-নির্বাচনে অটলবিহারীর মতামতের মূল্য যথেষ্টই ছিল। কিন্তু অটলবিহারী কর্তৃক নির্বাচিত গৃহ সিমলাবাসিদের মনোনীত হইল না। সেজন্য তাঁহারা আশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে আদায়ীকৃত সতের শত টাকা অটল-বিহারীকে দান করিলেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবন আশ্রমের সহিত কোনরূপ সংযোগ রাখিতে স্বীকৃত হইলেন না। এইরূপ সামান্য বিষয় লইয়া গণ্ডগোলের সূত্রপাত হওয়ায় হরনাথ অটলবিহারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সিমলাবাসিদের বলেন যে, অটলবিহারীর নির্বাচিত

ঘোষ, নরেশ মুখার্জী, যতীশ বিশ্বাস, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরেদ মুখার্জী, প্রমথ ব্যানার্জী—প্রত্যেকে ৫০, নারায়ণ দাস ৪০।

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৬৭ (ইংরাজী অনুবাদ)

২। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৭৬ (ইংরাজী অনুবাদ)

গৃহ কোনও দিন আশ্রম নামের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে না। হরনাথের অসন্তোষের কথা অবগত হইয়া অটলবিহারী অতিশয় মর্মাহত হইলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার উপায় ছিল ছিল না। কারণ, পুরোহিতপাড়ার গৃহের জন্য তিনি ইতিপূর্বেই বেশ কিছু টাকা অগ্রিম হিসাবে দিয়াছিলেন। গৃহটি ক্রয় না করিলে সেই অর্থ ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং সিমলাবাসিদের অসম্মতি এবং হরনাথের অসন্তোষ সত্ত্বেও, তাঁহাকে পুরোহিতপাড়ার গৃহ ক্রয় করিতে হইল। কিন্তু গৃহের জন্য নির্ধারিত মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা তাঁহার ছিল না বলিয়া, তিনি উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। হরনাথ ঠাকুরের কৃপায় বোম্বাইবাসী কতিপয় ভক্ত বৃন্দাবন আশ্রমের জন্য কিছু টাকা দান করায় অটল-বিহারীর অর্থসমস্যার সমাধান হইল এবং বৃন্দাবনে 'হর-কুসুমকুঞ্জ' প্রতিষ্ঠিত হইল।[১]

বৃন্দাবন আশ্রমের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিলেও, সিমলা-বাসিগণের অন্তরে হরনাথ বা কুসুমকুমারীর প্রতি কোনরূপ বিরূপ ভাবের সঞ্চার হয় নাই। বরং এই ঘটনার পর হইতে হরনাথ ও কুসুমকুমারীর প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বহুগুণ বর্ধিত হইল। সেইজন্য ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে হরনাথ ও কুসুমকুমারী যখন সিমলায় দ্বিতীয়বার পদার্পণ করিলেন, তখন সমগ্র সিমলা ব্যাপিয়া এক বিরাট মহোৎসব সুরু হইয়া গেল। এইবার হরনাথ ও কুসুমকুমারী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে রায় সাহেব) মহাশয়ের লক্করবাজারের নিকটবর্তী বাসভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লক্করবাজারের এই বাটীতে ইতিপূর্বে 'হরনাথ সভা' নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এইবার হরনাথ ও কুসুমকুমারীর আগমনে সেই সভায় একটি অধিবেশন করা হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে কয়েকদিন আনন্দ-উৎসব চলিল। হরনাথ-প্রেমে মাতোয়ারা সিমলাবাসিগণ আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইলেন।

১। ১৯১৩ সালের দোলপূর্ণিমার দিন। হরনাথ, কুসুমকুমারী, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, রাধাবল্লভ শীল প্রভৃতি এই বৃন্দাবন আশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবে যোগদান করেন।

অফিসের কাজকর্মে মনোনিবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা গৃহ-সংসারের কাজ কোনমতে সারিয়া হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে লইয়া আনন্দ-উৎসব করিতে লাগিলেন। এই উৎসবে হরনাথ সমস্ত সিমলাবাসীর অন্তরে অনির্বচনীয় প্রেম-ভাবের উদ্বোধন করিলেন। সিমলাবাসিগণ অনাস্বাদিতপূর্ব সেই প্রেমের অমৃতাস্বাদ লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন।

কয়েকদিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসব চলিবার পর হরনাথ ও কুসুমকুমারী সহসা ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িলে, সিমলাবাসী নরনারীবৃন্দ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং হরনাথ ও কুসুমকুমারীর চিকিৎসা ও সেবার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চিকিৎসা ও সেবার গুণে কুসুমকুমারীর জ্বরের প্রাবল্য কতকাংশে কমিল এবং অবস্থার উন্নতি হইল বটে, কিন্তু হরনাথের শারীরিক অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হইতে লাগিল। প্রবলভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ প্রবল রক্তামাশয়ে অত্যধিক রক্তক্ষরণহেতু, তিনি অতিশয় দুর্বল ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। সিমলার খ্যাতনামা বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী চিকিৎসকবৃন্দের যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও এই যন্ত্রণার লাঘব হইল না দেখিয়া, সিমলাবাসী ভক্তগণ সিভিল সার্জেন কর্নেল স্মিথকে হরনাথের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কর্নেল স্মিথ হরনাথের চিকিৎসাভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার চিকিৎসার গুণে হরনাথ আংশিকভাবে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। স্মিথ সাহেব কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবার জন্য হরনাথকে উপদেশ দান করিলেন এবং এই দুর্বল শরীরে আর কাজ করা চলিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

সিমলাবাসী ভক্তদের অনুরোধে ডাক্তার স্মিথ সাহেব এই মর্মে সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন যে, হরনাথ সিমলাবাসী ভক্তদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কাশ্মীর রাজ্যের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সুতরাং এই মর্মে একটি আবেদনপত্র লিখিত হইল এবং

ইহার সহিত ডাক্তার স্মিথ সাহেবের সার্টিফিকেটখানি কাশ্মীর দরবারে প্রেরিত হইল নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। কাশ্মীর দরবারে হরনাথের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল এবং কর্নেল স্মিথের সার্টিফিকেটে বর্ণিত হরনাথের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পেন্‌সন দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।[১] পেন্‌সনের পরিমাণ স্থির হইল মাসিক ষোল টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র।[২]

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৩ সালের মে মাস পর্যন্ত ছয়মাসকাল দৈহিক অসুস্থতার জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে বেতন দেওয়া হয়।[৩] ১৯১৩ সালের জুন মাস হইতে (১লা হার ১৯৭০) মাসিক ষোল টাকা চৌদ্দ আনা হিসাবে তাঁহাকে পেন্‌সন

১। Resolution No. 1 of 5 Katik, 1970, passed by the Dharmartha Committee, J. & K. State.

২। From :

The Superintendent,

Dharmartha, Jammu & Kashmir State, Srinagar.

To : Haranath Banerjee,

Sonamukhi, Dist. Bankura, Bengal.

Enclosures : No. 571 Dated Srinagar, the 5th October, 1914.

Subject :

In continuation of this office No. 529, dated the 18th September, 1914, Haranath Banerjee is hereby informed that His Highness the Maharaja Bahadur has been pleased to accord his sanction to grant an invalid pension of Rs. 16-14-0 P.M. in his favour with effect from 1st March, 1914.

The undersigned has requested the Accountant General, J. & K. State to make arrangements for payment of the amount due to him on this account.

Sd/- Illegible

Supdt. Dharmartha.

৩। ধর্মার্থ অফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের শ্রীনগর হইতে লিখিত ১৯১৪ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে লিখিত পত্র—

From : The Superintendent, Dharmartha,

Jammu and Kashmir State, Srinagar.

দিবার জন্য ব্যবস্থা হয়। হরনাথকে লিখিত ধর্মার্থ অফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের এক পত্রে জানা যায় যে, হার ১৯৭০ হইতে ফাল্গুন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পেন্‌সনের মোট পরিমাণ তিনশত চুয়ান্ন টাকা ছয় আনার বিল হরনাথের প্রাপ্তি-স্বীকারসূচক স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয়। পেনসনের টাকা মনি-অর্ডারে পাঠাইবার বিশেষ ব্যবস্থাও হরনাথের জন্য করা হয়।[১]

To: Babu Haranath Banerjee,
Sonamukhi, Bankura Dist., Bengal.

Enclosures: 2 No. 692, Dated Srinagar, the 6th November, 1914

Subject:

Pension case of B. Haranath Banerjee

In reference to his letter, dated nil, on the above subject Haranath Banerjee is informed that for the period of six months when he was on medical leave, he has been allowed sick leave allowance at Rs. 30/- p. m. Orders have already been issued to the Dharmartha Officer, Kashmir for the remittance of the amount which, the undersigned thinks, he will receive in a few days.

2. A copy of the Resolution No. 1, dated 5 Katik, 1970 passed by the Dharmartha Committee in connection with his pension case and that of letter No. 4851, dt. 25. 9. 1914 from the Chief Minister, J. and K. State conveying the sanction of His Highness the Maharaja Saheb Bahadur to the grant of his pension are herewith sent, as requested.

3. The undersigned shall be in Jammu in Maghar, 1971.

Sd/-Illegible

Superintendent, Dharmartha

১। উক্ত অফিসের ৩।৪।১৯১৫ তারিখের ১১৮৫নং জরুরী পত্র, পত্রখানি জম্মু ও কাশ্মীরের অ্যাকাউন্‌টেণ্ট জেনারেলের J. M. ৪৪৭৪ নম্বর ২৬শে।৩০শে মার্চ, ১৯১৫ তারিখের জরুরী পত্রের নকলের সহিত পাঠানো হয়।

Copy of the above forwarded to Babu Haranath Banerji for information and future guidance with request that he will kindly return the enclosed bill to the end of Phagan, 1971 duly receipted, stamped and supported by the life certificate on receipt of which the amount in question will be remitted to him by postal money order.

হরনাথ ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে বৃন্দাবনধাম হইয়া সোনামুখী বাটীতে আসিবার সঙ্কল্প করেন এবং সোনামুখীর সুচাঁদ কর্মকারকে এই মর্মে এক পত্র লেখেন। কিন্তু আসিবার পথে গয়া ও কাশী দর্শন করিয়া তিনি আসানসোলে আসেন। আসানসোলের ডি. টি. এস. অফিসে তখন হরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূল কাজ করিতেন। আসানসোল হইতে তাঁহার কলিকাতা যাইবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে আসানসোল হইতে পানাগড় হইয়া চন্দননগরে আসিতে হয়।

তমালিনী দত্ত তখন তাঁহার পিত্রালয় চন্দননগরে অবস্থান করিতেছিলেন। হরনাথ সোনামুখী আসিতেছেন জানিয়া, তিনি তাঁহাকে চন্দননগরে তাঁহার পিত্রালয়ে আসিবার জন্য পত্রে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। খুব সম্ভব আসানসোলে অনুকূলের ঠিকানায় লিখিত 'তমালিনী মা'র পত্রের উত্তরে হরনাথ পানাগড় হইয়া চন্দননগরে আসিবার কথা জানাইলে, তমালিনী মার পিতা তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে হরনাথকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসেন। কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁহার সহিত হরনাথের চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। সেইজন্য ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াইলে, ঘোষ মহাশয় ছবিতে-দেখা রূপের অনুরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। সহসা হরনাথ তাঁহার নিকটে আসিয়া 'দাদা মহাশয়' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, 'এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছ কেন? আমি কি তোমার বাটী চিনি না।'

চন্দননগরে ঘোষ মহাশয়ের বাটীর মধ্যে এক তমালিনী দত্ত ছাড়া আর কেহই হরনাথের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেন নাই। হরনাথের স্বহস্ত-লিখিত চিঠি এবং পুস্তকে মুদ্রিত প্রতিকৃতি মাত্র দেখিয়াই সকলে হরনাথের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। এইবার হরনাথকে নিজ বাটীতে পাইয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। হরনাথের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। গৃহ সজ্জিত হইল, দ্বারে কদলীবৃক্ষ ও আম্রপত্র লাগানো হইল, গৃহের সম্মুখে সমস্ত রাস্তা পরিষ্কার করানো হইল, রাস্তায় গঙ্গাজল ও চন্দন ছড়ানো

হইল। প্রাণের ঠাকুরের আগমন-পথ এইভাবে ভক্তের শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতার আলিম্পনে চিত্রিত হইল। যথাকালে গৃহকর্তা তারা-প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত হরনাথ তাঁহার চন্দননগর বাটীতে প্রথম পদার্পণ করিলেন। বাটীস্থ সকলে মহানন্দে তাঁহার সেবা ও পূজার আয়োজন করিলেন। বহুদিনের পরিচিতের মতো হরনাথ সকলের সহিত নিতান্ত সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করিলেন। তারা-প্রসাদবাবুর পুত্র রমাপ্রসাদ মাত্র দুই-তিন দিনের মধ্যে হরনাথের অতিশয় অন্তরঙ্গ ভক্তে পরিণত হইলেন, যদিও সে সময় তাঁহার কৈশোর অতিক্রান্ত হয় নাই।[১]

দুই-তিন দিন চন্দননগরে অবস্থান করিবার পর হরনাথ কলিকাতা গমন করেন এবং কলিকাতা হইতে বিনোদবিহারী ঘোষ ও বিষ্ণুচরণ দাসের চার্টার-করা স্টীমারে নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ধানী মা প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে লইয়া কুসুমকুমারী ও মাসীমাতাসহ গঙ্গাসাগর মেলা দর্শন করেন।[২]

সোনামুখীতে আসিয়া হরনাথকে নূতন করিয়া গৃহস্থালি আরম্ভ করিতে হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি কাশ্মীরে ছিলেন, পরিবারবর্গও তাঁহার সহিত কাশ্মীরেই ছিল। মধ্যে মধ্যে ছুটি লইয়া সোনামুখী বাটীতে আসিতেন বটে, কিন্তু সোনামুখীর গৃহস্থালি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, সোনামুখীতে আসিয়া তিনি নূতন

১। হরনাথ-স্মৃতি: সপ্তম লহরী: পৃ: ৩৪-৩৬

২। হরনাথ-স্মৃতি: নবম লহরী: পৃ: ১

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই মেলা দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, এই বিবরণীতে প্রদত্ত ঘটনার সালে ভুল আছে। নারায়ণবাবুর মতে, ১৯০৭-০৮ সালে তিনি হরনাথের সহিত পরিচিত হন (দ্র: The Wonderful Lilas of Haragopal: Page 5)। ভাগবতবাবুর নিকট হইতে অবগত হইয়া তিনি চুচুড়ায় নন্দলাল পালের বাটীতে হরনাথকে দেখিতে যান (দ্র: Life and Message of Bhagawan Sri Kusum-Haranath: Page 74)। ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসের পূর্বে তাঁহার সহিত হরনাথের দেখা হয় নাই অথচ তিনি লিখিয়াছেন, ১৯০৬ সালে হরনাথের সহিত তিনি গঙ্গাসাগর মেলায় গমন করেন। ইহা মুদ্রণ-প্রমাদ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

উদ্যমে গৃহ ও গৃহস্থালির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সোদরোপম সুচাঁদ কর্মকার তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণ একেবারে উদাসীন রহিয়া গেলেন। এতদিন পর্যন্ত শিবনারায়ণ ও হরনাথ একান্নবর্তী ছিলেন এবং সোনামুখীর সংসারে শিবনারায়ণই ছিলেন সর্বেসর্বা। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হরনাথের সোনামুখী আগমন তাই শিবনারায়ণ বেশ সুস্থ মনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। গৃহ ও গৃহস্থালি বিষয়ে হরনাথকে পৃথক ব্যবস্থা করিবার জন্য শিবনারায়ণ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। হরনাথ জ্যেষ্ঠের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাই প্রথমে তিনি শিবনারায়ণের ইঙ্গিতের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার ঔদাসীন্যে তিনি যথেষ্ট মনঃপীড়া পাইলেন।

এই সময় কুসুমকুমারীর স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটিল। রাত্রিতে তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল, সকালের দিকে সামান্য হাঁপানির টানও দেখা দিল। সেজন্য হরনাথ কুসুমকুমারীকে লইয়া কিছুদিন পুরী-বাসের সঙ্কল্প করিলেন।[১] তদনুসারে ফেব্রুয়ারি মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত হরনাথ কুসুমকুমারীকে পুরীধামে রাখিলেন। পুরীর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কুসুমকুমারীর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইলে, হরনাথ কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন।

১৯১৩ সালের মে মাসে হরনাথ মেদিনীপুর হইয়া বালাসোরে গমন করেন। মেদিনীপুরের তমালিনী দত্তকে লিখিত এক পত্রে[২] জানা যায় যে, রাইমতী, কৃষ্ণদাস এবং অনুকূলের পত্নী এই সময়ে তাঁহার সহিত ছিলেন। বালাসোরের এক ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহাকে বালাসোর লইয়া যাইবার জন্য। বামাচরণবাবুর কলিকাতা হইতে বালাসোরে আসিয়া হরনাথের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল। বালাসোর হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরনাথ কিছুদিনের জন্য সোনামুখী বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই বৎসর বর্ষাকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। সেজন্য শ্রাবণ মাসের মধ্যে

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৮৩ (ইংরাজী অনুবাদ)
২। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৮৪ (ইংরাজী অনুবাদ)

হরনাথ গৃহ হইতে কোথাও যাইতে পারেন নাই। অথচ চতুর্দিক হইতে নরনারীগণ তাঁহাকে আহ্বান জানাইতেছিলেন, যাতায়াতের খরচ বাবদ অনেক অতি-উৎসাহী ভক্ত টাকাও পাঠাইতেছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড বর্ষার জন্য হরনাথ কাহারও আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি খুব লজ্জিত হইয়াছিলেন।[১]

আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ষার প্রকোপ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে, হরনাথ ভক্ত নরনারীবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রার আয়োজন করেন। দেওয়াসের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাকে দেওয়াস রাজ্যে যাইবার জন্য মহারাজার আমন্ত্রণলিপি লইয়া আসিলে, হরনাথ উক্ত নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন এবং স্থির করেন যে, ২৫শে আগস্ট তারিখে গয়াধাম হইতে কতিপয় ভক্তসহ দেওয়াস রাজ্যে গমন করিবেন। হরনাথের প্রতিশ্রুতি পাইয়া দেওয়াসের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় উৎফুল্লচিত্তে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার পর হরনাথ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তকে গয়ার Public Prosecutor রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আদেশ দান করেন। হরনাথের আদেশ পাইয়া নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ মালাকার, সদানন্দ ব্রহ্মচারী (বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়), রাধাবল্লব শীল, রায়সাহেব সন্তোষকুমার রায় এবং বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ ১৯১৩ সালের ২৩শে আগস্ট কলিকাতা হইতে গয়াধাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং গয়াধামে আসিয়া হরনাথের সহিত মিলিত হইলেন। হরনাথ তখন কুসুমকুমারী, মাসীমাতা (কুসুমকুমারীর কনিষ্ঠা ভগিনী) এবং কন্যা রাইমতীসহ রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভক্তবৃন্দকে পাইয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইল। ২৪শে আগস্ট তারিখে দেওয়াসের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী আগমন করিলেন। হরনাথ, কুসুমকুমারী, মাসীমাতা ও রাইমতীর জন্য তিনি খাণ্ডুয়া স্টেশন পর্যন্ত একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করেন এবং হরনাথের ভক্তবৃন্দের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবার বন্দোবস্ত

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৮৫ (ইংরাজী অনুবাদ)

করেন। গাড়িতে হরনাথের জলযোগের জন্য চা, মিষ্টান্ন প্রভৃতির যথেষ্ট বন্দোবস্ত ছিল। যথাকালে খাণ্ডুয়া স্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ি বদল করিতে হইল। হরনাথের অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেওয়াসের মহারাজার মন্ত্রী মহাশয় খাণ্ডুয়াতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া, তিনি তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং ভক্তবৃন্দের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ি খাণ্ডুয়া হইতে ইন্দোরে পৌঁছিলে, মন্ত্রী মহাশয় অগ্রে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া হরনাথ, কুসুমকুমারী ও মাসীমাতাকে গাড়ি হইতে অবতরণ করাইলেন। তারপর ভক্তগণ গাড়ি হইতে অবতরণ করিলে, তিনি দেওয়াস যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। হরনাথ ও কুসুমকুমারীর জন্য মহারাজার নিজস্ব মোটরগাড়ি এবং ভক্তদের জন্য দুইখানি ফিটন গাড়ি স্টেশন এলাকায় অপেক্ষা করিতে-ছিল। সকলে গাড়িতে আরোহণ করিবার পর ভক্তগণ হরনাথ-কুসুমকুমারীর জয়ধ্বনি করিলে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ইন্দোর হইতে দেওয়াস রাজ্য কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। হরনাথের মোটরগাড়ি অল্পকাল মধ্যেই দেওয়াস রাজ্যের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার রাজ্যের সীমানার তোরণ পর্যন্ত আসিয়া গার্ড-অব-অনারসহ হরনাথের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। হরনাথ তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র মঙ্গলসূচক বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইল এবং মহারাজ ঠাকুরের (হরনাথের) কর্পূর আরতি সম্পাদন করিয়া, অগ্রণী হইয়া হরনাথের বাসের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেজারী ভবনের উপরতলায় হরনাথকে লইয়া গেলেন। হরনাথের আগমন উপলক্ষে উক্ত ভবনের দ্বারদেশে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং নানা বর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উহার শীর্ষদেশে উত্তোলিত হইয়াছিল।

ইন্দোর হইতে দেওয়াস রাজ্যে আসিবার পথে সিপ্রা নদী পার হইতে হয়। ভক্তবৃন্দের গাড়ি সিপ্রাতীরে পৌঁছিয়া ঘোড়া বদল করিবার জন্য থামিলে, ভক্তগণ সিপ্রা নদীর বিমল জলে স্নানকরণান্তর জলযোগ সম্পন্ন করিলেন এবং পুনরায় ফিটনে উঠিয়া দেওয়াস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজার মোটরগাড়িটি

ভক্তদের আনিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পথিমধ্যে যান্ত্রিক গোলযোগহেতু উহা থামিয়া যায়। ভক্তদের ফিটন গাড়ি যখন দেওয়াস রাজ্য হইতে মাত্র চারি মাইল দূরে আসিল, তখন মহারাজার যান্ত্রিক গোলযোগমুক্ত মোটরগাড়িটি আসিয়া তাঁহাদের দেওয়াসে লইয়া গেল। ভক্তগণ সকলেই বেলা প্রায় ৪টার সময় দেওয়াসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তদের অপেক্ষায় হরনাথ তখনও পর্যন্ত মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ এবং তাঁহার পরিবারবর্গও তখন পর্যন্ত উপবাসী ছিলেন। সেইজন্য ভক্তবৃন্দের আগমনের অব্যবহিত পরেই হরনাথের মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করা হইল। হরনাথ এবং ভক্তগণ মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতে বসিলে, মহারাজ হরনাথের সেবার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য হরনাথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হরনাথ তাঁহাকে নিজ পাত্র হইতে স্বহস্তে প্রসাদ তুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং ভক্তদের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদেশ দান করিলেন। হরনাথের আদেশ শিরোধার্য করিয়া মহারাজ ভক্তদের সহিত একত্রে বসিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে হরনাথ যে কয়েকদিন দেওয়াস রাজ্যে ছিলেন, সেই কয়দিন ভক্তদের সহিত নিত্য প্রসাদ পাইবার জন্য মহারাজ প্রত্যহ রাজপ্রাসাদ হইতে আগমন করিতেন।

দেওয়াস রাজ্যে হরনাথের দশদিনব্যাপী অবস্থানের মধ্যে কোনদিন মহারাজার এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। প্রসাদগ্রহণে তাঁহার এই আগ্রহ ও আন্তরিকতা দর্শনে হরনাথ এমন মুগ্ধ হন যে, দেওয়াস হইতে লিখিত পত্রে তিনি মহারাজকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করেন।

"The Maharaja of this place is truly a god ; on that account he has become the ruler of this Devas, the land of Devas (gods). Truly, I am besides myself at his love and care, so much care does not fit in with such a hapless fellow. All the of this place are Krishna's servants, the Maharaja is their leader.

N. G. Shastri, M. A., his Chief Officer and well-wisher is really a saint ; a very humble, very modest and calm."[১]

দেওয়াসের মহারাজা, প্রধান অমাত্য এবং অধিবাসীদের সম্বন্ধে হরনাথের এই উক্তিই প্রমাণ করে যে, দেওয়াস রাজ্যে গমন করিয়া হরনাথ যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার গভীরতা কতখানি। বাস্তবিকই ঐশ্বর্যপ্রাচুর্য ও রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্যে বাস করিয়াও দেওয়াসের মহারাজা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরভিমান এবং ভক্তি, দীনতা ও বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। হরনাথ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সেবার জন্য মহারাজা দৈনিক এক হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। এই বিরাট পরিমাণ অর্থ যে নিত্যই রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিদিন হরনাথের সেবার সময় যখন মহারাজা প্রসাদগ্রহণের জন্য উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার বিনয় ও দৈন্য দেখিলে কোনদিনই মনে হইত না, তিনিই এই যজ্ঞের হোতা। ভক্তবৃন্দও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন। নারায়ণচন্দ্র ঘোষের লেখনীমুখে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে ঃ—

"সাধারণের বিশ্বাস ঐশ্বর্যের ভিতর থাকিলে হৃদয়ে ভক্তিরসের উদ্রেক হয় না, কিন্তু দেওয়াসের মহারাজাকে দেখিয়া আমাদের সে ধারণা উল্টাইয়া গিয়াছিল। মহারাজার বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও তাঁহার পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসেবা এবং তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক পূজার ও উৎসব আদির ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। মহারাজা যখন আসিয়া আমাদের সহিত মিশিতেন, তিনি যে অতবড় রাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহার চালচলন, হাবভাবভঙ্গীতে কিছুমাত্র বুঝা যাইত না, তিনি সম্পূর্ণ নিরভিমান ছিলেন।"[২]

দেওয়াসে অবস্থানকালে মহারাজার ব্যবস্থানুসারে একদিন হরনাথ জেলখানা পরিদর্শন করেন। জেলখানায় কয়েদীদের আহার-

১। দেওয়াস হইতে লিখিত পত্রের ইংরাজী অনুবাদ—পত্রসংখ্যা ৮৬ : পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড।

২। হরনাথ-স্মৃতি : দশম লহরী, পৃঃ ৩৪

বাসস্থানের সুব্যবস্থা দেখিয়া হরনাথ পরম সন্তোষলাভ করেন। জেলখানায় ঠাকুরের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে মহারাজা পরদিন কয়েক-জন কয়েদীকে মুক্তিদান করেন। আর একদিন মহারাজা হরনাথ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের বনভোজনের আয়োজন করেন।

রৌপ্যনির্মিত আসন-বিশিষ্ট একটি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে হরনাথ ও কুসুমকুমারী প্রভৃতি আরোহণ করিয়া সর্বাগ্রে চলিতে থাকেন, তাহার পশ্চাতে অপর দুইটি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে ভক্তবৃন্দ আরূঢ় হন, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের রাজকর্মচারিগণ অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করেন। রাজধানীর প্রধান রাজপথ অতিবাহন করিয়া এই আড়ম্বর-পূর্ণ শোভাযাত্রা দেওয়াস রাজ্যের উপান্তে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে এবং দুই ঘণ্টাকাল পরে পূর্ব হইতে নির্বাচিত অরণ্য প্রদেশের একটি পরম রমণীয় স্থানে উপনীত হয়। এই স্থানে বনভোজন সমাধা করিয়া, শোভাযাত্রাসহকারে হরনাথ ও কুসুমকুমারী রাজ্যমধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কুসুমকুমারী উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দির দর্শন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মহারাজা একদিন সপার্ষদ্ ঠাকুরঠাকুরানীর অর্থাৎ হরনাথ ও কুসুমকুমারীর উজ্জয়িনী যাত্রার বন্দোবস্ত করেন।

হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সন্তোষবিধানের জন্য দেওয়াসের মহারাজার এইরূপ বিবিধ আয়োজন এবং হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সামান্যতম ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টাসমূহ পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি হরনাথের একজন পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই পরম ভক্তের আহ্বানে তাই ঠাকুর হরনাথ সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। দেওয়াস রাজ্যে আসিবার পর হইতে মহারাজা, মহারানী, অমাত্যবর্গ এবং রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকগণ সকলেই হরনাথের পরম ভক্তে পরিণত হন। সকলেই হরনাথের প্রেমে এমনই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, প্রত্যেকেই নিজ গৃহে সেবাগ্রহণের জন্য হরনাথকে আন্তরিকতার সহিত অনুরোধ করেন। কিন্তু অপর কাহারও গৃহে হরনাথের সেবার বন্দোবস্ত করিতে মহারাজার মন উঠিল না। সেইজন্য অপরের অন্তরে

যে বেদনার সঞ্চার হইতে পারে, তাহা অপসারণের জন্য মহারাজা হরনাথের দেওয়াসে অবস্থানকালের মধ্যে দুই-তিনটি বড় বড় ভোজ-সভার আয়োজন করেন এবং এই ভোজসভাসমূহে রাজ্যের সমস্ত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলেই যাহাতে ঠাকুরের প্রসাদ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় রাজা ও প্রজা একত্রে বসিয়া হরনাথের প্রসাদগ্রহণের সুযোগ পাইলেন এবং হরনাথের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া ও প্রসাদ পাইয়া সকলেই তাঁহার পরম ভক্তে পরিণত হন। এইভাবে মাত্র দশদিনের মধ্যে রাজা, প্রজা ও রাজকর্মচারী প্রভৃতি সকলের অন্তর জয় করিয়া সপার্ষদ্ হরনাথ দেওয়াস রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহাদের বিদায় দিবার সময় মহারাজা "হরনাথ-কুসুমকুমারী ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য বহু মূল্যের নানাপ্রকার বস্ত্র, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন দিয়াছিলেন এবং হরনাথের সহযাত্রী ভক্তদের প্রত্যেকের জন্য এক-একটি বহুমূল্যের জরির কাজ-করা পাগড়ি ও এক-একখানি উৎকৃষ্ট সিল্কের চাদর দিয়াছিলেন।"

বিদায়ের দিন রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাজপথের দুই পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। মহারাজা ও মহারানী উভয়েই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় অমাত্যগণের হৃদয় বেদনার্ত হইয়া উঠিল। সমর্পিত-প্রাণ এই সমস্ত ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনা দান করিয়া ভক্তবৃন্দসহ হরনাথ ও কুসুমকুমারী দেওয়াস হইতে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বরের পুণ্য প্রভাতে হরনাথ কুসুমকুমারী, মাসীমাতা, রাইমতী ও ভক্তবৃন্দসহ বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বোম্বাই নগরীতে আসিবার জন্য হরনাথের নিকট ভক্তগণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনার আন্তরিকতার জন্য হরনাথ দেওয়াস হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বোম্বাই আসিবার সঙ্কল্প করেন। বোম্বাই নগরী ও ইহার উপকণ্ঠে হরনাথের ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের

সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে হরনাথের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং তাঁহাদের অধিকাংশেরই আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও তিনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাই ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারী যখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল এবং স্টেশনের বাহিরে আসিবার পর যখন বিশালকায় যুগলাশ্ব-বাহিত বহুসংখ্যক অশ্বযান ও সুদৃশ্য গাড়ি এবং অসংখ্য মোটরগাড়ি শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তারপর যখন বোম্বাইয়ের নিরহঙ্কার ক্রোড়পতিগণ দীনতার প্রতিমূর্তিরূপে তাঁহাদের সেবার ও বাসস্থানের রাজকীয় আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সামান্যতম অসুবিধার নিরসনকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন হরনাথ তাঁহাদের বিনয়, দৈন্য ও সৌজন্যে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দেওয়াসের মতো বোম্বাইয়ের অধিবাসীবৃন্দও তাঁহাদের চক্ষে দেবতারূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেওয়াসের মহানন্দময় পরিবেশ হইতে সদ্য-প্রত্যাগত হইয়া তিনি বোম্বাইয়ের যে পরিবেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তাহা অধিকতর আনন্দদায়ক। হরনাথ তাই বলিলেন, "The people of Bombay are Gods. I am beyond myself to see them." এই আনন্দ অন্তরের অনুভূতির বস্তু, মুখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বোম্বাইবাসীদের আন্তরিক সেবায় হরনাথ যে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, উপরোক্ত উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বোম্বাই নগরীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া হরনাথ সোনামুখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার নারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ হরনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ভারাক্রান্ত চিত্তে নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোম্বাইয়ে বামাচরণবাবু অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং অসুস্থ শরীরেই পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন।

বোম্বাই হইতে সোনামুখীতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে শিবনারায়ণ হরনাথকে আহার-বাসস্থানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে আদেশ দান করিলেন। এই সময় হরনাথের খ্যাতি দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয় এবং

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে প্রতিদিন কেহ-না-কেহ সোনামুখী বাটীতে হরনাথ ও কুসুমকুমারীর নিকট আগমন করিতে থাকে। এই নিত্য অতিথি-সমাগমের ফলে সংসারে ব্যয়বাহুল্য হইতে লাগিল। মিতব্যয়ী শিবনারায়ণের ইহা ভালো লাগিল না। এই কারণে যে সমস্ত নরনারী হরনাথের নিকট আসিতেন, তাঁহাদের প্রতি শিবনারায়ণ প্রসন্ন ছিলেন না। ভাগবত মিত্রের বর্ণনায় এই তথ্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—"সে সময় আমরা সোনামুখী যাইলে শিবনারায়ণ বিশেষ বিরক্ত হইতেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন কোন্ ট্রেনে যাইবে? অর্থাৎ পানাগড় হইতে কোন্ ট্রেনে কলিকাতা রওনা হইব জিজ্ঞাসা করিতেন।"[১] রামরাখালবাবুর বাড়ীটি তখন পর্যন্ত বর্তমান আকার ধারণ করেন নাই। ফলে, অতিথিদের বাসস্থানেরও সবিশেষ অসুবিধা হইত। এই সমস্ত কারণে শিবনারায়ণ হরনাথের প্রতি অসন্তোষের ভাব পোষণ করিতেন। দেওয়াস এবং বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শিবনারায়ণের এই অসন্তোষের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল এবং পরিশেষে ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে পূজার পর হইতে শিবনারায়ণ হরনাথকে পৃথক হইতে বলিলেন। ভক্তদের সহিত রূঢ় আচরণ করার জন্য ভক্তবৎসল হরনাথ জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই যখন শিবনারায়ণ তাঁহাকে পৃথক হইবার কথা বলিলেন, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় শিবনারায়ণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। তদনুসারে পৈত্রিক বাসগৃহ, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি সকলই ভাগ করা হইল। হরনাথ এক অংশের মালিক হইলেন। এইবার তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন পর্যন্ত জমি-জায়গা তত্ত্বাবধান এবং সংসার-পরিচালনা প্রভৃতি শিবনারায়ণই করিতেন। হরনাথ কেবল শিবনারায়ণের নির্দেশমত টাকা পাঠাইতেন মাত্র।

এইবার সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়ায়, হরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। সোনামুখীর সংসার সম্বন্ধে কুসুমকুমারীরও বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। এতদিন পর্যন্ত তিনি

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা : পৃ ১৮১

গোলাপসুন্দরীর অঞ্চলচ্ছায়ায় নিশ্চিন্তমনে বাস করিতেছিলেন। সেই স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া সহসা অপসারিত হওয়ায়, কুসুমকুমারী কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তাহার পরই দৃঢ়-হস্তে তিনি সংসারের হাল ধরিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাগুণে অবিলম্বে সংসার শ্রী ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

পৃথক হইবার পর হরনাথের ভাগে তাঁহার স্বোপার্জিত অর্থে নির্মিত টিনের ঘরটি এবং পৈত্রিক গৃহের (অর্থাৎ জয়রাম ও ভগবতী দেবী-নির্মিত গৃহসমূহের) অর্ধেক অংশ পড়িল। তখন তাঁহার নিকট আগত ভক্তের সংখ্যা দিনের পর দিন বর্ধিত হইতেছে। তাঁহাদের অনেকেই দূর-দূরান্ত হইতে আসিতেন। এই সমস্ত ভক্তগণের অবস্থানের জন্য গৃহের অভাব উপলব্ধি করিয়া হরনাথ সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। অন্ততঃপক্ষে চারি-পাঁচটি কক্ষবিশিষ্ট একটি গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য এই কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইল না। এই সময় পৌত্রী মেনকুরানী পীড়িত হইল। ৮।৯ দিন ধরিয়া তাহার প্রবল জ্বরভোগ হইতে দেখিয়া হরনাথের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। সোনামুখীতে সে সময় ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিল না বলিয়া, কলিকাতা হইতে একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আসিয়া মেনকুর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মেনকুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া হরনাথ অতিশয় ব্যথিত হইলেন।

এই সময়ে রামরাখালবাবু সোনামুখীতে একটি পাকাবাড়ী নির্মাণ করিতেছিলেন। এখানে বসবাস করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। তথাপি কিসের জন্য যে তিনি সোনামুখীতে গৃহ নির্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন। তাঁহার বাটী নির্মিত হইতেছিল হরনাথের বাটী-সংলগ্ন উত্তরাংশের জমির উপর। ইতিমধ্যে প্রচুর ইট তৈয়ারি হইয়াছিল, কড়ি, বরগা, দরজা, জানালা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই আনীত হইয়াছিল। ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে বিজয়া দশমীর শুভদিনে তাঁহার গৃহের ভিত্তি খনন আরম্ভ হইল। এই সমস্ত কাজকর্মের তদারক করিবার জন্য ১২ই অক্টোবর তারিখে রামরাখালবাবু সোনামুখী আগমন করিলেন এবং হরনাথের

বাটীতেই অবস্থান করিলেন। বাটীতে ভক্তবৃন্দের অবস্থান করিবার গৃহের অভাব দেখিয়া রামরাখালবাবু প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার পাকাবাড়ীটি নির্মিত হইলে তথায় ভক্তবৃন্দ অবস্থান করিতে পারিবেন। তাঁহার প্রস্তাবে গৃহ-সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রামরাখালবাবু বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গৃহের পরিকল্পনাটিও ছিল বেশ বড়। মধ্যস্থলে ১৫′×১২′ পরিমিত একটি হল ও দুইপাশে ১২′×১২′ পরিমিত চারিটি কক্ষ-সমন্বিত এই গৃহটিতে বাহিরের-দিকে ২।৩টি কক্ষ নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা তাঁহার ছিল। বাটীর নিকট এইরূপ একটি বৃহদায়তন গৃহ থাকিলে, ভক্তবৃন্দের অবস্থানের সবিশেষ সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং দুই-একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে এই সংবাদ জানাইলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯১৩ সালে বৃন্দাবনধামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। আশ্রমের স্থান-নির্বাচন লইয়া অটলবিহারীর সহিত সিমলার হরনাথ-অনুরাগীদের মতান্তর উপস্থিত হইলে হরনাথ সিমলা-বাসীদের জানান যে, অটলবিহারীর নির্বাচিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত আশ্রম কখনও আশ্রম নামের যোগ্য হইবে না। এই উক্তিটিই প্রমাণ করে যে, অটলবিহারী কর্তৃক নির্বাচিত স্থান তাঁহার অনুমোদন লাভ করে নাই এবং স্থান নির্বাচনের মত সামান্য ব্যাপার লইয়া সিমলাবাসিদের সহিত মতবিরোধ হওয়ায় হরনাথ অটলবিহারীর প্রতি বিরক্তও হইয়াছিলেন। এজন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে অটলবিহারীকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দেখা যায়, ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে সিমলাবাসিগণ কর্তৃক আশ্রম প্রতিষ্ঠার চাঁদা আদায় হইলেও, এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃন্দাবনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ১৯১৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে তারাপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত এক পত্রে হরনাথ জানান যে 'বৃন্দাবন আশ্রম সম্বন্ধে অধিক

আর কি বলিব, আমি কোনও সংবাদ পাই নাই। অটলবিহারী শীঘ্রই বৃন্দাবন যাইবে।'[১]

এই পত্র হইতেই জানা যায়, রাধাবল্লভ শীল এক হাজার টাকায় শ্রীধাম নবদ্বীপে একখণ্ড জমি ঠিক করিয়াছিলেন এবং সেই জমি ক্রয় করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

এই বৎসর পূজার সময় রাজকোটের মহারাজা হরনাথকে একটি কাপড়ের পার্শেল প্রেরণ করেন এবং দ্বারকা ভ্রমণ করিয়া আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পৃথক হইবার পর নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া হরনাথ এমনই বিব্রত হইয়া পড়েন যে, দ্বারকা গমন সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা দান করিতে অসমর্থ হন।*

এই সময়ে কনিষ্ঠা কন্যা রাইমতী অসুস্থ হইয়া পড়ে। নরেশের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনুকূলের পত্রে এই সংবাদ জানিয়া হরনাথ অতিশয় চিন্তিত হন এবং রাইমতীকে দেখিতে যান। রাইমতীর জীবনের আশা ছিল না। কোনক্রমে এই যাত্রা রক্ষা পাইলে অন্নপথ্য দেওয়ার পর রাইমতীকে লইয়া তিনি আসানসোলে আসেন। আসানসোলে তারাপ্রসাদ ঘোষের পরিবারবর্গের আসিবার কথা ছিল। হরনাথের ইচ্ছা ছিল, তাহাদের সহিত রাইমতীকে দিল্লীতে নরেশের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু আসানসোলে আসিয়া তারাপ্রসাদবাবুর পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না বলিয়া রাইমতীকে সঙ্গে লইয়াই তিনি গয়াধামে গমন করেন এবং রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। এই স্থান হইতে রাইমতীকে দিল্লীতে নরেশের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে রাইমতী দিল্লীতে প্রথমে তারাপ্রসাদের বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া কথঞ্চিৎ শারীরিক শক্তি লাভ করিবার পর স্বামিগৃহে গমন করেন।

এই সময়ে দ্বিগুণ উৎসাহে পুরী আশ্রমের নির্মাণকার্য চলিতে থাকে। কর্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অপরিমিত উৎসাহের কথা

১। পাগল হরনাথ: পঞ্চম খণ্ড: পত্রসংখ্যা ১৯ (ইংরাজী অনুবাদ)

* পাগল হরনাথ: পঞ্চম খণ্ড: ১৫৩ পৃঃ (ইংরাজী অনুবাদ)

অবগত হইয়া হরনাথ অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং আশা করেন যে, বড়দিনের ছুটির সময় পুরী আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করা সম্ভব হইবে। গয়াধামে গমন করিয়া তিনি প্রথমে অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু ভক্ত-প্রবর রাখালদাসের ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে অনতিকাল মধ্যেই শারীরিক সুস্থতা লাভ করেন। ইহার পর রাইমতীকে দিল্লীতে পাঠাইবার সুব্যবস্থা হইলে এবং পুরী আশ্রমের স্থগিত কার্য পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইলে, তাঁহার মানসিক দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়। গয়াধামে অবস্থানকালে তাঁহার কেবলমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল কুসুমকুমারীর জন্য। পৃথক হইবার পর তাঁহাকে একাকিনী সোনামুখীতে সংসারে রাখিয়া তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল বলিয়া, নূতন ব্যবস্থায় কুসুমকুমারীকে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলির কথা চিন্তা করিয়া হরনাথ মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। সেজন্য পরম ভক্ত রাখালদাস বাবুর ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি গয়াধামে অধিক দিন অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন না। নভেম্বর মাসের শেষদিকে হরনাথ গয়া হইতে সোনামুখী প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তন কালের দুই একদিন পূর্বে তিনি সংবাদ পান যে, রাজকোটের মহারাণী পরলোকগমন করিয়াছেন।

সোনামুখীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হরনাথ দেখিলেন যে, রাম-রাখালের গৃহ-নির্মাণকার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। আয়োজন ও উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার আশা হইল যে, এইভাবে কাজ চলিলে দুই মাসের মধ্যেই গৃহ-নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবে। এই সময় আগামী দোল-পূর্ণিমায় (১৩২১ সালের ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯১৪ সালের ১লা এপ্রিল) পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু বৃন্দাবন আশ্রম সম্বন্ধে গোলযোগের তখনও অবসান হয় নাই। এই বিষয়ে বালাসোরের রাধাচরণ হরনাথের নিকট এক পত্র লেখেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া হরনাথ অতিশয় বিরক্ত হন এবং রাধাচরণের সহিত পত্রালাপ বন্ধ করিয়া দেন।*

* এইভাবে লেখার জন্য আমি রাধাচরণের সহিত পত্রালাপ বন্ধ করিয়াছি। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : ১৫৭ পৃঃ (ইংরাজী অনুবাদ)

১৯১৪ সালের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দ বিপুল উৎসাহে পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভক্তবৃন্দ ঐকান্তিক আগ্রহে এই শুভদিনটির প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। এই সময়ে লিখিত হরনাথের পত্রগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। তিনি তাঁহার বহু অন্তরঙ্গ ভক্তকে পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানান। উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট দিবসের কয়েকদিন পূর্বে হরনাথ সোনামুখী হইতে বাঁকুড়া গমন করেন। কুসুমকুমারী, সন্তোষকুমারী (জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ), মেনকুরানী এবং আরও কতিপয় ভক্ত তাঁহার সহিত গমন করেন। বাঁকুড়া হইতে মেদিনীপুরে গিয়া 'তমালিনী মা'কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বালাসোর গমন স্থির হয়। তারাপ্রসাদ ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের পুরী আসিবার সংবাদ হরনাথ পূর্বাহ্ণেই পাইয়াছিলেন। সিমলার ভক্তবৃন্দের কয়েকজনকে আসিবার জন্যও তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। মেদিনীপুর পৌঁছিবার পর ভক্তবৃন্দের অনুরোধক্রমে হরনাথ বালাসোর গমনের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন এবং দলবল সহ পুরী চলিয়া আসেন।

উৎসবের নির্দিষ্ট দিনের বেশ কিছুকাল পূর্বে হরনাথ পুরী আশ্রমে আগমন করায়, ভক্ত, অনুরাগী ও কর্মীবৃন্দের উৎসাহ শতগুণে বর্ধিত হইল এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা-উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট দিবসে সাড়ম্বরে পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল। নামসংকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ ভোজন প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। 'তমালিনী মা' অন্নপূর্ণার মত অকৃপণহস্তে অন্নদান করিলেন। সাত-আট দিন ধরিয়া এই উৎসবের জের চলিল। অবশেষে হরনাথ-অনাথ আশ্রমের সম্পাদক ফণিভূষণ বসুকে একাকী রাখিয়া সদলবলে পুরী হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৫।১৬ জন ভক্ত তাঁহার সহিত সোনামুখী পর্যন্ত আসিলেন কিছুদিনের জন্য হরনাথের সাহচর্য লাভ করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া। নির্দিষ্ট সময় অন্তে

তাঁহারা আপন আপন কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বালাসোর হইতে রাধাচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর স্থির হইল যে, আগামী ২রা কিংবা ৩রা বৈশাখ তারিখে হরনাথ বালাসোর গমন করিবেন। রাধাচরণ বিদায় লইবার পরও তিনি বিন্দুমাত্র বিশ্রাম পাইলেন না। কারণ, এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ দশ-পনের জন ভক্ত সোনামুখীতে আসিতেন। তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে এবং জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিতে হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে সদাসর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় ক্লান্তি অনুভব করিতে থাকেন। ইহার পর যখন একটি বিস্ফোটক উঠিয়া কুসুমকুমারীকে চলৎ শক্তিহীন করিয়া দিল তখন হরনাথের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। রাধাচরণের সহিত আলোচনায় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বালাসোরে গমন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু কুসুমকুমারীর বিস্ফোটক নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তিনি যাত্রা সম্বন্ধে কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। সারী ও অটলবিহারীর আগমনের ফলে আগত ভক্তবৃন্দের আদর-আপ্যায়নের কোনরূপ ত্রুটি অবশ্য হয় নাই।

সুদীর্ঘ এক পক্ষকাল পরে কুসুমকুমারী আরোগ্যলাভ করিলে ৬ই মে তারিখে হরনাথ তাঁহাকে লইয়া বালাসোর গমন-মানসে সোনামুখী বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পরদিন মেদিনীপুরে নামিয়া তমালিনী মাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা বালাসোরে গমন করিলেন। ইতিপূর্বে তমালিনীর মা ও তাঁহার পিতা অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। অনতিকাল মধ্যে তাঁহারা উভয়েই আরোগ্যলাভ করেন।* আরোগ্যলাভ করিবার পর তারাপ্রসাদ ঘোষ হরনাথ ও কুসুম-কুমারীকে একবার সিমলা গমনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন।

রাধাচরণ দাস ছিলেন বালেশ্বরের জমিদার। ইনি হরনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। বৃন্দাবন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতে হরনাথ ও ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল, রাধাচরণ দাস

* পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১০০ (ইংরাজী অনুবাদ)

তাহা জানিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, হরনাথ ইচ্ছা করিলে অটল-বিহারীকে ঘনবসতিপূর্ণ লোকালয়ের মধ্যে আশ্রমের স্থান-নির্বাচন-ব্যাপারে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। তাহা না করায় রাধাচরণবাবু হরনাথকে এক পত্র লেখেন। রাধাচরণের বক্তব্য পাঠ করিয়া হরনাথ তাঁহার উপর বিরক্ত হন এবং পত্রালাপ বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু শরৎকালীন মেঘের মত হরনাথের বিরক্তিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। তাই রাধাচরণের আমন্ত্রণে তিনি পুরী গমনের পথে বালেশ্বরে রাধাচরণকে দর্শন দিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। হরনাথ বালেশ্বরে আগমন না করায় রাধাচরণ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হরনাথের সোনামুখী প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই তিনি সোনামুখীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় অটলবিহারীর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং হরনাথ ও অটলবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার পরে তাঁহার দীর্ঘদিন-পোষিত ভ্রমের অপনোদন হয়। ফলে, বালেশ্বরে গমন করিবার জন্য হরনাথকে তিনি সকাতর অনুরোধ জানান। তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই হরনাথ বালেশ্বরে আগমন করেন।

বালেশ্বর হইতে সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে সিমলায় রাইমতীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পাইলেন। রাইমতী এই সময়ে সন্তানসম্ভবা ছিল বলিয়া, হরনাথ সঙ্গে সঙ্গে সিমলা যাত্রা করিলেন। হরনাথ সিমলায় আসিতেছেন শুনিয়া, সিমলাবাসী ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। অসুস্থ রাইমতীও পিতার আগমনবার্তা শ্রবণে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার রোগ-যন্ত্রণা যেন সহসা কমিয়া গেল। সিমলায় আগমন করিয়া হরনাথ প্রথমে রাইমতীকে দেখিলেন এবং তাহার চিকিৎসার সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে জানিয়া আশ্বস্ত হইলেন। স্নেহময় পিতৃদেবকে দেখিয়া রাইমতীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অথচ এযাবৎ কাল তারাপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাহার চিকিৎসার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়াও কোনরূপ আশার আলোক দেখিতে পান নাই। সেইজন্য সন্ত্রস্তচিত্তে

তাঁহারা হরনাথের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাইমতী আরোগ্যলাভ করিলে পর সিমলার ভক্তবৃন্দ হরনাথকে লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। এ্যালিন ভিলা এবং রিপন হাসপাতালের নিকট শৈলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। ভক্তবৃন্দের নিত্য সমাগমে এই স্থান আনন্দধামে পরিণত হইল।

হরনাথের সিমলায় অবস্থানকালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে ভারত সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই মহাযুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য হরনাথ উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেন এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধ-বিষয়ক বুলেটিন ঐকান্তিক আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিতেন।

ভাদ্র মাস পড়িবার পূর্বেই হরনাথ রাইমতীকে সঙ্গে লইয়া সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন। সন্তানসম্ভবা রাইমতীকে লইয়া ভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে জানিয়া, তিনি কলিকাতা হইয়া দেশে ফিরিবার পরিকল্পনা* পরিত্যাগ করেন। রাইমতীকে দেখিয়া জননী কুসুমকুমারীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার অক্লান্ত ও ঐকান্তিক যত্নে রাইমতী অবিলম্বে হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল।

রামরাখালবাবুর গৃহ-নির্মাণ কার্য এতদিন পর্যন্ত বন্ধ ছিল। সোনামুখীর গৃহ-নির্মাণ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছাও তাঁহার আর ছিল না। সুতরাং উক্ত অসমাপ্ত গৃহ ক্রয় করিয়া লইবার জন্য রামরাখাল-বাবু হরনাথকে অনুরোধ করেন। এই সঙ্গে বর্তমান বাগানবাটীর জমিটুকুও বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প তিনি প্রকাশ করেন। তদনুসারে উক্ত সম্পত্তিদ্বয়ের ন্যায্য মূল্য স্থির করা হইলে হরনাথ বুঝিলেন, মূল্যের টাকা এককালে দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। সেজন্য রাম-রাখালবাবুকে তিনি এককালীন দুই হাজার তিনশত টাকা দেন এবং বাকী টাকা পরিশোধ করিবার পূর্বে ভূসম্পত্তি রেজেস্ট্রি করিতে অস্বীকার করেন। হরনাথের ইচ্ছানুসারে রামরাখালবাবুর বিক্রয় কোবালা রেজেস্ট্রি হইল না। কিন্তু তিনি উক্ত অসম্পূর্ণ গৃহ

* হরনাথ সোভেনীর পৃঃ ৬৬।

প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই বৎসর আশ্বিন মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ রামরাখালবাবুর অর্ধসমাপ্ত গৃহটিকে সমাপ্ত করিয়া বাসযোগ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। রামরাখালবাবুর গৃহটির দেওয়াল সম্পূর্ণ হইয়াছিল, কড়ি, বরগা প্রভৃতিও আসিয়াছিল। কিন্তু ছাদের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় নাই।

হরনাথ প্রথমে একতলার ছাদ নির্মাণ করাইলেন। তাহার পর চূণ-সুরকি দ্বারা দেওয়াল প্লাস্টারিং করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মল্লিক[১] উপাধিধারী একজন ভক্ত এই কার্যের জন্য এককালে দুইশত পঞ্চাশ টাকা দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যে দশ-পনের টাকা প্রণামী হিসাবে প্রায়ই আসিতেছিল, তাহাতেও গৃহ-নির্মাণকার্যে যথেষ্ট সাহায্য হইতেছিল। অক্টোবর মাসের প্রথমদিকে একতলার ছাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

এই সময়ে অনুকূলের স্ত্রী ও মেনকুরানী অসুস্থ হইয়া পড়েন। অনুকূলের স্ত্রী এই সময়ে পূর্ণগর্ভা ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার জন্য হরনাথ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা একজন ভক্তকে লিখিত একটি পত্রে সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে।[২] রাইমতীও এই সময়ে গর্ভবতী ছিল। তাহারও জন্য হরনাথের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। নভেম্বর মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষকুমারী সম্বন্ধে হরনাথের উৎকণ্ঠা ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। এই মাসের প্রথম হইতেই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা প্রবল আকার ধারণ করিল। তদুপরি ৭ই নভেম্বর তারিখ হইতে যখন তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, তখন বাটীর সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। তৎসত্ত্বেও নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণধারণের ন্যায় স্থানীয় চিকিৎসকবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। ফলে, দুইদিন পরে সন্তোষকুমারী নির্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু প্রসবের অব্যবহিত পরেই

১। হরিদাস বসুমল্লিক। মাঝেরহাট স্টেশনে কাজ করিতেন।
২। Pagal Haranath, Part V Page 165

তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—সদ্য-প্রসূত সন্তানটিও মাতার অনুগমন করিল। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। [ভাগবত মিত্রের মতে, এই মৃত্যু ঘটে ১৯১০ সালে। এই ঘটনার পূর্বদিন ভাগবত মিত্র সোনামুখীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য অনুসারে জানা যায় যে, তিনি পরিবারবর্গের সহিত নৈনিতাল পাহাড় হইতে সোনামুখীতে আগমন করিয়া অনুকূলের স্ত্রীকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেন। তিনি দেখেন যে, প্রসব না হওয়াতে রোগিণীর এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যেন তখনই মৃত্যু হয়। বাড়ীতে রান্না বন্ধ হইয়াছিল। সোনামুখীতে আমরা সকলে পানাগড় হইতে পৌঁছিয়াছিলাম। স্নান করিয়া শিবমন্দিরের পূর্বদিকের ঠাকুরের (হরনাথের) এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহার করি এবং আহারান্তে সুচাঁদ কর্মকার দ্বারা পানাগড় (কারণ, ১৯১০ সালে ছোট রেল লাইন বি. ডি. রেলওয়ে খোলে নাই—এই লাইনটি ১৯১৫ সালে খোলা হইয়াছে) যাইবার জন্য গাড়ি ঠিক করিয়া, হরনাথের নিকট কলিকাতা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। হরনাথ অনুমতি দিলেন না। অধিকন্তু বলিলেন, সংসারে যাহা ঘটিবার ঘটুক, ইহার জন্য তুমি বিচলিত হও কেন? অনেকদিন পরে তুমি আসিয়াছ, তুমি চলিয়া গেলে আমার কষ্ট হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া এক সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। আমার সোনামুখীতে পৌঁছিবার পরদিন অনুকূলের স্ত্রী মারা গিয়াছিল।[১]]

ভাগবতবাবু এই প্রসঙ্গে হরনাথের বাটীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে অবশ্য মনে হয় না যে, শিবনারায়ণ ও হরনাথ তখন পর্যন্ত পৃথক হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি হরনাথের বাটীর যে পরিচিতি দিয়াছেন, তাহাতে (১) জয়রামের নির্মিত চারিখানি খড়ের চালাঘর, (২) ভগবতী দেবী নির্মিত ইটের দ্বিতলবাটী, (৩) হরনাথ দ্বারা খরিদা জমির উপর করগেট সিটের দ্বিতল-মাঠকোঠা প্রভৃতির বিবরণ দেখিলে মনে হয় যে, হরনাথ ও শিবনারায়ণ তখন একান্নবর্তীই ছিলেন এবং সেইজন্য বাড়ীর বিপদের সময় উভয় ভ্রাতার

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃষ্ঠা ৫৭

পরিবারবর্গের কেহই রন্ধনকার্য সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

হরনাথের বাটীর পরিচয়-দান প্রসঙ্গ যদি এইখানেই সমাপ্ত হইত, তাহা হইলে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাগবতবাবু এই প্রসঙ্গে রামরাখালবাবুর একতলা বাটী ক্রয় এবং রান্নাঘর নির্মাণ প্রভৃতির কথা লিখিয়াছেন। যদি অনুমান করা যায় যে, এই বাটী ক্রয় করার পরে ভাগবতবাবু এই অংশ লিখিয়াছিলেন এবং তাহাই স্বাভাবিক, তাহা হইলে অবশ্য কোন আপত্তি থাকে না। তাহা হইলেও কিন্তু সন্তোষকুমারীর পরলোকগমনের সাল সম্বন্ধে ভাগবতবাবু অভ্রান্ত মন।

ভাগবতবাবু অবশ্য ১৯১০ সালকেই সন্তোষকুমারীর মৃত্যুকাল বলিয়া সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেন নাই। পানাগড় হইতে কলিকাতা যাইবার কারণ প্রদর্শনকালে তিনি ১৯১০ সালের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু অন্যান্য বহু তথ্যের মত, ১৯১০ সালে বি. ডি. রেলওয়ে খোলে নাই। এই তথ্যটিকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিত্যাগ করিবার উপায় তিনি স্বহস্তেই বন্ধ করিয়াছেন অনুকূলের দ্বিতীয় বিবাহের সাল-তারিখ উল্লেখ করিয়া। তাঁহার মতে, অনুকূলের দ্বিতীয় বিবাহ নায়েকবাঁধ গ্রামে হয়, স্ত্রীর নাম স্নেহলতা, ১৩ই বৈশাখ ১৩২২ সালে বিবাহ হয়। অনুকূলের দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে ভাগবতবাবু-প্রদত্ত সন-তারিখ ব্যতীত অপর সমস্ত তথ্যই সত্য। সন-তারিখ সম্বন্ধে ভাগবতবাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করে স্বয়ং হরনাথের পত্র। এই পত্রে সুস্পষ্টভাবে তিনি লিখিয়াছেন, আমিও আগামী ২৮শে শ্রাবণ অনুর শুভবিবাহের দিন স্থির করিয়াছি।[১] পত্রের এই অংশটুকুই প্রমাণ করে ভাগবতবাবুর বর্ণনা অনুযায়ী অনুকূলের দ্বিতীয় বিবাহ বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয় নাই—অনুষ্ঠিত হয় ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসে।

১। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রখানির ইংরাজী অনুবাদ 'পাগল হরনাথ'-পঞ্চম খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রসংখ্যা ১০৯

১৯১০ সালে সন্তোষকুমারীর মৃত্যু হইলে ১৯১১ সালে রাইমতীর মৃত্যু হইয়াছিল ধরিতে হয়। কিন্তু হরনাথের পত্রই এই তথ্য প্রদান করে '২৩শে কার্তিক বৌমা গেলেন, আবার এই ২৩শে মাঘ রাইমতী চলে গেল।'[১] কিন্তু ভাগবত মিত্রের মতে, রাইমতীর মৃত্যু হয় ১৩২০ সালের ২৬শে মাঘ; অর্থাৎ, সন্তোষকুমারীর মৃত্যুর চারি বৎসরেরও কিছু অধিক কাল পরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্তোষকুমারীর মৃত্যু হয় ১৩২১ সালের ২৩শে কার্তিক এবং রাইমতীর মৃত্যু হয় ১৩২১ সালের ২৩শে মাঘ, অর্থাৎ সন্তোষকুমারী ও রাইমতীর মৃত্যুর বৎসর যথাক্রমে ১৯১৪ ও ১৯১৫ সাল।

হরনাথের যে সমস্ত পত্রের খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, এইগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। সেইজন্য অন্য উপায়ে ইহাদের যথার্থতা যাচাই করিয়া দেখা কর্তব্য।

অনুকূলের স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে হরনাথ ভাগবত মিত্রকে বিজয়া দশমীর শুভাশিস জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনুকূলের স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্রের খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহা ৩রা অক্টোবর ১৯১৪। পত্রখানি সোনামুখী হইতে লিখিত। আরও একখানি পত্রের খাম দেখিয়া জানা যায় উক্ত পত্রখানিও সোনামুখী হইতে একই তারিখে লিখিত।

প্রথমতঃ বিজয়ার শুভাশিস জ্ঞাপন করা হয় বিজয়া দশমীর দিবসে বা ইহার অব্যবহিত দুই-একদিন পরে। ১৩২১ সালের ১৩ আশ্বিন (২৯শে বা ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সাল) ছিল বিজয়া দশমী। সুতরাং ৩রা অক্টোবর তারিখে বিজয়া দশমীর শুভাশিস জ্ঞাপন করা অসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত পত্র দুইটিতেই অর্ধ-সমাপ্ত গৃহটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিবার জন্য হরনাথের সবিশেষ চেষ্টার উল্লেখ আছে।

১। সংগৃহীত পত্রাবলী : (ইংরাজী অনুবাদ) 'পাগল হরনাথ'—পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১০৬

আভ্যন্তরীণ এই বিষয়ে সাদৃশ্য হেতু পত্র দুইটি একই দিনে লিখিত বলিয়া মনে হয়। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিক হইতে এই গৃহনির্মাণ আরম্ভ হয়। সুতরাং সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ছাদ নির্মাণ করিয়া উক্ত গৃহটিকে বাসযোগ্য করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ভাগবতবাবুর বক্তব্যমত যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, ১৯১০ সালেই সন্তোষকুমারীর পরলোকগমন হয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি নৈনিতাল হইতে পানাগড় হইয়া সোনামুখী আসেন। অথচ ১৯০৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি যে মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনভোগী একজন কেরানী ছিলেন, ইহা ভাগবতবাবুর স্বলিখিত বিবরণী হইতেই জানিতে পারা যায় এবং আরও জানা যায়, পুরী আশ্রমের জমি রেজিস্ট্রির তারিখ ছিল ৩রা মে ১৯১০ সাল। এই দিনেই তাঁহাকে নৈনিতালে বদলি করা হয়। ৮ই নভেম্বর যদি পরিবারবর্গ সহ তিনি নৈনিতাল হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে মধ্যে নিশ্চয় একবার তাঁহাকে পূর্বতন কর্মস্থল হইতে পরিবারবর্গকে নৈনিতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। নূতন চাকুরির পক্ষে এত অল্প কালের মধ্যে এত ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তাঁহার পরিবারবর্গকে নৈনিতালে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আসেন নাই, তাহা হইলেও ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহার পক্ষে সপরিবারে নৈনিতাল হইতে সোনামুখী আসার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তাহা ছাড়া, হরনাথের নিজেরও ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে সোনামুখীতে আসার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না। যতদূর জানা যায়, এই সময়ে তিনি শ্রীনগর হইতে জম্মুতে আসিয়াছিলেন। ১৯১১ সালের ১৬ই।১৭ই ফেব্রুয়ারি জম্মু হইতে সোনামুখী হইয়া তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন।[১] এই পত্রে সোনামুখীতে আসিয়া কৃষ্ণদাসের উপনয়ন দিবার কথা আছে এবং ভাগবতবাবু যে তখন কলিকাতার টালাবাগান লেনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাও জানা যায়।

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৩৮, ৪১, ৪২ (ইংরাজী)

কৃষ্ণদাসের উপনয়ন দেওয়া হয় ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৯১১ সালের মার্চ মাসে। সুতরাং, খামের উপর ডাকঘরের মোহরের প্রমাণ অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া এই পত্রেই জানা যায়, ভাগবতবাবু তখন টালাবাগান লেনে অবস্থান করিতেছিলেন এবং সন্তোষকুমারী গয়ায় রাধিকাচরণের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। উপরোক্ত তথ্যসমূহ অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে, ভাগবতবাবু কথিত সন্তোষকুমারীর মৃত্যুকাল ১৯১০ সাল নহে, ইহা ১৯১৪ সাল। ১৯১৫ সালের প্রথম হইতেই ভাগবতবাবু নৈনিতাল হইতে কলিকাতায় বদলি হইয়াছিলেন। তাই ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে নৈনিতালের বাসা হইতে পরিবারবর্গকে দেশে লইয়া আসিতেছিলেন। নূতন স্থানে কর্ম আরম্ভ করিবার পূর্বে সপরিবারে হরনাথের শ্রীচরণ দর্শন করিবার মানসে পানাগড় হইয়া তিনি সোনামুখীতে আসিয়াছিলেন। সোনামুখী পৌছিবার পরদিনই সন্তোষকুমারীর ও তাহার সদ্যোজাত শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়।

সন্তোষকুমারীর অকালমৃত্যুতে হরনাথ অন্তরে নিদারুণ দুঃখ পাইলেন। মাতৃহীন মেনকুরানীর মুখখানি দেখিলেই তাঁহার সেই দুঃখের স্মৃতি শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সংসারে সংসারীর সাজ পরিয়া থাকিলে, দেবতাকেও যে সংসারের শোক, দুঃখ, তাপ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হয়, এই সময়ে হরনাথকে দেখিলে তাহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি হইত। সংসারী মানুষের ন্যায় ধীরে ধীরে হরনাথের শোকের উপশম হইতে লাগিল। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাইমতী নির্বিঘ্নে কন্যাসন্তান প্রসব করিলে, সন্তোষকুমারীর বিয়োগজনিত বেদনার উপর একটি সান্ত্বনার আবরণ পড়িল।

কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ই তারিখে (বাংলা ২৩শে মাঘ) রাইমতী যখন সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে পরলোকগমন করিল, তখন হরনাথের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রসবের পর একমাত্র ক্লান্তি ছাড়া তাহার দেহে অপর কোনরূপ রোগলক্ষণ দেখা যায় নাই। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত সে সুস্থভাবে উঠিয়া বসিয়া, সকলের সহিত চা খাইয়াছিল। তখন মৃত্যুলক্ষণ তো দূরের কথা, তাহার মুখে সামান্য

'আহা, উহু' শব্দও শোনা যায় নাই, চোখের দৃষ্টিতে কোন শারীরিক অস্বস্তির ছায়াপাত হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তাহাকে বেদানা খাইতে দেওয়া হইল। বেদানা খাইবার সময় সহসা সে স্থির হইয়া গেল, তখনও তাহার মুখে কোন প্রকার কাতরোক্তি শোনা যায় নাই বরং মুখের হাসিটি অম্লান ছিল। মৃত্যুর পরেও তাহার মুখ হইতে সেই হাসিটি মুছিয়া যায় নাই। দেখিলে মনে হইত যেন ঘুমাইয়া পড়িয়া মজার কোন স্বপ্ন দেখিতেছে।* তাই ওষ্ঠাধরে হাসির আভাস।

রাইমতীর পরলোকগমনে সোনামুখীর বাড়ীতে শোকের ঝড় উঠিল। কনিষ্ঠা কন্যাকে হারাইয়া কুসুমকুমারী পাগলিনীর মত হইলেন। ইহার উপর আবার নরেশচন্দ্র আসিয়া যখন পাগলের মত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অপরিসীম ধৈর্যশীল হরনাথের হৃদয়ও নিদারুণ শোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। রাইমতীর কন্যা-সন্তানটি মাতার মৃত্যুর পরেও কিছুদিন জীবিত ছিল। তাহার পর সে-ও মাতার অনুগমন করিল।

রাইমতীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অটলবিহারী এবং তাঁহার পত্নী সারীও বৃন্দাবনে নিদারুণ শোকক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। পত্রে তাঁহাদের নিদারুণ মানসিক অবস্থার কথা অবগত হইয়া হরনাথ সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। কিন্তু কুসুমকুমারীর অবস্থা দেখিয়া তিনি বিশেষভাবে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে পুরীতে লইয়া যাইবার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেলে, শোকের প্রকোপ কিছুটা কমিয়া আসিল। সময়ের ব্যবধানে সকল দুঃখ-শোকই তীব্রতা হারায়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে পদচারণা করিতে করিতে শোকের কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার জ্বালা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যায়। হরনাথের পরিবারও কয়েক মাসের মধ্যে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সংসার জীবনের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবার ইচ্ছা জন্মলাভ করিল। প্রথমেই প্রত্যক্ষগোচর হইল

* সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৫৭

পত্নীহারা অনুকূলের মানসিক অবস্থা। তাঁহার সংসার বিষয়ে বিতৃষ্ণা, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্যে জননী কুসুমকুমারীর হৃদয় সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। অনুকূলের মন সংসারমুখীন করিবার জন্য তিনি তাঁহার জন্য উপযুক্ত একটি পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে স্বামীকে অনুরোধ জানাইলেন। হরনাথও তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া অনুকূলের জন্য একটি পাত্রী নির্বাচন করিবার জন্য ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান করিবার পর ভবানীপুরের একটি কন্যার সংবাদ দেওয়া হইল। কন্যাটির বিষয় অবগত হইয়া, উক্ত কন্যাকে দেখিবার জন্য এবং দেখিয়া পছন্দ হইলে অনুকূলের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য হরনাথ প্রিয়ভক্ত ফণিভূষণকে নির্দেশ দান করেন। এখানে পাত্রী পছন্দ হইল না বলিয়া, অন্যত্র পাত্রীর সন্ধান করা হইতে লাগিল এবং নায়েকবাঁধ গ্রামে স্নেহলতা নাম্নী একটি অপূর্বসুন্দরী কন্যাকে পছন্দ করা হইল। কন্যাটিকে দেখিয়া হরনাথেরও ভাল লাগিল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ পাকা কথা দিলেন এবং শ্রাবণ মাসের ২৮শে তারিখে অনুকূলের বিবাহের দিন ধার্য করিলেন। শুভদিনে স্নেহলতার সহিত অনুকূলের শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হইল। এই বিবাহেও হরনাথ বেশ ভালভাবেই আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য প্রায় বারশত টাকার মতো খরচ হইয়াছিল।

অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ

অনুকূলের বিবাহের দিন ধার্য করিয়া উক্ত সংবাদ দানকালে হরনাথ তাঁহার এক ভক্তকে লিখিয়াছেন, 'এ বছরের মত দুর্বৎসর আমি আর দেখি নাই।' সূচনাতেই পরম স্নেহের পাত্রী রাইমতীকে হারাইতে হয় বলিয়া মনে হয়, তিনি বুঝি ১৯১৫ সালকেই দুর্বৎসর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যতদূর মনে হয়, হরনাথ বাংলা ১৩২২ সালকেই দুর্বৎসর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কারণ, এই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে সোনামুখী অঞ্চলে ব্যাপক অজন্মা হয়। ফলে, অধিকাংশ লোককে অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন যাপন করিতে হয়। ইহাদের দুঃখ দেখিয়া হরনাথের কোমল অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠে এবং এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে তিনি চেষ্টা করিতে থাকেন। অনাহারী বা অর্ধাহারী জনগণ নিত্য তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের প্রার্থনা শুধু দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন সংস্থানের জন্য। তাহাদের আবেদনের আকুলতা হরনাথের অন্তর স্পর্শ করিল এবং তিনি নানাবিধ কার্যে প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। ফলে, নিরতিশয় দরিদ্র কৃষক সাধারণ দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অনাহার ও অর্ধাহার নিবারণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সংস্থান করিতে সমর্থ হইল। তাঁহার মতে, অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য দুর্বৎসরই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এই সময়ে কাজ করাইলে বহু লোক অনাহার-জনিত মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পায়। সেইজন্য পুকুর কাটান, বাগান তৈয়ারি করা, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে লোকজনকে নিযুক্ত করিয়া হরনাথ তাহাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এইভাবে দরিদ্রের সেবায়, নিরন্নকে অন্নদানে ব্যয়িত হইল।

কার্তিক মাসে হরনাথ কুসুমকুমারীসহ বৃন্দাবন গমন করেন এবং অটলবিহারী ও সারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া পরলোকগতা সন্তোষকুমারী ও রাইমতীর আত্মার শান্তির কামনা করিয়া গয়াভোজ দান করেন। অগ্রহায়ণ মাসে

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রায় পাঁচশত লোককে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া উক্ত গয়াভোজের উপসংহার করা হয়।* পৌষ মাসে অনুকূলের স্ত্রীর জন্য হরনাথ 'শীতের তত্ত্ব' পাঠান। এই তত্ত্বের জিনিসপত্রের জন্য একশত পঁচিশ টাকার মতো ব্যয় হয়। এই বৎসর কৃষ্ণদাস প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান নবম শ্রেণী) উত্তীর্ণ হন। পৌষসংক্রান্তিতে জয়দেব-কেন্দুলির মেলা দেখিবার জন্য কুসুমকুমারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, হরনাথ তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দান করেন এবং স্বয়ং তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে সম্মত হন।

দেখিতে দেখিতে বাংলা ১২৩৩ সাল সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইল এবং নূতন বারতা লইয়া নববর্ষের আগমন হইল। পুরাতন বৎসরের সমস্ত জীর্ণ সঞ্চয় চৈতালী ঝড়ে ঝরাপাতার মত উড়িয়া গেল এবং নববর্ষের নব কিশলয়ের মত নূতন সম্ভাবনা সূর্যাভিনন্দন করিল। এই বৎসরের প্রথম হইতেই সুবৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গেল। আশ্বস্তচিত্তে হরনাথ ও কুসুমকুমারী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দ বহুদিন হইতেই তাঁহাদিগকে আপনাদের মধ্যে পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে ভাগবত মিত্রের আগ্রহ সমধিক জানিয়া হরনাথ এবার তাঁহারই টালার বাটীতে আগমন করিলেন। ভাগবত মিত্র ও তাঁহার পরিবারবর্গের আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহার বাটীতে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর হরনাথের জন্মদিন ১৭ই আষাঢ় আসন্ন হইয়া আসিল। এই সংবাদ অবগত হইয়া ভাগবত মিত্র মনে মনে তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে এক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া হরনাথের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আত্ম-প্রচারে বিমুখ হরনাথ প্রথমে ইহাতে সম্মতি দান করিলেন না। কিন্তু ভাগবত মিত্রের ঐকান্তিক অনুরোধের ফলে অবশেষে সম্মতি দান করিলেন। হরনাথের ইচ্ছাক্রমে ভাগবত মিত্র উৎসবের আয়োজন যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিলেন। অন্তরঙ্গ

---

* পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ১৭৩ (ইংরাজী)

ভক্তবৃন্দ ব্যতীত এই উৎসবের সংবাদ আর কেহ জানিতে পারিল না। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন ছিল।

নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বদিন হইতেই নূতন কর্মোদ্দীপনায় ভাগবত মিত্র এবং তাঁহার পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ মাতিয়া উঠিলেন। গৃহদ্বারে মঙ্গল কলস স্থাপিত হইল, আঙ্গিনা আলিম্পন-চিত্রিত হইল, ধূপ-ধুনার সৌরভে সমগ্র মিত্র-ভবন আমোদিত হইয়া উঠিল। ১৮ই আষাঢ় সূর্যোদয়ের পূর্বে মঙ্গল শঙ্খরবে হরনাথের আবির্ভাব-ক্ষণের শুভলগ্ন দিগ-দিগন্তে ঘোষিত হইল। নহবতের সুমধুর বাদ্যে ও ভক্ত নরনারী কণ্ঠ-নিঃসৃত জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রভাতী পূজার পর হরনাথ-কুসুমকুমারীর চা ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হইল। তাঁহাদের সেবার পর মিত্রগৃহিণী প্রসাদ পাইয়া মধ্যাহ্নকালীন পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন-কালে স্নান সমাধা হইলে হরনাথকে নববস্ত্রে বিভূষিত করা হইল এবং কুসুমকুমারীকে তাঁহার বামপার্শ্বে সংস্থাপিত করা হইল। এই যুগলমূর্তিকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইলে, পূজা ও আরতি করা হইল। অতঃপর তাঁহাদের ভোগের ব্যবস্থা করা হইল। হরনাথের নির্দেশক্রমে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, নারী ভক্তদের লইয়া কুসুমকুমারীও উপবেশন করিলেন। ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদেরও প্রসাদ পাওয়ার পালা চলিল। হরনাথ সকলকে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া প্রসাদ বিতরণ করেন, আর ভক্তদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মহানন্দে ভোজনপর্ব সমাধা করিবার পর হরনাথের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইল। এইভাবে সান্ধ্য পূজা ও নৈশ ভোগেরও ব্যবস্থা করা হইল। এই জন্মোৎসব সকল প্রকার বাহুল্য ও আড়ম্বর-বর্জিত হইলেও, কীর্তন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা ছিল। ভাগবত মিত্রের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় ইহা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইল। পরমারাধ্য ঠাকুরকে তাঁহার শুভ জন্মদিনে পূজার্চনা করিতে পাইয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দও বিশেষরূপে আনন্দিত হইলেন।*

---

* হরনাথ সোভেনীরে ভাগবত মিত্র এই উৎসবের আভাষ দান করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিস্তৃত বিবরণের জন্য বোম্বাই জন্মোৎসব পুস্তিকার ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জন্মদিন উৎসব পালনের বীজ এইভাবে ভাগবত মিত্র কর্তৃক রোপিত হইল। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে হরনাথের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব-অনুষ্ঠান ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহের সামগ্রাতে পরিণত হইল। ভক্তদিগের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ও আগ্রহে হরনাথ জন্মদিবস উৎসব নিত্য নূতন পরিকল্পনা ও সমারোহে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। হরনাথও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত এই উৎসবে হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। পরবর্তী কালে প্রত্যেকটি জন্মদিনে তিনি বিশ্ববার্তা (World Message) প্রেরণ করিতেন। বিশ্ব মানবের অন্তরে ব্যাপকভাবে প্রেমের উদ্বোধন করিতে এই বিশ্ববার্তাসমূহ প্রেরিত হইত। এইগুলি পাঠ করিলে বিশ্বমানবের-প্রতি হরনাথের প্রেম যে কত গভীর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।

ভাগবত মিত্রের গৃহে জন্মতিথি উৎসব সমাপ্ত হইবার পর হরনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জলবায়ুর পরিবর্তনে এই অসুস্থতা দূর হইতে পারে ভাবিয়া, ভক্তদের পরামর্শক্রমে হরনাথ কুসুমকুমারীসহ পুরী যাত্রা করিলেন। পুরীধামে হরনাথ অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্মাণ কার্য তখন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল। আশ্রমের চতুঃসীমা বেষ্টন করিয়া প্রাচীরটি তখনও কিন্তু নির্মিত হয় নাই। সমুদ্রের অনতিদূরে অবস্থিত এই আশ্রমের পরিবেশটি অতিশয় মনোরম। সেইজন্য অসমাপ্ত হইলেও এই আশ্রম-গৃহেই হরনাথ ও কুসুমকুমারী বসবাস করিতে লাগিলেন। এই বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই বর্ষাগম হইয়াছিল। শ্রাবণ মাসের আরম্ভ হইতেই অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। গত বৎসরের অনাবৃষ্টির পরে এই বৎসরের এই সুবৃষ্টি দেখিয়া হরনাথ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। অনাবৃষ্টি জনিত অজন্মার ফলে গত বৎসর যাহারা অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন যাপন করিয়াছিল, এই বৎসরে তাহাদের দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইল। তিনি সাময়িকভাবে দৈহিক অসুস্থতার কথা ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কোনরূপ উপশমই হইল না। কলিকাতা হইতে আসিবার পর

পনের-ষোল দিন পরেও শারীরিক অসুস্থতা উপশম না হওয়ায় তিনি বিরক্তচিত্তে সোনামুখীতে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কুসুমকুমারীর অনুরোধে তাঁহাকে আরও ৬।৭ দিন পুরীধামে অবস্থান করিতে হইল।

এদিকে সোনামুখী হইতে নিত্য পত্র আসিতেছে। সেই সমস্ত পত্রে তাঁহার জমি-জায়গার চাষ-বাস, পুষ্করিণী ও বাগানের অবস্থা সম্বন্ধে নিত্য নূতন সংবাদ আসিতেছে। সেইগুলি পাঠ করিয়া হরনাথ আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন। এই উৎকণ্ঠার বশে তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নটবর বিটকে নানারূপ উপদেশ ও নির্দেশসহ পত্র লিখিতেছেন। এই সমস্ত উপদেশ ও নির্দেশগুলি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, চাষবাস সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর অভিজ্ঞতা ছিল।

পল্লীবাসী যে সমস্ত গৃহস্থের সংসার-পোষণের একমাত্র উপায় কৃষিজাত দ্রব্যাদি, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, সারা বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলির অধিকাংশই বর্ষাকালে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাতের জন্য প্রয়োজনীয় ধানচাষের একমাত্র সময় বর্ষাকাল। তাহা ছাড়া, কলাই, কুমড়া, খাড়া, বেগুন, ভুট্টা, বড়ধনিয়া, ঝিঙ্গা, শসা প্রভৃতি নানাবিধ শাক-সবজি এই বর্ষাকালেই প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবী গৃহস্থ বর্ষাকালে উৎপন্ন কুমড়া ও কলাই সযত্নে রক্ষা করে—পূজা-পার্বণে লোকজন এবং ধান্যকর্তনের সময় জন-মজুরদের খাওয়াইবার জন্য। মৃত্তিকা সর্বদাই নরম থাকে এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রৌদ্রের তেজ অধিকাংশ সময়েই থাকে না বলিয়া, বর্ষাকাল বাঁশ ও কলার চারা রোপণের প্রশস্ত সময়। পল্লীবাসী গৃহস্থের নিকট বাঁশ একটি বিশেষ মূল্যবান সম্পত্তি, অথচ ইহার কোনরূপ উৎপাদন-ব্যয় নাই। অব্যবহার্য পতিত জমিতে শিকড়সমেত একটি বাঁশের খণ্ড বর্ষাকালে রোপণ করিলেই, কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটি ঝাড় হইয়া উঠে। পুষ্করিণীসমূহ বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। বর্ষার এই ঘোলা জলে অতি সহজেই

মাছের ডিম ফুটে। ফলে, অল্প ব্যয়ে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালে প্রচুর ঘাস জন্মে। গৃহপালিত গাভী ও বলদকে খাওয়াইলে একদিকে যেমন খড়ের ব্যয় কমিয়া যায়, অপরদিকে কাঁচা ঘাস খাইয়া গাভীদের প্রচুর দুগ্ধ হয়। দুগ্ধ-সংরক্ষণ-বিদ্যা পল্লীগ্রামে প্রচলিত না থাকিলেও, দুগ্ধ হইতে প্রচুর পরিমাণ ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পল্লীবাসিগণ অসময়ের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখে।

হরনাথের এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকারই কথা। বাল্যকাল হইতে তিনি যতদিন সোনামুখী বাটীতে ছিলেন, তাহার মধ্যে কোনও দিন চাষবাস করেন নাই এবং এই বিষয়ের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আগ্রহ ছিল বলিয়াও জানা যায় না। সুদূর কাশ্মীর রাজ্যে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং, কৃষিকার্যের সম্বন্ধে পল্লীবাংলার গৃহস্থদের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভের কোন সম্ভাবনাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু পুরী হইতে নটবর বিটকে লিখিত পথে তিনি যে সমস্ত উপদেশ ও নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয়ে তাঁহার যে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, কৃষিকার্যে সবিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন গৃহস্থেরও সেরূপ অভিজ্ঞতা সর্বত্র দেখা যায় না।

"করঞ্জবুনি ও রাউতারার জমি যাতে চাষ হয় তার ব্যবস্থা করবে। পুকুরগুলিতে অবিলম্বে গঙ্গার ডিম ফেলিবে।" বাঁশের চারা পোতা হয় নাই জানিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। সেইজন্য বাঁশের চারা সংগ্রহার্থ তিনি নটবরকে কাঁটাবাঁধে যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। কাঁটাবাঁধে গেলে বাঁশের চারা সংগ্রহও হইবে এবং জমিগুলিও দেখা হইবে। বাড়ীর পিছনের পুষ্করিণীর তীরে তিনি নারিকেল ও মর্তমান কলার চারা রোপণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বড় ধনিয়া ও ভুট্টার বীজ ছড়াইতে, খাড়া, ডিংলা (কুমড়া) ও বেগুন চারার চাষ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি উপদেশ দিয়াছেন।*

গৃহকর্তার পরিচালনাগুণে সংসার শুধু যে প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠে তাহা নয়, শ্রীমণ্ডিতও হইয়া উঠে। সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য যে

* পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১১৩। (ইংরাজী)

সমস্ত দ্রব্যাদির প্রয়োজন, সেগুলির অধিকাংশই যদি উৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে সংসারে আপনা-আপনিই স্বাচ্ছল্য আসে এবং পরিপূর্ণ স্বাচ্ছল্যের মধ্যেই সংসার শ্রী ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার জন্য যে দুরদৃষ্টির প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাহা লাভ করা সম্ভব হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও হরনাথের দুরদৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

এই বৎসর প্রচণ্ড বারিবর্ষণের ফলে ভাদ্র মাসে শালি নদীতে প্রবল বন্যা হয়। বন্যার জল হরনাথের বাড়ীর পশ্চাৎ দেশ পর্যন্ত উঠিয়া আসে। অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ ও বন্যার ফলে সোনামুখীর বহু ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়, হরনাথের টিনের বাড়ীর পশ্চাতে অবস্থিত একখানি ঘর পড়িয়া যায়, বাগানের চতুর্দিকের বেড়া নষ্ট হইয়া যায় এবং বহু গাছ ভূপতিত হয়। তাহাদিগকে সযত্নে উঠাইয়া খুঁটি দিয়া পুনরায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রবল বর্ষার মধ্যেও হরনাথের বাগানবাড়ীর গৃহ-নির্মাণকার্য কিন্তু অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল। এইরূপভাবে কার্য চলার ফলে বাগানবাড়ীটি অল্পকাল মধ্যেই সমাপ্ত হয়। ইহার পর তিনি বাগানবাড়ীর সংলগ্ন একটি রন্ধনশালা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কার্য আরম্ভ করেন। পূজার পরে রন্ধনশালার ভিত্তি খনন করা হইল এবং দ্রুতগতিতে নির্মাণকার্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে হরনাথ দিবসের অধিকাংশ কাল বাগানবাড়ীতেই অবস্থান করিতেন। এই সময়ে বাগানবাড়ীর সংলগ্ন একটি পুষ্করিণী খনন করাইবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হয়। বাগানবাড়ীর পূর্বভাগে বৃহদাকার একটি পুষ্করিণীর উপযুক্ত পরিমাণ আয়তন-বিশিষ্ট একখণ্ড ডাঙ্গা জমিও ছিল। উক্ত জমিটি মালিকের[১] নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতে থাকেন। ব্যবহারিক দিক দিয়া উক্ত জমিটির বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু হরনাথ যখন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত জমিটি বন্দোবস্ত লইতে বা খরিদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ

১। যে জমিটির উপর অনন্ত কুণ্ড খনন করা হয়, তাহা হরনাথ খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লন।

করিলেন, তখন জমির মালিকের ব্যবসায়-বুদ্ধি জাগ্রত হইল। তিনি মিথ্যা অজুহাতে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। হরনাথ যে জমি পছন্দ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই মূল্যবান জমি হইবে এবং অপেক্ষা করিলে অনেক বেশী মূল্য* পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি চিন্তা জমির মালিকের মনে উদিত হইল। হরনাথ তাহা বুঝিলেন। কিন্তু সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণনির্ভর হরনাথের ইহাতে দুশ্চিন্তা হইল না। তিনি জানিতেন, তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জমির মালিকের নিকট হইতে উক্ত জমি পাওয়া যাইবে। সেজন্য তিনি পুষ্করিণীর একটি পরিকল্পনা করেন।† পুষ্করিণীর আয়তন হইবে চারি বিঘার মত—ইহার দুই দিকে দুইটি বাঁধাঘাট থাকিবে। এই পুষ্করিণী খনন করিবার সময় বহু দরিদ্র নরনারী কার্য পাইবে এবং পুষ্করিণী খনন করা হইবার পর জনসাধারণের পানীয় জলের সংস্থান হইবে। হরনাথ জানিতেন যে, উক্ত স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইতে ব্যয় কিছু বেশী হইবে। কিন্তু সেজন্য তাঁহার বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি জানিতেন যে, তিনি নিমিত্তমাত্র—যিনি তাঁহার হৃদয়ে এই কার্য করিবার প্রেরণা দিয়াছেন, সেই সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ এই কার্য সম্পন্ন করাইবেন। অর্থের জন্য তাঁহার কোনদিন বিশেষ কোনরূপ দুশ্চিন্তা ছিল না। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যশালী ভক্তবৃন্দ তাঁহার সামান্য একটি ইঙ্গিতে অকাতরে শত-সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। কার্য আরম্ভ করিলেই চতুর্দিক হইতে অর্থ আসিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং তিনি জানিতেন, অর্থাভাবে তাঁহার কোন কার্যই অসমাপ্ত থাকিতে পারে না, তাঁহার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না এবং বস্তুতঃ তাহা হয়ও নাই।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে বাগানবাড়ী-সংলগ্ন রান্নাঘরের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইলে, পুষ্করিণীর পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত

* উচ্চমূল্য বলিতে এখানে মোটা রকমের সেলামী বুঝিতে হইবে।

† ভগবানদাস রণছোড়দাস মোদীকে লিখিত ইংরাজী পত্র দ্রষ্টব্য—পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ১৭৯ (ইংরাজী)

করিবার জন্য হরনাথ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এপ্রিল মাসে পুষ্করিণীর জন্য জমিটি সংগৃহীত হইল। গ্রীষ্মাধিক্যহেতু এই সময়ে পুষ্করিণীর খননকার্য আরম্ভ হইল না। পুষ্করিণী খননের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহাও এই সময়ে ছিল না। অবশ্য অল্পকাল মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত ভক্তবৃন্দ পুষ্করিণীর জন্য জমি সংগৃহীত হইয়াছে জানিয়া, পুষ্করিণী খননের ব্যয়নির্বাহের জন্য যথাসাধ্য অর্থসাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই কার্যের জন্য বোম্বাইনিবাসী ভক্তগণ এককালে চারি হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

১৯১৭ সাল হইতে হরনাথের জন্মদিবস উপলক্ষে উৎসব করিবার জন্য ব্যাপক আয়োজন চলিতে থাকে। সমস্ত ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে উৎসবের স্থান নির্বাচিত হয় পুরীর 'হরনাথ অনাথ আশ্রম'। এই উৎসবটিকে হরনাথ-ভক্তদের বাৎসরিক সম্মেলনে পরিণত করিবার জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা চলে এবং পূর্ব হইতেই নানারূপ প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অবশেষে সকলে একমত হইয়া উৎসবের কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া হরনাথের অনুমোদনের জন্য পাঠান। তিনি ১৭ই আষাঢ়ের পরিবর্তে ১৮ই আষাঢ় দিনটিকেই তাঁহার জন্মদিবস উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন।

তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ১৯১৭ সালের ৩রা জুলাই (বাংলা ১৩২৪ সালের ১৮ই আষাঢ়) তারিখে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বৎসরের জন্মোৎসবে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিরাট সংখ্যক ভক্ত যোগদান করেন। কটকের জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়চৌধুরী উৎসবের তত্ত্বাবধান-কার্যের এবং তদীয় ভ্রাতা টহলপ্রসাদ অতিথি-আপ্যায়ন ও ভোজের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতার অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন দেশবাসী ভক্তসমূহ নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন এবং সকলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠায় পুরীধামে হরনাথের জন্মোৎসব সাফল্যের সহিত প্রতিপালিত হইল। উৎসব-অনুষ্ঠানের সাফল্যে হরনাথ অতিশয় প্রীত হইলেন। সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইল, কয়েকজনকে বস্ত্রদান করা হইল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ হরনাথ

ও কুসুমকুমারীর পূজা ও আরতি করিলেন এবং আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী জন্মদিনের উপহার শ্রীচরণে অর্পণ করিলেন। যাঁহারা আসিতে পারেন নাই, ডাকযোগে প্রেরিত তাঁহাদের উপহার আসিয়া পৌঁছিল। পুরী-উৎসবে অনুকূল ও মেনকুরানী যোগদান করিয়াছিলেন।ঃ

উৎসবের পর পুরীধামে কিছুদিন অতিবাহিত করিরা হরনাথ সোনামুখী বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সোনামুখীতে তখন অসহ্য গরম। সমুদ্রতীরস্থ পুরীধাম হইতে আসার পর সেই গ্রীষ্ম আরও অসহ্য হইয়া উঠিল। হরনাথ অবিলম্বে বৃন্দাবন যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন বর্ষাকাল। বর্ষাকালে গৃহকর্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কৃষিকার্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। নভেম্বর মাসে কৃষ্ণদাস ছাপরায় গমন করিলেন। হরনাথ ছাপরা হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার জন্য মনে মনে পরিকল্পনা করিলেন।

কিন্তু এবারও বৃন্দাবন যাত্রা হইল না। তৎপরিবর্তে ভক্তদের আহ্বানে কলিকাতায় আগমন করিতে হইল। অবশ্য বৃন্দাবনের প্রধান আকর্ষণ অটলবিহারীর সাক্ষাৎলাভের সম্ভাবনা দেখা গেল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় গমন করিয়া হরনাথ জানিতে পারেন যে, অটলবিহারী তাঁহার দেশের বাটীতে আসিয়াছেন এবং হরনাথের কালনা গমনের সম্ভাবনা আছে জানিয়া কালনায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এবার হরনাথ একাকীই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কুসুমকুমারী, তদীয় ভগিনী মতিবালা ও মেনকুরানীকে লইয়া জয়দেব-কেন্দুলি দেখিতে গিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আসিতে পারেন নাই। ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ই।৮ই তারিখে হরনাথ কলিকাতা হইতে কালনায় শ্রীযুক্ত আনন্দলাল গোস্বামীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এখানে দুই-একদিন অবস্থান করিয়া পানাগড় হইয়া সোনামুখী গমন করেন। তাঁহার সহিত মানুর* স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা সোনামুখী গমন করেন।

ঃ আমার অভিজ্ঞতা : প্রথম খণ্ড : পৃঃ ৬০-৬৯

* তমালিনী মার আত্মীয়।

এবার কলিকাতায় গিয়া হরনাথ অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৯১৮ সাল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাশি হইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে বুকে বেদনাও বোধ হইত। ইহার ফলে যথেষ্ট কষ্ট হইত। কলিকাতায় যাইবার পর আবার অর্শরোগ আত্মপ্রকাশ করায় অতিশয় যন্ত্রণা হইত। কলিকাতা হইতে সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিবার পরেই কিন্তু সমস্ত রোগগুলি একে একে বিদায় হইল। কাশি নিরাময় হইল, বুকের বেদনাও রহিল না এবং অর্শের আক্রমণের বেগও অবিশ্বাস্যরূপে মন্দীভূত হইয়া উঠিল। মোটের উপর তিনি প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

দুই-একদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ হইতে আহ্বান আসিল। নারায়ণ ধর্মরাও নামে একজন ভক্ত তখন বহরমপুরে অবস্থান করিতেন। তাঁহার শ্যালকও বহরমপুরেই থাকিতেন এবং তিনিও হরনাথ ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে একজন ছিলেন। এই ভক্তদ্বয়ের আহ্বানে হরনাথকে কুসুমকুমারীসহ বহরমপুরে গমন করিতে হইল। কুসুমকুমারীর ইচ্ছা ছিল মেনকুরানীকে সঙ্গে লইবার জন্য। কিন্তু মেনকু এবার তাহার নূতন মাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। অনুকূলের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ইতিমধ্যে একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। নবজাত সেই ভাইটি নূতন মা ও মেনকুরানীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। এতদিন পর্যন্ত মেনকুকে কাছে পাইত না বলিয়া, স্নেহলতার মনেও একটা ক্ষোভ ছিল। এবার মেনকু যখন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার অঞ্চলতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের সবটুকু স্নেহে সে তাহাকে অভিষিক্ত করিল। মেনকু ও অনুকূলের শিশুপুত্রকে রাখিয়া যাইতে কুসুমকুমারীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভক্তের আহ্বানে সাড়া না দিয়া উপায় ছিল না।

বহরমপুর হইতে হরনাথ ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭শে তারিখে পুরী যাত্রা করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পুরীধামে দুই-একদিন অবস্থান করিয়া কটকে আসিবেন এবং কটকে দিন কয়েক অবস্থান করিবার পর কলিকাতা আসিবেন। কিন্তু সোনামুখী হইতে পক্ষাধিক কাল অনুকূলের কোন চিঠি না পাইয়া কুসুমকুমারী এতাদৃশ চিন্তান্বিতা

হইয়া উঠেন যে, হরনাথকে বরাবর কলিকাতায় আগমন করিতে হয়। মাদ্রাজ হইতে কয়েকজন নরনারী তাঁহার সহিত কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিয়া সোনামুখীর সর্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদ পাইয়া, কুসুমকুমারী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। হরনাথ তখন কলিকাতায় অধ্যাপক রামমূর্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে মনস্থির করিলেন। অধ্যাপক রামমূর্তি বহুদিন যাবৎ ঐকান্তিক আগ্রহে হরনাথকে একবারের জন্য তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। এইবার হরনাথ তাঁহার বহুপোষিত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণার্থে কুসুমকুমারীসহ তাঁহার ভবনে শুভ পদার্পণ করিলেন।[১]

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হরনাথ কলিকাতা হইতে সোনামুখীতে আসেন। কলিকাতায় তাঁহার হাত কাটিয়া একটি গভীর ক্ষত হয়। সোনামুখীতে আসিবার কয়েকদিন মধ্যে সেই ক্ষতটি নিরাময় হইয়া যায়। হরনাথ কিন্তু বেশীদিন সোনামুখীতে অবস্থান করিবার সুযোগ পাইলেন না। কলিকাতা হইতে রামরাখালবাবু তাঁহাকে আহ্বান জানাইলেন, হরনাথ-অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের এক সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার জন্য। ১৯১৬ সালে ভাগবত মিত্রের টালার গৃহে হরনাথের প্রথম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জীবিতাবস্থায় জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করা রীতিবিগর্হিত বিবেচনা করিয়া, হরনাথের কলিকাতাবাসী একদল ভক্ত এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ভাগবত মিত্র কাহারও কথা না শুনিয়া তাঁহার বাটীতে হরনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেন। জন্মোৎসব পালনের স্বপক্ষে তিনি যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন। জন্মোৎসব উপলক্ষে হরনাথের ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ বৎসরের মধ্যে একটিবারের জন্যও পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। ভাগবত মিত্রের এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ফণিভূষণ বসু, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ বাগচি, তুলসীচরণ ঘোষ, বিনোদবিহারী ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দে, রামচন্দ্র মিত্র,

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ১৮৮

ভবানীচরণ বসু, কালীপদ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ দাস, জ্ঞানদাচরণ দাস, কিরণচন্দ্র মৈত্র ও কিরণচন্দ্র দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ হরনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে সম্মতি দান করেন। রাওলপিণ্ডির নীরদবিহারী বসু এবং কটকের যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও এই উৎসবে যোগদান করেন।+

কিন্তু কলিকাতাবাসী অপরাপর ভক্তবৃন্দ ইহাতে যোগদান করিলেন না। তদুপরি 'হরনাথ বুক কমিটি'র কার্যসূচী লইয়াও ভাগবত মিত্রের সহিত বুক কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য রামরাখাল ঘোষ মহাশয় সমস্ত হরনাথ ভক্তও অনুরাগীদের ২৪শে মার্চ আহ্বান করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটান। হরনাথ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

ইতিমধ্যে ভগবানদাসজী হরনাথ-কুসুমকুমারী ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলকে বোম্বাই লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া হরনাথের সম্মতি ভিক্ষা করেন। ভক্তের আহ্বানে সাড়া না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ ভগবানদাসজী ও তাঁহার স্ত্রী বিমলা মোদীর সুগভীর ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় পাইয়া হরনাথ এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বিমলা মাকে 'যশোদা মা'-নামে অভিহিত করিতেন। তৎসত্ত্বেও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই যাত্রার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। কারণ, দোলের সময় কলিকাতা হইতে ভাগবত মিত্র, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার স্ত্রীর (হরনাথের মেজদাদা ও মেজবৌদির) সোনামুখী আসিবার কথা ছিল। তাঁহারা আসিবার পর তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া হরনাথ স্থির করিলেন যে, মে মাসের প্রথমদিকে বোম্বাই যাত্রা করা হইবে।

তদনুসারে ১৯১৮ সালের মে মাসে ভগবানদাসজী সোনামুখী আগমন করিয়া, তাঁহাদের সকলকে বোম্বাই লইয়া গেলেন। ভগবানদাসজীর বাটীতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই বাটীতে

+ বোম্বাই জন্মোৎসব, পৃঃ ৫৫

হরনাথ সপরিবারে মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। এইবারে তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইবাসী ভক্তদের মধ্যে একটা প্রবল উৎসাহের ভাব দেখা গেল। ক্রোড়পতি ধনকুবেরগণ রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার সেবার ও পূজার বন্দোবস্ত করিলেন। প্রতিদিন বিপুল সমারোহে ভোগার্চনা হইত। হরনাথ নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার এইবারের বোম্বাই অবস্থানকালে বোম্বাই-বাসিগণ প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিল।[১] মাসাধিক কাল বোম্বাইয়ে অবস্থান করিবার পর হরনাথ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সোনামুখী ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, বোম্বাইবাসিগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। তাঁহাদের আন্তরিকতায় হরনাথ মুগ্ধ হইলেন। পুরীধামে জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ জানাইলেন। অবিলম্বে তাঁহার সাহচর্য লাভ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বোম্বাইবাসী ভক্তগণ বিপুল সমারোহে এবারের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে, হরনাথ সম্মতি দান করিয়া বোম্বাই হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে চতুর্ভুজ শেঠ তাঁহাকে নগদ চারি হাজার পাঁচশত টাকা দিলেন।[২] এই টাকা হাতে আসায় রামরাখাল-বাবুর বাটী ক্রয় করা ও বাটীটিকে বাসযোগ্য করার সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা রহিল না। জন্মোৎসবের পর পুরী হইতে সোনামুখী গিয়াই প্রথমে বাড়ীটি রামরাখালবাবুর নিকট হইতে কোবালা করিয়া লইতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। এই বাড়ীর জন্য তিনি ইতিপূর্বে এক হাজার আটশত টাকা দিয়াছেন, এখনও দুই হাজার দুইশত টাকা দিতে হইবে। মোট চারি হাজার টাকার বিক্রয়-কোবলা রেজিস্ট্রি করিতেও তিনশত টাকার মতো খরচ হইবে। চতুর্ভুজ শেঠ মোটামুটিভাবে হিসাব করিয়াই বাড়ীর দাম বাবদ আড়াই হাজার টাকা এবং বাড়ী মেরামত করিবার জন্য দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

১। দ্রঃ পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১২৭
২। দ্রঃ পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১০৬

এই বৎসর জন্মোৎসবে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পুরীধামে ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল। উৎসবের দুইদিন পূর্বে হরনাথ-কুসুমকুমারী ও পরিবারস্থ অপর সকলে পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই আগমন-সংবাদ দিতে ভুল হওয়ায় স্টেশনে অভ্যর্থনা হয় নাই। উৎসবের পূর্বদিন বোম্বাইবাসী ভক্তগণের সহিত ভগবানদাস ও বিমলা মা পুত্রকন্যাগণ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় মহাসমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, শত সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে খাদ্য ও বস্ত্র দান করা হইল, রাজকীয় সমারোহে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। ভক্তদের আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠায় উৎসবের প্রতিটি অঙ্গই প্রাণবন্ত হইয়াছিল। উৎসবের পরদিন বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত হরনাথ পুরীধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। খড়্গপুরে আসিয়া বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দকে বোম্বাইগামী ট্রেনে উঠাইয়া দিবার সময় ভগবানদাস ও বিমলা মার সহিত অপর সমস্ত ভক্ত-নরনারীর হৃদয় বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল। বিমলা মার অশ্রু অজস্রধারায় উৎসারিত হইতে লাগিল। অশ্রুমুখী এই মহিলাটিকে সান্ত্বনা দান করিয়া হরনাথ বিষণ্ণচিত্তে সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসর হইতে ভাগবত মিত্রের যত্নে 'মোহনমুরলী'* নামক গানের পুস্তকের প্রচার আরম্ভ হয়।

সোনামুখীতে ফিরিয়া অল্পকাল মধ্যেই রামরাখালবাবুর বাড়ীটি ক্রয় করিবার জন্য তিনি মূল্যের টাকাসহ অনুকূলকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। অনুকূল রামরাখালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। রামরাখালবাবু সানন্দে বিক্রয়-কোবালা রেজেস্ট্রি করিয়া দিলেন।[১]

দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়া জুলাই মাসের ২৪শে।২৫শে তারিখে অনুকূল কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে হরনাথ হিসাব করিয়া দেখিলেন, গৃহটিকে বাসযোগ্য ও দ্বিতল করিতে হইলে আরও চারি হাজার টাকার মতো লাগিবে।[২]

---

* দ্রষ্টব্য :বোম্বাই জন্মোৎসব পুস্তিকা পৃঃ ৭০-৭১

১। দলিল কলিকাতায় রেজেস্ট্রি হয়।

২। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১৩৩

টাকার অভাবে তাঁহার কোন কার্যই কোনদিন বন্ধ থাকিত না। চতুর্ভুজ শেঠ-প্রদত্ত টাকা হইতে তিনি অনুকূলকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন। সুতরাং আরও দেড় হাজার টাকা তাঁহার হাতে ছিল। বাড়ীটির ছাদ ইতিপূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। এখন দরজা-জানালার কপাট বসাইয়া ও দেওয়াল, মেঝে প্রভৃতি পলস্তারা করা হইলেই একতলাটি বাসযোগ্য হয়। পলস্তারার কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি দরজা-জানালা প্রভৃতির জন্য মজবুত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে আসানসোল গমন করিতে মনস্থ করেন। আসানসোলে বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। সম্ভবত, ইঁহার নিকট হইতে কতক কাষ্ঠ ক্রয় করা হয়।

আগস্ট মাসে বোম্বাইবাসিনী বিমলা মোদী জন্মদিনের উপহার হিসাবে হরনাথকে একটি সুন্দর হাতঘড়ি, একটি কাপ ও একটি মনোগ্রাম পাঠান। উপহারগুলি পাইয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন এবং উপহারসমূহের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে পত্র লিখেন তাহাতে জানা যায় যে, তিনি আগস্ট মাস হইতেই বাড়ীটির পলস্তারা কার্য আরম্ভ করার এবং এক মাসের মধ্যে একতলাকে বাসযোগ্য করিবার পর দ্বিতলের কথা চিন্তা করিতেছেন। এই কার্য সমাপ্ত করিতে হইলে পূর্বের হিসাবমত যে অতিরিক্ত চারি হাজার টাকা লাগিবার কথা, সে সম্বন্ধে হরনাথের কোন চিন্তাই ছিল না। কৃষ্ণের ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে—অন্তরে এই স্থির বিশ্বাস লইয়া তিনি ঝাড়শুগুদার নন্দবাবা ও নগানন্দকে মজবুত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য পত্র লিখেন। ইতিপূর্বে তিনি কলিকাতায় শরৎচন্দ্র দে মহাশয়কে দরজা-জানালার মাপ দিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং আসানসোল ও ঝাড়শুগুদা হইতে যে কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা দ্বিতলের জন্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই সময়ে তিনি দ্বিতল-গৃহের জন্য ইষ্টক ক্রয় করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইষ্টক-ব্যবসায়ীদের কাহারও নিকট ইষ্টক মজুত ছিল না বলিয়া, ভাল ইষ্টক প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ জাগে।[১] তাহা হইলেও আগস্ট মাসে ইষ্টক

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : ইংরাজী পত্রসংখ্যা ১৩৪

তৈয়ারি করানো এবং পোড়ানো সম্ভব নয় বুঝিয়া, তিনি ইষ্টক ক্রয় করিবার চেষ্টা করেন।

খুব সম্ভব পূজার অব্যবহিত পরেই দোতলার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। সেইজন্য তিনি উপযুক্ত পরিমাণ চুণ-সুরকি সংগ্রহ করিয়া এক মাসের মধ্যেই একতলার নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত করিতে মনস্থ করেন। এই সময় কলিকাতায় 'হরনাথ বুক কমিটি'র একটি অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। সেই অধিবেশনে যোগদান করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাস সহসা অসুস্থ হওয়ায়, তাঁহার যাওয়া হয় নাই। দারুণ পেটের যন্ত্রণায় কৃষ্ণদাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে।[1]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হরনাথ শরৎবাবুকে দরজা-জানালার মাপ দিয়া আসিয়াছিলেন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সম্মুখীন কলিকাতা মহানগরীতে ১৯১৮ সালে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় বলিয়া, সেপ্টেম্বর মাসেও জানালার খড়খড়ি, স্ক্রু প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পৌঁছিল না। অথচ নীচুতলার চারিটি ঘরের পলস্তারা কার্য তখন শেষ হইয়াছে। এইগুলিতে অবিলম্বে দরজা-জানালার পাল্লা না বসাইলে ছোট ছেলেমেয়েরা এবং গরু-মহিষাদি গৃহপালিত পশু উন্মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কিছু নষ্ট করিয়া দিতে পারে. এই আশঙ্কায় ঐগুলি অবিলম্বে সোনামুখী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি ভূতনাথকে এক পত্র লিখেন। হরনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, কলিকাতার বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত খড়খড়ি পাওয়া সম্ভব হইবে না। সেই কারণে অবশিষ্ট খড়খড়িগুলির জন্য তিনি আসানসোলেও এক পত্র লিখেন।

ভূতনাথ তখন চন্দননগরে তারাপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে ছিলেন। গৃহ-নির্মাণ ব্যাপারে হরনাথ বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার পত্র লেখার বিরাম ছিল না। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বহুসংখ্যক পত্র তাঁহার নিকটে আসিত এবং সেই সমস্ত পত্রের উত্তর তিনি স্বহস্তে

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : ইংরাজী পত্রসংখ্যা ১৩৫

লিখিতেন। প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ ছাড়াও এই সমস্ত পত্রগুলিতে এমন অনেক সংবাদ থাকিত, যাহা দেখিলে মনে হয়, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও হরনাথের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

প্রত্যেকটি পত্রেই হরনাথ পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সব-কিছুই খুঁটিনাটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ও স্থানীয় প্রত্যেকটি ভক্তের নাম করিয়া সম্পর্ক অনুসারে আশীর্বাদ, প্রীতি বা শুভেচ্ছা জানাইতেন। ভাগবত মিত্রের পত্রে ফণীবাবুর প্রসঙ্গে তাঁহার রোগশান্তির কামনা করিতে এবং অসুস্থ আশুতোষ বাগচির সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেও তিনি ভুলেন নাই। আবার ময়নাপাখীর ও হলুদবুনি পাখীজোড়ার একটির মৃত্যুসংবাদ ভূতনাথকে জানাইতে যেমন ভুলেন না, তেমনই বাগানে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফোটার কথা জানাইতেও তাঁহার লেখনী ক্লান্তি অনুভব করে নাই।

আগস্ট মাস হইতে হরনাথ তাঁহার পূর্ব পরিকল্পনামত বাগানের নিকট পুষ্করিণী খনন করাইবার কার্যও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে চাষবাসের কার্য শেষ হওয়ায় মজুর-শ্রেণীর বহু নরনারী প্রতিদিন খনন কার্যে যোগদান করিতে লাগিল। এই সময় হরনাথের উপর সোনামুখী মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার বাড়ীর একতলার সমাপ্তি ও দোতলা নির্মাণের আয়োজন এবং পুষ্করিণী খননের উদ্যোগ দেখিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তাগণের ধারণা হইল হরনাথ একজন প্রভূত বিত্তশালী ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার উপর তাঁহারা বেশ মোটা রকম মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য করিলেন। ঐ ব্যাপারে অবশ্য তাঁহাদের বিশেষ কিছু অপরাধ ছিল না। কারণ, ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থে রাজকীয় সমারোহে হরনাথের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত। বোম্বাইবাসী ভক্তগণের, বিশেষতঃ চতুর্ভুজ শেঠ, রণছোড়দাস এবং বিটলদাস প্রভৃতির, অর্থে গৃহ-নির্মাণ এবং পুষ্করিণী খনন চলিতেছিল; কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের এ সংবাদ জানার উপায় ছিল না। সেজন্য তাঁহারা

হরনাথকেই প্রভূত বিত্তশালী ধারণা করিয়া অত্যধিক পরিমাণ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য করিলেন। হরনাথ এজন্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না। সেই কারণে হরনাথ আসল তথ্য জানাইবার জন্য বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দকে পত্র লিখিলেন এবং স্থির করিলেন, মিউনিসিপ্যালিটির অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবেন।[১]

জনসেবক হরনাথ

এই বৎসর পূজার সময় হইতেই সোনামুখী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। পূজার সময় হরনাথের শ্যালক গোলকের স্ত্রীর এরূপ প্রবল জ্বর হয় যে, তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে। তাহার বাটীর অপর সকলেও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়া তাহার করাল বাহু বিস্তার করিতে থাকে। সোনামুখী এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ইহা ব্যাপক মহামারীর আকার ধারণ করে। শত শত নরনারী এই মহামারীর ফলে প্রাণ হারায়, চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিতে থাকে। অর্থাভাবে রোগের চিকিৎসা হয় না, পথ্যের সংস্থান হয় না। দরিদ্র নরনারী অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। দীন-দুঃখীর এই করুণ অবস্থা দেখিয়া হরনাথের কোমল প্রাণে নিদারুণ ব্যথা বাজিল। রোগার্ত নরনারী যাহাতে রোগের ঔষধ ও পথ্য পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে। তিনি বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট দরিদ্র নরনারীর জন্য রোগের ঔষধ ও পথ্য চাহিলেন। তাঁহার অনুরোধকে আদেশ জ্ঞান করিয়া, বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দ একদফা ঔষধ ও পথ্য পাঠাইলেন। হরনাথ মুক্তহস্তে সেই সমস্ত ঔষধ ও পথ্য রোগাক্রান্ত দরিদ্র নরনারীদিগকে বিতরণ করিলেন। ঔষধের গুণে বহুলোক রোগমুক্ত হইল। কিন্তু প্রেরিত ঔষধের তুলনায় ইহার চাহিদা ছিল বহুগুণ বেশী। সুতরাং পুনরায় ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন অনুভব হইল। আবার

১। রণছোড়দাসকে লিখিত ১৩৭নং পত্র। দ্রঃ পাগল হরনাথ : পঞ্চম : ইংরাজী অনুবাদ

এক হাজার টাকা মূল্যের ঔষধ ও পথ্য বোম্বাই হইতে আসিল। এইগুলিও অবিলম্বে নিঃশেষ হইয়া গেল। সুতরাং হরনাথের অনুরোধে বোম্বাইবাসিগণ আবার একদফা ঔষধ ও পথ্য পাঠাইলেন। এইভাবে বোম্বাইবাসিগণ প্রদত্ত চারি হইতে পাঁচ হাজার টাকার ঔষধ ও পথ্য সাহায্যে হরনাথ মহামারীর আকারধারী ম্যালেরিয়াকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন। ঔষধটি সম্বন্ধে হরনাথ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে ডাক্তার বা বৈদ্যের প্রয়োজন হয় না। রোগের অবস্থা বিবেচনা করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। রোগ আক্রমণের পূর্বে বা পরে এবং রোগাক্রান্ত হইলে যে কোন অবস্থায় ঔষধটি সেবন করিলেই সুফল ফলিবে।[১] এই অত্যাশ্চর্য ঔষধের সাহায্যে হরনাথ বহুসংখ্যক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নরনারীকে আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন। আরোগ্য-লাভান্তে শত শত কণ্ঠ তাঁহার জয়ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিলে, তিনি তাহাদিগকে বোম্বাইবাসী নরনারীগণের ঔদার্যের কথা বলিলেন এবং যাহাদের দানে তাহারা রোগমুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মঙ্গলকামনা করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার বোম্বাইবাসী ভক্তদের বদান্যতার কথা রোগমুক্ত নরনারীর কণ্ঠে দিক-দিগন্তে প্রচারিত হইল। হরনাথ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তাঁহার পত্র হইতে জানা যায় যে, প্রতিদিন পাঁচশত হইতে ছয়শত নরনারী রোগের ঔষধ ও পথ্য পাইত।[২] ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়া তাহাদের রোগমুক্তি ঘটাইয়া হরনাথ অপরিমিত আনন্দলাভ করিতেন। কৃষ্ণদাস ও মেনকুরাণীও এই সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহারাও উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া সুস্থ হইয়া উঠে।

রোগের প্রকোপ কমিবার পর সোনামুখীতে নিদারুণ বস্ত্রাভাব দেখা দিল। শীতবস্ত্র দূরের কথা, দরিদ্র নরনারীগণের পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। কারণ, এই সময় কাপড়ের দর এরূপ উচ্চ হয় যে, ইহা

১। ঔষধটির নাম হরনাথ লিখেন নাই। যতদূর জানা যায়, জ্বরঘ্ন ঔষধ হিসাবে বোম্বাই হইতে Edward's Tonic আসিয়াছিল।

২। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১৪৪ (ইংরাজী অনুবাদ)

দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। অথচ বস্ত্রের সরবরাহ পূর্বাপেক্ষা বেশীই ছিল। স্থানীয় ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত মুনাফার আশায় অতি উচ্চমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিত। তখনকার দিনে প্রতি জোড়া কাপড় ছয় টাকা হিসাবে বিক্রয় করিত। ইহাতে হরনাথ স্থানীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং কলিকাতা হইতে অন্ততঃপক্ষে দুই হাজার টাকার কাপড় আনিয়া কলিকাতার দরে বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফালাভের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে হরনাথ ভাগবত মিত্রকে দুই হাজার টাকার মতো কাপড় এক মাসের জন্য ধারে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য এক পত্র দিলেন।[১] ভাগবত মিত্র তাঁহার আদেশ পালন করেন এবং অনতিবিলম্বে কাপড়ের গাঁট সোনামুখীতে প্রেরণ করেন। এই সমস্ত কাপড় কলিকাতার দরে বিক্রয় করার ফলে একদিকে যেমন দরিদ্র নরনারীগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, অপরদিকে তেমনি সোনামুখীর বাজারে বস্ত্র ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত মুনাফার লোভ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, বস্ত্রসঙ্কট কাটিয়া যায়।

১৯১৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলা দেশের তৎকালীন গভর্নর বিষ্ণুপুরে আগমন করিতে মনস্থ করেন। এই আগমন উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। হরনাথকেও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই নিমন্ত্রণপত্রে তাঁহাকে ঠাকুর হরনাথ নামেই অভিহিত করা হয়।[২]

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১৪৫

পত্রখানি বিষ্ণুপুর হইতে প্রেরিত হয় ৩০শে নভেম্বর, সোনামুখী পোস্ট অফিস হইতে বিলি হয় ১লা ডিসেম্বর ১৯১৮ তারিখে; খামের উপর ঠিকানা লিখিত ছিল Thakur Haranath, Sonamukhi ঠাকুরের পত্রেও জানা যায়, গভর্নরের আগমন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। সংগৃহীত পত্রাবলী দ্রষ্টব্য। এই পত্রসংলগ্ন খামের উপর যে তারিখ পাওয়া যায়, ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৮, পত্রসংখ্যা ৬৩

২। পত্রখানির অবিকল নকল দেওয়া হইল :—

The presence of Thakur Haranath is requested at the Reception Pandal at 10 a. m., on Wednesday, the 4th

হরনাথ অবশ্য এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, এই সময়ে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কোথাও যাইবার কথা পর্যন্ত তিনি চিন্তা করিতে পারেন নাই। এমনকি কৃষ্ণদাস ও মেনকুর স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে স্থান-পরিবর্তনের জন্য কলিকাতা যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াও যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। তবে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে তাঁহার বিষ্ণুপুর যাত্রার কথা ছিল। কারণ, ভাগবত মিত্রকে কাপড়ের জন্য লিখিত চিঠির উত্তর বিষ্ণুপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ঠিকানায় দিবার জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন।[১]

যাহা হউক, হরনাথের কৃপায় সোনামুখী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু দরিদ্র নরনারী ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল এবং যথোপযুক্ত পথ্যও পাইল। তাহা ছাড়া, নিদারুণ শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে বস্ত্রাদি কিনিবার সুযোগ লাভ করায়, তাহাদের মহা উপকার সাধিত হইল। দরিদ্র নরনারীদের অনেকেই বোম্বাইবাসিগণ কর্তৃক প্রদত্ত শীতবস্ত্রাদি বিনামূল্যে পাইল।[২] এজন্য ভক্তদের মধ্যে প্রভুদাসজী, বিঠলদাসজী ও ভগবানদাসজীর প্রতি হরনাথ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। সেই প্রসন্নতা তাঁহার অতিশয় প্রিয় পরম ভক্তিমতী বিমলা মাকে লিখিত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে "Dear mother, God alone knows how happy I am now-a-days seeing thousand poor sufferers are daily getting well through the kind help of you. Five to six hundred people are daily getting medicines here and they are getting well instantly.

December, 1918, on the occasion of the visit of His Excellency, the Governor of Bengal.

Vishnupur, The 28th November, 1918 Block E/28

P. C. Ghose
President,
Reception Committee.

১। ১৪৫নং পত্র—পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : (ইংরাজী অনুবাদ)

২। উক্ত পত্রে জানা যায়, বোম্বাইবাসী ভক্তগণ ঔষধের সহিত সাগু, বার্লি, কোট এবং আরও নানাপ্রকার সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

May Krisna give you full reward for this kind help. Thousands are daily praying for long life and full happiness of all my fathers and mothers of Bombay. May the prayer of these sufferers be heard by our Lord."[১]

কৃষ্ণদাসের পরীক্ষা

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণদাস কটক যাত্রা করিল, কিন্তু কটকে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া উঠে। এজন্য হরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই বৎসর কৃষ্ণদাসের ফাইন্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষারও আর বেশী দেরী নাই। অথচ কৃষ্ণদাস অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে জানিয়া, স্নেহময় পিতার দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না। তিনি অধীর আগ্রহে কৃষ্ণদাসের কুশল সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ-বার দিন মধ্যেই কৃষ্ণদাসের আরোগ্যের সংবাদ পাইয়া তিনি অনেকটা স্বস্তি লাভ করিলেন এবং তাহার পরীক্ষার ফি ত্রিশ টাকা জমা দিলেন। কৃষ্ণদাসকে সে সংবাদ জানাইয়া সাবধানে থাকিবার জন্য এবং খেলাধূলায় বেশী মন না দিয়া মনোযোগসহকারে পড়াশুনা করিবার জন্য পত্র দিলেন। বাড়ীতে অনুকূল ও মেনকুরাণীও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এডওয়ার্ডস টনিক ব্যবহার করিয়া ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল। অনুকূল অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই দুর্বল শরীর লইয়াই তাহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত দেখিয়া পিতৃহৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।*

জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে হরনাথ ও কুসুমকুমারী কলিকাতা গমন করেন অনুকূল ও মেনকারানীও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। কলিকাতায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ই।১১ই তারিখে তাঁহারা সকলেই সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন। এখনও

১। বিমলা মাকে ইংরাজীতে লিখিত পত্র, পত্রসংখ্যা ১৪৬, পাগল হরনাথ পঞ্চম খণ্ড

* দ্রঃ পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ২১২ (ইংরাজী অনুবাদ)

পর্যন্ত হরনাথের দ্বিতল-ভবনের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয় নাই। পুষ্করিণীর খনন-কার্যও অনেক বাকী ছিল। বোম্বাইবাসী ভক্তগণ গৃহ ক্রয় ও বাসযোগ্য করার জন্য সাড়ে চারি হাজার টাকা এবং পুষ্করিণী খননের জন্যও অনুরূপ পরিমাণ টাকা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তাঁহার নির্দেশমত দরিদ্র ও অনাথ নরনারীগণের ঔষধ ও পথ্যের জন্যও তাহারা চারি হাজারেরও বেশী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে বোম্বাইবাসীদের নিকট হইতে গৃহ-নির্মাণ ও পুষ্করিণী-খননের জন্য আরও অর্থসাহায্য চাহিতে হরনাথ সঙ্কোচবোধ করিতে লাগিলেন। অথচ আরও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা ব্যতিরেকে উক্ত কার্য দুইটি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য তিনি সিমলাবাসী সন্তোষকুমার রায়কে গৃহ-নির্মাণ এবং পুষ্করিণী-খনন কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক পত্র লিখেন। গৃহ নির্মিত হইতেছিল আগত ভক্তবৃন্দের অবস্থানের সুবিধার জন্য। প্রতিদিন বহুসংখ্যক ভক্ত তাঁহার দর্শনাভিলাষে সোনামুখীতে আগমন করিত, গৃহাভাবে তাহাদের অবস্থানের অত্যন্ত অসুবিধা হইত।

সেই অসুবিধার নিরসনকল্পেই হরনাথ দ্বিতল-ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়া কার্যারম্ভ করেন, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য মধ্যপথে সকল কার্য বন্ধ হইয়া যায়। কি ভাবে এই দুইটি বিরাট ব্যয়বহুল কার্য সম্পূর্ণ হইবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। অপর একজন বিশিষ্ট ভক্ত ভাগবত মিত্রকে লিখিত পত্রে তাঁহার এই অস্থিরতা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাবা, সত্যই পুকুর আর বাড়ী আমায় পাগল করে তুলেছে। কোন রকমে ৫।৬ হাজার টাকা পেলে আমি পাপমুক্ত হই।'[১] এই সময় কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ফুলবাবু হরনাথের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; তাহা অবগত হইয়া হরনাথ লিখেন, 'ফুলবাবু যদি তার statue-এর টাকাটা আমায় পুকুর করিবার জন্য দেয়, তা হলে আমাকে জীবন্ত গাঁথিয়া রাখিতে পারে।'

১। সংগৃহীত পত্রাবলী নং ৬৪, খামের তারিখ ২৫।২।১৯; এই পত্রের ইংরাজী অনুবাদের জন্য পাগল হরনাথ—পঞ্চম খণ্ডের ১৫১নং পত্র দ্রষ্টব্য।

মার্চ মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ কৃষ্ণদাসের সহিত ছাপরায় গমন করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে ছাপরায় গমন করিতে হয়। কৃষ্ণদাসের পরীক্ষা যতদিন ধরিয়া চলিল, ততদিন হরনাথও ছাপরায় অবস্থান করিলেন। কৃষ্ণদাস ভালভাবেই পরীক্ষা দিল। হরনাথের আশা হইল, কৃষ্ণদাস পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবে। পরীক্ষার পূর্বে অতিশয় খোস-পাঁচড়া হইয়াছিল বলিয়া, কৃষ্ণদাস অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। সেইজন্য হরনাথ তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দিতে ভরসা করেন নাই।

ছাপরা যাইবার পূর্বে হরনাথ বোম্বাইয়ের বিঠলদাসজীকে এক পত্র লিখেন। এই পত্রে খুবসম্ভব দ্বিতল-ভবন নির্মাণ এবং পুষ্করিণীর খনন কার্যের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা একটু বেশীমাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নটবরদাসজী সেই অংশটুকু পাঠ করিয়া অতিশয় মর্মাহত হন এবং ভগবানদাসের পত্নী বিমলা মার কোমল হৃদয় বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। লীলা সংবরণের আশঙ্কায় অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তিনি হরনাথকে এক পত্র লিখেন। এই পত্রে পরম স্নেহময়ী বিমলা মার নিদারুণ মনোবেদনার কারণ অবগত হইয়া, হরনাথ অতিশয় ব্যথিত হন এবং বিমলা মাকে সান্ত্বনা দান করিয়া লিখেন যে, "I do not fear to execute thousand and one such big work. Dear mother, my only request, please forget what I have unknowingly written in my letter and be cheerful. I am not anxious about anything or any work. Through my Lord's grace all my works will be completed in time. Please never worry about me or my words."[১]

এই সময়ে বাসুদেব নামে একজন ভক্ত হরনাথ-কুসুমকুমারীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত একটি লকেট প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা করেন।[২]

ব্যবসায়ের ভিত্তিতে এই লকেট প্রস্তুত করিলে, প্রত্যেকটি হরনাথ

১। বিমলা মাকে লিখিত ইংরাজী পত্র: পাগল হরনাথ: পঞ্চম খণ্ড: পত্রসংখ্যা ১৫২

২। বাসুদেবের পূর্ণনাম—বাসুদেব ঘোষ

অনুরাগী ও ভক্ত অন্ততঃপক্ষে একটি হিসাবে লকেট কিনিবে এবং তাহা হইলে আশ্রমের জন্য প্রচুর অর্থাগম হইবে। বাসুদেবের এই পরিকল্পনা কলিকাতার ভক্তবৃন্দ, বিশেষতঃ ভাগবত মিত্র, ঐকান্তিক আগ্রহে সমর্থন করিয়া সম্মতি লাভের জন্য নিবেদন করিলে, হরনাথ উৎসাহের সহিত ইহা সমর্থন করেন। বাসুদেবের মস্তিষ্কে এই পরিকল্পনা জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া, হরনাথ তাহার উচ্চ প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠেন—'ধন্য বাসুদেব, যার এ চিন্তা মস্তকে আসিয়াছে। এর কপিরাইট রাখিবে, তা হলেই লাভবান হবে। কৃষ্ণ করুক তোমাদের চেষ্টা সফল হ'ক এবং ডাইসটি সুন্দর হোক।'

হরনাথ লকেট সম্বন্ধে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই লকেট বিক্রয় করিয়া ভক্তগণ অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই বিপুল অর্থে পুরী আশ্রমের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইত। পরবর্তী কালে হরনাথ-কুসুমকুমারীর একক বা যুগল এবং বিভিন্ন সময়ের প্রতিকৃতি-সমন্বিত বহুবিধ লকেট প্রস্তুত হইতে থাকে এবং ইহার ব্যবসায়ে বহু ভক্তের অন্ন-সংস্থান তথা বহু আশ্রমের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ হয়।

হরনাথ লকেট সম্বন্ধে আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই লকেট সকল স্থানের ভাইদের মধ্যে একটা পরিচয়ের মহৎ উপায় হইবে। পরবর্তী যুগে এই ভবিষ্যদ্বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। হরনাথের জীবিতকালেই বিভিন্ন গঠনের এবং নানারূপ প্রতিকৃতি-সমন্বিত লকেট হরনাথ-ভক্তদের মধ্যে বহুল প্রচারিত হয়। হরনাথ-ভক্তগণ এই লকেট ধারণাকে সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া থাকেন এবং সন্তান-সন্ততিগণকেও এই লকেট ধারণ করিতে উৎসাহিত করেন। কালক্রমে এই লকেট ধারণ হরনাথ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয় এবং লকেটের মাধ্যমেই পরস্পরকে হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করিতে থাকেন।

এই সময়ে কটক হইতে 'হরনাথ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। এই পত্রিকায় হরনাথ ও কুসুমকুমারীর যুগলমূর্তির

ফটো মুদ্রিত করিবার পরিকল্পনা হয়। হরনাথ সানন্দে ইহাতে সম্মতি দান করেন।[১]

বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দ হরনাথের পত্রে দ্বিতল-ভবন এবং পুষ্করিণীর বিষয় অবহিত হইয়া, তাঁহার ইচ্ছা পরিপূরণার্থে পূর্ণোদ্যমে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিঠলজী অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। অযাচিতভাবে এই অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া হরনাথ একদিকে যেমন বিস্মিত হইলেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহার প্রতি বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ বিঠলদাসজীর, অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অনতিবিলম্বে গৃহ-নির্মাণকার্য ও পুষ্করিণী-খননকার্য আরম্ভ হইল। প্রতিদিন শতাধিক খননকারী নিযুক্ত হওয়ায় পুষ্করিণী খনন-কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সমস্ত কার্যের তদারক করিবার ভার অনুকূলের উপর অর্পণ করিয়া, হরনাথ কুসুমকুমারীসহ উড়িষ্যা ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং উড়িষ্যার কতিপয় স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া পুরীতে আগমন করেন। পুরী হইতে তাঁহারা সোনামুখীতে আসিয়া দেখেন যে, বোম্বাই হইতে বিমলা মা কর্তৃক প্রেরিত একটি আমের পার্শেল আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই বৎসর মে মাস হইতেই জন্মোৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে। কলিকাতা উৎসবের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায়, স্বাভাবিক-ভাবেই ভাগবত মিত্রের উপর উৎসবের সকল দায়িত্ব আসিয়া পড়িল এবং তিনি সানন্দে এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে সম্মত হইলেন। উৎসবের কার্যসূচী-রচনার ব্যাপারে ভাগবত মিত্র একবার কলিকাতায় আসিবার অনুরোধ জানাইলে, হরনাথ ভাগবতের উপরেই সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি কেবলমাত্র কলিকাতার মতো বিখ্যাত স্থানের উপযোগী করিয়া কর্মসূচী রচনা করিতে এবং কোন বিষয়েই মাত্রাতিরিক্ত কিছু না করিবার নির্দেশ দিলেন। কারণ, কলিকাতার মতো স্থানে উৎসবের কোন আঙ্গিকে কোনরূপ ত্রুটি থাকিলে, তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

১। Pagal Haranath : Part V, Page 214

এইরূপ আলোচনায় হরনাথ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের নামে নিন্দা রটিতে পারে। ভক্তদের নিন্দার জন্যই তাঁহার ভয় ছিল বেশী। তাঁহার নিজের নামে প্রচারিত নিন্দা বা অপবাদকে তিনি কোনরূপ গ্রাহ্য করিতেন না। ইতিপূর্বে সিমলাবাসী একজন ভক্ত সন্তোষকুমার রায় সিমলার জনসাধারণকে হরনাথের কতকগুলি দোষ-ক্রটির আলোচনারত দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সে সংবাদ জানাইলে, হরনাথ তাঁহাকে বৃথা দুঃখ পাইতে নিষেধ করেন এবং জানান যে, আমার কতগুলি দোষ-ক্রটির কথা তাহারা জানে? 'মন্দ জিনিসের আমি একটি গুদামঘর। জানা-অজানা যত রকমের দোষ আছে, তার সবগুলি আমার মধ্যে আছে।' সেইজন্য তিনি সন্তোষকুমারকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মন্দ হয়োনা, লোককে মন্দ বলতে দাও। যে মন্দ নয়, তার সম্বন্ধে মন্দ বললে তার সম্মান বাড়ে। নিজে ভাল থাক, যার যা খুসী তা বলুক।"

কিন্তু তাঁহার নিন্দা হইলে, সে নিন্দায় ভক্তগণের হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার হইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভাগবতকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে নিন্দার ভাগী না হইতে হয়। ১৯১৯ সালের জুন মাসে অসহ্য গরম পড়ে এবং গ্রীষ্মাধিক্যহেতু হরনাথের অতিশয় কষ্ট হইত। কোনরূপে ইহা অবগত হইয়া যোগেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে একটি স্পিরিট ল্যাম্প ফ্যান উপহার দেন। বোম্বাই-বাসিনী বিমলা মা গ্রীষ্মাধিক্যহেতু স্নেহের হরগোপালের কষ্টের কথা অনুমান করিয়া, একটি ব্যাটারী-চালিত পাখা উপহার দেন। দুইটি পাখাই হরনাথ ব্যবহার করিতেন বলিয়া পত্র লিখিবার সময় প্রচুর বাতাস পাইতেন।*

বরাহনগরে শ্রীশরৎচন্দ্র দে-র উদ্যান-বাটীকায় জন্মোৎসব হইবে স্থির করিয়া, ভাগবত মিত্র উৎসবের কার্যসূচী প্রণয়ন করিলেন এবং এই কার্যসূচী অনুসারে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কার্যের ভার দিলেন।

* দ্রঃ তমালিনী মাকে লিখিত পত্র—পাগল হরনাথ: পঞ্চম খণ্ড (ইংরাজী) পৃঃ ২২১

হরনাথের মতে, ভাগবত মিত্র রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলা আশা করা যায় না। কিন্তু ভাগবত মিত্র অতিশয় নিয়মনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। সামান্য বিশৃঙ্খলা বা নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও তাঁহার নিকট অমার্জনীয় অপরাধরূপে প্রতিভাত হইত। তাঁহার সহ্যগুণের নিতান্তই অভাব ছিল। সেইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। হরনাথকে লিখিত পত্রে সেই বিরক্তি প্রকাশিত হইলে হরনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া জানাইলেন, এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে খুব নিয়মনিষ্ঠ হওয়া চলে না।

১৮ই আষাঢ় তারিখের ৩।৪ দিন পূর্বে সিমলা হইতে সন্তোষকুমার রায় হরনাথের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। ২৯শে জুন তারিখে হরনাথ একটি তারবার্তায় অবগত হইলেন যে, উক্ত দিবসেই মাতা, ভগিনী এবং অন্যান্য সকলের সহিত বিমলা মা বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছেন। হাওড়া স্টেশনে তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভাগবতকে পত্র লিখিয়া, সন্তোষকুমার এবং সোনামুখীর ভক্ত নরনারীগণসহ হরনাথ ও কুসুমকুমারী কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

এই জন্মোৎসবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে হরনাথের ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করিলেন—মহাসমারোহে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। ভাগবত মিত্র যে সত্যই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, একজন লেখকের বিবরণীতে তাহা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] কিন্তু ভাগবত মিত্র যজ্ঞেশ্বরের কথা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার আয়োজনে ত্রুটি ছিল না, ভক্তি ও নিষ্ঠাও কম ছিল না। কিন্তু যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই উৎসব, সেই হরনাথের ও কুসুমকুমারীর সেবা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষভাবে কাহাকেও ভার না দেওয়ার জন্য তাঁহারা অভুক্তই রহিয়া গেলেন। শত সহস্র নরনারীকে মহানন্দে ভোজনরত দেখিয়া, হরনাথ ও কুসুমকুমারী আপনাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে

১। বোম্বাই জন্মোৎসব, পৃঃ ৭৯

কর্তব্যে ত্রুটিজনিত ভাগবতের দোষ স্খালন হয় না। সকলের জন্য টিফিন আসিল, সকলকেই টিফিন দেওয়া হইল, কিন্তু সকলের সহিত উপবিষ্ট হরনাথকে টিফিন দেওয়ার কথা সেই সময়ে কাহারও মনে পড়িল না। হরনাথের সহিত যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও উপর এই ভার দেওয়া হইলে এই মহাপরাধ হইত না। হরনাথ কিন্তু এজন্য ভাগবতের প্রতি রুষ্ট হইলেন না। সদানন্দ মনে তিনি বোম্বাইবাসী ভক্ত নরনারীগণের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং খড়্গপুরে তাহাদিগকে বোম্বাইগামী ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া সোনামুখী আসিয়া পৌঁছিলেন।*

হরনাথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিপুল অর্থব্যয়ে মহাসমারোহে উৎসবের অনুষ্ঠান করার এবং অগণিত জনসমাগমে সেই উৎসব আশাতীত সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায়, ভাগবতের মনে অহমিকা জাগ্রত হইয়াছে এবং অর্থব্যয়ের জন্যই এই বিরাট জনসমাগম হইয়াছে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হইয়াছে এই অহমিকা ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থ হরনাথ ভাগবতকে এক পত্রে তাঁহার কর্তব্যে ত্রুটির জন্য জানাইলে ভাগবতের লজ্জা ও দুঃখের সীমা রহিল না। নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি হরনাথকে এক পত্র দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ভাগবতের সযত্ন-পোষিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে হরনাথ পত্রোত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, অভুক্ত থাকার জন্য তাঁহার মনে সত্যই কোন বেদনাবোধ জাগে নাই, তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন ভাগবতের কর্তব্যে অবহেলার জন্য। তিনি জানাইলেন, ভাগবত প্রমুখ ভক্তবৃন্দের অর্থেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে বিপুল জনসমাগমের জন্য উৎসবটি সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা হরনাথেরই জন্য। উৎসবে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী অর্থব্যয় করিলেও এত বেশী জনসমাগম হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এইভাবে ভাগবতের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া তিনি ভাগবতকে সান্ত্বনা দান করিয়া জানাইলেন যে, এইরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে দুঃখিত

---

* ভাগবত মিত্রকে লিখিত পত্র—দ্রঃ পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড (ইংরাজী)

হইবার মতো অকরুণ তিনি নহেন। সুতরাং ভাগবতও যেন এই সামান্য ব্যাপারের স্মৃতি তাঁহার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া ফেলেন।[১]

ভাগবত মিত্র এই বেদনাদায়ক স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু হরনাথ ইহা সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইলেন। সন্তানের সকল ত্রুটি স্নেহময় পিতা যেমন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেন, হরনাথও তেমনি ভাগবতের এই ত্রুটি ক্ষমা করিয়াছিলেন। ভাগবতকে লিখিত তাঁহার পরবর্তী পত্রেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই পত্রে ভাগবত তদীয় ভ্রাতা কেদারের অসুস্থতার বিষয় হরনাথকে জানাইলে, তিনি কেদারের জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন, ভাগবতের প্রতি অন্তরে কোনরূপ অপ্রসন্ন ভাব পোষণ করিলে তাহা কখনই সম্ভব হইত না।[২]

"স্নেহের বাবা আমার। তোমার পত্রপাঠে আজ যে কত কাতর হইলাম বলিতে পারি না। স্নেহের কেদার কেন এভাবে এত কষ্ট পাইতেছে বলিতে পারি না। বাবা-রে, এ সম্বন্ধে আমি যে কি বলিব, তার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বাবা ডাক্তারগণ নিজের ঘরে কিছুই মতামত দিতে পারে না। আমার অবস্থাও তাই হইয়াছে। এখন সকলের সঙ্গে যুক্তি করে যা ভাল হয় করিবে। একবার কলেজে দেখাইলে ভাল হয়।···বাবা ভাবিও না, প্রভু মঙ্গলই করিবেন। তোমার প্রাণে যেন প্রভু কখনও কোন রকম অশান্তি না আনেন।" এই পত্রেই হরনাথ অটলবিহারী ও সারীকে বৃন্দাবন যাত্রার পাথেয় দিবার জন্য শরৎবাবুকে অনুরোধ করেন।

এই বৎসর জুলাই মাসের ২০শে।২৫শে তারিখ পর্যন্ত বর্ষা নামিল না দেখিয়া, হরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, এই বৎসর হয়তো অনাবৃষ্টিহেতু ধান্যের চাষ ভাল হইবে না।

আগস্ট মাসের প্রথমেই হরনাথ বোম্বাই নগরীতে 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইলেন। এই হরিসভা প্রতিষ্ঠা বরাহনগরে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জন্মোৎসব

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ১৫৯ (ইংরাজী অনুবাদ)
২। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৬৬

উপলক্ষে হরনাথ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিকট-সংস্পর্শে আসিয়া বোম্বাইবাসী ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই মনে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের একান্তিক ইচ্ছা জাগে—বোম্বাই নগরীতে হরিসভা প্রতিষ্ঠা সেই ইচ্ছারই ফলশ্রুতি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ভক্ত ও অনুরাগীদের আগ্রহ দর্শনে হরনাথ অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং সকল ভক্তকেই এই আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই সঙ্গে হরনাথ আরও একটি সংবাদ পাইয়া সবিশেষ আনন্দিত হন। বৃন্দাবন হইতে অটলবিহারী সারীকে লইয়া চন্দননগরে আসিবার এবং তথা হইতে মেদিনীপুরে আসিয়া তমালিনী দত্তকে সঙ্গে লইয়া সোনামুখী আসিবার ইচ্ছা পত্রে জানাইলে, হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হন। হরনাথ-লীলার মূলাধার এই নন্দী দম্পতি তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং পরম ভক্তিমতী তমালিনী দত্তও পরম স্নেহের পাত্রী ছিলেন। পরম প্রিয় এই ত্রয়ীকে নিকটে পাইবার আনন্দে হরনাথ উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং তমালিনী মাকে অটলবিহারী ও সারীর সহিত সোনামুখী আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। অটলবিহারী ও সারী অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন জানিয়া হরনাথ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ের রণছোড়দাসজী পুরী আশ্রম সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে, সেবার জন্য সংরক্ষিত তহবিল কেবলমাত্র দরিদ্র ও আর্তের সেবায় ব্যয়িত হইবে, ইহা হইতে অন্য কোন খাতে কোনরূপ ব্যয় করা চলিবে না। রণছোড়দাসজীর এই প্রস্তাব হরনাথ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং রণছোড়দাস প্রমুখ বোম্বাই ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হরিসভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। প্রকৃতপক্ষে হরনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত আশ্রম এবং সভারই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এই সমস্ত বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দ। ইহাদেরই অর্থে হরনাথের সোনামুখীর গৃহ-নির্মাণকার্য দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল। পুষ্করিণী-খননকার্যও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল এবং ইঁহাদেরই স্বেচ্ছা-প্রদত্ত সাহায্যে তাঁহার দরিদ্রনারায়ণ ও আর্তের সেবার কামনা

চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। হরনাথের মাধ্যমে বোম্বাইবাসী ভক্তগণ গত বৎসরে রোগার্তকে ঔষধ-পথ্য দানের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এমনকি বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিও তাঁহাদের এবং হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে আকর্ষণ তীব্র হইয়া উঠিলে, বাঁকুড়ার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তদীয় সহধর্মিণীকে সঙ্গে লইয়া সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে একদিন সোনামুখী আগমন করেন এবং হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

হরনাথের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া গুরুসদয়বাবু প্রীত হন। হরনাথের মুখে বোম্বাইবাসী ভক্তদের সদাশয়তার কথা শুনিয়া গুরুসদয়বাবু হরনাথের বাগানবাটী ও পুষ্করিণী দর্শন করিয়া যার-পর-নাই চমৎকৃত হন। এই বৎসরও অনাবৃষ্টির ফলে বহু স্থানের ভূমি অকর্ষিতই রহিয়া গিয়াছিল। অন্ন-সংস্থানের জন্য কৃষকেরা হরনাথের পুষ্করিণী খননে নিযুক্ত হইয়াছিল। ফলে, সেপ্টেম্বর মাসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সোনামুখী আগমনের পূর্বেই পুষ্করিণী খনন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল। পুষ্করিণীর উত্তর তীরের পার্শ্ব দিয়া পার্শ্ববর্তী অরণ্য হইতে আগত অতি ক্ষুদ্র একটি স্রোতস্বিনী বর্ষাকালে প্রবাহিত হইত। বাঁধ বাঁধিয়া এই জলপ্রবাহের সাহায্যে পুষ্করিণী পূর্ণ করা হইত। সেজন্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় জল-প্রবেশের পথ নির্মিত হইয়াছিল। এই পথে প্রবিষ্ট জলধারা বিরাট গর্জনে পুষ্করিণীর মধ্যে পতিত হইয়া, ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের আকার ধারণ করিত। প্রশস্ত সোপান-সমন্বিত দুই পার্শ্বের দুইটি ঘাট পুষ্করিণীটির শোভা বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিল। পুষ্করিণীর সৌন্দর্য দেখিয়া গুরুসদয়বাবু চমৎকৃত হন এবং কঠিন প্রস্তরসঙ্কুল ভূমিতে এইরূপ বৃহদাকার পুষ্করিণী খনন করিবার সমস্ত ব্যয় যাঁহারা হাসিমুখে বহন করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিক দানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যাঁহার ইচ্ছা পূরণার্থে তাঁহারা এই বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছেন, সেই হরনাথের অপরিসীম মহিমার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মস্তক শ্রদ্ধায়

অবনত হইয়া পড়ে। অতঃপর বাগান ও বাগানবাড়ী দেখিয়া তিনি ও তাঁহার সহধর্মিনী অতিশয় প্রীত হন। বিদায় গ্রহণকালে তাঁহারা হরনাথের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুষ্করিণীটিকে 'বোম্বাই ট্যাঙ্ক' নামে অভিহিত করিলেন। ভক্তের গৌরবে হরনাথের অতিশয় আনন্দ হইল। এই সময়ে লিখিত বহু পত্রে সেই আনন্দ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বোম্বাই ট্যাঙ্ক' নামকরণের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বোম্বাইবাসী ভক্তগণের অপরিমেয় দানের যে স্বীকৃতি দান করিলেন, তাহাতে হরনাথ বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইলেন।[১]

বোম্বাইবাসী ভক্তগণের হরনাথের প্রতি নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে। নরোত্তম নামক একজন ভক্তের নিকট হরনাথ একদা কথাপ্রসঙ্গে ক্ষুদ্র একখণ্ড হীরকখচিত একটি অঙ্গুরীয়ক পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কালক্রমে তিনি এই কথা বিস্মৃত হন। কিন্তু নরোত্তম এবং তাঁহার স্ত্রী টুনটুনি (টুনটুনি মা) ইহা বিস্মৃত হইলেন না। হরনাথের এই ইচ্ছা পূরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া তিনি সেপ্টেম্বর মাসে বহুমূল্য হীরকখচিত একটি অঙ্গুরীয়ক প্রণামীস্বরূপ হরনাথের নিকট প্রেরণ করেন। এই অঙ্গুরীয়কটির মূল্য ছিল ১৪০০৲ টাকা। এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক পাইয়া হরনাথের মনে অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল এবং অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশিত তাঁহার সামান্যতম একটি ইচ্ছা পূরণের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করা হইয়াছে, তাহারই মাধ্যমে নরোত্তমের ঐকান্তিকতা ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি অভিভূত হইলেন। এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক পরিধান করিলে লোকে উপহাস করিবে ভাবিয়া, হরনাথ ইহা পরিধানে বিরত হইলেন। কিন্তু লোকমুখে শুনিয়া এই বহু মূল্যবান অঙ্গুরীয়ক দেখিতে কৌতূহলী নরনারী দলে দলে আগমন করিতে লাগিল দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ইহা পরিধান করিতে হইল। তিনি এই অঙ্গুরীয়কের নামকরণ করিলেন 'পর্বতাঙ্গুরীয়ক'।

১। ২২।৯।১৯ তারিখে নেপালচন্দ্র ঘোষকে লিখিত পত্র: হরনাথ স্মৃতি: দ্বাদশ লহরী, পৃ: ৯৪ এবং ১৬।৯।১৯ তারিখে রণছোড়দাসজীকে ইংরাজীতে লিখিত পত্র।

শ্রীশচন্দ্র দত্তের মাতৃ-বিয়োগ

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে হরনাথ মেদিনীপুরে তমালিনী দত্তের বাটীতে গমন করেন। তমালিনী মার বৃদ্ধা শ্বশ্রুমাতা এই সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার গমনের কারণ সম্ভবতঃ তাঁহাকে শেষবারের মত দেখিয়া আসা। হরনাথকে দেখিয়া শ্রীশ-বাবুর বৃদ্ধা জননী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠেন। এই বাটীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া হরনাথ সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, বাড়ীতে বহু জনসমাগম হইয়াছে। দশ-বারোজন নরনারী ইতিপূর্বে আসিয়া অবস্থান করিতেছে এবং দৈনিক আরও অনেকে আসিতেছে। বাড়ীতে বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান নাই।

এই সমস্ত নরনারীর অভ্যর্থনা ও আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য সকলে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন, তথাপি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাহার উপর মতিবালা (ছোট মাসীমা) পিত্রালয়ে যাওয়া স্থির করিলে, কিরূপে সমাগত ভক্তবৃন্দের আদর-অভ্যর্থনা এবং আহারাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে, ইহা ভাবিয়া হরনাথ আকুল হইলেন।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে মেদিনীপুর হইতে শ্রীশবাবুর মাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিল। সেই সঙ্গে তমালিনী মার অসুস্থতার সংবাদ আসিলে, হরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে তমালিনী মার কন্যা টুকু বৈধব্যদশাপ্রাপ্ত হয়। এই নিদারুণ শোকে তমালিনী মার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর সংসারের কাজে তিনি অতিশয় পরিশ্রম করিতেন। সেজন্য তিনি প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। অন্য সময়ে এজন্য ভাবনা হইলেও, এবারের মতো তত বেশী ছিল না। কারণ, এবারে শাশুড়ীর পরলোকগমনে অশৌচ পালনের মধ্যেই অসুখ করিয়াছিল। পরম নিষ্ঠাবতী তমালিনী যে অসুস্থ দেহেও সর্বপ্রকার নিয়ম পালন করিয়া চলিবেন, এই বিষয়ে হরনাথের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অসুস্থ দেহে ইহার ফল মারাত্মক হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি

পূর্বাহ্ণেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। 'আজকাল শরীর বুঝে নিয়ম পালন করিবে। তবে দেখা আছে মার জন্য নিয়ম রক্ষা করিতে কখনও কাহারও কোনরকম অনিষ্ট হয় নাই বা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিলে কোন ব্যাধি নিকটে আসে না। যাই হ'ক মা যতদূর সাধ্য নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিও এবং সকলকে করিতে বলিও এবং সকলকে চলিতে বলিও।'[১]

এইভাবে তমালিনী মাকে সাবধান করিয়া তিনি শ্রীশচন্দ্রকেও অভয় দান করিলেন—বাবাগো কোন চিন্তা করিও না। প্রভু সকল মঙ্গল করিলেন।[২]

এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিলে, ভক্তদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভক্তগণও তাঁহাকে অতি আপনার জন মনে করিয়া, ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহাকে সর্বদা নিকটে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন এবং দেখা গিয়াছে, কোন ভক্তের কোন কার্যে হরনাথ উপস্থিত থাকিলে তো কথাই নাই, পূর্বাহ্ণে তাঁহাকে জানাইলেও আয়োজনের শত ত্রুটি সত্ত্বেও কার্যটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত। এমনকি প্রাকৃতিক বিপর্যয় পর্যন্ত সাময়িকভাবে স্থগিত হইয়া কার্যটিকে নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইবার সুযোগ দান করিত।[৩] এই কারণে প্রত্যেক ভক্তই স্বগৃহে আয়োজিত যে-কোন কার্যে তাঁহার উপস্থিতি প্রার্থনা করিত। হরনাথ সর্বদা সকলের ডাকে সাড়া দিতে পারিতেন না, কিন্তু যেখান হইতেই তাঁহার ডাক আসিত, সেই স্থানের কার্যই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে, কার্য সমাপ্ত হইবার পরে তাঁহার চিঠিতে আয়োজনের বিবরণ পাওয়া যাইত। এমনকি ভোজ্যের স্বাদের ভাল-মন্দ পর্যন্ত তাঁহার চিঠিতে লেখা থাকিত। এইজন্য ভক্তগণের ধারণা হইয়াছিল যে, স্মরণ করিলে বা শরণ লইলে হরনাথ স্থূল দেহে না হউক, সূক্ষ্ম দেহেও ভক্তের নিকটে

১। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৩০
২। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৩১
৩। নারাণচন্দ্র ঘোষ : হরনাথ স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী, পৃঃ ১০

আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মাতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হরনাথকে উপস্থিত থাকিবার জন্য শ্রীশবাবুর ভ্রাতা ক্ষিতীশবাবু সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তিনি লিখিলেন—'এ শুভকার্যে আমি থাকিতে পাইব বলিয়া মনে হয় না তবে শরীর যেখানেই থাক আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছি জানিবে।'

যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রীশবাবুর মাতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইল এবং সমস্ত কার্য নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। হরনাথ এই সময়ে ছাপরায় যাত্রা করিলেন বলিয়া, ইচ্ছা সত্ত্বেও মেদিনীপুরে গমন করা সম্ভব হইল না। কতকটা ইচ্ছা করিয়াও হরনাথ মেদিনীপুরে গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর তমালিনী দত্তকে লিখিত পত্রে তিনি সেই কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন—'মা, এ সময় আমি থাকিলে সত্যই খুব আনন্দ হ'ত কিন্তু তুমি আর কিছু কার্য করিতে পারিতে না। একে স্নেহের মধুর অসুখ, তার উপর আবার এই কোলের খোকাটি গেলে তোমার একেবারেই সময় থাকিত না। যাই হোক মা, আমিও বড় আনন্দে তোমার পাছে পাছে ফিরিতেছিলাম।'[১]

'আনন্দ-মিলন' উৎসবের সূচনা

নভেম্বর মাসে ছাপরাবাসিগণ হরনাথকে তাঁহাদের মধ্যে পাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য হরনাথ ১৪ই তারিখে ছাপরা যাত্রা করেন, তাঁহার সঙ্গে গমন করেন অনুকূল ও রাম খাঁন নামক একজন ভক্ত। কলিকাতা হইতে শরৎচন্দ্র দে এবং বাসুদেব ছাপরায় গমন করেন, আর পাটনা হইতে যোগেশবাবু আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাহা ছাড়া, দূরবর্তী বহু স্থান হইতেও আরও বহু ভক্ত আসিয়া ছাপরায় পৌঁছেন।

হরনাথ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে পাইয়া ছাপরাবাসিগণ অভিভূত হইয়া পড়ে। কয়েকদিন ধরিয়া প্রবল উৎসাহে নামগান ও সংকীর্তনাদি

১। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৩৩

চলিতে থাকে, ছাপরা আনন্দের স্বর্গে পরিণত হয়। ছাপরাবাসীদের প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া হরনাথ মুগ্ধ হন। ছাপরা এবং ছাপরাবাসীদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'মাগো! এখানে আসিয়া বেশ আনন্দেই আছি, সকলেই যেমন কি এক নূতন রাজ্য পেয়ে আনন্দ করিতেছে। এ আনন্দে সদাই মনে হইতেছে, যদি তুমি সঙ্গে থাকিতে তাহলে আরও আনন্দ হইত।'*

এই আনন্দের রাজ্যে প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া হরনাথ সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন। আসিবার দিন পথিমধ্যে অনুকূলের জ্বর হয়। কয়েক দিন বাদে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহার মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসে। তিনি ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণদাসের বিবাহের জন্য পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন। পাত্রী মাছডোবা গ্রামের বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরীবালা। আশীর্বাদের সময় পাত্রীকে সাধ্যমত অলঙ্কারাদি দেওয়া হয়। হরনাথ বেশ ভালভাবেই আশীর্বাদীর জিনিসপত্র দিয়াছিলেন। বিবাহের দিন কিন্তু তখনও পর্যন্ত স্থির হয় নাই। এই বৎসর পৌষ মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ মনে মনে নূতন একটি পরিকল্পনা করিলেন। পৌষ মাসে বাংলা দেশে যে বনভোজনের রীতি আছে, হরনাথ তাঁহার ভক্তদের লইয়া এই বৎসর হইতে সেইরূপ একটি বনভোজনের আয়োজন করিতে মনস্থ করিলেন।[১] কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের সহিত এই বিষয়ে পত্রালাপ করিয়া তাঁহাদের সম্মতি জানিয়া মহা উৎসাহে বনভোজনের আয়োজন করিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ সকলেই চাকুরি-জীবী। ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত না হইলে তাঁহাদের পক্ষে বনভোজনে যোগদান করা সম্ভব হইবে না এবং সম্ভব হইলেও, উৎসবের আনন্দ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করা সম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া হরনাথ দেখিলেন, ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারি সরকারী ও বেসরকারী সকল অফিস বন্ধ থাকে। ৩০শে তারিখে অফিসের ছুটির পর যাত্রা করিলে, ৩১শে তারিখে প্রাতঃকালে সোনামুখী

* সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৪২

১। The Lord Supreme Vol : No. I মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠা।

পৌঁছিতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। এইদিন বনভোজনে যোগদান করিয়া সেইদিন সন্ধ্যায় বা পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিলেও ২রা জানুয়ারি কর্মস্থলে পৌঁছিতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। অথচ বনভোজনের আনন্দ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। সুতরাং হরনাথ ৩১শে ডিসেম্বর তারিখেই বনভোজনের আয়োজন করিতে মনস্থ করিয়া ভক্তবৃন্দকে সাদর আহ্বান জানাইলেন। বনভোজনের স্থানও নির্বাচিত হইল।

হরনাথের উৎসাহে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত এই বনভোজন উৎসবে যোগদান করিলেন। ইহাদের মধ্যে মেদিনীপুরের তমালিনী মা, শ্রীশবাবু, ক্ষিতীশবাবু প্রভৃতি অন্যতম। কলিকাতা হইতেও কিছুসংখ্যক ভক্ত এই উপলক্ষে সোনামুখী আগমন করেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের নাম জানা যায় না।

এই বৎসর হরনাথ পৌষালী উৎসবের আকারে যে উৎসবের সূচনা করিলেন, কালক্রমে তাহা বিরাট আকার ধারণ করিল। এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া মহা আনন্দ লাভ করিতেন বলিয়া, তাঁহারা ইহাকে 'আনন্দ-মিলন' নামে অভিহিত করেন। এই আনন্দ-মিলন উৎসবের দিনটির জন্য হরনাথের প্রত্যেকটি ভক্ত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং ইহাতে যোগদান করিবার সুযোগ পাইলে তাহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিত। মুসলমানদের নিকট যেমন মহরম্, খ্রীষ্টানদের নিকট যেমন বড়দিন, হরনাথের ভক্তদের নিকট 'আনন্দ-মিলন' তেমনই এক পরম আকাঙ্ক্ষিত উৎসব।

কৃষ্ণদাসের বিবাহ

১৯২০ সাল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই হরনাথ কৃষ্ণদাসের বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পৌষমাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য মাছডোবা যাত্রা করেন। পাত্রীপক্ষের সম্মতিক্রমে বৈশাখ মাসে কৃষ্ণদাসের বিবাহের দিনস্থির হইল। কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসের বিবাহে তাঁহার একটু

সমারোহ করিবার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য তিনি প্রত্যেকটি ভক্তকে বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ ভক্তদের নিকট আদেশেরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হরনাথের গৃহে আসন্ন বিবাহ উৎসব। এই কার্যোদ্ধার করিবার দায়িত্ব ভক্তগণ নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল। কুমারখালির ছেলেরা ব্যাগপাইপ এবং কলিকাতা-বাসিন্দা বোম্বাই প্রদেশের ভক্তেরা ব্যাণ্ড বাদ্যের আয়োজন করিল। এই দুই দল বাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিবার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, বাটীস্থ স্ত্রীলোকেরা 'বাঈজী' নাচের ব্যবস্থা করিবার জন্য হরনাথকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে হরনাথের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শুভ অনুষ্ঠানে কাহারও মনে ব্যথা দিতে তাঁহার সঙ্কোচবোধ হইল। সুতরাং একদল বাঈজী আনাইবার জন্য হরনাথ মেদিনীপুরের ক্ষিতীশ দত্তকে অনুরোধ জানাইলেন।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে হরনাথ কৃষ্ণদাসকে পুরীর আশ্রম হইতে সোনামুখীতে আসিবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন এবং কিছু কিছু বিবাহের জিনিসপত্র কিনিয়া আনিবারও ভার দিলেন। তদনুসারে কৃষ্ণদাস জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে সোনামুখীতে আগমন করিলেন। দূর-দূরান্তর হইতে নিত্য ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল। হরনাথ সকলকেই বরযাত্রী লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। এই বরযাত্রী যাওয়া বিষয়টি বর্ণনা করিয়া একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন—'বরযাত্রী রওনা হইবার সময় হইয়াছে। চারিদিকে সাজ সাজ শব্দ উঠিয়াছে। ছেলের সঙ্গে মাত্র ১৯ জন বরযাত্রী যাইবে এইরূপ কথা ছিল। হরনাথের ভক্তবৃন্দের কুড়ি-পঁচিশ জন সঙ্গে আসিতে পারে বিবেচনায় কন্যাকর্তা সর্বসমেত ২০০।২৫০ লোকের জলযোগ এবং থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রি ৮টার সময় আমাদের বিরাট দল সেখানে পৌঁছিতে লাগিল। হরনাথ প্রথমেই বাটীর সংলগ্ন মাঠে

যাইয়া থামিলেন। বিবাহবাটীর সকলে আমাদের অগণিত লোক-সংখ্যা দেখিয়া অবাক! বাজিকর, বাদ্যকর, চাকর নফরেই ৪০০ লোকের অধিক। কন্যাকর্তা অর্থাৎ কর্মকর্তা যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইলেন।'*

কিন্তু কর্মকর্তার উদ্বেগ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইল। তিনি এক জায়গায় বরযাত্রীদের জন্য বেলের সরবৎ করিয়াছিলেন। চন্দননগরের তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় হরনাথের নির্দেশমত উহার পরিমাণ দেখিয়া অনুমান করিলেন যে, সমস্ত সরবতে মাত্র দেড়শত লোকের সংকুলান হইতে পারে। ইহা শুনিয়া হরনাথ এক গ্লাস সরবৎ লইয়া পান করিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, জল ঢালিয়া ইহাকে আরও পাতলা করিবার আদেশ দান করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতি-পালিত হইল। উক্ত সরবৎ সকলকে এক গ্লাস করিয়া দিবার আদেশ দান করিলেন এবং পরিমাণ কম হইবামাত্র উহাতে জল মিশাইয়া লইতে নির্দেশ দিলেন। সেই সরবৎ স্বাদে গন্ধে অপূর্ব হইয়া উঠিল। বরযাত্রী কন্যাযাত্রী সকলেই আশা মিটাইয়া এই সরবৎ পান করিলেন। তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও মুক্তহস্তে এই সরবৎ বিলাইতে লাগিলেন। সরবতের অপূর্ব স্বাদ ও গন্ধের উপাদানের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, সরবতে 'পণ্ড সিরাপ' মিশ্রিত করা হইয়াছে। এই 'পণ্ড সিরাপ'-মিশ্রিত সরবতের ক্রিয়ায় সকলেই অনতিকাল মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল, স্বয়ং বরের চক্ষুও নিদ্রালু হইয়া উঠিল। কোনমতে উঠিয়া শেষরাত্রের লগ্নে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়া বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। পরদিন সকলেই লুচি, মণ্ডা, মিঠাই প্রভৃতি পেট ভরিয়া খাইয়া সোনামুখী অভিমুখে যাত্রা করিল।

বিবাহের পর ভক্তগণ সকলেই নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। হরনাথও দুই-একদিন মধ্যে পুরী গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় আশুতোষ গুহ নামক একজন ভক্ত শান্তিপুর হইতে তাঁহার বন্ধুর যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীকে হরনাথের নিকট পুরীতে লইয়া যাইবার

---

* হরনাথ স্মৃতি : পঞ্চম লহরী, পৃঃ ৫৫

জন্য শান্তিপুর যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া, প্রথমে জুতার খোঁজ করিতে লাগিলেন, কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। নিরাশচিত্তে একমাত্র কোটখানি পরিধান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, উহাতে বিবাহের এত রং লাগিয়াছে যে, উহা গায়ে দিয়া বন্ধুর বাড়ী শান্তিপুরে যাওয়া যায় না। তাঁহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া হরনাথ নিকটে আসিয়া বলিলেন—'কি খুঁজতেছ? ছেঁড়া জুতা কুকুরে লইয়া গেল বুঝি? সঙ্গে এস'—এই বলিয়া তাঁহাকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই ঘরে নানারকমের কাপড়-চোপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ স্তূপীকৃত রহিয়াছে। হরনাথ বলিলেন, 'তোমার পায়ে ঠিক হয় এমন এক জোড়া জুতা এর থেকে নিয়ে যাও।' তাঁহার বাড়ীর জিনিস লইতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় হরনাথ বলিলেন, নানা দেশ থেকে নানা লোক এ সব পাঠিয়েছে। এত জুতা পোশাক কে পরিবে? সুতরাং দান বিতরণ করে সব খরচ করে তবে তো ঘর খালি করতে হবে।' একজোড়া জুতা দেখাইয়া হরনাথ বলিলেন, 'এই জোড়া তুমি লও, তোমার পায়ে ঠিক লাগিবে।'

লজ্জিতচিত্তে আশুতোষ জুতা পায়ে দিলেন। পায়ে ঠিক হইয়াছে দেখিয়া হরনাথ হাসিলেন, আশুতোষও হাসিয়া উঠিলেন। হরনাথ আবার বলিলেন, 'তোমার কোটটিতে যে রং লেগেছে তা শীঘ্র উঠবে না। অফিস যাবে কি পরে। এটা গায়ে দাও ত। বোধ হয় ঠিক হবে।' আশুতোষ অনিচ্ছার সহিত কোটটি গায়ে দিয়া দেখিলেন যে, উহা গায়ে ঠিক হইয়াছে। হরনাথ তাঁহাকে আরও একটি কোট দেখাইয়া লইতে বলিলেন। আশুতোষ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হরনাথ বলিলেন, 'একটা ধোপাকে কাচিতে দিলে আর একটা না থাকিলে কি গায়ে দিবে এটাও লও।' আশুতোষকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া হরনাথ বলিয়া উঠিলেন, 'গাড়ীর সময় নাই শীঘ্র কর।' আশুতোষ কোটটি লইলে হরনাথ বলিলেন, 'দেখলে বাবা, বাড়ীতে বিবাহ থাকলে বিবাহের পর বাড়ীর ছেলে বিদেশ যাবার সময় সাজ পোষাক পায়। তাদের বিদেশ থেকে কিছু আনতে হয় না।'

ইহার পর হরনাথ আশুতোষকে শান্তিপুর গমন করিতে নিষেধ করিয়া, বরাবর পুরী যাইতে বলিলেন এবং জানাইয়া দিলেন, তাঁহার বন্ধুর আত্মীয়েরা শান্তিপুর হইতে রওনা হইয়া কলিকাতা পর্যন্ত আসিয়াছে। হরনাথ যেদিন পুরী পৌঁছিবেন, সেইদিনই তাহারা পুরী পৌঁছিবে। সুতরাং আশুতোষ যেন পুরী গিয়া আশ্রমে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাদের জন্য বাসা ভাড়া করিয়া রাখেন। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আশুতোষ বিস্মিত হইলেন। কারণ, তাঁহার বন্ধুর জননীকে দেখাইবার কথা ইতিপূর্বে হরনাথের নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। তথাপি তাঁহার আদেশক্রমে আশুতোষ পুরীতেই যাত্রা করিলেন এবং বাসা ভাড়া করিয়া আশ্রমে পৌঁছিয়া শুনিলেন, কিছুপূর্বে হরনাথ আশ্রমে পৌঁছিয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন। আশুতোষ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ রাখাল দাসের জননীকে দেখিতে গেলেন এবং তাঁহার সহিত সামান্য কথাবার্তা কহিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আশুতোষকে জানাইলেন, 'রাখাল দাসের জননীর আয়ু আর অধিক দিন নাই।' তিনি তাঁহাকে দুই মাসকাল পুরীতে অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিবার নির্দেশ দিলেন।

পুরীধামে এক মাসকাল অবস্থান করিয়া হরনাথ সোনামুখীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময়ে ভাগবত মিত্র পুনরায় কলিকাতায় বদলি হইয়া আসেন। ভাগবত মিত্রের উৎসাহে কলিকাতার তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা আবার নূতন উদ্যমে জাগিয়া উঠে। এই বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত হইবার কথা হয়। হরনাথের সম্মতিক্রমে বোম্বাইবাসী ভক্তগণ মহাসমারোহে জন্মোৎসবের আয়োজন করিতে থাকেন। হরনাথ কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দকে তাঁহার সহিত বোম্বাই যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দান করেন।[১]

এই বৎসর জুন মাসে ভাগবত মিত্র হরনাথের পত্রাবলীর আর একটি সংকলন প্রকাশ করিতে মনোযোগী হন। চতুর্থ খণ্ড—পাগল হরনাথের পত্রাবলীর ব্যাপ্তি যে কালসীমা পর্যন্ত, প্রস্তাবিত এই পত্র-

১। হরনাথ-স্মৃতি : ষষ্ঠ লহরী, পৃঃ ২—৪

সংকলনটিতে তাহার পরবর্তী কালে লিখিত পত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট করিবার ইচ্ছা ভাগবত মিত্রের ছিল। এই সঙ্গে এই সমস্ত পত্রাবলীতে প্রদত্ত উপদেশসমূহেরও আর একটি সংকলন প্রকাশ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। গ্রন্থদ্বয়ের যথাক্রমে 'পাগল হরনাথ' পঞ্চম খণ্ড এবং 'উপদেশামৃত' দ্বিতীয় ভাগ নামকরণ করিবার প্রস্তাব জানাইয়া ভাগবতবাবু হরনাথের সম্মতি চাহিলে, তিনি এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করিলেন এবং লিখিলেন যে, 'পাগল হরনাথ' পঞ্চম খণ্ড এবং 'উপদেশামৃত' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত না দেখিয়া তিনি যাইবেন না।[১] তিনি নির্ভয়ে পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য ভাগবত মিত্রকে পরামর্শ দিলেন।

এই সময়ে কটক হইতে প্রকাশিত 'হরনাথ' নামক পত্রিকার বিরুদ্ধে ভক্তমণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রতিবাদ উঠিতে থাকে। সেইজন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ইহার প্রকাশভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করা হয়। ভাগবত মিত্র কলিকাতায় বদলি হইলে, হরনাথ কলিকাতা ও কটকের ভক্তগণকে সম্মিলিতভাবে এই পত্রিকা প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিতে বলেন। সত্যই হরনাথের বাঙ্গালী ভক্তের সংখ্যা এইরূপ বর্ধিত হইয়াছিল যে, তাঁহার লীলা এবং উপদেশাবলী প্রচারের জন্য এইরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। কটক হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় হরনাথের অলৌকিক কার্যাবলীই বিশেষভাবে প্রকাশিত হইত এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতিরঞ্জিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে ভক্তমণ্ডলীর প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠে।[২]

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৯০। হরনাথের জীবিতকালে 'পাগল হরনাথ' পঞ্চম খণ্ড এবং 'উপদেশামৃত' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। 'পাগল হরনাথ' পঞ্চম খণ্ডের জন্য শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় পত্র সংগ্রহ করেন এবং সেগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

ইহাদের ইংরাজী অনুবাদ ১৯৬৪ সালে A. Ramkrishna Shastri নামে একজন অন্ধ্রদেশীয় ভক্ত Pagal Haranath—Part V নামে প্রকাশ করেন।

২। কলিকাতা এবং কটকের ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে 'হরনাথ' পত্রিকা প্রকাশে মনোযোগী হন নাই। 'হরনাথ' পত্রিকা কটকের শ্রীহরনাথ প্রেস হইতে অজয় ঘোষ কর্তৃক কিছুকাল প্রকাশিত হইয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়।

বোম্বাই জন্মোৎসব

২রা জুলাই (বাংলা ১৮ই আষাঢ়) বোম্বাই নগরীতে হরনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে, সম্ভবতঃ জুন মাসের ২০শে।২১শে তারিখে, পুত্র, পুত্রবধূদ্বয় ও মেনকুরানীসহ হরনাথ ও কুসুমকুমারী কলিকাতার ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া বোম্বাই নগরীতে শুভ পদার্পণ করিলেন। বোম্বাইবাসিগণ মহাসমারোহে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া রণছোড়দাসজীর 'কৃষ্ণকুঞ্জে'[১] লইয়া গেলেন। বোম্বাইবাসীগণ ভারতের সর্বস্থানের ভক্তবৃন্দকে জন্মোৎসবে যোগদানের জন্য সাদর আহ্বান জানাইয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকুঞ্জে'[১] সকলের স্থান সংকুলান হইবে না বুঝিয়া, তাঁহারা 'কৃষ্ণকুঞ্জ' হইতে কিছুদূরে আলতামণ্ড রোডের পার্শ্ববর্তী কাম্বালা হিলের এক বিরাট উদ্যানবাটীতে উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসব-স্থানটি এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে, হরনাথ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাহা ছাড়া, বোম্বাইবাসিগণ উৎসবের প্রত্যেকটি বিষয়ে এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিপুল জনসমাগম সত্ত্বেও সামান্যতম গোলমালও শ্রুত হয় নাই। এই সুবন্দোবস্ত দেখিয়া হরনাথ অতিশয় প্রীত হইলেন ও পরম সন্তোষলাভ করিলেন। তমালিনী মাকে লিখিত একটি পত্রে হরনাথের এই সন্তোষ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 'মা! এরকম উৎসব কখনও দেখি নাই, বড় আনন্দ হয়েছিল এদের সুবন্দোবস্ত দেখে, এমন সুবন্দোবস্ত আমরা দেখি না। এরকম কাজ, কিন্তু একটু গোলমাল নাই। কারও মুখের একটি কথা শুনিতে পাই নাই।[২] বিপুল আয়োজনও হইয়াছিল। হরনাথের মতে, একাধারে রাজসূয় যজ্ঞ ও প্রভাস যজ্ঞ হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে, বিশেষতঃ কলিকাতা, কটক, ছাপরা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে, অগণিত ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। তিনদিন ধরিয়া উৎসব চলিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন আকাশ ছিল

১। রণছোড়দাসজীর বাসভবনের নাম

২। সংগৃহীত পত্রাবলী : ৪২নং পত্র

রৌদ্রকরোজ্জ্বল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে প্রচণ্ড বর্ষণ আরম্ভ হইল। আনন্দোৎসবের শেষদিনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়া ব্যথিত আকাশ যেন তাহার মনোবেদনা প্রকাশ করিল। তৎসত্ত্বেও বোম্বাইবাসী নরনারীর অদম্য পরিশ্রমে কাহারও কোন অসুবিধা হইল না।

উৎসবের শেষদিনে অনেকেই আপন আপন গৃহে গমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। ভক্তরা হরনাথ ও কুসুমকুমারীর নিকট বিদায় লইবার সময় অজস্র অশ্রুপাতে তাঁহাদের উভয়ের চরণযুগল অভিসিঞ্চিত করিল। তাহাদের বিদায়দানকালে হরনাথেরও চক্ষে ধারা বহিল। আকাশ হইতে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতেছে, তাহার সহিত শত সহস্র নরনারীর বিদায়-বেলার অশ্রু মিশ্রিত হইতেছে, আকাশের গর্জনের সহিত তাহাদের বেদনার্ত কণ্ঠের ব্যথার বাণী একাকার হইয়া যাইতেছে। স্বয়ং হরনাথ এই অপূর্ব দৃশ্যটির একটি জীবন্ত বর্ণনা দান করিয়াছেন। 'আজ উৎসবের শেষ দিন, তাই আজ আকাশ, পাতাল, পৃথিবী সব অন্ধকার ও আকাশের বারিধারার সঙ্গে সহস্র সহস্র ভক্তের নয়নের জল মিশিতেছে। আকাশের গর্জনের সঙ্গে সকলের ভয়ানক হৃদয়বিদারক চীৎকার মিশিয়া কি যে করিতেছে বলিতে পারি না।'

৪ঠা জুলাই উৎসব শেষ হইল। দুই-একদিনের মধ্যে ভক্তগণ প্রায় সকলেই নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু বোম্বাইবাসিগণ হরনাথ-কুসুমকুমারীকে এত শীঘ্র যাইতে দিলেন না। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে হরনাথকে আরও কিছুদিন বোম্বাই নগরীতে অবস্থান করিতে হইল। হরনাথের ইচ্ছানুক্রমে কয়েকজন ভক্তও আরও দুই-একদিনের জন্য তাঁহার সহিত অবস্থান করিলেন।[১] ভক্তগণসহ হরনাথ ও কুসুমকুমারী কৃষ্ণকুঞ্জে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দুই-তিন দিন পরেই মেদিনীপুরে গমন করিলেন। আশুতোষ গুহ হরনাথের

১। তারাপ্রসাদ ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ ও আশুতোষ গুহ প্রভৃতি হরনাথের সহিত কৃষ্ণকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রঃ হরনাথ-স্মৃতি : ষষ্ঠ লহরী, পৃঃ ৭

সহিত আরও দশ-বার দিন অবস্থান করিলেন। এইবারে হরনাথ প্রায় একমাস কাল বোম্বাই নগরীতে অবস্থান করেন। বোম্বাইবাসিগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আদর-যত্নে হরনাথ অভিভূত হইলেন।

সোনামুখীতে আসিবার কিছুদিন পরে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। হরনাথের দক্ষিণ চরণের দুইটি অঙ্গুলি ভয়ানকভাবে দগ্ধ হইল। ইহাতে হরনাথ অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কুসুমকুমারীও ক্ষুধামান্দ্যে ভুগিতে লাগিলেন, মেনকুরানীর শরীরও সহসা খারাপ হইল। কিছুদিন ধরিয়া মানসিক অশান্তি ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর হরনাথ কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। আগস্ট মাসে বৃন্দাবন হইতে অটলবিহারী সংবাদ দিলেন, বৃন্দাবন আশ্রমের ছাদ মেরামতের জন্য দুইশত টাকার প্রয়োজন। বোম্বাইবাসিগণও কলিকাতার ভক্তগণের নিকট হইতে টাকা চাহিতেছেন জানিয়া হরনাথ ভাগবতকে এ-বিষয়ে ব্যবস্থা লইবার জন্য লিখিলেন।

ভাগবত মিত্র এই সময় হইতেই হরনাথের জীবনী রচনা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, উপাদান-সংগ্রহে মনোযোগী হন এবং সেজন্য হরনাথের ছাত্রজীবন, কর্মজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। ভাগবত মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত এই সমস্ত তথ্য 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা' নামক পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হরনাথ ভাগবতের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তরদান করিতে থাকিলে, উৎসাহী ভাগবত প্রশ্নের উপর প্রশ্নে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলেন। তিনি শান্তভাবে ভাগবতের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দান করেন এবং উৎসাহিত করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। বোম্বাইবাসিগণও এই সময়ে তাঁহার জীবনের দুই-একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ব্রতী হন।

এই সময়ে হরনাথের একজন বিশিষ্ট ভক্ত তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মাসিক সাড়ে সাতশত টাকা বেতনে হাইকোর্টের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রারের পদে উন্নীত হন। ভাগবত মিত্রেরও লাহোরে বদলি হইবার কথা

হইতেছিল। বরাহনগরের শরৎচন্দ্র দে মহাশয় আগামী পূজার সময় নগর-সংকীর্তন করাইবার আয়োজন করিতেছিলেন এবং নগর-সংকীর্তনে হরনাথকে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। পূজার সময় হরনাথ কলিকাতা যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া, পূজার পূর্বেই একবার শরৎবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করেন। আগস্ট মাসের মধ্যে নারায়ণচন্দ্র ঘোষের সোনামুখী আসিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি আসিলে হরনাথ তাঁহার সহিত কলিকাতা যাইতে মনস্থ করেন।

হরনাথের দগ্ধ পদাঙ্গুলিদ্বয়ের ক্ষত ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে ছিল। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, সে সম্বন্ধে ভক্তবৃন্দ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন। কিন্তু একমাত্র তারাপ্রসাদ ঘোষ ব্যতীত হরনাথ কাহারও নিকট এই দুর্ঘটনার কারণ ব্যক্ত করেন নাই। তারাপ্রসাদ ঘোষ বিশ্বাস করিতেন যে, অনেক সময় ভক্তদের জন্য হরনাথকে রোগ ভোগ করিতে হয় বা দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। পদাঙ্গুলি দগ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও সেইরূপ কোন কারণের অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি অবগত হইলেন, যেদিন বোম্বাই নগরীতে হরনাথের এক বিশিষ্ট ভক্তের বিপণিতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, সেইদিনই হরনাথের পদাঙ্গুলিদ্বয় দগ্ধ হইয়াছিল। অগ্নিকাণ্ডে ভক্তটির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই জানিয়া, তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, ভক্তকে দুর্ভাগ্যের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য হরনাথ অগ্নির দাহিকা-শক্তি স্বীয় পদাঙ্গুলিতে আকর্ষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে, হরনাথ অগ্নিকাণ্ডজনিত ক্ষতি হইতে ভক্তকে রক্ষা করার ব্যাপার ছাড়া তারাপ্রসাদ ঘোষের আর সমস্ত কথাই স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জানাইলেন, তাঁহার পদাঙ্গুলির ক্ষত নিরাময় হইয়াছে কিন্তু সে স্থানে একটি সুগভীর কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িয়াছে।[১]

সেপ্টেম্বর মাসে ভাগবত মিত্র সত্যসত্যই বদলি হইলেন, কিন্তু লাহোরে নয়—রাওলপিণ্ডিতে। রাওলপিণ্ডিতে গমন করিয়া কিছুদিন

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭ (ইংরাজী অনুবাদ)

নগেনবাবুর সহিত বাস করিয়া তিনি বাসা পাইলেন এবং সহধর্মিণীকে লইয়া সেই বাসায় বসবাস করিতে লাগিলেন। লেখাপড়ার জন্য সন্তান-সন্ততিবর্গকে আনা হইল না। তাহারা কলিকাতায় রহিল। রাওলপিণ্ডিতে আসিয়া ভাগবতচন্দ্র স্বচক্ষে কালীবাড়ী, হরিসভা প্রভৃতি দর্শন করিলেন। হরনাথের আমলের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তখন প্রায় কেহই আর রাওলপিণ্ডিতে ছিলেন না। সেইজন্য ভাগবতচন্দ্র তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাইলেন না ; কিন্তু কাজের চাপ কম থাকায়, রাওলপিণ্ডির নির্জন পরিবেশে ভাগবতের 'হরনাথ-জীবনী'র রচনাকার্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাগবতচন্দ্র শ্রীনগর গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সংবাদ অবগত হইয়া হরনাথ তাঁহাকে শ্রীনগরের ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার ললিতমোহন বসুর অথবা ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিবার পরামর্শ দান করিলেন। শ্রীনগরে গমন করিয়া ভাগবতচন্দ্র হরনাথের মুখে শোনা তাঁহার জীবনীর বহু ঘটনার স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীনগর এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মানচিত্রও তিনি এই সময়ে সংগ্রহ করেন। স্বর্গধাম-গত হরনাথ ভক্তদের জন্য স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার পরিকল্পনাও এই সময়ে তাঁহার মনে উদয় হয়। হরনাথ এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহিত করেন।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হরনাথ সোনামুখী হইতে কটক এবং কটক হইতে পুরী গমন করেন। কটকের টহলপ্রসাদ ও জ্যোতিষপ্রসাদ হরনাথকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আদর-যত্নে মহানন্দে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া হরনাথ পুরীতে গমন করেন। পুরী আশ্রমে এই সময় এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে চারিদিন ধরিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্রভোজন করানো হয়। বরাহনগরের শরৎচন্দ্র দে মহাশয় এই বাবদ এক সহস্র মুদ্রা দান করেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দরিদ্রনারায়ণের ভোজনের তত্ত্বাবধান করেন। উৎসবের পর শরৎবাবু কলিকাতা গমন করেন। কিন্তু হরনাথ আরও কিছুদিন পুরীতে অবস্থান

করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তিন-চারিদিন পরে সোনামুখী বাটীতে অসুস্থতার পর কুসুমকুমারীর পথ্য পাওয়ার সংবাদ পাইয়া হরনাথ সোনামুখী যাত্রা করিলেন।

সোনামুখীতে পৌঁছিয়াই হরনাথ দেখিলেন যে, বাটীর প্রায় সকলেই অসুস্থ অথবা অসুস্থতার কারণে দুর্বল। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তা হইল। পূজার আর বেশী বিলম্ব নাই। পূজার সময় বহু ভক্ত এবং আত্মীয় সমাগম হইবার সম্ভাবনা। অথচ যাঁহারা তাহাদের তত্ত্বাবধান এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিবার মতো কর্মক্ষম তাঁহারা সকলেই রোগাক্রান্ত অথবা রোগজীর্ণ। অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়াও কোন কূল-কিনারা পাইলেন না। অবশেষে সমস্ত চিন্তাধারা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তিনি কিয়ৎ পরিমাণে স্বস্তি লাভ করিলেন।

এই বৎসর পূজার সময় যে সমস্ত ভক্ত সোনামুখী আগমন করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নারাঙ্গীলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারাঙ্গীলালকে দিয়া হরনাথ 'পাগল হরনাথ' ও 'উপদেশামৃত'-এর হিন্দী অনুবাদ করাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া নারাঙ্গীলালও অনতিকাল মধ্যেই অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।[১]

পূজার অব্যবহিত পরেই হরনাথ ও কুসুমকুমারী নিদারুণ সর্দি ও কাশিতে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। সেজন্য অন্যান্য বৎসরের মতো এ বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন (২৭শে অক্টোবর) তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অসুস্থতার সময় সুশীল নামক একজন ভক্ত প্রাণপণে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবার গুণে হরনাথ ও কুসুম-কুমারী অল্পকাল মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং একই দিনে পথ্য পাইলেন। কিন্তু শরীরে বল পাইতে হরনাথের প্রায় এক মাস লাগিল। কুসুমকুমারীর দুর্বলতা এক মাসের মধ্যেও কাটিয়া উঠিল না। তিনি দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৭৭ (ইংরাজী অনুবাদ)

সুস্থ হইয়া উঠিয়া হরনাথ আবার পূর্বের ন্যায় চলাফেরা করিতে এবং পত্র লিখিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া, কতকগুলি কার্য তাড়াতাড়ি সমাধা করিবার জন্য এবং সেইগুলি সম্পন্ন হইবার পর নূতন কয়েকটি কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ভাগবত মিত্রকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে সি. পি. সিংহ নামক একজন ভক্ত 'পাগল হরনাথ'-এর উর্দু অনুবাদ করিতেছিলেন।[১] ভাগবত মিত্র তাঁহাকে এই কার্যে উদ্‌বুদ্ধ করেন বলিয়া, হরনাথ তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন গ্রন্থখানির উর্দু অনুবাদ কতখানি হইয়াছে। উর্দু অনুবাদ সমাপ্ত হইলে, অনূদিত গ্রন্থখানি শীঘ্র মধ্যে মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার জন্যও ভাগবতকে নির্দেশ দিলেন। তাহার পর গুরুমুখী ভাষায় 'পাগল হরনাথ'-এর অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা ভাগবতকে জানাইলেন।

ইতিমধ্যে সোনামুখীতে পুনরায় ব্যাপক আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দিল এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীগণ হরনাথের দ্বারে আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের জন্য প্রার্থনা জানাইলে, হরনাথ তাঁহার বোম্বাইবাসী ভক্তবৃন্দকে কিছু ঔষধ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। হরনাথের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহারা বিপুল পরিমাণ ঔষধ ও পথ্যাদি পাঠাইলেন। বরাহনগরের শরৎবাবুও এই বিষয়ে সাহায্য করিলেন। হরনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস এই ঔষধ বিতরণের ভার গ্রহণ করিলেন। বাটীতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

বোম্বাইবাসী ভক্তগণের মধ্যে ভগবানদাস ও রণছোড়দাস সোনামুখীতে একটি স্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া, উহা চালাইবার জন্য মাসিক ব্যয়ের আনুমানিক একটা হিসাব হরনাথের নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন। এই সুমহান ইচ্ছা প্রকাশের জন্য হরনাথ ভগবানদাসকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কোন হিসাব পাঠাইলেন না। তিনি স্থির করিলেন যে, দাতব্যের পরিমাণ এই বৎসরে দেখিয়া লইবার পর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করিবেন।*

১। পাগল হরনাথ: চতুর্থ খণ্ড: ১৪নং পত্র

* এই দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই

১৯২১ সালের মার্চ মাসের ২৭শে হইতে ৩১শে পর্যন্ত হরনাথের বাটীতে পঞ্চদিবসব্যাপী নামসংকীর্তন হয়। ১লা এপ্রিল বৈষ্ণব ভোজন করানো হয়। এই সময়ে তিনি আশা করেন, আগামী জন্মোৎসবের সময় 'পাগল হরনাথ'-এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এই বৎসর জন্মোৎসব পুরীতে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু ভাগবত মিত্র এই সময়ে লাহোরে ছিলেন। কলিকাতার ভক্তদের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন। গত বৎসর বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবের কার্যসূচী ভাগবত মিত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের উৎসব আশাতীতরূপে সাফল্য লাভ করায় ভাগবতবাবুর ধারণা হয় যে, ইহা তাঁহার নির্দেশানুযায়ী প্রণীত কর্মতালিকার ফলশ্রুতিমাত্র। হরনাথ তাঁহার এই ভ্রম অপনোদন করিয়া জানান যে, বোম্বাইবাসী ভক্তগণ ভাগবতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু উৎসবের সময় যে আন্তরিকতার পরিচয় তাহারা দিয়াছিল তাহা ভাগবতের আদেশে সম্ভব হয় নাই। ইহা তাহাদের ঐকান্তিকতা বা একনিষ্ঠতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

জন্মোৎসবের পূর্বে দেশ-বিদেশের ভক্তগণ নিজ নিজ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যতটা সম্ভব চাঁদা আদায় করিতেন। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইত। প্রথমতঃ, সামান্য হইলেও উৎসবের ব্যয় কিয়ৎপরিমাণে নির্বাহ হইত। দ্বিতীয়তঃ, হরনাথের প্রচারও হইত। এই বৎসর হরনাথ নিয়ম করেন যে, এক টাকার কমে চাঁদা দিতে অসমর্থ কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা লওয়া হইবে না। কোনরূপ বিরূপ মন্তব্যসহ কোন চাঁদাও গ্রহণ করা চলিবে না। তবে দারিদ্র্যহেতু যাহারা দানে অসমর্থ, তাহাদের নিকট হইতে এক পয়সা চাঁদাও লওয়া চলিবে।[১]

এই বৎসর পুরীতে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবে* তাঁহার বিশ্ববাণী প্রথমে প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাহিরে হরনাথের যত

১। পাগল হরনাথ : পঞ্চম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ২২২ (ইংরাজী অনুবাদ)

* জন্মোৎসবের বিবরণের জন্য (বোম্বাই জন্মোৎসব) পুস্তিকার ৭৬—৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ভক্ত নরনারী আছেন, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববাণী ইংরাজী ভাষায় রচিত হয়। এই বিশ্ববাণীতে তিনি আপনাকে বারবার পাগল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, পাগলের অসম্বদ্ধ প্রলাপে আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, তিনি নিজেই তাঁহার কথার অর্থ সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পান না। ভক্তদের সহিত সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এ সম্পর্ক একদিনের নয়—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, আবার সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে—আবার সকলে মিলিয়া লীলা করিবেন। হরনাথের বাহির ও অভ্যন্তর—এই দুইটি সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য তাঁহাকে উপলব্ধি করা কষ্টকর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সকলের সহিত আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। তিনি কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও ভগিনী। এইভাবে তাঁহার আত্মীয়তার পরিধি ক্রমবর্ধমান আকারে বিস্তারলাভ করিতেছে।

উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া তিনি ভক্তদিগকে বলেন—"Lay all your burden of misery on my head, and with the help of the leaky boats cross joyfully and playfully to the other side, let me see this and be happy."

সর্বশেষে ভক্তদের আবার অনুরোধ করিয়াছেন—"Do not think of me, but do not forget me."[১]

এই বিশ্ববাণী হরনাথ অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে সবিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতি ছত্রে ভক্তদের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক ভালবাসা ও সুগভীর প্রেম অভিব্যক্ত, তাহার স্পর্শে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। ভক্তবৃন্দকে আপনার জন বলিয়া স্বীকৃতি-দানের মধ্যেই এই প্রেম ও ভালবাসা সীমাবদ্ধ নয়। তাহাদের প্রত্যেকের পাপের বোঝা সানন্দে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতেও তিনি প্রস্তুত। যিনি এইভাবে ভক্তদের সকল ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সকল চিন্তা হইতে বিনির্মুক্ত করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তদের ভালবাসা যে দিনের পর দিন ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না।

১। Birthday Message 1921 (Vide Sri Haranath—His Play and Precepts : Vithaldas Nathavai Mehta : Page 55)

বরাহনগরের জন্মোৎসব : উদ্যোগপর্ব

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে হরনাথ দিল্লীর নেপালচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'হরিসভা' পরিদর্শনের জন্য এক সাদর আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন। নেপালবাবু ইহার কিছুকাল পূর্বে কালেক্টারের পদ পাইয়াছেন। হরনাথের অহেতুকী কৃপার বলে তাঁহার এই উচ্চ-পদে উন্নয়ন হইয়াছে, একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার অবসরের পরিমাণও কিছু অধিক হওয়ার ফলে তিনি দিল্লীতে একটি 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মোৎসবের পর সোনামুখীতে আগমন করিবার কিছুদিন পরে এই হরিসভা পরিদর্শনের জন্য হরনাথের নিকট নেপালবাবুর সাদর আহ্বান আসে। কিন্তু হরনাথ এই সময় দিল্লী হরিসভা পরিদর্শন করার যৌক্তিকতা দেখিতে পান না। তিনি বুঝিতে পারেন, নেপালবাবুর হরিসভা খুব বেশীদিন হয় নাই। সেইজন্য হরিসভার ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে দিল্লী যাইবার কথা তিনি নেপালবাবুকে জানাইলেন।*

এই বৎসর পূজার পরে হরনাথ কিছুদিনের জন্য বোম্বাই গমন করেন এবং বোম্বাই হইতে ফিরিবার পথে ২৩শে নভেম্বর তারিখে নাগপুরে গমন করেন। নাগপুরে চার-পাঁচ দিন অবস্থান করেন। সেই সময় সমগ্র নাগপুরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট উৎসব হয়। নাগপুরবাসিগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, হরনাথের ১৯২২ সালের জন্মোৎসব নাগপুরেই যেন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে হরনাথও সম্মতিদান করেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দ-মিলন' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে হরনাথের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন। ফলে, 'আনন্দ-মিলন' সত্যই আনন্দের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠে। এই আনন্দের পরেই হরনাথ এক নিরানন্দময় পরিবেশের মধ্যে পড়েন। বোম্বাই হইতে আসিবার পথে নাগপুরের ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে ১৯২২ সালের জন্মোৎসব নাগপুরে অনুষ্ঠিত করিবার জন্য

* সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১০৯

তিনি স্বীকারোক্তি করেন। তাহা লইয়া কলিকাতার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, ভাগবত মিত্র নাগপুরে এ বৎসর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে মোটেই সম্মতিদান করিলেন না। কলিকাতায় জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য তিনি জিদ ধরিয়া থাকেন। ইহাতে হরনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ভাগবতের উপরেই এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ করেন। তবে দরিদ্র নাগপুরবাসীদের জন্য যে তাঁহার অন্তরে সহানুভূতির ফল্গুধারা প্রবাহিত হইতেছিল, পত্রের ভাষায় তাহা গোপন রহিল না। তাহা ছাড়া, নাগপুর সম্পূর্ণ নূতন স্থান। এইরূপ নূতন স্থানে উৎসবের মাধ্যমেই জনসাধারণের মধ্যে হরনাথের ধর্ম্মমত প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ভাগবত মিত্র কিন্তু হরনাথের কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করিলেন না। কলিকাতাতেই উৎসব করিতে তিনি মনস্থির করিলেন। তদনুসারে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি নাগপুরবাসীদের এক পত্র দিলেন।

ভাগবতের পত্রে ভক্তগণের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে দেখিয়া, নাগপুরবাসী ভক্তগণ এবারের মত তাঁহাদের দাবি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতাতে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দিলেন। এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পত্র লিখিতে নাগপুরবাসীদের মাত্র ৮।১০ দিন সময় লাগিল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই ভাগবতবাবু অধৈর্য হইয়া উঠিলেন এবং উৎসবের সকল উদ্যোগ-আয়োজন বন্ধ করিলেন। ভাগবতের এই নির্বিকার ঔদাসীন্যে ভীত হইয়া কলিকাতার ভক্তগণ হরনাথের শরণ লইলে, তিনি অতিশয় মর্ম্মপীড়া পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, অরণ্য-কুসুমের অরণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া বিজন অরণ্যে ঝরিয়া যাওয়া বরং ভাল, তবুও এইভাবে উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করা ভাল নয়।

ভাগবতের ঔদাসীন্য হরনাথকে ভীতি-প্রদর্শনের জন্য। তাঁহার সহিত যুক্তি না করিয়া উৎসব নাগপুরে অনুষ্ঠান করিবার কথা দিয়া হরনাথ যেন মহা অপরাধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের সহিত হরনাথের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। উৎসবে তাঁহার স্থান

উপস্থিত অতিথির সমতুল্য। অথচ, উৎসব-অনুষ্ঠানের স্থান-নির্বাচন লইয়া তাঁহাকে অহরহ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করিতে হইল। সেইজন্য তাঁহাকে আর ভয়-প্রদর্শন না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া হরনাথ ভাগবতকে পত্র দিলেন। ভাগবতের এই মনোভাবের ফলে তাঁহার এরূপ মনোবেদনা হয় যে, তিনি ভাগবতকে জানাইয়া দেন, তাঁহাদের সহিত আলাপ না হইয়া যদি তাঁহাকে ভিক্ষান্নেও জীবনধারণ করিতে হইত, তাহাতেও তিনি পরম শান্তি লাভ করিতেন।

এই সময়ে অটলবিহারী নন্দী দুইখানি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া হরনাথের অনুমতি চাহিলে, হরনাথ সানন্দে অনুমতি দান করেন এবং এই বিষয়ে পঞ্চজন বৈষ্ণবের মতামত লইয়া কার্যে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন। ভাগবত মিত্রও এই সময়ে একটি গীতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। ভাগবতের ব্যবহারে মনোবেদনা পাইলেও, গীতা-প্রকাশ বিষয়ে হরনাথ তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন এবং দোলপূর্ণিমার সময় ভাগবতকে সোনামুখী আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইতিপূর্বে বরাহনগরের শরৎবাবু সোনামুখী আসিয়া তাঁহার নিকট কয়েকদিন অবস্থান করেন। ভাগবতবাবু হরনাথ-জীবনীর উপাদান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের পিতামাতার ব্যবহৃত জিনিষপত্র বা হিসাবের খাতার পাতা প্রভৃতিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভগবতী দেবীর বাক্সের মধ্যে হরনাথের গলার রূপার পদক, দুই-একটি গুঁজিকাঠি ও কয়েকটা তামার পয়সা পাওয়া গিয়াছিল।[১]

হরনাথের বাল্যকালে ব্যবহৃত এই পদকটি এবং ভগবতী দেবীর গুঁজিকাঠি প্রভৃতি কয়েকটি অলঙ্কার ও ভগবতী দেবীর নকল দাঁত ভাগবতবাবু হরনাথের নিকট চাহিয়াছিলেন। হরনাথ অলঙ্কার কয়েকটি ভাগবতকে লইয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার দাঁত তাঁহার লীলাবসানের পর লইবার জন্য ভাগবত মিত্রকে অনুরোধ করিলেন। যে পত্রটিতে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির

১। অমিয় হরনাথ-লীলাকথা

কথা লিখিত হইল, তিনি সেই পত্রখানিকেই দানপত্র হিসাবে গণ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।[১]

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (বৈশাখ মাসের ২রা তারিখে) 'রাধানগর' আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হরনাথ রাধানগর যান।* এই সময় তাঁহার সহিত যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম পাওয়া যায় না। তবে বীরভূমের খ্যাতিপুরের বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রাধানগরের আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে যে হরনাথের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায়। তাহা ছাড়া, এমন অনেক ভক্ত গিয়াছিলেন যাঁহারা সকলেই বেশ শিক্ষিত ও ভদ্র-সন্তান এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ। যতদূর মনে হয়, নারায়ণ-চন্দ্র ঘোষ, সত্যচরণ সেন ও নিত্যনিরঞ্জন সেন প্রভৃতিও এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় রাধানগরে গমন করিয়াছিলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে রাধানগর গ্রাম-নিবাসী রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় চার্বাক মতাবলম্বী নাস্তিকের মত হরনাথের ভক্তগণের ব্যবহার দেখিয়া প্রথমে তাঁহাদের এবং হরনাথের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু পরে তিনি একজন নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হন এবং রাধানগর আশ্রম তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠে।[২]

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রাধানগর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, আর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন 'বেলুট' আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। বেলুটের ফণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাকল্পে হরনাথের কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তকে নিমন্ত্রণ করেন। কবিরাজ সত্যচরণ সেন, নিত্যনিরঞ্জন সেন, খাগড়ার জমিদার কিরণেন্দু ঘোষ, উকিল যতীশচন্দ্র বিশ্বাস এবং নারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কলিকাতা হইতে আগমন করেন। রাত্রি ১১টার সময় তাঁহারা গলসী স্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন এবং ফণিকণ্ঠবাবুর ব্যবস্থানুসারে রক্ষিত গো-শকটে করিয়া

১। পাগল হরনাথ: পঞ্চম খণ্ড: পত্রসংখ্যা ২৩২

* এই আশ্রমটি রাধানগরের অন্তর্গত রঘুনাথপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়; নাম শ্রীশ্রীহরনাথ আশ্রম। দ্রঃ হরগাথা, পৃঃ ১

২। হরনাথ-স্মৃতি, পঞ্চম লহরী, পৃঃ ২৯

রাত্রি আড়াইটার সময় বেলুটে আসিয়া পৌছান। হরনাথ তাহার পূর্বদিনে বেলুটে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

মহানন্দে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা উৎসব উদযাপিত হইল। নিত্যনিরঞ্জন স্ব-রচিত গানে বেলুটের পল্লী-পরিবেশ মাতাইয়া তুলিলেন। তিনি যখন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ভাল পাগল-ধরা ফাঁদ পেতেছে পাগলা' গানটি প্রাণের সমস্ত দরদ ঢালিয়া গাহিতে লাগিলেন, তখন উপস্থিত সকলেরই মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল। বৈকালিক আলোচনা-সভায় সত্যচরণ সেন মহাশয় যখন তাঁহার রচিত 'হরনাথ চরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে হরনাথের জীবন-কাহিনী পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন হরনাথ অভিভূত হইয়া বলেন, 'আমার মনে হইতেছে তুমি আমার ডাইরী বহি চুরি করিয়া কপি করিয়া লইয়াছ।'[১]

বেলুটে রঘুমণি ভট্টাচার্য নামক এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা উৎসবে ভক্তবৃন্দকে খোল-করতালসহযোগে হরনাথের জয়ধ্বনি করিতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে থাকেন। কিন্তু কালক্রমে ইনিও একজন পরম নিষ্ঠাবান হরনাথ-ভক্তে পরিণত হন।[২]

যথাসময়ে বরাহনগরে হরনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।[৩] ভাগবত মিত্র প্রাণপণ যত্নে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেইজন্য উৎসবের আয়-ব্যয়ের একটা বাজেট তিনি প্রস্তুত করিলেন এবং দেখিলেন যে, আয়ের অনুপাতে উৎসব অনুষ্ঠান করিতে হইলে উৎসবের কয়েকটি অঙ্গ বাদ পড়িয়া যায়। অপরাপর কর্মকর্তাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা হইল। তাঁহারা কেহই উৎসবের কোনরূপ অঙ্গহানি করিতে সম্মত

১। উক্ত গ্রন্থের কোন্ অংশ সম্বন্ধে হরনাথ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, সত্যবাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থেতে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনায় বহু ভুল তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। সেইজন্য সমগ্র গ্রন্থটি সম্বন্ধে হরনাথ কখনই এইরূপ মন্তব্য করিতে পারিতেন না। এই মন্তব্য গ্রন্থটির অংশবিশেষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে।

২। হরনাথ-স্মৃতি: অষ্টম লহরী, পৃঃ ৩০-৩১

৩। বোম্বাই জন্মোৎসব, পৃঃ ৭৯

হইলেন না। ঘাট্‌তির টাকা কোন ভক্তের নিকট ঋণস্বরূপ লইয়া উৎসব করার স্বপক্ষে তাঁহারা মত দিলেন, পরে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থাগম হইলেই এই ঋণ শোধ করা হইবে, ইহাও স্থির হইল। ঋণশোধের জন্য উৎসবের কর্মকর্তাগণই দায়ী থাকিতে সম্মত হইলে, সকলে মিলিয়া ঘাট্‌তির পাঁচশত টাকা সাময়িকভাবে ঋণদানের জন্য ভাগবত মিত্রকেই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। ভাগবত মিত্র তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। কিন্তু ৪ঠা জুলাই তারিখে জন্মোৎসবের খরচের জন্য অর্থ অনটনের কথা হরনাথকে জানানো হইলে, তিনি স্বয়ং যখন ভাগবতকে ডাকিয়া পাঁচশত টাকা কর্জ দিতে বলেন, তখন ভাগবত পাঁচশত টাকা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উৎসবের কর্তাদের হস্তে দিয়াছিলেন। এই টাকা কর্জ দিয়া কর্মকর্তাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার লিখিত দলিল গ্রহণ করা হয় নাই।[১] যাহা হউক এইভাবে আড়ম্বরের সহিত উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইল।

কিন্তু কলিকাতার ভক্তদের মধ্যে এক মত-বিরোধ সৃষ্টি হইল। ভাগবত মিত্রের অদম্য কর্ম-প্রেরণা মধ্যে কিছু পরিমাণ অসহিষ্ণুতাও ছিল। সেজন্য অন্যান্য ভক্তগণ ভাগবতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। সেই বিরূপ ভাব এতদিন প্রকাশ পায় নাই। এইবার তাহা প্রকাশ পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার কতিপয় ভক্ত ভাগবতকে যতদূর সম্ভব উপেক্ষা করিতে লাগিল। দুঃখিত হইলেও ভাগবতের মুখে ইহার কিছুই প্রকাশ পাইল না, কিন্তু হরনাথ সকলই বুঝিতে পারিলেন। ভাগবতের মলিন মুখখানি দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বড় বাজিল। সেই সঙ্গে আশঙ্কাও জাগিল, ভাগবতের অসহিষ্ণুতা কখন তীব্র প্রতিবাদে মুখর হইয়া উৎসবের আনন্দময় পরিবেশকে বিবাদ-বিসংবাদ ও কোলাহলে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভাগবত এইবার চরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন। উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। উৎসবে প্রচুর ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। হরনাথের পত্রে জানা যায়, এবার

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃঃ ২১১

উৎসবে তিনি সকলকে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, এমন জনতা তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই।[১]

উৎসবের পর হরনাথ সোনামুখীতে আসিলেন। কিন্তু উৎসবের সময় ভাগবত অসন্তোষের যে বহ্নিজ্বালা সযত্নে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইবার তাহা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভাগবতের পত্রে ইহার আভাস পাইয়া হরনাথ তাঁহাকে শান্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। ভাগবতের প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দল যে অন্যায় বা অবিচার করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না। সেইজন্য ভাগবতের বেদনায় তাঁহার সহানুভূতি শতধারায় অভিব্যক্ত হইল। তৎসত্ত্বেও তিনি ভাগবতকে এই সময়ে নীরবে সহ্য করিতে উপদেশ দিলেন এবং হৃদয়ের ব্যথা লাঘব করিবার জন্য আগস্ট মাসে হরনাথের সহিত পুরীধাম যাইতে আমন্ত্রণ করিলেন।

কলিকাতার ভক্তদের পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধের ভাব দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃই একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় রূপান্তরিত হইতেছিল দেখিয়া শান্তিপ্রিয় শরৎবাবু তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। ফলে, সভার কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। হরনাথের যে সমস্ত পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে পুরী আশ্রমের ব্যয়ভার নির্বাহ হইত, সেই সমস্ত পুস্তকও যথাসময়ে পুরী আশ্রমে প্রেরিত হইতেছিল না। পুরী আশ্রম হইতে এই সংবাদ পাইয়া হরনাথ উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং নেপালবাবুর মাধ্যমে শরৎবাবুকেও জানাইলেন যে, কর্মকর্তা হউন বা না হউন, শরৎবাবু যেন তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করেন।

আগস্ট মাসের প্রথম দশদিনমাত্র পুরীতে অতিবাহিত করিয়া হরনাথ সোনামুখী ফিরিয়া আসিলেন। পুরীতে অবস্থানকালে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। অর্শের যন্ত্রণায় তিনি অতিশয় কষ্ট পান। কিছুদিনের মধ্যে যন্ত্রণার বেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে, হরনাথ অনেকটা স্বস্তি লাভ করেন। এই বৎসর বর্ষাকালে প্রচুর

১। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১০৬

বৃষ্টিপাত হয়। ফলে, বি. ডি. আর লাইন ভাঙ্গিয়া যায়। সেইজন্য আগস্ট মাসে হরনাথ কলিকাতা আসিতে পারেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস পানাগড় হইয়া কলিকাতা আসেন।

এই বৎসরের জন্মোৎসবে যাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ জাগ্রত হয়, তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার অসন্তোষের কারণ চব্বিশ প্রহরব্যাপী সংকীর্তনের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। শরৎবাবুর বাগানবাটীতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে এত বেশী জনসমাগম হয় যে, সেখানে চব্বিশ প্রহরব্যাপী নামসংকীর্তনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব প্রতিভাত হয়। সেই হেতু নামসংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয় বাগানবাটীর বাহিরে। ইহাতে তারাপ্রসাদবাবু অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং জন্মোৎসবের কর্মকর্তাদের, বিশেষতঃ ভাগবতের, বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া হরনাথকে এক পত্র লিখেন। ইহাতে হরনাথ অতিশয় বিরক্ত হন। উৎসবটি যে ভাগবতের নিজের কাজ নয়, সকল ভক্তেরই ইহাতে সমান দায়িত্ব আছে, তাহা জানাইয়া লিখেন যে, তারাপ্রসাদ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের দায়িত্ব পালন না করার জন্যই উৎসবটি ত্রুটি-বিনির্মুক্ত হয় নাই।

এই সময়ে অনুকূল অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়ে। আগস্ট মাসের বারো তারিখ হইতে তাহার শরীর অসুস্থ হয়। সর্দিকাশির সহিত প্রবল জ্বরে অনুকূলের দেহের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। সেজন্য কথা থাকিলেও হরনাথ এই সময় কটক যাইতে পারেন নাই। অনুকূল সুস্থ হইয়া উঠিলে হরনাথ কটক গমন করিতে মনস্থ করেন। সাতদিন পরে অনুকূলের জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু অত্যধিক দুর্বলতার জন্য তাহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। তাহার অবস্থা দর্শনে হরনাথ অতিশয় কাতর হইলেন। আরোগ্যলাভ করিবার পর কয়েকদিন মধ্যে অনুকূল কিয়ৎ পরিমাণে সবল হইয়া উঠিলে, হরনাথ কটক যাত্রা করিলেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার বোম্বাই ও নাগপুর গমনেরও কথা ছিল। নভেম্বর মাসে হরনাথ পাটনা গমন

করেন। এইখানে ভক্তপ্রবর প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হরনাথের সংস্পর্শে আসেন (২৫ ডিসেম্বর)।[১]

পাটনা হইতে হরনাথ ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন এবং 'আনন্দ-মিলন' উৎসবের আয়োজন করেন। এই বৎসর 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে অসংখ্য ভক্ত নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় পাঁচ হাজার অতিথি আপ্যায়িত হয়।[২] ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারি এই দুইদিন ধরিয়া এই উৎসব চলিয়াছিল।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমার গুপ্ত ও তাঁহার পত্নী সরলা দেবী হরনাথের সংস্পর্শে আসেন।[৩] পরবর্তী কালে ইনি হরনাথ কর্তৃক 'বরিশালের গৌয়ারগোবিন্দ' এবং ভক্তগণ কর্তৃক হরনাথ-লীলার 'মুরারী গুপ্ত' নামে অভিহিত হন। হরনাথ এই সময়ে সোনামুখীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কটকের শ্রীযুক্ত টহলপ্রসাদ ও জ্যোতিষচন্দ্র রায়চৌধুরী এই সময়ে হরনাথের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। অক্ষয়বাবু ও তদীয় সহধর্মিণী সরলা দেবী হরনাথের নিকট দীক্ষা লইবার মানসে সোনামুখীতে আগমন করেন এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহারা উভয়ে হরনাথের ঐকান্তিক অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইতিপূর্বে সরলা দেবী স্বপ্নে হরনাথকে দর্শন করিয়াছিলেন। হরনাথও তাঁহাদিগকে অতিশয় পরিচিতের ন্যায় আদর-অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু তাঁহারা যখন আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, তখন হরনাথ দীক্ষাদানে তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি অক্ষয়বাবুকে এক পত্রে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, দীক্ষাদানের পদ্ধতিই তাঁহার জানা নাই।[৪] তৎসত্ত্বেও তাঁহারা এই আশায় বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন যে, হরনাথ তাঁহাদিগকে নিরাশ করিবেন না। কিন্তু দীক্ষা সম্বন্ধে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন হরনাথ

১। হরনাথ-স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী, পৃঃ ৭২
২। বিমলা মাকে লিখিত ইংরাজী পত্র : সংখ্যা ২৪৩
৩। হরনাথ-স্মৃতি : পঞ্চম লহরী, পৃঃ ৫৭
৪। আমার অভিজ্ঞতা : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, তখন সরলা দেবী বলিলেন, 'তবে আর আপনি আমাদের কোন উপায় করিলেন না'। তিনি যেরূপ জিদ করিতেছিলেন তাহাতে অবশেষে হরনাথ তাঁহাদের উভয়ের মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইয়া বলিয়াছিলেন, 'কোন চিন্তা নাই মা, আমি তো তোমাদের কোলে চব্বিশ ঘণ্টা আছি মা, চব্বিশ ঘণ্টা আছি বাবা।'[১]

সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের ২রা তারিখে অক্ষয়বাবু ও সরলা দেবী সোনামুখীতে আগমন করেন এবং হরনাথের স্নেহ ও করুণাধারায় অভিষিক্ত হইয়া আনন্দিতচিত্তে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। হরনাথও ইহার কয়েকদিন পরে পুরী গমন করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে অক্ষয়বাবু ও সরলা দেবী হরনাথ ও কুসুমকুমারীর শ্রীচরণযুগল দর্শনার্থ কলিকাতা হইতে পুরীধামে গমন করেন। এই বৎসর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দোল-উৎসব হয়। এই উৎসবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সহিত আবির খেলিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। তাহা ছাড়া, হরনাথের সহিত তাঁহারা জগন্নাথদেবের মন্দির, গম্ভীরা, হরিদাসের সিদ্ধবকুল, সমাধি প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন।

মার্চ মাসের ১৯শে।২০শে তারিখে হরনাথ পুরী হইতে সোনামুখী ফিরিয়া আসেন। আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ আসে হাওড়া জেলার আমতা হইতে আট মাইল দূরবর্তী ঝিখিরা নামক স্থানে হরনাথকে কেন্দ্র করিয়া উৎসবের আয়োজন হইয়াছে এবং উক্ত উৎসবে হরনাথকে যোগদান করিতেই হইবে। গোবর্ধন সেন, অনাদি মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা অবনী প্রভৃতি ঝিখিরা গ্রাম-নিবাসী কয়েকজন ভদ্র যুবক কলিকাতায় কর্ম করিতেন। কলিকাতায় আগমন করিলে গঙ্গার যে ঘাটে হরনাথ স্নান করিতে যাইতেন, তাঁহারাও সেই ঘাটে স্নান করিতেন। এইভাবে হরনাথের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা কালক্রমে হরনাথের অনুরাগী হইয়া পড়েন এবং হরনাথকে স্বগ্রামে লইয়া গিয়া একটি আনন্দোৎসব করিবার

১। আমার অভিজ্ঞতা : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৪

ঐকান্তিক কামনা তাঁহাদের অন্তরে জাগ্রত হয়। ভক্তবৎসল হরনাথ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন। তদনুসারে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া এবং ঝিখিরা গ্রামে উৎসবের আয়োজন করিয়া, ঝিখিরায় আগমনের জন্য হরনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন।[১] এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই উৎসবের আয়োজন হয় এবং হরনাথ ইহাতে যোগদান করেন। বোম্বাই হইতে জগমোহন দাস কল্যাণদাস এই উৎসবে আগমন করেন। হাওড়ার প্রফুল্ল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়েরও তখন কর্মসূত্রে ঝিখিরা যাইবার কথা ছিল। হরনাথ আসিয়াছেন জানিয়া তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া আমতা হইতে আট মাইল পথ সাইকেলে অতিক্রম করিয়া, ঝিখিরায় আসিয়া উপস্থিত হন। প্রফুল্লকে দেখিয়া হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার বাটীতে অন্নগ্রহণ করিয়া কলিকাতা ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ঝিখিরায় তিন-চারি দিন উৎসব চলিবার পর প্রফুল্লবাবু হরনাথকে লইয়া হাওড়া চলিলেন। এই প্রথমবার হরনাথ প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে গমন করিতেছেন। পরম প্রতীক্ষিত দিবসটি সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবুর মনে কতই না পরিকল্পনা ছিল। প্রাণের ঠাকুরকে প্রথম গৃহে আনয়নের দিবসটি স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি ইতিপূর্বে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছেন! কিন্তু কদমতলা স্টেশন যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাঁহার কল্পনার তার কাটিয়া যাইতে লাগিল। কদমতলা স্টেশনে ভাল গাড়ি পাওয়া যায় না। যে গাড়িগুলি স্টেশনে অপেক্ষমান থাকে, সেগুলি অতিশয় জঘন্য। এইরূপ জঘন্য গাড়িতে হরনাথকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে হইবে বলিয়া, প্রফুল্লবাবু অন্তরে অতিশয় ব্যথা পাইলেন। কিন্তু কদমতলায় উপস্থিত হইবামাত্র একজন সাহেব একটি নূতন ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিলেন। প্রফুল্লবাবু হরনাথের দিকে চাহিতেই তিনি হাসিমুখে তাঁহার কপাল দেখাইয়া দিলেন। নূতন ঝকঝকে গাড়ি পাইয়া প্রফুল্লবাবুর মনের ক্ষোভ অনেকটা দূর হইল কিন্তু অতঃপর

১। যতীন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ৩৫

হরনাথের সেবা কিরূপে করিবেন সেই বিষয়ে তাঁহার দুশ্চিন্তা হইল। কারণ তাঁহার স্ত্রী তখন হাওড়া-বাটীতে ছিলেন না। যাহা হউক, করুণাময় হরনাথের কৃপায় কিছুরই অসুবিধা হইল না। প্রফুল্লবাবু নিশ্চিন্তমনে বৈকালের দিকে একটি মহোৎসবের বন্দোবস্ত করিলেন। আমতা হইতে তিনি কিছু পান্তুয়া আনিয়াছিলেন। নৈশ ভোজের সময় সেই পান্তুয়া পরিবেশন করা হইল।

ইহার পরদিন প্রভাতে হরনাথ কলিকাতায় শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন এবং এই স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন। এই বৎসর মৈমনসিংহ জেলার আতরবাড়ীতে হরনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার পরিকল্পনা হয়। সম্ভবতঃ আতরবাড়ীর রাজাসাহেবের আগ্রহেই এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আতরবাড়ীর মত নগণ্য পল্লী-অঞ্চলে হরনাথের জন্মোৎসবে সমাগত ভক্ত ও অতিথিগণের উপযুক্ত আপ্যায়ন সম্ভব হইবে কিনা, হরনাথের বিশিষ্ট কয়েকজন ভক্তের মনে এইরূপ সন্দেহ ছিল। কিন্তু হরনাথ স্বয়ং তাঁহার এই বৎসরের জন্মোৎসব আতরবাড়ীতেই সম্পন্ন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করায়, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিমেষে দূরীভূত হইল।

আতরবাড়ীর পথ অতিশয় দুর্গম। শিয়ালদহ হইতে ই. বি. রেলযোগে ব্রহ্মপুত্র যাইয়া, ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া মৈমনসিংহ হইয়া আতরবাড়ী যাইতে হইত। সেইজন্য হরনাথ বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণকে কলিকাতার ৫৪নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাসভবনে আতরবাড়ী যাত্রার অন্ততঃপক্ষে একদিন পূর্বে সমবেত হইবার নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভারতের দূরবর্তী স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ জুন মাসের ২৭শে।২৮শে তারিখ মধ্যে শরৎবাবুর বাটীতে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর শরৎবাবু ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার প্রাসাদোপম বাসভবনে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরনাথ, কুসুমকুমারী, কৃষ্ণদাস এবং সোনামুখীর ভক্তবৃন্দ ২৯শে জুন প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের সহিত মেদিনীপুরের দলও যোগদান করিয়াছিল এবং জগমোহন দাস,

ভগবানদাস, বিমলা মা এবং বোম্বাইবাসী আরও অনেক ভক্ত খড়্গপুর স্টেশনে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকে হাওড়া স্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শরৎবাবু বহু সংখক যানবাহনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং নিজের গাড়ি লইয়া হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হন।

হরনাথ-কুসুমকুমারীসহ ভক্তবৃন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুর বাটীতে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। এই স্থানে হরনাথ এমন আনন্দচঞ্চল হইয়া উঠিলেন যে, হাওড়া স্টেশনে অবতরণের সময় তাঁহার অসুস্থতা ও দুর্বলতার কথা সকলেই ভুলিয়া গেলেন। সমস্ত দিবস আনন্দে অতিবাহিত করিয়া এবং ভুরিভোজে পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দ বৈকালের দিকে শিয়ালদহ স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে বহু ভক্ত ও অনুরাগী সমবেত হইয়া হরনাথের দর্শনলাভের জন্য আকুলতা প্রকাশ করায় শরৎবাবুর বাটীর বিরাট হলঘরে হরনাথকে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে উপবিষ্ট হইতে হইল। এই সময় ভক্তদের উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এমন সুমধুর উপদেশ-লহরী বহির্গত হইতেছিল যে, আতরবাড়ী-গমনেচ্ছু বহু ভক্ত নরনারী ট্রেন ধরিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পরে ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহারা সচকিত হইয়া স্টেশন অভিমুখে ছুটিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার কয়েক মিনিটমাত্র পূর্বে হরনাথ, কুসুমকুমারী ও কৃষ্ণদাস সোনামুখী এবং বোম্বাই-এর দলসহ শিয়ালদহ স্টেশনে উপনীত হইলেন। তাঁহারা রিজার্ভ কামরায় উঠিবার পর কুসুমকুমারী প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার একটি বাক্সের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে হরনাথ অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন এবং প্রত্যেককেই বাক্সটির অনুসন্ধান লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কুসুমকুমারীর হাত বাক্সের অনুসন্ধানে সকলেই ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ফলে, নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও বাষ্পীয় যানকে গতিশীল না করিবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে কর্মরত হরনাথের অন্যতম ভক্ত ট্রেন কনট্রোলার হরিদাস বসুমল্লিক মহাশয় গার্ডকে অনুরোধ করিয়া অতিরিক্ত কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেন

থামাইয়া রাখিলেন। অনতিকালমধ্যেই কৃষ্ণদাস সংবাদ দিলেন যে, কুসুমকুমারীর বাক্স পাওয়া গিয়াছে। তাহা ভক্তদের একটি কামরায় বেশ ভালভাবেই রহিয়াছে জানিয়া, হরনাথ ও কুসুমকুমারী উভয়েই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। 'কুসুম-হরনাথ' জয়ধ্বনিতে ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরা মুখরিত হইয়া উঠিল।

ইতিপূর্বে হরনাথের পূর্ববঙ্গে আগমন হয় নাই, অথচ এই অঞ্চলের অগণিত নরনারী তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জন্মোৎসব উপলক্ষে হরনাথের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা সকলেই হরনাথ-কুসুমকুমারীর দর্শন লাভের জন্য স্টেশনে সমবেত হইতে লাগিলেন। এভাবে প্রত্যেকটি স্টেশনে বহুসংখ্যক ভক্ত নরনারীর আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়া হরনাথের ট্রেন যখন ঈশ্বরগঞ্জে আসিয়া উপনীত হইল, তখন এক বিরাট জনসমুদ্র ট্রেনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের মনস্কামনা পূরণের নিমিত্ত হরনাথ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া জনতার ভিড় ঠেলিয়া ঈশ্বরগঞ্জ স্টেশনের সুউচ্চ বারান্দায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এইবার সকলেই তাঁহার দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হইলেন। তখন অনেকেই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের সে সৌভাগ্য হইল না, তাঁহারা যে পথের উপর দিয়া হরনাথ পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই পথের ধূলি অঙ্গে মাখিতে ও মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঈশ্বরগঞ্জে ট্রেন ছাড়িতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইল। হরনাথ নিজ কামরায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলে ট্রেন আবার গতিশীল হইল এবং অনতিবিলম্বে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আসিয়া উপনীত হইল। ই. বি. রেল কোম্পানির ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া ওপারে যাইতে হয়।

তখন বর্ষাকাল। কূলে কূলে ভরা বিশালাকায় ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়া ষ্টীমার অগ্রসর হইতেছে। সহসা ঝড় উঠিল—ব্রহ্মপুত্র উন্মত্ত ও উত্তাল হইয়া উঠিল। ব্রহ্মপুত্রের সেই রুদ্র মূর্তি দেখিয়া ষ্টীমারের সারেঙ, লস্কর প্রভৃতি প্রমাদ গণিল। অপরাপর আরোহীদের মনে

অতিশয় আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। একমাত্র হরনাথ সকলকে মাভৈঃ দান করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঝড় এখনই থামিয়া যাইবে।' সুতরাং সারেঙ প্রভৃতিকে তিনি নির্ভয়ে ষ্টীমার চালাইয়া যাইতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া হরনাথের ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ নির্ভয়ে চা-পানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্টোভ ধরাইতে দেখিয়া ষ্টীমারের অন্যান্য আরোহীগণ ভৎর্সনা করিয়া আপৎকালে ভগবানের নাম লইতে বলায়, ভোজনানন্দ উত্তর দিলেন, 'মহাশয়, তাঁর নাম করতে মেহনত হয় বলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার দরকার থাকে তো আসুন, আমাদের কাছে চা খান।'[১] যাহা হউক, হরনাথের ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া ঝড়-তুফান থামিয়া গেল এবং সকলেই নিরাপদে ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে উপনীত হইলেন। অন্যান্য আরোহিগণ শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে হরনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইলেন।

অল্পকাল মধ্যেই হরনাথ দলবলসহ মৈমনসিংহে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং স্টেশনে মৈমনসিংহবাসী একজন ভক্ত কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার বাসভবনে আগমন করিলেন। তাঁহার বিশাল বাসভবনে ও নিখুঁত আয়োজনে কাহারও আহার বা অবস্থানের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। পরম পরিতোষসহকারে মধ্যাহ্নভোজনের পর হরনাথকে মধ্যস্থলে রাখিয়া ভক্তবৃন্দ এক বিরাট হলে উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত দুইজন ব্যক্তি হরনাথের নিকট আগমন করেন এবং শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি হইতে অনর্গল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরনাথ ধৈর্যসহকারে তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ কয়েকটি শ্লোকের টীকাকে অজ্ঞানোচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন, তখন আর হরনাথ সহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি কোনরূপ রূঢ় প্রতিবাদ করিলেন না। বরং স্বভাব-সুলভ মাধুর্যের রসে স্বীয় যুক্তি ও বাগ্মিতাকে এমনভাবে অভিষিক্ত

১। আমার অভিজ্ঞতা : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৬

করিয়া প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, পণ্ডিতগণ মুগ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাই, অবশেষে যখন হরনাথের শ্রীমুখ হইতে গোমুখী ধারার মত অবিশ্রান্তভাবে শাস্ত্রীয় শ্লোকসমূহ বিনির্গত হইতে লাগিল এবং তাঁহার বাগ্মিতা উত্তরোত্তর পণ্ডিতদ্বয়ের যুক্তি-জালকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল, তখনও তাঁহারা হরনাথের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীসমূহ মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হরনাথ যখন প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, পণ্ডিতদ্বয়-কথিত শ্লোক-সমূহের টীকার মধ্যে অজ্ঞানোচিত কিছু নাই, তখন হরনাথের পাণ্ডিত্যে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের একজন স্থানত্যাগ করিলেন, অপরজন হরনাথের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণব্যাপী গুরুগম্ভীর আলোচনায় রত থাকার ফলে হরনাথও অতিশয় ক্লান্তিবোধ করিতে লাগিলেন। এই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য হরনাথ ভোজনানন্দকে কিছু হাল্কা রসিকতা করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু সেদিন ভোজনানন্দের রসিকতা জমিল না। তখন হরনাথের আদেশে বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আসরে নামিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে তাঁহার অনবদ্য রসিকতা আসরের গম্ভীর আবহাওয়া হাল্কা করিয়া দিল।

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সকলেই আতরবাড়ী যাইবার ট্রেন ধরিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যথাকালে মৈমনসিংহ স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া সকলে বেলা তিন ঘটিকার সময় আতরবাড়ীতে পৌঁছিলেন।

আতরবাড়ী বাংলা ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। ইহার চারিদিকে চা-বাগান। এই অঞ্চলে জোঁকের উৎপাত খুব বেশী। কৃষ্ণদাস হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মতো স্থূলকায় এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য একটি জোঁক ধরিয়াছিলেন।

এইরূপ স্থানে হরনাথের জন্মোৎসবের মত বিরাট উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ার পথে বহুবিধ অন্তরায় বর্তমান। কিন্তু আগ্রহশীল ও নিষ্ঠাবান কোনও হরনাথ-ভক্ত কোনদিনই অপদস্থ বা অকৃতকার্য হন

নাই। উৎসবে চল্লিশ হাজার লোক-সমাগম হইলেও, এই গ্রামে অনুষ্ঠিত উৎসবে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই এবং দশ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করিতেও এই উৎসবের উদ্যোক্তাদের যে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই, ইহা আতরবাড়ীতে উৎসব অনুষ্ঠান-কারিগণের ঐকান্তিক হরনাথ-প্রীতির ফলশ্রুতি মাত্র।

ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবের উদ্যোক্তাদের কয়েকজনের পক্ষে ইহা শিক্ষামূলকও বটে। পূর্বের জন্মোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তাদের বিশিষ্ট একজনের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বিশাল জন-সমাগম সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলভাবে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার একমাত্র কারণ তাঁহার মস্তিষ্ক-প্রসূত পরিকল্পনা এবং তাঁহার ত্রুটিহীন পরিচালনা। সম্ভবতঃ তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি হরনাথের নিকট ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন এবং হরনাথ তাঁহার প্রতিবাদ করিলেও সম্ভবতঃ তাহা উক্ত ভক্তের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করিতে পারে নাই। আতরবাড়ী উৎসবের বিপুল জন-সমাগম এবং বিরাট কার্যসূচীর অবিশ্বাস্য সাফল্য দর্শনে তাঁহার এই সযত্নপোষিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আতরবাড়ী উৎসবে যোগদান করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, পল্লীগ্রাম হইলেও আতরবাড়ীর জনসাধারণের আগ্রহ ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। উৎসবের উদ্যোক্তাদের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না। আতরবাড়ীর রাজাসাহেবের সুবৃহৎ হলঘর-সমন্বিত একটি বৃহৎ সৌধ হরনাথ ও তাঁহার পুরুষ ভক্তদের এবং অপর একটি বিশাল ভবন কুসুমকুমারী ও নারী ভক্তদের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই দুইটি অট্টালিকা-সংলগ্ন বিরাট চত্বর উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য সুসজ্জিত হইয়া-ছিল। 'হরনাথ স্বেচ্ছাসেবক'-লিখিত লাল ফিতা-পরিহিত একদল স্বেচ্ছাসেবক ভক্ত ও অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নে নিযুক্ত হইয়াছিল।

১লা জুলাই অপরাহ্ণে হরনাথ দলবলসহ আতরবাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। স্টেশন হইতে তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রাসহকারে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসা হইল। উৎসব-স্থলে

পৌঁছিবার পর তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল। সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর সংকীর্তন আরম্ভ হইল। রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি সোফায় উপবিষ্ট হইয়া হরনাথ সংকীর্তনের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একটি পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবা এই সংকীর্তনের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্যের মত হইল এবং উন্মত্তের ন্যায় অবশেষে হরনাথের চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিল। হরনাথ তাহাকে শান্ত করিবার পর সেই যুবকটি উৎসবমণ্ডপের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

সংকীর্তন শুনিতে শুনিতে হরনাথ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি বাক্ ও শ্রবণশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের মুখে ইহা অভিব্যক্ত হইবার পর হরনাথকে হলঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। হরনাথের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে ভক্ত-নরনারীগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তারাপ্রসাদবাবু কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না।

পরদিন ২রা জুলাই, জন্মোৎসব। নির্মল নীল আকাশে নবোদিত সূর্যের উজ্জ্বল কিরণমালা একটি সুন্দর প্রভাতের সূচনা করিল। নিরতিশয় আনন্দে ভক্তবৃন্দ হরনাথের নাম সংকীর্তন করিয়া গ্রাম্যপথ প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রভাতফেরীর দল উৎসবের স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে, হরনাথ বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন দিলেন।

পরদিন বেলা নয় ঘটিকার সময় হরনাথ সহসা হলঘরে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত দরজা বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। উৎসবক্ষেত্রে এইরূপ রুদ্ধদ্বার গৃহে অবস্থান হরনাথের রীতি-বহির্ভূত।

ভক্তজনমণ্ডলী উৎকণ্ঠিতচিত্তে হলঘরের সম্মুখে সমবেত হইলেন এবং সম্মিলিতকণ্ঠে কুসুম-হরনাথ নামসংকীর্তন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল পরে হরনাথ রুদ্ধদ্বার উদঘাটন করিয়া সুসজ্জিত বরবেশে বাহিরে আগমন করিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় এক অপরূপ ভাবের বন্যায় পরিপ্লাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে

একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহার মস্তকে রেশমী ঝালরযুক্ত ছত্র ধারণ করিলেন। হাস্যোজ্জ্বল বদনে হরনাথ উৎসবমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন।

চত্বরের মধ্যস্থলে নির্মিত মণ্ডপের উপর সুসজ্জিত একটি সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছিল। হরনাথ ও কুসুমকুমারী সেই সিংহাসনে আসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপূজা আরম্ভ হইল। পৌরোহিত্য করিলেন প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। অপরিমিত পরিমাণে বিচিত্র নৈবেদ্য নিবেদন করা হইল। লুচি, ফল, মূল, মিষ্টান্ন, ছানা, দধি প্রভৃতি উৎসর্গ, করা হইল। আরত্রিকের পর মহানন্দে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। এই সময়ে ভক্তগণের 'জয় হরনাথ' ধ্বনি সহসা 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে পরিণত হইল। বহু ভক্ত নিবেদিত ভোজ্যসমূহে জগন্নাথের ভোগের সৌরভ পাইলেন। এই উৎসবে প্রায় দশ সহস্র নরনারী পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করে। প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান ঠাকুরের এই জন্মোৎসবে যোগদান করে।* মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হরনাথ বিশ্রাম লাভের জন্য হলঘরে শয্যায় শয়ন করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অল্পক্ষণ পরে ভক্তিমতী তমালিনী দত্ত মহাশয়া হরনাথের পদসেবার জন্য রুদ্ধদ্বার উদঘাটন করিয়া হলঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া হরনাথকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্তে পুরীর জগন্নাথকে শয্যায় শায়িত দেখিতে পাইলেন।

এইদিন সন্ধ্যায় একজন সুকণ্ঠ বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণলীলা কীর্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদাবলীর গানে রাধাকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলা গীত হইতে লাগিল, হরনাথ ও কুসুমকুমারীর আচরণে তাহা পরিস্ফুট হইতে লাগিল এবং সর্বশেষে যখন তিনি হরনাথের হস্ত কুসুমকুমারীর স্কন্ধে এবং কুসুমকুমারীর হস্ত হরনাথের স্কন্ধে সংস্থাপন করিয়া, যুগলমিলনের গীতি গাহিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে যুগলমূর্তির চরণে প্রণত হইলেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ যেন রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। সকলেই তাঁহাদের চরণ স্পর্শ

* আমার অভিজ্ঞতা : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১

করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে, কীর্তনীয়া বৈষ্ণবপ্রবর তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত এই বৎসর পুরীতেও জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুরীতে জন্মোৎসবের উদ্যোক্তা-গণের পক্ষ হইতে টহলপ্রসাদের এক তারবার্তা আসিল। তাহাতে তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, "উৎসবের সময় ঠাকুর হরনাথ কোথায় ছিলেন, পুরীতে না আতরবাড়ীতে?" উত্তর পাইবার খরচ দিয়া টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছিল। হরনাথকে টেলিগ্রামখানি দেখানো হইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিলেন, "পরিষ্কার করিয়া জানাও, জন্মোৎসব দিবসে জগন্নাথ পুরীতে না আতরবাড়ীতে ছিলেন।[১]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তমালিনী মা শয্যায় হরনাথের পরিবর্তে পুরীধামের জগন্নাথমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন এবং ভোগের সময়ে ভক্তবৃন্দও 'জয় হরনাথ জয়' গাহিতে গাহিতে সহসা কি এক অননু-ভূতপুর্ব ভাবের আবেশে 'জয় জগন্নাথ জয়' গাহিতে আরম্ভ করেন।[২] এই ঘটনা দুইটির সহিত হরনাথের টেলিগ্রাম—আতরবাড়ী জন্মোৎসবের এই তিনটি বিষয় হরনাথের ভক্তবৃন্দের মতে সবিশেষ ইঙ্গিতময়। তাঁহাদের বিশ্বাস, আতরবাড়ী জন্মোৎসবের এই ঘটনাবলীতে, বিশেষতঃ হরনাথ কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রামের উত্তরে, জগন্নাথের সহিত হরনাথের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেইজন্যই আতরবাড়ী জন্মোৎসবকে তাঁহারা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন।

হরনাথ-ভক্তবৃন্দের এই বিশ্বাস, হরনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদের সুউচ্চ ধারণার পরিচয় দান করে। ভক্তদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলিবারও

১। টেলিগ্রাম দুইটির বক্তব্য নিম্নে দেওয়া হইল :—

"Thousand poors fed with ***Prasad.*** Thy presence proved marvellous. Write ***please whether*** you were at Atarbari or at Puri on Janmotsab Day."—***Tahal.***

Reply of Thakur Haranath "Write plain whether Jagannath was at puri or Atarbari on Janmotsab Day."

—***Haranath***

২। হরনাথ-স্মৃতি : চতুর্থ লহরী, পৃঃ ২৭

কিছু নাই। কিন্তু হরনাথ সম্প্রদায়ের বাহিরে হরনাথের সহিত জগন্নাথের অভিন্নত্বে বিশ্বাসীর সংখ্যা বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

আতরবাড়ী জন্মোৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য, মুসলমান ভক্ত সমাগম। প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান দর্শনার্থী আতরবাড়ী জন্মোৎসবে হরনাথের দর্শনলাভের জন্য সমাগত হইয়াছিল। এই বিষয়ে রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমার গুপ্ত লিখিয়াছেন, "আমি ইহার পূর্বে ঐ স্থানের নিকটবর্তী কেলুয়া থানায় তিন বৎসর দারোগা ছিলাম এবং জনতার মধ্যে দেখি, ঐ থানার এলাকায় বহু মুসলমান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের বাড়ী ১০।১২ মাইল ব্যবধান। তাহারা পূর্বে আমাকে যমের মত ভয় করিত, কিন্তু আজ আর আমাকে গ্রাহ্যই করিতেছে না, তাহারা বলে ঠাকুর কি আপনাদেরই? আমরা কি ঠাকুরকে দেখিতেও পাইব না। আমি আর কি বলি? চুপ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলাম।"[১]

আতরবাড়ীর জন্মোৎসবে ১০।১২ বৎসর বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবক অতিশয় দক্ষতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল। তাহাদের কর্তব্যপরায়ণতায় হরনাথ এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে রৌপ্য পদকদানে পুরস্কৃত করিবার আদেশ করেন। কলিকাতার 'তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা' মহানন্দে এই আদেশ পালন করেন।

আতরবাড়ীর মতো পল্লীগ্রামে কিরূপে এই বিরাট উৎসব সমাধা হইয়াছিল, সে-বিষয়েও অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন। 'তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা'র মত অনুযায়ী এই উৎসবে ৬৪৬৮॥৶৩ পাই ব্যয় হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে খরচ অনেক কম লাগে, তৎসত্ত্বেও এই বিরাট পরিমাণ অর্থব্যয় উৎসবের বিশালত্বেরই প্রমাণ দেয়।

উৎসবের পর হরনাথ ও কুসুমকুমারী আতরবাড়ী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া সোনামুখীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হরনাথের কলিকাতাস্থ ভক্তগণের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বরাহনগরে অনুষ্ঠিত ১৯২২

১। আমার অভিজ্ঞতা: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১

সালের জন্মোৎসবে উৎসবের কর্মকর্তাগণ ভাগবত মিত্রের নিকট হইতে পাঁচশত টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এক বৎসরকাল মধ্যে উক্ত টাকা পরিশোধের কোন চেষ্টা না দেখিয়া ভাগবত মিত্র বুঝিতে পারেন, উক্ত ঋণ পরিশোধের কোনরূপ ইচ্ছা কর্মকর্তাগণের নাই। সেইজন্য তিনি 'হরনাথ তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, অন্যতম প্রধান হরনাথ-ভক্ত কবিরাজ সত্যচরণ সেন মহাশয়ের সহিত মিলিত হন এবং 'হরনাথ সাধন-সংঘ' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করেন। ভক্তদের মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য দর্শনে হরনাথ অতিশয় ব্যথিত হন। এই সময়ে লিখিত পত্রসমূহে হরনাথের সেই মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভাগবতের ব্যবহারে সত্যই বড় দুঃখিত হয়েছি। কি করিব, প্রভুর যা ইচ্ছা তাই হ'ক। তার মন যখন যেদিকে যায়, তাতেই সে মুগ্ধ হ'য়ে থাকে। তার অত্যন্ত ভালবাসার ইহাই পরিণাম। যাক, আর চিন্তা করিব না। তোমরাও দুঃখ করিও না।'[১]

ভাগবতের ব্যবহারে মর্মাহত হইলেও, হরনাথ কিন্তু তাঁহার প্রতি কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন না। বরং মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবচরণ নামক হরনাথের একজন ভক্ত উন্মাদ হইয়া পড়িলেন এবং অটলবিহারী কুণ্ডু নামক অপর একজন ভক্তও তদনুরূপ হইয়া পড়েন। এই সংবাদ পাইয়া হরনাথের মর্মবেদনার সীমা রহিল না।

কিন্তু আরও একটি দারুণ আঘাত হরনাথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। হরনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবনারায়ণ আগস্ট মাসে মহাপ্রয়াণ করিলেন। পৃথক হইলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি হরনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভক্তির বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির ক্রমাগত বর্ধিত হইতেছিল। সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতার মহাপ্রয়াণে তাঁহার মনোবেদনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। সংসারী হইলে,

১। নেপালচন্দ্র ঘোষকে লিখিত পত্র—হরনাথ-স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী, পৃঃ ১০২

যে কোনও প্রকার দুঃখ-শোকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নাই, শিবনারায়ণের পরলোকগমনে গভীরভাবে শোকসন্তপ্ত হরনাথ আর একবার তাহা প্রমাণ করিলেন। শিবনারায়ণের দেহান্তের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোকুলচন্দ্র গৃহে ছিলেন না। সেই কারণে হরনাথকেই শিবনারায়ণের মুখাগ্নি করিতে হয় এবং শ্রাদ্ধাদি কার্যও তিনি করেন। এই শ্রাদ্ধাদি কার্যে হরনাথ যথাসাধ্য ব্যয় করেন।

ইহার পর হইতে হরনাথের শরীর এমন অসুস্থ হইয়া পড়ে যে, তিনিও দেহরক্ষা করিবেন, সকলের মনে এইরূপ আশঙ্কা হইল। বহুকষ্টে তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পাইলেন। এই সময়ে 'কামারহাটী সাধন আশ্রমে' অতুলচন্দ্র মজুমদার দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেন। এইজন্য 'আগড়পাড়া সাধন আশ্রম' হইতে ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় কামারহাটীতে আগমন করেন। এই দুইটি আশ্রমই হরনাথ-অনুরাগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইত।

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে হরনাথ কুসুমকুমারী ও মেনকুরানীসহ কলিকাতায় গমন করেন এবং ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার গুপ্তের বাটীতে পদধূলি দান করেন। এই উপলক্ষে অক্ষয়বাবু একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবে কলিকাতাস্থ শতাধিক ভক্ত সমাগম হয়।

রাত্রি দশটার সময় অক্ষয়বাবুর বাটীতে মহোৎসব হয়। তৎপূর্বে সন্ধ্যার দিকে শরৎচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহার মানিকতলার বাটীতে হরনাথের আগমন উপলক্ষে গৌরদাস কীর্তনীয়ার সংকীর্তনের আয়োজন করেন। রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্ত হরনাথের সহিত এই সংকীর্তনানন্দ উপভোগ করেন।

কলিকাতা হইতে হরনাথ সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। পূজার সময় হরনাথের বাটীতে প্রতি বৎসরই বহুসংখ্যক ভক্ত-সমাগম হইত। এই বৎসর অক্ষয়বাবুর সঙ্গে নূতন একজন ভক্ত রসিকরঞ্জন সেন সোনামুখী আসেন।

৫ই ডিসেম্বর তারিখে ১১নং নিয়োগী ঘাট স্ট্রীটে একখানি বাটী ভাড়া করিয়া ভাগবত মিত্র মহাশয় 'হরনাথ সাধন-সংঘ' অফিস স্থাপন করেন এবং 'হরনাথ ফ্রি পাঠশালা' নামক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ভাগবতবাবুর সমর্থকের অভাব ছিল না। কারণ, বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও তিনি হরনাথেরই প্রচার করিতেছিলেন। ভাগবত ছিলেন কর্মবাদী, তিনি হরনাথ অপেক্ষা হরনাথের কাজকে বড় করিয়া দেখিতেন। এই মতবাদই অন্যান্য ভক্তদের সহিত ভাগবতবাবুর মতানৈক্যের মূল কারণ। কোন কোন ভক্তের মতে, কেবল ঠাকুরের পূজা, তাঁহার অলৌকিক কার্যাদি প্রচারই একমাত্র করণীয়। অন্যান্য সভ্যগণ সাধারণের হিতসাধক কার্যাদি করিতে চাহিলেন। ভাগবতবাবু শেষোক্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন। হরনাথ একদিন সংঘের বাড়ীতে আসিলে বিদ্যালয় খোলা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে হরনাথ বলেন—"Science is one religion, Prayer is another but they are two sisters. Mad as I am, I believe, study is better than precepts."[১] হরনাথের এই উক্তি হইতে জানা যায়, ভাগবতের আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেও ভাগবতের প্রতি তাঁহার স্নেহ অব্যাহত ছিল। তিনি জানিতেন, কর্মবাদী ভাগবত একেবারে চরমপন্থী। তিনি বলিতেন, "ভাগবত যখন যা নিবে, একেবারে extreme-এ চলে যাবে, আবার যখন ছাড়ে, তখন একেবারে মুছে ফেলে। এ দোষ না থাকিলে সে একটা মহা কর্মবীর বলে জগতে গণ্য হত।" সেইজন্য তিনি অন্যান্য ভক্তদের উপদেশ দিতেন, 'তার উদ্যমকে তোমরা অনুকরণ কর, তার অস্থিরতাকে বর্জন কর, তা হলেই উন্নত হতে পারিবে।'[২]

যাহা হউক, ভাগবতের নবোদ্যমের ফলে প্রতিষ্ঠিত 'হরনাথ সাধন-সংঘ'-এ নিয়মিত অধিবেশন হইতে লাগিল। কিন্তু ভাগবত ধীরে ধীরে 'হরনাথ তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা'র সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃঃ ২০৮

২। নেপালচন্দ্র ঘোষকে লিখিত পত্র—হরনাথ-স্মৃতি: দ্বাদশ লহরী, পৃঃ ১০৩

যাইতে লাগিলেন এবং হরনাথের সহিত যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

৩১শে ডিসেম্বর 'আনন্দ-মিলন' উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উৎসবেও ভাগবত এবং সত্যচরণ সেন প্রমুখ ভক্তগণ যোগদান করিলেন না। ভাগবতের এইরূপ ব্যবহারে হরনাথ অতিশয় মর্মাহত হইলেন। কিন্তু মর্মাহত হইলেও হরনাথ ভাগবতের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন না। ভাগবত-প্রতিষ্ঠিত হরনাথ সাধন-সংঘে তাঁহার উপস্থিতিই ইহা প্রমাণ করে।

১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি হরনাথ-কুসুমকুমারীর চরণযুগল বন্দনা করিয়া, ভক্তবৃন্দ সকলেই আপন আপন কর্মস্থলে বা বাসভবনের দিকে যাত্রা করিলেন। হরনাথও ইহার দুই-একদিন পরে কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতায় গিয়া তিনি প্রথমেই নারায়ণচন্দ্র ঘোষের বাটীতে অবস্থান করেন। তদুপলক্ষে নারায়ণবাবু ৬ই জানুয়ারি তারিখে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই মহোৎসবে কলিকাতার বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপরদিন হাওড়ার প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাড়ীতেও মহোৎসবের আয়োজন করেন। কলিকাতা হইতে তারাপ্রসাদ ঘোষ, বাসুদেব মজুমদার, সত্যচরণ সেনের সহিত হরনাথ নাগপুর যান। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হরনাথকে পূজার সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়া, ধার করিয়া ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া হরনাথের সঙ্গী হইলেন। হরনাথকে পাইয়া নাগপুরবাসিগণ নিরবচ্ছিন্ন উৎসবের আয়োজন করিলেন। হরনাথের মাত্র তিনদিন নাগপুরে থাকার কথা ছিল; কিন্তু নাগপুরবাসীদের আগ্রহাতিশয্যে আটদিন অতিক্রান্ত হইলে, হরনাথ বোম্বাই গমনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। বোম্বাই-বাসিগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া সদলে নাগপুরে আসিয়া, হরনাথকে বোম্বাই লইয়া গেলেন। বোম্বাই-এ কয়েকদিন অবস্থান করিয়া হরনাথ সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নাকড়াকোঁদা হইতে হরনাথের পৌত্রী মেনকুরানীকে দেখিতে আসিয়া পাত্রপক্ষের পছন্দ হইলে,

বিবাহের দিনস্থির হয়। ২৯শে ফাল্গুন তারিখে মেনকুরানীর বিবাহের দিনস্থির হয়।[১] সময় সংক্ষেপ বলিয়া খুব তাড়াতাড়ি বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে হইল। সেইজন্য হরনাথের বাড়ীতে নিরতিশয় কর্মব্যস্ততা দেখা দিল।

২রা মার্চ তারিখে ভাগবত মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হরনাথ সাধন-সংঘ'-র একটি অধিবেশন আহুত হয়। এই অধিবেশনে যোগদান করার জন্য হরনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে এবং মেনকুরানীর বিবাহ উপলক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েকটি কার্য সম্পাদন করিতে, হবনাথ ২রা মার্চ তারিখে কলিকাতায় আগমন করেন এবং ভক্তপ্রবর শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। অপ্রত্যাশিতভাবে হরনাথকে পাইয়া শরৎবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠেন এবং হরনাথের আগমন উপলক্ষে ২রা ও ৩রা তারিখ সন্ধ্যায় মহোৎসবের আয়োজন করেন। ২রা তারিখে সন্ধ্যায় হরনাথ সাধন-সংঘের অধিবেশনে যোগদান করিয়া শরৎবাবুর মানিকতলার বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে, বরিশালের C. I. D. Inspector অক্ষয়কুমার গুপ্ত (পরবর্তী কালে রায় সাহেব) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি পুত্র, কন্যা ও জামাতাসহ অধিবেশনে যোগদান করেন। মেনকুরানীর বিবাহে সপরিবারে যোগদান করিবার জন্য অক্ষয়বাবু বরিশালের একটি বিখ্যাত Gang Case-এর বিচারের দিন ১৫ই মার্চ তারিখ নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু ৪ঠা মার্চ তারিখে যখন তিনি হরনাথের নিকট অবগত হইলেন যে, ১৫ই মার্চ তারিখেই*

১। পাগল হরনাথ (ইংরাজী)—Part V-এ ১৯।২।২৪ তারিখের পত্রে (পত্রসংখ্যা ২৫০) বিবাহের তারিখ 24th Falgoon বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু কলিকাতার 'শ্রীহরনাথ তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা'র প্রীতি উপহারের তারিখ ২৯শে ফাল্গুন ১৩৩০ ছাপা আছে। প্রীতি উপহারে বিবাহের তারিখ ছাপানোই রীতি। বিবাহের পরের তারিখ ছাপানো রীতি নয়। সুতরাং বিবাহের তারিখ ২৯শে ফাল্গুন বলিয়াই মনে হয়। অক্ষয়কুমার গুপ্তের 'আমার অভিজ্ঞতা' ১ম খণ্ডে বিবাহের তারিখ ১৫ই মার্চ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

* তুলনীয়: যেদিন বরিশালে আমার ঐ মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে ঠিক সেইদিন সুদূর সোনামুখীতে মেনকুর বিবাহ। হরনাথ-স্মৃতি: পঞ্চম লহরী, পৃঃ ৬০

মেনকুরানীর বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে, তখন পূর্ব অনুরোধ মত অন্ততঃপক্ষে দশদিন পূর্বে মেনকুর বিবাহের তারিখ তাঁহাকে না জানাইবার জন্য অক্ষয়বাবুর মুখে যাহা আসিল ঠাকুরকে তাহাই বলিতে লাগিলেন। কারণ, বিচারের প্রথম তারিখ ধার্য করা সম্পূর্ণ তাঁহার হাতে ছিল। পূর্বে জানিতে পারিলে মেনকুর বিবাহের দিনে বিচারের দিনস্থির করিতেন না।

বরিশালের 'গোঁয়ারগোবিন্দ' অক্ষয়বাবুর রাগ দেখিয়া, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে হরনাথ ভবানীপুরে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গমন করেন এবং অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া হরনাথ যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে Gang Case-এর বিচার হইবে, তারিখ পরিবর্তন করার জন্য তাঁহাকে একটি চিঠি লিখিয়া দিতে অক্ষয়বাবুকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু Gang Case-এর বিচারে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণাদির প্রয়োজন হয় এবং জেলার বিশিষ্ট কয়েকজন রাজকর্মচারীর উপস্থিতিও একান্ত প্রয়োজন হয়। তাঁহাদিগকে উক্ত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকিবার জন্য ইতিমধ্যেই সমন দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিচারের তারিখ পরিবর্তন অসম্ভব জানিয়া, অক্ষয় গুপ্ত প্রথমে উক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অনেকেই অক্ষয় গুপ্তকে চিঠি লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকায়, তিনি তৎপরদিন সমস্ত বিষয় জানাইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে একটি চিঠি লিখিলেন এবং যদি কোনরূপে অন্যদিন ধার্য করা সম্ভব হয়, সেজন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানাইতে নির্দেশ দিলেন। পরদিন বেলা ১০টার সময় ঐ চিঠি যথাস্থানে বিলি হওয়ার কথা বলিয়া, অক্ষয়বাবু ঐদিন আর কোন সংবাদের আশা রাখেন নাই। কিন্তু ঐদিন (৬।৩।২৪) বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় ভ্রাতার টেলিগ্রাম পাইয়া অক্ষয়বাবু বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। ঐ টেলিগ্রামে সংবাদ আসিল, date gang case changed fifteenth।[১] বিস্ময়ের মাত্রা এত বেশী হইল যে, তিনি টেলিগ্রামটিকেও

১। আমার অভিজ্ঞতা : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৩—৯৫

বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদিবস পত্রে তারিখ পরিবর্তনের কারণ অবগত হইয়া তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন! তাঁহার ভ্রাতা লিখিয়াছেন যে, গত ৪ঠা মার্চ রাত্রিবেলা হইতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটবাবু চক্ষুর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন এবং সেইজন্য অক্ষয়বাবুর ভ্রাতা তাঁহার দর্শনাভিলাষে গমন করিলে, তিনিই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া Gang Case বিচারের তারিখ পরিবর্তনের জন্য অক্ষয়বাবুকে অনুরোধ জানাইতে বলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অক্ষয়বাবু হরনাথের নিকট গমন করিলেন এবং ছুটির জন্য অফিসে দরখাস্ত করিলেন।

ইতিমধ্যে ৪ঠা তারিখে ভবানীপুর পদ্মপুকুরে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এবং ৫ই তারিখে শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ীতে মহোৎসব হইয়া গিয়াছিল। ৬ই মার্চ তারিখে কবিরাজ সত্যচরণ সেন মহাশয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে হরনাথকে তাঁহার বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ভক্ত-সমাগমহেতু এই বাটীতেও মহোৎসব হয়। ৭ই মার্চ তারিখে হরনাথ শরৎবাবুর মানিকতলা বাটীতে বিশ্রাম গ্রহণান্তর সোনামুখী যাত্রা করেন।

মেনকুরানীর বিবাহ উপলক্ষে দূর-দূরান্তর হইতে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইতে থাকে। বিশিষ্ট কয়েকজন ভক্ত বিবাহের তিন-চারি দিন পূর্বেই সোনামুখীতে আগমন করেন।[১]

বিবাহের অব্যবহিত পূর্বদিনে রামগোপাল ভট্টাচার্য রাধানগরের আরও কতিপয় ভক্তসহ সোনামুখী ধামে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার এইবারে হরনাথ-কুসুমকুমারীর (ঠাকুর-ঠাকুরানীর) যুগল-মিলন প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষ হয়। এয়ো কামানের দিন কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজী বাজনা আসিল। সেই বাদ্যের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া কুসুমকুমারী ও মাসীমাতা প্রভৃতি বৈঠকখানা ঘরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে হরনাথও আসিয়া কুসুমকুমারীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। রামগোপাল-

১। ১১ই মার্চ তারিখে অক্ষয়কুমার গুপ্ত সপরিবারে সোনামুখী পৌছান। দ্রঃ হরনাথ-স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী, পৃঃ ৪৮

বাবু এই মনোহর যুগল-মিলন প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট দিবসে মহাসমারোহে সত্যচরণের সহিত মেনকুরানীর বিবাহ হইয়া গেল। ঘর ও বর সমস্তই ভাল। সুতরাং, এই বিবাহে সকলের আনন্দের অবধি রহিল না। পরদিবস সমাগত ভক্তগণ একটি সভার আয়োজন করিলেন। এই সভায় ভক্তপ্রবর ললিতমোহন দত্তের প্রযোজনায় অক্ষয়বাবু ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা হরনামাঙ্কিত এক-একটি নিশানহস্তে 'হরনামের' নিশান তুলে আয়রে কে যাবি পারে' গানটি গাহিয়া সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করেন। অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত হরনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদের আপন আপন অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। সর্বশেষে অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া, হরনাথের miracle প্রদর্শনমানসে পুত্রকন্যাদিগকে 'সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারই দুয়ারে এসেছি' গানটি গাহিতে বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সমবেতকণ্ঠে উক্ত গানটি গাহিতে লাগিল, তখন সভায় আর কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। অক্ষয়বাবুর ভাষায়, সকলেই বেহাল হইয়া পড়িলেন। এই সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গে অক্ষয়-বাবু বলিয়াছেন, 'বোম্বের প্রকাণ্ড নামজাদা রণছোড়দাস আসিয়া একবার আমাকে জড়াইয়া ধরেন, একবার ছেলেমেয়েদের জড়াইয়া ধরেন, একবার আমার জামাতার গলা জড়াইয়া ধরেন, আবার দৌড়াইয়া আমার স্ত্রীর নিকট গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। সভার অনেক লোকই এইরূপ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ায় সভার কার্য আর চলিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া সভাপতি সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নহে।'[১]

বিবাহের পর মেনকুরানী স্বামীগৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু নূতন কুটুম্বগণ অষ্টমঙ্গলার দিন মেনকুরানীকে সোনামুখী পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে হরনাথ অতিশয় ব্যথিত হইলেন। অষ্টমঙ্গলার দিন মেনকুরানীকে না পাঠানোর জন্য সকলেই অতিশয় দুঃখিত

১। হরনাথ-স্মৃতি : পঞ্চম লহরী, পৃঃ ৬৬-৬৭

হইলেন এবং সমগ্র বাটীতে একটা দুঃখের কালোছায়া পড়িল। হরনাথ তাই সখেদে লিখিলেন, 'ঘর বর দুইই ভাল কিন্তু কুটুম্ব সুবিধার নয়।'[১]

ভক্তবৃন্দের সকলেই ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র জগমোহনদাস কল্যাণ দাস মহাশয় হরনাথকে মহাবালেশ্বর লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরনাথ কুসুমকুমারীর শোকাচ্ছন্ন মূর্তি দেখিয়া এরূপ অভিভূত হইলেন যে, কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া মেনকুরানীর শ্বশুরবাড়ীতে গমন করিলেন, কুটুম্বদিগকে শান্ত করিয়া মেনকুকে সোনামুখী লইয়া আসিবার জন্য। কৃষ্ণদাস ও জগমোহনদাসের চেষ্টায় স্বামীসহ মেনকুরানী সোনামুখী আগমন করিলে, হরনাথ-কুসুমকুমারীর মুখে হাসি ফুটিল এবং হরনাথ জগমোহন দাসের সহিত মহাবালেশ্বর গমন করেন।

এই বৎসর একজন মাদ্রাজী ভক্ত চিকাকোলে জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব করিয়া হরনাথের সম্মতি প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে নাগপুরেও জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব আসে। চিকাকোলের মতো স্থানে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠান করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া হরনাথ নাগপুরেই জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার সম্মতি দান করেন। এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য হরনাথ অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ করেন। সিমলাবাসী সন্তোষকুমার রায় উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ছুটি পাইবেন না জানিয়া, সিমলাতেও অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য হরনাথ সন্তোষবাবুকে নির্দেশ দান করেন।

নাগপুর উৎসবে যোগদান করিবার জন্য হরনাথ ও কুসুমকুমারী ২৯শে জুন তারিখে সোনামুখী হইতে যাত্রা করেন এবং মেদিনীপুরে পৌঁছিয়া পরম ভক্তিমতী তমালিনী মা ও তাঁহার কন্যা টুকুরানীকে সঙ্গে লইয়া ৩০শে জুন তারিখে খড়্গপুর পৌঁছান। এই স্টেশনে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত অগণিত ভক্ত আসিয়া, হরনাথ ও কুসুমকুমারীর সহিত মিলিত হন। মহানন্দে সকলে বোম্বাই মেলে উঠিয়া বসিলেন এবং পরদিন বেলা দেড়টার সময়

১। Pagal Haranath : Part—V, Page 318

নাগপুরে উপনীত হইলেন। হরনাথ-কুসুমকুমারীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নাগপুর ও বোম্বাই-এর বহু ভক্ত ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। Orange Market-এর নিকটস্থ ধর্মশালার প্রাসাদোপম ভবনে জন্মোৎসব পূজা এবং ভক্তবৃন্দের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাহাতে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

রাত্রিকালীন অধিবাসের আরতি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তাহার পরদিন ২রা জুলাই জন্মোৎসব। সেজন্য একটি প্রকাণ্ড হলঘর সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বেলা ৯টার সময় বোম্বাই হইতে বিঠলভাই নামক একজন প্রাচীন ভক্তের আগমনে সমাগত ভক্তমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। হরনাথ-কুসুমকুমারীরও আনন্দের সীমা রহিল না।

বেলা দশটার সময় পূজার আয়োজন হইলে, সুবৃহৎ তাম্রপাত্র, সুবৃহৎ কোশাকুশি, বৃহদাকার শঙ্খঘণ্টা, ধূপদান প্রভৃতি পূজায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। নাগপুরের অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্রীযুক্ত শিবাজী সাহারিয়া পূজা করিলেন এবং বরোদা রাজ্যের ধর্মপ্রচারক পণ্ডিত দামোদর কাঞ্চী তন্ত্রধারক হইলেন। ষোড়শোপচার পূজা এবং সুমধুর মন্ত্র উচ্চারণে সকলেরই হৃদয় অভিভূত হইল। পূজার অব্যবহিত পরেই অক্ষয়কুমার গুপ্তের সহধর্মিণী হারমোনিয়ম বাজাইলেন এবং তাঁহার দুই শিশুকন্যা ও পুত্র সমবেতকণ্ঠে গান গাহিলেন।

অতঃপর তমালিনী মা প্রমুখ প্রবীণা মহিলাবৃন্দ কুসুমকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করণান্তর বহুক্ষণ ধরিয়া কুসুমকুমারীর সম্মুখে নৃত্য করিলেন। ইহার পর প্রসাদ বিতরণের পালা আসিল। স্থানীয় যে সমস্ত ভদ্রলোক উৎসব অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলে সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

পরদিন ৩রা জুলাই মহাসমারোহে দরিদ্রনারায়ণের সেবা গ্রহণ করা হইল এবং হরনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া একটি প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির করা হইল। মিছিলটির দৈর্ঘ্য এক মাইলেরও অধিক হইয়াছিল ; মিছিলের জন্য উষ্ট্র পর্যন্ত সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

৪ঠা জুলাই তারিখে নাগপুর-নিবাসী ভক্তপ্রবর নিবারণচন্দ্র পাঠকের বাড়ীতে এক মহোৎসবের আয়োজন হয়। এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া ও প্রসাদের সম্মান করিয়া ভক্তবৃন্দ রাত্রির ট্রেনে নাগপুর পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় 'হরনাথ সাধন সংঘ'-র পরিবর্তে 'হরনাথ শিক্ষা সংঘ' নামকরণ করা হইয়াছিল। এই শিক্ষা সংঘের সভ্যগণ জন্মতিথি ধরিয়া হরনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব করিলে, হরনাথ ভক্তগণের মধ্য হইতে তীব্র আপত্তির ঝড় উঠে। তাঁহাদের মতে, ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে একই দিনে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। ভাগবতবাবু এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না এবং সংঘের সভ্যগণের সকল প্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহারা জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, কিন্তু গোলযোগহেতু আসিবেন না ভাবিয়া এই জন্মোৎসবে আসিবার জন্য হরনাথকে ডাকিলেন না; অর্থাৎ, শিবহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। নাগপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরনাথ এই সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই জন্মোৎবে তাঁহাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য না ডাকায়, তিনি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন। ভাগবতচন্দ্রকে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"স্নেহের ভাগবত, বাবা আমি কলিকাতায় যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু ডাকিলে না, তাই গেলাম না। বাবা, তুমি সকলের জন্য এভাবে জীবন উৎসর্গ করেছ আর আমি যাইব না এ চিন্তা নিতান্ত অমূলক হইয়াছিল।"[১] যাহা হউক, ভাগবতচন্দ্রের উদ্যোগে ১০ই জুলাই তারিখে মহাসমারোহে এক নূতন জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইল। অমৃতবাজার পত্রিকার কলিকাতা সংস্করণে সেই সংবাদ প্রকাশিত হইল। "The astrological birth-day puja of Thakur Haranath was celebrated on Thursday, the 10th July, 1924."[২]

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা, পৃঃ ২১০ পত্রের ফটো দেওয়া আছে।
২। Amrita Bazar Patrika, Calcutta, July 19th, 1924

এই জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করার ফলে, ভাগবত মিত্রের সহিত হরনাথ শিক্ষা-সংঘের কতিপয় সভ্য এবং অপরাপর হরনাথ ভক্তগণের প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হইল এবং তাহার চরম আত্মপ্রকাশ হইল শিক্ষা-সংঘের ৩রা আগস্ট তারিখের অধিবেশনে। ভাগবতবাবু ইতিপূর্বে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাস হইতে সুচারুরূপে এই বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহ হইতেছিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ভাগবতবাবু আগামী শিক্ষা-বৎসর হইতে একটি অবৈতনিক দিবা স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা করেন।

৩রা আগস্ট তারিখে আহূত অধিবেশনে এই প্রস্তাব আলোচনা করা হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি হইল না। গণ্ডগোল বাধিল বিদ্যালয়ের নামকরণ লইয়া। ভাগবত বাবু হরনাথের পিতা জয়রামের নামে বিদ্যালয়টির নামকরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু অক্ষয় গুপ্ত প্রমুখ ভক্তবৃন্দ হরনাথের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করিবার পক্ষে মত দেন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে ভোট গৃহীত হয় এবং প্রচুর ভোটের বৈষম্যে অক্ষয়বাবু পরাজিত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অক্ষয়বাবু ঐ সংঘের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। কারণ, তাঁহার মতে সেই দিনের সভায় হরনাথের ভক্ত অপেক্ষা বাহিরের লোকই বেশী ছিল।[১] সভ্যগণের প্রবল মত-বিরোধিতা দেখিয়া ভাগবতবাবুর প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও, নামকরণ বিষয়ে হরনাথের মতামত জানিবার জন্য সংঘের সভাপতি ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হরনাথকে এক টেলিগ্রাম করেন। হরনাথ সেই টেলিগ্রামের উত্তরে লিখিলেন—am proud, name well selected, why Deben।[২] হরনাথের সম্মতি পাইয়া ভাগবত-বাবুর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার পরিকল্পনার কথা বিস্তৃত-ভাবে জানাইয়া হরনাথকে এক পত্র লিখেন। খুব সম্ভবতঃ টেলিগ্রামে

১। আমার অভিজ্ঞতা : প্রথম খণ্ড : পৃঃ ১২

২। টেলিগ্রামটির ফটো 'অমিয় হরনাথ লীলাকথা'র ২০৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। পোস্টাফিসের স্ট্যাম্পে 8 Aug. 24 তারিখ দেখা যায়।

"why Deben ?" অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কেন টেলিগ্রাম করিলেন, ভাগবত করিলেন না কেন? এই প্রশ্নই ভাগবতের উক্ত পত্র লেখার কারণ। পত্র পাইয়া হরনাথ ভাগবতের দুর্বোধ্য ব্যবহারের জন্য কতকগুলি অনুযোগ করেন। এই পত্রপাঠেই জানা যায় যে, ভাগবতের ব্যবহারে হরনাথ কতদূর ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি দলাদলি হইতে উর্ধ্বে থাকিবার জন্য ভাগবতকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। কারণ, তাঁহারা যাহাই করুন, হরনাথের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিলে লোকে তাঁহাদেরই উপহাস করিবে।[১] 'হরনাথ-তত্ত্ব প্রচারিণী সভা'কেও তিনি অনুরূপভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। অতুলচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত এক পত্রে ভাগবতের মনোভাব তিনি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন—"Bhagabat Baba does not want me, he loves my work. Let him do that. The Lord has not given same work to all."[২]

কটকে অজয়কুমার ঘোষকে লিখিত পত্রেও কলিকাতার ভক্তগণের এই দলাদলির মনোভাব বিশেষতঃ হরনাথ শিক্ষা-সংঘের দুর্বোধ্য আচরণে হরনাথের ক্ষুব্ধ ব্যক্তিমানসের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে।

"সত্যই সঙ্ঘ একটু বাড়াবাড়ির মধ্যে পড়েছে। সকল সদস্যগণই সঙ্ঘের কার্যে সন্তুষ্ট নয়।" ভাগবতবাবু সম্বন্ধে এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"স্নেহের ভাগবত কর্মবাদী, সে ভগবানের কর্মকে ভগবান অপেক্ষা বেশী মনে করে। সত্যই সে একজন কর্মবীর। তবে সময়ে সময়ে সে কেমন হয়ে পড়ে যার জন্য অনেকেই মর্মাহত হয়। এবারও তাই হয়েছে, দেখা যাক, শেষ কি হয়। আমার নামে সংঘ করে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবার মত হয়েছে, আমাকে আর একেবারেই ভালবাসে না বোধ হয়।"[৩]

উপরোক্ত পত্রসমূহ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়

১। ভাগবত মিত্রকে লিখিত পত্রের ইংরাজী অনুবাদ (Vide Pagal Haranath : Part V, Pages 319-320)

২। Pagal Haranath : Part V, Page 321

৩। সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১৪

যে, হরনাথ শিক্ষা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ভাগবত মিত্র এবং তাঁহার মতানুসরণকারিগণ হরনাথের নিকট একটি সমস্যার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অপরাপর ভক্তগণও এজন্য সবিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং সেকারণ হরনাথের মানসিক শান্তি ব্যাহত হইতেছিল। অপরদিকে গৃহেও হরনাথের শান্তি ছিল না। কুসুমকুমারী সহসা সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। অনুকূলের শিশুপুত্র নারায়ণদাসও অসুখে ভুগিয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

এইভাবে দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইলেও, হরনাথের মানসিক স্থৈর্য কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সমস্ত দুশ্চিন্তা, অশান্তি এবং ক্ষোভ অন্তরের অন্তঃস্থলে সংগোপন করিয়া, ধৈর্য ও স্থৈর্যের অবিচল প্রতিমূর্তির মত হরনাথ বিরাজ করিতে লাগিলেন। কাহারও প্রতি কোন বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করেন নাই, এমন কি, পাছে কেহ মনে দুঃখ পায় সেজন্য সংঘের পরিণতি সম্বন্ধেও তিনি কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই।[১] এই সময়ে হরনাথের শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়ে।

এই বৎসর ৩রা অক্টোবর হরনাথের পৌত্র নারায়ণদাসের অন্নপ্রাশনের দিন ধার্য হয়। এই দিন পঞ্চমী হওয়ায়, কতিপয় ভক্ত পূজার দিনগুলি হরনাথের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়া সোনামুখীতে আগমন করেন। অক্ষয়বাবু সঙ্গে করিয়া 'হরনাথ তত্ত্বপ্রচারিণী সভা'র উপঢৌকন দুই ঝুড়ি ইলিশ মাছ সঙ্গে করিয়া আনেন। বরফ দেওয়া না থাকায় মাছগুলি পচিয়া যায়। এই মাছ পচা দুর্গন্ধ দেখিয়া কুসুমকুমারী এইগুলিকে ফেলিয়া দিবার আদেশ দান করেন। তদনুসারে চাকরেরা মাছের ঝুড়ি দুইটি লইয়া বাগানবাড়ী অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলে, হরনাথ সেগুলিকে ঘাটের নীচের ধাপে রাখিতে নির্দেশ দান করেন। ভোরবেলায় ঘাটে গিয়া মাছগুলি দেখিয়া কুসুমকুমারী পুনরায় সেগুলি ফেলিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। চাকরেরা সেগুলি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে, হরনাথ নিষেধ করেন ও মাছ কাটিবার জন্য আগত স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিতে বলিলেন।

সেই স্ত্রীলোকেরা আগমন করিলে হরনাথ তাহাদিগকে মাছ

১। নেপাল ঘোষকে লিখিত পত্র—হরনাথ-স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী, পৃঃ ১০৪

কাটিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাহারা মাছ কাটিতে আরম্ভ করিলে তাজা রক্ত বাহির হয় এবং কাটা মাছ হইতে কোনরূপ পচাগন্ধ পাওয়া যায় না। ভক্তের আগ্রহের দান অনাদর করিয়া ফেলিয়া দিলে ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগিবে বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় ভক্তবৎসল হরনাথ এই অলৌকিক লীলা দেখাইলেন।[১]

৫ই অক্টোবর তারিখে বরিশালের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার বসন্তকুমার সেন সস্ত্রীক এই উৎসবে আগমন করেন। তৎপরদিন দেওঘর হইতে সস্ত্রীক যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁহার শ্বশুর প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ও সোনামুখীতে আসেন। এই সমস্ত ভক্তের সাহচর্যে হরনাথ পূজার সময় আনন্দে অতিবাহিত করেন।

পূজার পরে হরনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই অসুস্থতা তাঁহার শরীরকে এমন দুর্বল করিয়া তুলে যে, তিনি পাঁচ-সাতদিন ধরিয়া কাহাকেও পত্র লিখিতে পর্যন্ত পারেন না। কয়েকদিন পরে শরীর কথঞ্চিৎ সবল হইয়া উঠিলে, হরনাথ কলিকাতা গমন করেন। কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া হরনাথ পুরী গমন করেন। পুরীতে হরনাথের অন্যতম ভক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

পুরী হইতে সোনামুখীতে ফিরিবার পর দুই-একদিনের মধ্যেই হরনাথকে কলিকাতা গমন করিতে হয়। নলিনীনাথ দত্ত নামক হরনাথের একজন ভক্ত শান্তিপুরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত আয়োজন করেন এবং হরনাথকে শান্তিপুর লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতা আসেন। নলিনীবাবুকে হরনাথ বলিলেন, 'বাবা বরযাত্রার মত বাজনা-বাদ্য Procession করিও না। সংকীর্তন কর, অতিথিসেবা কর।' কিন্তু নলিনীবাবু ইতিপূর্বেই বাদ্য-ভাণ্ডের ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহা বন্ধ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। নতুবা কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম করিয়া সেগুলি বন্ধ করা যাইত।

১লা নভেম্বর তারিখে শান্তিপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল। এইরূপ

১। দ্রঃ আমার অভিজ্ঞতা: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৩—১২৬

বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রা সকলের পক্ষে প্রীতিকর হইল না। বিশেষতঃ যাঁহারা হরনাথের ভক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া প্রতিভাত হইল। ইহা হরনাথেরও কর্ণগোচর হইল। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই হরনাথ বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রার আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে গমন করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই দেখিয়া, তিনি যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা-উৎসবের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সেই ক্ষোভ প্রকাশ পাইল।

কলিকাতায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসবের আলোচনা হইতেছিল। হরনাথ এই আলোচনায় যোগদান করিয়া বলিলেন, 'বাবা জানিও আমি এখানে বাহিরে পুরুষ, কিন্তু ভিতরে প্রকৃতি (I am Purusha outside but Prokiriti within)। আমি উচ্চঘরের কুলবধূ, কিন্তু তোমরা আমাকে সাধারণ বেশ্যার মত নাচাইতে চাহ।'[১]

পূর্ব বৎসরের মত এই বৎসরেও হরনাথের বাগানবাড়ীতে পৌষালী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উৎসবে সকল স্থানের ভক্তগণই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাইয়ের জগমোহনদাস, কল্যাণদাস, নাগপুরের শিবাজী সাহরিয়া এবং মাদ্রাজের পি. রামদাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় চারি সহস্র নরনারীকে একত্র মিলিত হইয়া আহারাদি করিতে দেখিয়া, হরনাথের অন্তরে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল। জগমোহনদাস হরনাথকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করেন। এই বৎসর পৌষালী উৎসবে নাগপুরের শিবাজী সাহরিয়া হরনাথের জন্য একটি উৎকৃষ্ট কাপড় আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশে পুরুষেরাও চওড়া-পাড় কাপড় ব্যবহার করেন। সুতরাং হরনাথের জন্য আনীত কাপড়টির রক্তবর্ণ পাড়ও ছিল খুব চওড়া। হরনাথের স্নান সারা হইলে হাতীপাড়সদৃশ সেই কাপড়টি হরনাথকে পরানো হইলে, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ রসিক ভক্তবৃন্দ কয়েকজন মিলিয়া হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই শব্দ শুনিয়া অদূরে উপবিষ্টা মাতা ঠাকুরানী ও তাঁহার সখিগণ চমকিত

১। হরনাথ-স্মৃতি : পঞ্চম লহরী, পৃঃ ৫

হইয়া উঠিলেন এবং হুলুধ্বনির কারণ বুঝিতে না পারিয়া আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এইভাবে বৎসরের শেষদিন হাসি-তামাসা, আমোদ-প্রমোদ ও ভূরিভোজনের মধ্য দিয়া মহানন্দে অতিক্রান্ত হইল। ভক্তদের মধ্যে মত-বিরোধহেতু এতদিন ধরিয়া হরনাথের মনে যে বেদনা সঞ্চিত হইয়াছিল, ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারির 'আনন্দ মিলন'-উৎসবে তাহা সাময়িকভাবে অপসারিত হইল। সিমলার সন্তোষকুমার রায় এবং কলিকাতার ভাগবত মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত এই 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে যোগদান না করায়, হরনাথের মনে ব্যথার সঞ্চার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিভিন্ন দেশবাসী চারি সহস্র ভক্তের একত্র সম্মিলনে ও আনন্দ কলরবে সেই ব্যথার মেঘটুকু মুহূর্তমধ্যে অপসারিত হইয়া গেল।

যতীন্দ্রনাথ মিত্রাকে অনুগ্রহ (১৯২৫ সাল)

'আনন্দ-মিলন' উৎসবের কয়েকদিন পরে হরনাথ কলিকাতা গমন করেন[১] এবং কলিকাতা মানিকতলায় ভক্তপ্রবর শরৎচন্দ্র দে-র বাটীতে অবস্থান করেন। ৯ই জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন ডেপুটী চেয়ারম্যান যতীন্দ্রনাথ মিত্র নামক একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি হরনাথের দর্শনাভিলাষে মানিকতলায় আগমন করেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি হরনাথের একজন নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হন। এইদিন রাত্রিকালে শরৎবাবুর বাটীতে একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট. মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উক্ত সভায় শ্রীকৃষ্ণলীলা ও অবতার তত্ত্বের বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন। ১০ই জানুয়ারী তারিখে হরনাথ সোনামুখীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পক্ষণের জন্য হইলেও যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় হরনাথের সুমধুর সাহচর্যে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি তাঁহার সহধর্মিণীর নিকট

১। ৭ই জানুয়ারি, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ

হরনাথের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। স্বামীর মুখে হরনাথের কথা শুনিয়া মিত্র-গৃহিণী প্রতিদিন পূজার সময় হরনাথকে স্মরণ করিতেন এবং একদিন পূজার সময় তাঁহার ধ্যানের মানসে হরনাথকে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামীর নিকট বিস্তৃতভাবে তাঁহার রূপ বর্ণনা করেন। হরনাথের প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপের সহিত স্ত্রীর ধ্যানদৃষ্ট রূপের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, মিত্র মহাশয় অতিশয় বিস্ময় অনুভব করিলেন।*

৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সোনামুখী হইতে হাওড়া যাত্রা করিয়া হরনাথ হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন—"Going to Howrah, Stealthily attend Station." তারবার্তা পাইয়া প্রফুল্লবাবু হরনাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যার ট্রেনে হরনাথ আসিয়া পৌঁছিলে, তাঁহাকে সযত্নে বাটীতে লইয়া আসেন। প্রফুল্ল-বাবুকে হরনাথ জানাইলেন যে, তাঁহার এবারের হাওড়া আগমন যতীন্দ্রনাথ মিত্রের জন্য। প্রফুল্লবাবু তাঁহাকে সংবাদ দিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হরনাথ কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলেন। হরনাথের আদেশ পাইবামাত্র প্রফুল্লবাবু সাইকেলে চড়িয়া যতীন-বাবুর বাটীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, যতীনবাবু সেইমাত্র ফিরিয়াছেন। তিনি সেইদিন সন্ধ্যায় 'শালিখা গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ'-এর সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন এবং সভাশেষে এই সভার সাহিত্য-শাখার সভাপতি জলধর সেন মহোদয়কে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া বাটী ফিরিলেন। প্রফুল্লবাবুর মুখে হরনাথের আদেশ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া সপরিবারে প্রফুল্লবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যতীনবাবুকে দেখিয়া হরনাথ তাড়াতাড়ি আহার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের সকলকে তাঁহার শয়নকক্ষে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া যতীনবাবুর স্ত্রীকে বলিলেন, 'মা! তোমার ছেলেকে মিলিয়ে নাও পূজার ঘরে যে রকম দেখেছিলে, সেই রকমটিই কিনা পরীক্ষা করে নাও।' এই কথা

---

* শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ (পাণ্ডুলিপি)

শুনিয়া মিত্র-গৃহিণীর দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, তাঁহার ধ্যানের মানসে হরনাথ সত্যসত্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পর হরনাথ যতীন্দ্রবাবুকে কতকগুলি সময়োচিত উপদেশ দান করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে হাওড়ার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হরনাথকে দর্শন করিতে আসিলেন। ইহাদের মধ্যে হাওড়া জেলাবোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর আশুতোষ বসু, ভূতপূর্ব ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌জিনীয়ার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রমোহন বসু এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শৈলেশ্বর সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কাহারও কোনরূপ পরিচয় জানা না থাকা সত্ত্বেও, হরনাথ প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী উপদেশ দান করিতেছিলেন। ইহাতে দর্শনার্থী প্রত্যেকটি ব্যক্তিই বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এইদিন মধ্যাহ্নে হাওড়া চিন্তামণির ঘাটে স্নান সমাপন করিয়া হরনাথ যতীন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। ভোজনকালে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে তিনি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া প্রসাদ দান করিতে লাগিলেন। হরনাথের মধ্যাহ্নভোজনের অব্যবহিত পরেই চক্রবেড়িয়ার প্রিয়নাথ ঘোষ নামক এক পরম বৈষ্ণব হরনাথকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। হরনাথ সানন্দে সম্মত হইলেন এবং যতীন্দ্রনাথের মোটরে করিয়া প্রিয়নাথের বাটীতে গেলেন। প্রিয়নাথবাবুর ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া হরনাথ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। সন্ধ্যার দিকে চক্রবেড়িয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরনাথ কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দের অশ্রুসজল চক্ষু দেখিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং সেই রাত্রির মত তিনি প্রফুল্লবাবুর বাটীতে অবস্থান করিলেন এবং যতীন্দ্রনাথবাবুর স্ত্রীকে সেখানে আনাইতে মোটর পাঠাইতে নির্দেশ দান করিলেন। সংবাদ পাইয়া এইদিন রাত্রিতে কলিকাতার অনেক ভক্ত হাওড়ায় আগমন করেন এবং কলিকাতায় সংবাদ না দিয়া হরনাথের হাওড়া আগমনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হন। পরদিন প্রাতঃকালে হরনাথ হাওড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভাগবত

মিত্র-প্রতিষ্ঠিত 'হরনাথ পাঠশালা'র* ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণী সভায় যোগদান করেন এবং তৎপরদিন শরৎবাবুর বাটীতে 'হরনাথ তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা'র অধিবেশনেও উপস্থিত থাকিয়া হরনাথ সভার সভ্যবৃন্দকে উৎসাহ দান করেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং হরনাথগোষ্ঠীতে নবাগত যতীন্দ্রনাথ মিত্র একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন।[১] শঙ্করবাদে পরম বিশ্বাসী মিত্র মহাশয় এই বক্তৃতায় বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া সকলের উপরে প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন এবং ঠাকুর হরনাথের প্রেমধর্মের জয়গান করেন। সর্বশেষে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া ভক্তজন-চিত্তগ্রাহী উপদেশ দান করিয়া হরনাথ নীরস অদ্বৈত মতের খণ্ডন করিয়া উপস্থিত সকলের হৃদয়ে প্রেমভক্তির রুদ্ধ প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এই দিনই যতীন্দ্র মিত্রের মনের সকল সন্দেহের নিরসন হয় এবং তিনি হরনাথের চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। পরদিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার ট্রেনে হরনাথ কলিকাতা হইতে সোনামুখী যাত্রা করিলেন।

পূর্ব বৎসরের মত এই বৎসরও ঝিখিরায় হরনাথকে লইয়া উৎসবের আয়োজন হয়। ঝিখিরায় হরনাথ আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা হয়। ঝিখিরার জমিদার কিশোরীমোহন রায় এই আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিদান করিতে ও আশ্রম-নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিলে, উৎসবের উদ্যোক্তাগণ হরনাথের দ্বারা এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করাইতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহাদের সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া হরনাথ উৎসবে যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ঝিরিয়া হইতে হাওড়ায় যতীন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে আগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ইচ্ছার কথা অবগত হইয়া যতীন্দ্রনাথ মিত্র খবরের কাগজে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন।

* বর্তমানে এখানে বালকদের জন্য একটি বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ২৭—৩১

হরনাথ ২৪শে এপ্রিল তারিখে ঝিখিরায় আগমন করেন। এইদিন বৈকালের দিকে প্রফুল্লবাবু ও যতীনবাবু হাওড়া হইতে ঝিখিরায় আগমন করেন। উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবশেষে হরনাথকে সঙ্গে করিয়া হাওড়া হইয়া যাওয়াই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা যখন ঝিখিরায় পৌঁছিলেন, হরনাথ তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া হরনাথ একটি মুদির দোকানে উপবেশন করেন। এই মুদির দোকানের মালিক ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান এবং হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া স্থানীয় লোকে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। এই মুদির দোকানে উপবেশন করিয়াই হরনাথ যতীন্দ্রনাথ মিত্রকে জম্মু হইতে শ্রীনগরের পথে তাঁহার দেহান্ত ও নবকলেবর প্রাপ্তির কাহিনী বিবৃত করেন।[১]

২৫শে এপ্রিল তারিখে ঝিখিরার বারোয়ারীতলায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নামসংকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, হরনাথের স্নানলীলা, মধ্যাহ্নভোজন প্রভৃতি যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। বৈকালের দিকে একজন বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে গমন করিয়া হরনাথ সমাগত ভক্তবৃন্দকে কতকগুলি সুমধুর উপদেশ দান করিলেন। সেই সমস্ত উপদেশের মূলকথা—ভালবাসা—সব কিছু ভুলিয়া অন্ধের মত ভালবাসা।

পরদিন ২৬শে এপ্রিল (বাংলা ১৩ই বৈশাখ ১৩৩২ সাল) অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে হরনাথ গ্রামের প্রান্তদেশে নদীর ধারে শ্মশানের কাছে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন এবং মধ্যাহ্নভোজনের পর যতীনবাবু ও প্রফুল্লবাবুর সহিত হাওড়া উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মোটরযোগে আমতা পৌঁছিলে আমতার স্বনামধন্য রায় বাহাদুর জয়কালী চক্রবর্তী স্টেশনে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং হরনাথকে সেইদিন আমতায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু ঐ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যতীনবাবুর বাটীতে 'হাওড়া হরনাথ সভা' প্রতিষ্ঠার দিন পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট ছিল বলিয়া, যতীনবাবু চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। মার্টিন কোম্পানির লাইট

১। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে

ট্রেনের একটি কামরায় ভক্তদ্বয়সহ হরনাথ উপবেশন করিলেন। আমতা হইতে হাওড়া আসিতে উক্ত ট্রেণের প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। শ্যামসুন্দর পল্লীসমূহের মধ্য দিয়া চলমান ট্রেনের কামরায় বসিয়া হরনাথ মহানন্দে গল্প করিতেছিলেন। হঠাৎ কি কারণে ট্রেণটি একবার থামিয়া গেল। তখন হরনাথ তাঁহার জীবনে দুইবার গাড়ি থামিবার কাহিনী বিবৃত করিলেন।[১]

ট্রেন-থামার কাহিনী

একবার বোম্বাই হইতে বাড়ী আসিবার কালে পথিমধ্যে এক স্টেশনে হরনাথের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একজন পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক উঠেন। সেই কামরায় হরনাথের কয়েকজন ভক্তও ছিলেন। তখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার জন্য সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য হইতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন বাহির করিয়া হরনাথ ভক্তজনমধ্যে বিতরণ করেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণকেও কিছু গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু উক্ত ভদ্রলোক ট্রেনে কিছু খাইতে অস্বীকার করেন এবং জানান যে, জব্বলপুর স্টেশনে তাঁহার জন্য খাদ্য লইয়া তাঁহার লোক উপস্থিত থাকিবে। তথাপি হরনাথ তাঁহাকে কিছু খাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন, কিন্তু উক্ত ভদ্রলোক কোনমতে সম্মত না হওয়ায় হরনাথও কিছু খাইলেন না। অপরাহ্নে ট্রেন জব্বলপুরে থামিল। কিন্তু হরনাথের সহযাত্রীটির খাবার লইয়া কোন লোক আসিল না। তখন হরনাথ তাঁহাকে কিছু খাইবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত স্নান হয় নাই জানাইয়া, ভদ্রলোকটি কিছু খাইতে অস্বীকার করেন। হরনাথ আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু ট্রেনটি হঠাৎ থামিয়া গেল। হরনাথ তখন ভদ্রলোকটিকে নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিতে বলায়, ভদ্রলোক যে স্থলে ট্রেন থামিয়াছিল তাহার অনতিদূরে একটি সুন্দর জলাশয় দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ট্রেন ছাড়িয়া যাইবে এই ভীতি প্রকাশ করিয়া নামিতে চাহিলেন না। কিন্তু তাঁহার ভয় ছিল ট্রেন

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ৪৫

ছাড়িয়া যাইবার জন্য নহে, তাঁহার ভয়ের কারণ ছিল স্যুটকেশটি। অন্তর্যামী হরনাথ ইহা বুঝিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, 'বাবা তুমি দ্বিধা করো না। আমি জানি তুমি একজন বড় সওদাগর। তোমার জুয়েলারির ব্যবসা। তোমার এই স্যুটকেশে লক্ষ টাকার মুক্তো রয়েছে, তাও আমি জানি। আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত গাড়ি ছাড়বে না, তোমার মুক্তোও যথাস্থানে থাকবে এবং আমার কথার জন্য আমিও তোমার কাছে জামিন রইলাম।' হরনাথ আর কালবিলম্ব না করিয়া উক্ত সওদাগরের হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামিলেন এবং তাঁহার সহিত পুষ্করিণী পর্যন্ত গমন করিলেন। স্নানান্তে সওদাগর আসিয়া ট্রেনে চড়িতেই ট্রেন চলিতে লাগিল। হরনাথের এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাদর্শনে সওদাগরটি হরনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সহিত আহার করিলেন। পরে এই ভদ্রলোকই হরনাথের একজন পরম ভক্তে পরিণত হন।

আর একবার পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পুরী স্টেশনে এইরূপ ট্রেন থামিয়াছিল। স্টেশনে অনেক ভক্ত-সমাগম হয়। তন্মধ্যে মিঃ আহাদ নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী হরনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। সেবার আসিবার সময় হরনাথ তাঁহার স্ত্রীকে দর্শন দিয়া আসেন নাই বলিয়া, মিঃ আহাদের মনে অতিশয় ক্ষোভ ছিল। অন্তর্যামী হরনাথ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্ত্রীকে আনয়ন করিবার জন্য মিঃ আহাদকে নির্দেশ দিলেন। তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশী বিলম্ব না থাকায়, মিঃ আহাদ ইতস্ততঃ করেন। ইহাতে হরনাথ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলেন যে, তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ট্রেন ছাড়িবে না। হরনাথের উপর মিঃ আহাদের গভীর আস্থা ছিল। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি স্ত্রীকে আনিতে ছুটিলেন। ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। কিন্তু ড্রাইভারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও গাড়ি নড়িল না। তখন গার্ড, স্টেশন-মাস্টার ও ড্রাইভার সকলে মিলিয়া ইঞ্জিন না চলিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইভাবে

প্রায় আধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইবার পর মিঃ আহাদ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া স্টেশনে আসিলেন। তিনি আসিয়া হরনাথের চরণে প্রণতা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হরনাথ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া, তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল।

এই অলৌকিক ঘটনা দুইটি যে হরনাথের ইচ্ছাশক্তিতেই হইয়াছিল, সঙ্গী ভক্তদ্বয় তাহা উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু একটি অভুক্ত সওদাগর এবং জনৈক ভক্তের জন্য এভাবে ট্রেন থামানো কতটা সঙ্গত হইয়াছে, ভক্তপ্রবর যতীন্দ্রনাথ মিত্রের মনে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইল। হরনাথ তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, 'বাবা, এটা প্রভুর ইচ্ছাতেই হয়েছে, এতে কারু কিছু ক্ষতি হতে পারে না। অনেক সময় অনেক অযথা কারণে বহুক্ষণ ট্রেন থেমে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু এই দুটো কারণে যতক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়েছিল সেই সময়টুকু পূরণ করে নিতে ড্রাইভারের কোন অসুবিধা হয়নি।'[১]

এইভাবে গল্প করিতে করিতে ট্রেন ডোমজুড় (ঝাপড়দহ) স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অপেক্ষমান যতীন্দ্রনাথ মিত্রের মোটরে করিয়া হরনাথ সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। সেদিন 'হাওড়া হরনাথ সভা' প্রতিষ্ঠার কথা ইতিপূর্বেই যতীন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়, বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে শালকিয়ার বিজলীকুমার মুখোপাধ্যায় ও শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণপুরের চারুচন্দ্র মল্লিক, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম ও রামকৃষ্ণ ঘোষ, ব্যাঁটরার বিনোদ মিত্র, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট প্রমোদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ভোলানাথ রায়, সরকারী উকিল ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারুচন্দ্র সিংহ, উকিল অনাথনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, ভক্তপ্রবর পরেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৪৮

হইতেও ভক্তপ্রবর শরৎচন্দ্র দে ও তদীয় ভ্রাতা বসন্তকুমার দে এবং আরও অনেক ভক্তের আগমন হইয়াছিল।[১]

হরনাথের উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই সভার অধিবেশন হইল এবং হাওড়া সভা প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হইল। রাত্রিকালে ভক্তগণের সহিত আহারাদি করিয়া হরনাথ যতীন্দ্রবাবুর গৃহেই অবস্থান করিলেন। পরদিন ১৪ই বৈশাখ প্রাতে হাওড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হরনাথের দর্শনাভিলাষে যতীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আগমন করিলেন। হরনাথ তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ ও মিষ্টান্ন প্রসাদে পরিতৃপ্ত করেন। তারপর রামকৃষ্ণপুরের চিন্তামণিঘাটে ভক্তবৃন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া, যতীন্দ্রবাবুর গৃহে উপস্থিত ভক্তজনসহ হরনাথের মধ্যাহ্নভোজন সমাধা হইল।

সেইদিন রাত্রিকালে হরনাথ কলিকাতায় গমন করিলেন। হরনাথের কলিকাতা আগমনের সংবাদ পাইয়া মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মিত্র শরৎবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া হরনাথকে থিয়েটারে লইয়া যান। অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই প্রসিদ্ধ নাট্যভবনটি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেইদিন নবনির্মিত নাট্যমন্দিরে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয় এবং হরনাথকে উপস্থিত থাকিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

সেইদিন হাওড়ার যতীন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ভক্তদের সহিত আলোচনায় রাত্রি অধিক হইয়াছিল বলিয়া, কয়েকবার মানিকতলার বাটীতে উপস্থিত হইয়াও উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় হরনাথের সাক্ষাৎ পান নাই। তাই রাত্রি অধিক হইলেও আসিয়া পৌঁছিবামাত্র মিত্র মহাশয় হরনাথকে মিনার্ভা থিয়েটারে লইয়া আসেন। মিনার্ভা থিয়েটারের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী কিছুকাল যাবৎ হরনাথের পূজা করিতেন। সেদিন হরনাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়। অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বর্ষণে তাঁহার সেই আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। তাঁহার সেদিনকার প্রাণস্পর্শী কীর্তন উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করে

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৪৮

পরিশেষে হরনাথ তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ ও অভয় দান করিয়া মানিকতলায় ফিরিয়া আসেন। উক্ত অভিনেত্রীটি পরদিন সন্ধ্যায় মানিকতলায় আসিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং সুমধুর কীর্তনে হরনাথ ও তাঁহার ভক্তজনকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার ভাবের পরিবর্তন উল্লেখ করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে হরনাথ বলেন, 'দেখত আমার মায়ের মুখখানি কেমন ভালবাসা মাখানো। হোক সে পতিতা, তবু সে আমার মা।'[১] এই অভিনেত্রীটি এই বৎসরের পুরী জন্মোৎসবেও যোগদান করেন এবং হরনাথের কৃপালাভে ধন্যা হন।

১৬ই বৈশাখ সন্ধ্যার ট্রেনে হরনাথ কলিকাতা হইতে সোনামুখী প্রত্যাবর্তন করেন।

পুরীর ষষ্ঠীতম জন্মোৎসব

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হরনাথ প্রায় দুই মাসকাল সোনামুখী ছাড়িয়া আর কোথায়ও যান নাই। ইহার মধ্যে ভাগবতের মোকদ্দমা রুজু করার কথা তিনি অবগত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার অন্তরে যে গভীর বেদনা হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তাঁহার শ্যামসুন্দরের সেবার পালা পড়ে, এই সময়ে বহু ভক্ত তাঁহার সহিত সোনামুখীতে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সাহচর্যে ভাগবতের ব্যবহার জনিত হরনাথের মনোবেদনা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলেও, ইহার মূলোৎপাটন হইল না। দেখিতে দেখিতে জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইল এবং জন্মোৎসবের আয়োজনে ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই বৎসর হরনাথের বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, ভক্তগণ জন্মোৎসবের বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। হরনাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুরী আশ্রমে এ-বৎসরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হয়। এবারের জন্মোৎসবে নূতন ভক্তগণের মধ্যে হাওড়ার যতীন্দ্রনাথ মিত্র এবং মিনার্ভা থিয়েটারের সেই খ্যাতনামা অভিনেত্রীটিও যোগদান করেন।

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৫৮। এই অভিনেত্রীটির কথা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

২৬শে জুন তারিখে হরনাথ সোনামুখী হইতে যাত্রা করেন এবং ২৭শে জুন প্রাতে মানিকতলায় শরৎবাবুর বাটীতে আগমন করেন। মানিকতলা বাটীতে ভক্তগণ আসিয়া হরনাথের সহিত মিলিত হন এবং ৩০শে জুন তারিখে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া হরনাথ পুরী এক্সপ্রেসে পুরী যাত্রা করেন। এই কয়দিন কলিকাতায় অবস্থানকালে অন্যান্য ভক্তগণের মুখে ভাগবতের অদ্ভুত ও অন্যায় ব্যবহারের কথা নিরন্তর শ্রবণ করিয়া হরনাথ অতিশয় বিরক্ত ও বিষণ্ন হন। ভাগবত মিত্র তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সহিত সকল যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করেন এবং 'হরনাথ শিক্ষা সংঘ' ও 'হরনাথ পাঠশালা' প্রভৃতি লইয়া এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়ও তাঁহার হয় না। কর্মবাদী ভাগবত এবং তাঁহার মতানুসারী কয়েকজন ভক্তের সহিত এইজন্য ভক্তিমার্গের ভক্তগণের সংঘাত বাধে। কিন্তু ভাগবতবাবু স্বীয় সঙ্কল্পে অবিচল থাকেন এবং সকল ভক্তের সহিত, এমনকি হরনাথেরও সহিত, সকল যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করেন। মাত্র এই পর্যন্ত করিয়াই যদি ভাগবত ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে হরনাথের এত দুঃখ হইত না।

ভাগবত আরও অগ্রসর হইলেন। ১৯২২ সালে বরাহনগর জন্মোৎসবে কর্জ-দেওয়া টাকা আদায় করিবার জন্য তিনি সহসা তত্ত্বপ্রচারিণী সভার নামে নালিশ করিতে উদ্যত হইলেন এবং কর্জ-দেওয়া টাকার কোন দলিল না থাকায়, আদালতে এই মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া হরনাথকে সাক্ষী মানিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সাক্ষীর কাঠগোড়ায় উঠিতে হইবে—এই চিন্তা হরনাথ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সুগভীর মনঃপীড়ার কারণ হইল। মনের এইরূপ অবস্থায় জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য হরনাথ যাত্রা করেন বলিয়া, সমস্ত পথের মধ্যে হরনাথের মুখের বিরক্ত ও বিষণ্ণভাব দূরীভূত হইল না। অন্যান্য স্থানের তুলনায় কলিকাতার কয়েকজন ভক্তের মধ্যে আন্তরিকতার অভাবের কথা তিনি বারে বারে উল্লেখ করিতে লাগিলেন এবং চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। এমনকি খড়্গপুর স্টেশনে আসিয়া ট্রেন পৌঁছিলে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ পুষ্পার্ঘ্য লইয়া তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেও

তিনি উঠিলেন না এবং কেহ তাঁহাকে জাগাইতেও সাহস করিল না। খড়্গপুর স্টেশনে কুসুমকুমারী এবং সোনামুখী হইতে আগত মহিলা ভক্তবৃন্দও আসিয়া হরনাথের সহিত মিলিত হইলেন এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরায় উঠিলেন। প্রাতঃকালে ট্রেন কটকে আসিয়া পৌঁছিলে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ভক্ত ছোটিলাল, জগমোহন দাস, কল্যাণ দাস, দ্বারকা দাস, পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী প্রভৃতি হরনাথের কামরায় উঠিলেন। কবিরাজ নিত্যনিরঞ্জন সারাটি পথ খোল-করতালসহযোগে কীর্তন করিয়া এক অপূর্ব আনন্দলোকের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিলেন। এই আনন্দধারায় অবগাহন করিয়া ট্রেনটি ১৭ই আষাঢ় তারিখে পুরী পৌঁছিল।

পুরী স্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া ভক্তবৃন্দ আশ্রমের পথে যাত্রা করিলেন। হরনাথ তাঁহার গাড়িতে নাতিজামাই সত্যকে এবং যতীন্দ্র মিত্রকে তুলিয়া লইলেন। গাড়ি মন্দিরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে হরনাথ গাড়ি থামাইলেন এবং গাড়ি হইতে নামিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন।

সন্ধ্যার দিকে হরনাথের শরীর সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িল বলিয়া, সেদিন ঘর হইতে বাহির হইলেন না। ইহাতে ভক্তগণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সেবাযত্নে হরনাথ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

পরদিন ২রা জুলাই হরনাথের জন্মোৎসব। এই বৎসর হরনাথের বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইল বলিয়া, এবারের উৎসব 'হীরক জয়ন্তী' উৎসব। তাই অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবারের উৎসবের সমারোহ অপেক্ষাকৃত অধিক। নানা দেশ হইতে ভক্ত নরনারীর আগমনে আশ্রম পরিপূর্ণ। প্রাতঃকালে চা ও জলখাবারের পর হরনাথ-কুসুমকুমারীর পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ভক্ত* এই পূজার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইহা একটি বিরাট ব্যাপার। বরোদার গাইকোয়াড়ের প্রধান পুরোহিত এবং ঐ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত দার্শনিকপ্রবর দামোদর

---

* দ্রষ্টব্য : শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৬৩

শাস্ত্রী হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে পূজা করিলেন এবং হরনাথকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন।[১] তারপর মাদ্রাজের ডাক-বিভাগের কন্ট্রোলার মিঃ আচারিয়া হরনাথের ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'বিশ্ব-সন্দেশ'টি পাঠ করিলেন। পূজাশেষে ভক্তগণ সকলেই নির্মাল্য গ্রহণ করিলেন।

এইবারে উপস্থিত ভক্তগণমধ্যে রামগোপাল ভট্টাচার্য, হরিদাস বসু মল্লিক, আশু বাগচী, প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, টহলপ্রসাদ রায়, শিবাজী সাহরিয়া প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বোম্বাই ও মাদ্রাজের কয়েকজন ভক্তের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মহিলা ভক্তগণের মধ্যে যশোদা মা ও তমালিনী মা-র নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার পর যথারীতি ভক্তগণ কর্তৃক প্রসাদ গ্রহণ ও দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করানো হইল। বৈকালের দিকে অন্তরঙ্গ ভক্তজন পরিবৃত হইয়া হরনাথ সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিলেন। সেই সময় যতীন্দ্রনাথ মিত্র হরনাথ-কুসুমকুমারীর প্রতিকৃতি-সমন্বিত একটি লকেট কুড়াইয়া পান এবং হরনাথের আদেশে উহা স্বীয় অঙ্গে ধারণ করেন।

রাত্রিতে নিখিল ভারত হরনাথ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। হরনাথ এই সভায় উপস্থিত থাকেন এবং যতীন্দ্রনাথ মিত্রের উপর সভার পরিচালন ভার অর্পিত হয়। তিনি প্রথমেই হরনাথের 'বিশ্ব-সন্দেশে'র বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দেন। উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া মহিলাবৃন্দের অনেকেই অশ্রুপাত করেন। তারপর হরনাথের পত্রাবলীর ইংরাজী তর্জমার অধিকার লইয়া বোম্বাইয়ের জগমোহন দাস, কল্যাণ দাস এবং কলিকাতার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। যতীন্দ্রনাথ মিত্রের মধ্যস্থতায় বিষয়টির একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হয়। সভার কার্য শেষ হইবার পূর্বে মিনার্ভা থিয়েটারের সেই অভিনেত্রীটি কয়েকটি কীর্তন গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

১। গীতগোবিন্দম্—দামোদরপ্রসাদ শাস্ত্রী—মহারাজা অব গাইকোয়াড় কর্তৃক প্রকাশিত এবং হরনাথকে উৎসর্গীকৃত—উৎসর্গপত্রে হরনাথ সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদে হরনাথকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পুস্তক-খানি গুর্জর ভাষায় রচিত।

পরদিন ৩রা জুলাই হরনাথের পাণ্ডা ভোজন করাইবার ইচ্ছা হইল। ইহা জানিয়া প্রাতে নরসিংহ নামক এক পাণ্ডা আসিয়া হরনাথের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করেন। মাত্র দুই হাজার টাকার মধ্যে পাণ্ডাভোজন করানো হইবে জানিয়া, তিনি নিরুৎসাহবোধ করিলেন এবং জানাইলেন, কোন একজন রাজা ও আর একজন জমিদার সেইদিন পাণ্ডাভোজন বাবদ যথাক্রমে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। হরনাথকে এই সংবাদ দিয়া দুই হাজার টাকার মধ্যে পাণ্ডাভোজন অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। বারে বারে এই কথা বলায় হরনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'বাবা, আমি গরীব বলে আমাকে এরূপ অপমান করছেন। যাঁর পায়ে মুনি ও ঋষিরাও মাথা নোয়ায় তাঁর প্রতি আপনার এতটুকু দয়া হল না? আমাকে কি আপনি পুরুষোত্তম ত্যাগ করাতে চান?'

তারপর একবার মন্দিরের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "জানেন এই আশ্রম কোথায় প্রতিষ্ঠিত, এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সমুদ্র স্নান করতেন। সমুদ্র এই ক'বছরে কতটা সরে গিয়েছে তার খবর রাখেন? ঐ যে আশ্রমের কুয়ো দেখছেন এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভোগবতী গঙ্গা আপনিই এসেছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে হরনাথ সহসা পাণ্ডাঠাকুরের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "জানেন আমি কে? আমি শনি। যে শনি আপনাকে পথের ভিখারী থেকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছে সেই শনিই আবার আপনাকে পথের ভিখারী করবে।"

হরনাথের এইরূপ ভাব-পরিবর্তনে এবং এইরূপ কথা শুনিয়া পাণ্ডাঠাকুর ভয়ে কাঁপিতেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হরনাথের নিকট নতি স্বীকার করিয়া কার্যটি সুসম্পন্ন করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। যথাসময়ে হরনাথের দুই হাজার টাকায় পাণ্ডাভোজন হইল। কিন্তু রাজার দশ হাজার টাকার বা জমিদারের পাঁচ হাজার টাকার পাণ্ডাভোজন সেদিন হইল না। বিশেষ কারণবশতঃ তাঁহাদের পাণ্ডাভোজন সেদিনের মতো স্থগিত রাখিবার জন্য তাঁহারা

নির্দেশ দান করেন। হরনাথ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকল পাণ্ডাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে এবং মোট ব্যয় দুই হাজার টাকার বেশী পড়িল না।[১]

এইদিন হরনাথ ভক্তগণের সহিত একত্রে সমুদ্রস্নান করিলেন এবং সেই অভিনেত্রী কীর্তনীয়া বৈকালে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাবেলা হইতে প্রবল বারিবর্ষণ হওয়ায়, হরনাথ স্বয়ং ভক্তবৃন্দের একটি কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং অমৃতময়ী কৃষ্ণলীলা-কথা কহিতে লাগিলেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে পুনরায় ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া হরনাথ সমুদ্রস্নান করিলেন। এইদিন প্রসাদ-গ্রহণের পর রামগোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ৫ই জুলাই তারিখে আরও কয়েকজন ভক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বোম্বাইয়ের ভক্তগণসহ হরনাথ আরও দুইদিন পুরীধামে অবস্থান করিয়া ৭ই জুলাই তারিখে পুরীধাম হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়া ৯ই জুলাই প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

ইতিপূর্বে হরনাথের কলিকাতা যাত্রার সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। হাওড়া স্টেশনে যতীন্দ্রনাথ মিত্র, হরনাথ এবং বোম্বাইবাসী ভক্ত-বৃন্দকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই মানিকতলায় শরৎবাবুর বাটীতে আসিয়া উঠিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার সময় হরনাথ বোম্বাই-বাসী ভক্তগণের সহিত স্টার থিয়েটারে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলেন। তাঁহাদের সহিত বাঁশবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ও থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে রাত্রি অধিক হওয়ায়, হরনাথ রায় মহাশয়কে তাঁহার কালীঘাটের বাসায় ফিরিতে নিষেধ করিলেন এবং শরৎবাবুর বাটীতেই রাত্রিযাপন করিতে আদেশ করিলেন। পরম ভক্ত রায় মহাশয়ও হরনাথের আদেশ শিরোধার্য করিয়া নীচের বৈঠকখানা-ঘরে একটি শোফায় শয়ন করিলে, হরনাথ উপরতলায় শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু রাত্রিশেষে একটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশি হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়া রায় মহাশয়কে জানাইলেন যে,

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৬৫

শরৎবাবুর স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেই শিশি হইতে মাত্র একফোঁটা ঔষধ জলপূর্ণ একটি ঔষধের গ্লাসে দিতে বলিলেন। রায় মহাশয় গ্লাসে ঠিক এক ফোঁটা ঔষধ দিলেন। অমনি হরনাথ বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক হয়েছে বাবা। তুমি যেমনটি পারবে তেমন আর কেউ পারবে না, তা আমি জানতাম এবং সেইজন্যই তোমায় বিরক্ত করলাম।' রায় মহাশয় বিস্মিত হইলেন। কারণ, শৈশবে তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিতেন, ইহা আর কেহ জানিত না।* যাহা হউক, ঔষধে আশ্চর্য ফল হইল এবং শরৎবাবুর স্ত্রী শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠেন।

১০ই জুলাই তারিখে যতীন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার হাওড়ার বাড়ীতে এক মহতী সভার আয়োজন করেন। সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া তিনি হরনাথকে আনিবার জন্য গাড়ি লইয়া মানিকতলায় আসেন এবং অনতিকাল মধ্যেই হরনাথও বোম্বাইয়ের ভক্তগণকে লইয়া হাওড়া পৌঁছেন। পরে তাঁহার গাড়ি আশ্চর্যভাবে দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পায়।†

এইদিনের সভায় হাওড়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় আশুতোষ বসু বাহাদুর সভাপতিত্ব করেন। সভার কথা দুই-তিন দিন পূর্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল বলিয়া, হাওড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। যতীন্দ্রবাবুর বিশাল বাটীতে সেদিন তিলধারণের স্থান ছিল না।

এই সভায় যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ছোটালাল, জগমোহনদাস দ্বারকাদাস, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের হরনাথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিবরণ দান করেন এবং হরনাথও প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া নানাবিষয়ক উপদেশ দান করেন। সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং হৃদয়গ্রাহী বাচনভঙ্গীসহযোগে হরনাথ যখন সুমধুর কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন, তখন সভাস্থ সকলে

---

* এই ঘটনাটিকে হরনাথের সর্বজ্ঞতার প্রমাণরূপে অনেকেই উপস্থাপিত করেন।

† শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৭৩

আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। সভাশেষে যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে হাওড়া, কলিকাতা ও বোম্বের প্রায় দেড়শতজন ভক্ত মহানন্দে নৈশভোজন করেন। তারপর রাত্রি বারোটার সময় হরনাথ এবং তাঁহার ভক্তগণ কলিকাতার মানিকতলায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১১ই জুলাই বোম্বাইয়ের ভক্তবৃন্দ কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের ট্রেনে উঠাইয়া দিবার জন্য হরনাথও হাওড়া স্টেশনে আগমন করেন। হরনাথও ১৩ই জুলাই তারিখে সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতা হইতে সোনামুখী যাত্রা করিলেন।

হরনাথের পার্থিব দেহ ক্রমশঃই জরাগ্রস্ত হইতেছিল। সেইজন্য তিনি আর পূর্বের মতো একাকী ভ্রমণ করিতে পারিতেন না। 'আমি পথে একজন সঙ্গী না নিয়ে এ বয়সে কোথাও যাই না'—যতীন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রীর নিকট হরনাথের এই উক্তি পার্থিব দেহের উপর তাঁহার আস্থাহীনতারই পরিচয় দান করে। কিন্তু এই ভবের হাটে যাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, যাইবার সময় তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া যাইবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। জীবনে চলার বৃহত্তর পথে, তাঁহার যে সমস্ত ক্রীড়াসঙ্গিগণ পথের বাঁকে হারাইয়া গিয়াছেন, সারাজীবন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া হরনাথ তাঁহাদের অনেককেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাকী সঙ্গীদের খুঁজিয়া বেড়াইবার জন্যই তাঁহার হাওড়া-লীলা। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 'হাট ভাঙবার সময় হয়ে এলো।' সেইজন্যই 'যাবার বেলা সকলকে একবার না দেখে যেতে' পারিতেছেন না। "মূল পালা গাওয়া শেষ হয়েছে, রাত্রিও আর বেশী নাই—অন্য জায়গা থেকে ডাক আসছে"—তাই এখানকার বাকী অংশের ভার কাহার উপর দিয়া যাইবেন, সে-কথাই তিনি চিন্তা করিতেছেন। তাই তিনি সব নিজ জনদের খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছেন। সেইজন্যই বার্ধক্য হেতু পার্থিব দেহ বিকল হইলেও, তাঁহার যাতায়াতের বিরাম নাই এবং একমাত্র এই কারণেই উৎসব, অনুষ্ঠান বা সভা আহ্বান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গমন করিতেন।

এই যাতায়াতের ফলে অবশ্য কতিপয় নিজ জনের সাক্ষাৎ তিনি

লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের মধ্যাহ্নবেলায় পাওয়া দুই-একজন ভক্তের অন্যায় ও অদ্ভুত ব্যবহারে তিনি যৎপরোনাস্তি মনে অশান্তি পাইয়াছিলেন। খেলা ভাঙ্গার সময় প্রধান একজন ক্রীড়াসঙ্গীর এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহার তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত ও বিষণ্ণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি জানিতেন, "জগতের কোন কিছুই বৃথায় যাইবার নয়। সকলের মূলেই সেই পরম করুণাময়ের মঙ্গল হস্ত বিরাজিত।" তাই ভাগবত মিত্র মহাশয় যেদিন তাঁহার নিকট হইতে কর্জ লওয়া পাঁচশত টাকার জন্য তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিলেন এবং টাকা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয়ও গ্রহণ করিবার ভীতি দেখাইলেন এবং পরিশেষে আদালতের আশ্রয়ও গ্রহণ করিলেন,[১] তখন হরনাথ প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেও মুখে কিছু প্রকাশ করিলেন না। বরং ভাগবত মিত্রের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ভক্ত-মণ্ডলীকে যতদূর সম্ভব শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি জানাইলেন, "স্নেহের ভাগবত সত্যই নিতান্ত অবুঝের মত এ কার্য ক'রছে, কেবল তোমাদের উপর রাগ করে। এই চিন্তা সত্যই আমাকে কাতর করছে। মনে করছি, এটা ভুলে যাই, কিন্তু কেবল সব সময়েই চিন্তাটা আসছে, যা ভাল মনে কর, তাই করিও। ছিঃ! ছিঃ! ভাগবত যে এরকম অনর্থ ঘটাবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাক, যার যা ইচ্ছা কর। প্রভুর ইচ্ছা হয়েছে একবার কোর্টের through-তে আমি, আমার তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা, আমার নামে পাঠশালা ইত্যাদি লোকের নিকট জাহির হবে। তাই হ'ক। প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? তাঁর সকল কার্যই মঙ্গলময়।"[২]

এইভাবে হরনাথ অপরাপর ভক্তগণকে সান্ত্বনা দান করিলেও, ভাগবতের ব্যবহারে যে নিতান্তই মর্মাহত হইয়াছিলেন, উক্ত পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইজন্য এইবারের জন্মোৎসবে যোগদান করিতে যাওয়ার সময়ও তাঁহাকে অতিশয় বিরক্ত ও বিষণ্ণ

১। অমিয় হরনাথ লীলাকথা : পৃঃ ২৩০
২। হরনাথ-স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী : পৃঃ ১০৫

দেখাইতেছিল।[১] জন্মোৎসবের পরেও ভাগবতের দুর্ব্যবহারের কথা তাঁহাকে অহরহ পীড়া দিতেছিল বলিয়া তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেইজন্য পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুদিনের মত মাছডোবা গ্রামে বাস করিতে গেলেন। মাছডোবার শান্ত নির্জন পরিবেশে তাঁহার মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। কারণ, আদালতের আশ্রয়গ্রহণহেতু সাক্ষীর সপিনা সম্ভবতঃ মাছডোবা গ্রামেই বিলি হয় এবং অন্যান্য ভক্তদের পত্রেও এই মোকদ্দমার ধারাবাহিক বিবরণ তাঁহার গোচরীভূত হইতে থাকে। ফলে, আবার তাঁহার মনে অশান্তি সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সময়ের তাঁহার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নেপালচন্দ্র ঘোষকে লিখিত পত্রে।* ভাগবতের মন এমন হইবে, তা স্বপ্নেও জানি না। "ভাগবত সত্যই পাগলের মতো কার্য করিতেছে। জানি না, সে আরও কত কি করিবে। এমন লোক যে এমন হতে পারে তা ভাবি নাই। ভাগবতে সকলই সম্ভব মনে হইতেছে। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই হবে। জানি না, তিনি আবার একি এক নূতন খেলা খেলিতে আরম্ভ করেছেন। বড় দুঃখ হইতেছে। আমি বড় লজ্জিত হইতেছি। তাই, আমার শরীরের জন্য আমি মাছডোবায় এসেছি। এ নির্জনেও ভাগবত আমায় শান্তিতে থাকিতে দিতেছে না। ভাগবত যে এভাবে আমায় কষ্ট দিতে পারে, পূর্বে কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারি নাই।"

ভাগবতের এইরূপ ব্যবহারে অন্যান্য ভক্তগণের মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহাতে হরনাথের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগেরই পরিচয় পরিস্ফুট হয়। মোকদ্দমায় অবশ্য ভাগবত জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেওয়া কর্জের টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে হরনাথের বা তাঁহার তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার কোন অমর্যাদা তো হয়ই নাই বরং এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী হরনাথের সাক্ষ্যে সকলেই যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিল। যাঁহার তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৫৯
* হরনাথ-স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী : পৃঃ ১০৫-১০৬

বিরুদ্ধে মামলা তিনিই সাক্ষ্য দিলেন এবং সেই সাক্ষ্যের বলে ভাগবত মিত্র জয়লাভ করিলেন। মোকদ্দমায় পরাজিত হইলেও, সত্যের জয় বিঘোষিত হইল এবং হরনাথ ও তাঁহার তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার মহিমা জনসমাজে নবরূপে প্রচারিত হইল।

ভাগবতের মোকদ্দমা শেষ হইবার দুই-চারিদিন পরেই দেওয়াস গমনের আমন্ত্রণ লইয়া তত্রস্থ মহারাজার সেক্রেটারী সোনামুখীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মাষ্টমীর পূর্বে দেওয়াস রাজ্যে পদধূলি দান করিবার জন্য মহারাজা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। সুতরাং ভক্তবৎসল হরনাথ দেওয়াস গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া নাগপুর মেলে বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মিত্রকে টেলিগ্রাম করিলেন। টেলিগ্রাম পাইয়া যতীন্দ্রবাবু তদীয় বন্ধু গোবিন্দ চোংদার নামক রেল-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় ৮ই আগস্ট তারিখে তিনটি বার্থ রিজার্ভ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণদাস ও দেওয়াসের মহারাজার সেক্রেটারীকে লইয়া হরনাথ হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন এবং শরৎবাবুর বাড়ীতে আহার ও বিশ্রামান্তে বেলা তিনটার সময় নাগপুর মেল ধরিলেন। হাওড়া হইতে প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায় হরনাথের সঙ্গ লইলেন। ভুসাতাল স্টেশনে জগমোহন-দাস, দ্বারকাদাস ও ভগবানদাস প্রভৃতি বোম্বাইবাসী ভক্তগণ হরনাথের সহিত যোগদান করিলেন।

তাঁহারা যথাসময়ে দেওয়াস পৌঁছিলেন। স্বয়ং মহারাজা হরনাথকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং ভক্তগণকেও রাজ-প্রাসাদে স্থান দেওয়া হইল। অন্যান্য রাজ্যের রাজা, মহারাজারাও জন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। হরনাথ ইতিপূর্বে আর একবার দেওয়াস গমন করিয়াছিলেন। তখন হইতেই দেওয়াসের মহারাজা ধর্মকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই অন্যান্য রাজ্যের অধীশ্বর-গণের মন ধর্মমুখীন হইয়াছিল।

জন্মাষ্টমী উৎসবে মহারাজা কেল্লায় বাস করিতেন। উৎসবান্তে শোভাযাত্রা যখন জেলখানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তখন হরনাথের

সম্মানার্থে দুইজন কয়েদীকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য প্রফুল্লবাবু মহারাজাকে অনুরোধ করেন। হরনাথের সম্মানার্থে দুইজন কয়েদীকে ইতিপূর্বেই মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—এই সংবাদ প্রফুল্লবাবু জানিতেন না। তথাপি তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল এবং আরও দুইজন কয়েদীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। উৎসবের পর মহারাজা রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রত্যহ হরনাথ ও অপরাপর ভক্তদের সহিত তিনি আহার করিতেন। প্রথম প্রথম মহারাজা কিছু না বলায়, হরনাথ তাঁহাকে প্রসাদ দিতেন না। ইহাতে মহারাজা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং পরদিন দীনভাবে হরনাথকে বলেন, 'হামকো প্রসাদ নেহি মিলে গা?' সঙ্গে সঙ্গেই হরনাথ তাঁহাকে পরমান্ন প্রসাদ দিলেন এবং মহারাজাও কৃতার্থ হইয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।[১]

জন্মাষ্টমী উৎসবের পর হরনাথ আরও দুই-একদিন দেওয়াসে অবস্থান করিলেন। তারপর মহারাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হরনাথ বোম্বাই গমন করিলেন। প্রফুল্লবাবু দেওয়াস হইতেই হাওড়া রওনা হইলেন। বোম্বাই নগরীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া হরনাথ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালে একদিন তিনি যতীন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট বৈষ্ণবী শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বিবৃত করেন।

"যখন আমি অযোধ্যায় শিক্ষকতা করতাম, তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানকার প্রসিদ্ধ তালপুকুরের পাড়ে একটি তালগাছের তলায় এসে বসে থাকতাম আর নানা বিষয় চিন্তা করতাম। তখন আমি যে বাবা কত পাগলামি করতাম, তার ইয়ত্তা ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্রকে বলতাম, তোমার কি শক্তি আছে? আমার বৈষ্ণবী শক্তিকে পরাস্ত করে এমন শক্তি তোমার নেই। তারপর একদিন কি হল জান? সেইদিনও ঠিক এই রকম চিন্তা করছি, হঠাৎ ভীষণ মেঘ করে এল এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। একটা ভয়ঙ্কর বজ্রপাত

১। হরনাথ স্মৃতি : দ্বাদশ লহরী : পৃঃ ৮২-৮৩

হল। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা পুড়ে গেল। কিন্তু তখনও আমি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছি—ইন্দ্র! তুমি আমার কি করতে পারলে? এই ত বজ্র নিক্ষেপ করলে, কিন্তু আমার কিছু ক্ষতি করতে পারলে কি? এদিকে বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে আমায় খুঁজতে লাগল। আমি যে রোজই এখানে বসে চিন্তা করতাম তারা সে-কথা জানত। তারা এসে সে অবস্থায় আমাকে দেখে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেল। আমার কিছু হয়নি দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তাই বলছিলাম বাবা, বৈষ্ণবী শক্তির আশ্রয় পেলে কারুর কোন আশঙ্কা থাকে না—সব বিপদই কৃষ্ণ কাটিয়ে দেন। অন্য কোন শক্তিও তার একটু ক্ষতি করতে পারে না।"[১]

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জোড়াসাঁকো-নিবাসী ভক্ত ফণীকণ্ঠের গৃহে 'জোড়াসাঁকো হরনাথ হরিসভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। ফুল-তুলসী দিয়া হরনাথের আরতি হইবার পর ভক্তবৃন্দ সেই ফুল-তুলসী সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই উৎসবে যতীন্দ্রনাথ মিত্র এবং তদীয় সহধর্মিণী শেফালী-রানীও যোগদান করেন। এইদিন ছিল ২১শে ভাদ্র। যতীন্দ্রনাথ মিত্র তদীয় জন্মদিবস উপলক্ষে হরনাথের আশীর্বাদপ্রার্থী হইয়া সস্ত্রীক মানিকতলায় গমন করেন এবং সেখান হইতে অন্যান্য ভক্তগণসহ ভক্ত ফণীকণ্ঠের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। ৭ই সেপ্টেম্বর হরনাথ সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতা হইতে সোনামুখী যাত্রা করেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসেন।

ইহার পর হরনাথ কিছুদিনের জন্য আর কোথাও বাহির হন নাই। সেজন্য ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সোনামুখীতেই আগমন করিতেন। এই সময়ে 'পাগল হরনাথ' এবং 'উপদেশামৃত' তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করিবার চেষ্টা হয় এবং এই বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট মাদ্রাজী ভক্ত সচেষ্ট হইয়া উঠেন। হরনাথের নিকট এইজন্য অনুমতি চাহিলে, তিনি সানন্দে তাঁহাদিগকে অনুমতি এবং আন্তরিকতার সহিত উৎসাহ দান করিলেন।

১। হরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ৮২-৮৩

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে শারদীয়া পূজা হয়। পূজার পরে মেনকুরানীর দ্বিরাগমন হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। পতিগৃহে যাত্রাকালে মেনকুরানীর অশ্রুসজল মুখখানি দেখিয়া হরনাথ বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

ইতিমধ্যে শুভ বিজয়ার প্রণাম জানাইবার জন্য দুই-একজন ভক্ত সোনামুখীতে আসিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট (পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) প্রমোদকুমার ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। পুরী হইতে যতীন্দ্রনাথ মিত্র হরনাথকে বিজয়ার প্রণাম জানান। এই বৎসর পূজাবকাশে সস্ত্রীক পুরী ভ্রমণকালে তিনি হরনাথ অনাথ আশ্রমে অবস্থান করেন এবং Mrs. Rabinson নাম্নী হরনাথের এক মহিলা ভক্তের সহিত পরিচিত হন।

৩০শে অক্টোবর হরনাথ কলিকাতায় আসেন এবং ১লা নভেম্বর কলিকাতার ভক্তবৃন্দকে লইয়া শান্তিপুর যাত্রা করেন। তৎপরদিন অর্থাৎ ২রা নভেম্বর, রবিবার শান্তিপুরে উৎসব হয়। রবিবার দিন প্রাতে হাওড়া হইতে যতীন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার বাল্যবন্ধু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে লইয়া শান্তিপুর যাত্রা করেন।

মহাসমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল এবং যথারীতি স্নানলীলা ও প্রসাদগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হইলে, ভক্তগণের মধ্যে কয়েকজন শান্তিপুর-নিবাসী হরনাথ-ভক্ত আশুতোষ বাগচীর সহিত শান্তিপুর দর্শনে বহির্গত হইলেন। অক্ষয়কুমার গুপ্তও এই নগর দর্শনে যোগদান করেন। এইদিন বৈকালে যতীন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার বন্ধুদ্বয় ও আর একজন ভক্তের সহিত শান্তিপুর হইতে চলিয়া আসেন।

এইদিন সন্ধ্যাবেলা শান্তিপুরে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে কয়েকজন অর্বাচীন লোক আসিয়া সমালোচনার উদ্দেশ্যে হরনাথকে কতকগুলি অবান্তর প্রশ্ন করায় সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

যাহা হউক, শান্তিপুরে আর একদিন অবস্থান করিয়া ৪ঠা নভেম্বর

(বাংলা ১৭ই কার্তিক মঙ্গলবার) তারিখে হরনাথ শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তৎপরদিন বৈকালে প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্তসহ হরনাথ হাওড়ার যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে আগমন করেন এবং সেখানে চা পান ও জলযোগ করেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্রের সহধর্মিণী শেফালীরানী সেদিন হরনাথের আরতি করেন। রাত্রিতে হরনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া তৎপরদিন সোনামুখী যাত্রা করেন।

এই বৎসর ২৮শে ডিসেম্বর সোনামুখীতে 'আনন্দ-মিলন' উৎসব হয়।[১] এই 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে প্রায় তিন হাজার নরনারীকে পরিতোষসহকারে ভোজন করানো হয়। এবৎসরের আনন্দ-মিলনে ভক্তপ্রবর শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের সহধর্মিণী মৃন্ময়ী দেবী যোগদান করায়, হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হন। অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবানদাস মোদীকে লিখিত পত্রে হরনাথের এই আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়াছে।[২]

১৯২৬

'আনন্দ-মিলন' উৎসবের পর হইতে হরনাথের শারীরিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে। এই সময়ে তিনি সর্দি, কাশি এবং অর্শের আক্রমণে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া রোগভোগ করিবার পর কিয়ৎপরিমাণে সুস্থতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভক্তদের আহ্বানে তাঁহাকে সাড়া দিতে হইল।

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুঙ্গেরের রাজা রঘুনন্দন সিংহের একজন কর্মচারী তত্রস্থ হরনাথকে রাজবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন।[৩] এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামক হরনাথের একজন ভক্ত মুঙ্গেরের সাব-জজ ছিলেন। তিনি ১৯২৬-এর জন্মোৎসব মুঙ্গেরেই অনুষ্ঠান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাজা

১। যতীন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আনন্দ-মিলনের তারিখ ১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু ১১ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর হয়। হরনাথের পত্রেও দেখা যায় 28th December, not 27th has been fixed as the day of utsav.

২। ভগবানদাস রণছোড়দাস মোদীকে লিখিত ইংরাজী পত্র (দ্রঃ Pagal Haranath : Part V Page 332

৩। আমার অভিজ্ঞতা, তৃতীয় খণ্ড : পৃঃ ১৪৬

রঘুনন্দন সিংহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ও মুঙ্গের নগরীতে জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিবার সুবিধা আছে কিনা, স্বচক্ষে দেখিবার মানসে হরনাথ শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও মুঙ্গের গমনের সঙ্কল্প লইয়া ১৫ই জানুয়ারি কলিকাতায় আসেন এবং তৎপরদিন প্রফুল্লবাবু[১] ও অক্ষয়কুমার গুপ্ত প্রভৃতিকে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করেন। এই বৎসর পি. রামদাসের স্ত্রীও মাদ্রাজের কোকনদ গ্রামে হরনাথের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব করায় হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হন।[২]

মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া আসিবার অল্পকাল পরেই বরোদার গাইকোয়াড়ের নিকট হইতে হরনাথ একটি নিমন্ত্রণ পান এবং কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথমদিকে আমেদাবাদ যাত্রা করেন। আমেদাবাদ হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারি বোম্বাই গমন করেন এবং তথা হইতে বরোদা রাজ্যের তৎকালীন প্রধান পুরোহিত দামোদর শাস্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে হরনাথ বরোদা যাত্রা করেন। তিনি রাজসভায় হরনাথের ধর্মীয় উপদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। এই সভায় হরনাথ কৃষ্ণকথা বলিতে আরম্ভ করেন।

কিছুক্ষণ পরে বরোদার গাইকোয়াড় অন্য এন্‌গেজমেন্টের জন্য অবশিষ্ট lecture অন্যদিনে দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে হরনাথ দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন :—

"Lecture! I am not a lecturer. You can employ paid men who will give you lectures according to your choice and convenience; but I do not speak where there is absence of 'Bhaba' or 'Bhakti'. When I speak, I speak from a higher plane according to the dictate of the Supreme Spirit within me. These are not my own words which I am speaking here now. If this flow of 'Bhaba' is checked today, it may not come tomorrow. As you have an engagement, I shall stop here, but I am sorry to say that I shall not be

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ৫৩
২। Pagal Haranath : Part V : Page 334.

able to oblige you by continuing my talk another day".[১]

গাইকোয়াড় ইহা শুনিয়া বিশেষ লজ্জিত হন এবং তাঁহার ভাষণ শেষ করার জন্য হরনাথকে অনুরোধ করেন। কিন্তু হরনাথ আর কোন কথা বলিলেন না এবং সেইদিনই বরোদা ত্যাগ করেন।

বরোদা হইতে হরনাথ কলিকাতা আসেন ২৩শে মার্চ তারিখে।[২] তৎপরদিন প্রসিদ্ধ ভাস্কর জি. পাল মানিকতলায় হরনাথের একটি মৃন্ময়মূর্তি নির্মাণ করেন। মূর্তির মুখ একটু গম্ভীর ধরণের হইয়াছিল। একজন ভক্ত ইহা প্রকাশ করিলে, পাল মহাশয় মূর্তিটির মাথায় সজোরে একটি ঘা দেওয়ামাত্রই মুখটি একটু উঁচু হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির মুখটিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। হরনাথ হাসিতে হাসিতে মন্তব্য করিলেন, 'বাবা এক চড়ে হাসিয়ে দিলে।' এইদিন সন্ধ্যাবেলায় হরনাথ চুনাপুকুরে দ্বিজেন্দ্র দত্তের বাড়ীতে হরিসভায় যোগদান করেন। পরদিনও সুমধুর উপদেশ দান করিয়া ভক্তবৃন্দের মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার করেন। তৎপরদিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি কলিকাতা হইতে সোনামুখী যাত্রা করেন।

হরনাথ এককালে বেশীদিন সোনামুখীতে থাকিতে পারিতেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোনামুখীতে তাঁহার অবস্থিতি আরও কম হইতে লাগিল। নূতন ও পুরাতন ভক্ত, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত এই সময়ে তিনি খুব ঘন ঘন সাক্ষাৎ করিতেন। অল্পকালের ব্যবধানে হরনাথকে স্বগৃহে আসিতে দেখিয়া হরনাথ-ভক্ত সকলেই আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

বৈশাখ মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই হরনাথ পুনরায় সোনামুখী হইতে বাহির হইলেন এবং ৮ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) কলিকাতায় তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের মানিকতলার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভক্তগণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কিরণ, আশুতোষ, ভোজনানন্দ,

---

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ৯৬-৯৭

২। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ৯৮

ব্রজেন্দ্র, গৌরী, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যায় তিনি হাওড়ায় যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। এইদিন এই স্থানে তাঁহার বাল্যবন্ধু বেণীমাধব রায় তাঁহার কন্যাকে (প্রমোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে) সঙ্গে লইয়া হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে আহারাদি করিয়া হরনাথ প্রফুল্লবাবুর বাটীতে রাত্রি যাপন করের। এইদিন তিনি সাংসারিক অশান্তিজনিত কারণে সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু একজন ভদ্রলোককে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনায় অস্থির হইয়া মানুষের মনে সময়ে সময়ে ঘর ছাড়িয়া বৈরাগী হইবার চিন্তা উদিত হয়। কিন্তু তাহা যে আসল বৈরাগ্য নয়, মর্কট বৈরাগ্য এবং এই বৈরাগ্যের মোহে সংসার ছাড়িলে কোন আনন্দই পাওয়া যায় না—ইহা তিনি উক্ত ভদ্রলোককে বুঝাইয়া বলেন, 'সংসার বঙ্গসমুদ্রের মত সব সময়েই তরঙ্গপূর্ণ। অতএব ঢেউ সরে গেলে স্নান করব মনে করলে স্নান হবে না। তাই বলি, ঢেউও চলুক, স্নানও কর। কাল করব বলে বসে থেকো না।'

পরদিন ১০ই বৈশাখ সকাল আট ঘটিকায় হাওড়া হইতে মার্টিন কোম্পানির ট্রেনে হরনাথ ঝিখিরা যাত্রা করিলেন। শরৎচন্দ্র দে, কিরণেন্দু ঘোষ, আশুতোষ বাগচী, যতীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ভক্তগণ হরনাথের সমভিব্যাহারে গমন করেন। ট্রেন আমতা স্টেশনে পৌঁছিলে হরনাথ ভক্তগণসহ ট্রেন হইতে নামিলেন এবং এখান হইতে মোটরে করিয়া ঝিখিরা পৌঁছিলেন। ঝিখিরার জমিদার কিশোরীমোহন রায়ের বাটীতে ভক্তগণসহ হরনাথ স্নানাহার করিলেন এবং সন্ধ্যাবেলায় বারোয়ারী তলায় গিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন।

পরদিন উৎসব ও দরিদ্রনারায়ণের ভোজন চলিল এবং সন্ধ্যা-বেলায় জমিদার কিশোরীমোহনের বাটীতে স্থানীয় লোকদের লইয়া একটি সভা হইল। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে পণ্ডিতম্মন্য একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। হরনাথকে পরীক্ষা করিবার মানসে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি মামুলি প্রশ্ন করিলে, হরনাথ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন। অপরাপর

গ্রামবাসিগণ হরনাথের সহজ সরল উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। পরদিন প্রাতঃকালে শরৎচন্দ্র দেপ্রমুখ ভক্তগণ সহিত হরনাথ ঝিখিরা হইতে হাওড়া আসেন এবং যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে পদধূলি দান করেন। সেখানে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আরও একদিন অবস্থান করিয়া হরনাথ ১৪ই বৈশাখ সোনামুখী অভিমুখে যাত্রা করেন।

সোনামুখীতে ফিরিয়াই হরনাথ সংবাদ পাইলেন বীরভূম জেলার খ্যাতিপুরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা প্রখ্যাত ভক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া হরনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায়, হরনাথ খ্যাতিপুর গমন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে বসন্তবাবু এরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি ঘোষণা করেন—'হরনাথ না আসিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন।'[১] সুতরাং বাধ্য হইয়া হরনাথ খ্যাতিপুর গমনে সম্মতি দান করিলেন। মে মাসের শেষের দিকে খ্যাতিপুরের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল।[২] হরনাথ খ্যাতিপুরে আসিলেন, স্টেশন হইতে তাঁহাকে পাল্কী করিয়া উৎসবক্ষেত্রে আনয়ন করা হইল। বহু ভক্ত সেই পাল্কী আপনাদের স্কন্ধে বহন করিতে লাগিলেন। মহানন্দে আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। হরনাথ আরও দুই-একদিন খ্যাতিপুরে অবস্থান করিয়া সোনামুখী ফিরিয়া আসিলেন।

এই বৎসর মুঙ্গেরে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা হয়। উদ্যোগকর্তা মুঙ্গেরের সাব-জজ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং ভাগলপুরের গভর্নমেন্ট অডিটার হরনাথ-জগতের 'উপানন্দ বাবা' প্রিয়কুমার

১। হরনাথ-স্মৃতি : তৃতীয় লহরী, পৃঃ ১-২

২। Pagal Haranath : Part V, Page 338

এই পত্রে জানা যায়, প্রায় একই সঙ্গে রাধানগরের বার্ষিক উৎসব হয়। রাধানগরের বার্ষিক উৎসব হইয়াছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের ৬ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে।২৪শে মে) ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিন সত্য ও মেনকু রাধানগর উৎসবে যাইবেন বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

চক্রবর্তী। মুঙ্গের আদালতের কয়েকজন বিশিষ্ট উকিল উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য আবশ্যকমতো অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে, নরেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে হরনাথের অনুমতি চাহেন। হরনাথ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন বটে, তবু কলিকাতার 'হরনাথ তত্ত্ব-প্রচারিণী সভা'র সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে নির্দেশ দান করিলেন। হরনাথের সম্মতি পাইয়া তত্ত্ব-প্রচারিণী সভার পরামর্শ চাহিলে, সভার পক্ষে অক্ষয়কুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায় এবং নারায়ণচন্দ্র ঘোষ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে এই বিষয়ে আবশ্যকীয় পরামর্শ দান করেন। স্থির হইল, হরনাথের অন্যতম ভক্ত নরেন্দ্রবাবুর মুঙ্গেরের তারিণীঘাটের বাসার সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে এ-বৎসরের উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সোনামুখী হইতে মহিলা-ভক্তদের আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া সোনামুখী যাত্রা করেন এবং সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন।[১]

ইতিমধ্যে মুঙ্গেরে উৎসবের বিরাট আয়োজন হইল। কিন্তু সারা জুন মাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ না হওয়ার জন্য চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। পুষ্করিণীসমূহ শুষ্কপ্রায় হইল; দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। উৎসব-কর্তাগণ প্রমাদ গণিলেন। একে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহার উপর নিদারুণ জলকষ্ট। এইরূপ অবস্থায় ভক্তগণসহ হরনাথের আগমন হইলে কিভাবে তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা হইবে, ইহা ভাবিয়া সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

৩০শে জুন সোনামুখী হইতে যাত্রা করিয়া হরনাথ টেলিগ্রাম করিলেন যে, তিনি ১লা জুলাই মধ্যাহ্নে মুঙ্গের পৌঁছিতেছেন। টেলিগ্রামটি আসিবার অল্পকাল পরেই মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল এবং ১লা জুলাই বেলা ১০টা পর্যন্ত সেই বৃষ্টিপাত অব্যাহত রহিল। ফলে নদী, নালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্তই ভরিয়া গেল এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত মুঙ্গের নগরী স্নিগ্ধশীতল হইয়া উঠিল।

হরনাথ মুঙ্গেরে পৌঁছিবার দুই ঘণ্টা পূর্বে আকাশ একেবারে

১। হরনাথ-স্মৃতি : তৃতীয় লহরী, পৃঃ ৪

পরিষ্কার হইয়া গেল। উৎসব কমিটির সদস্যগণ হরনাথকে স্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া আনিবার জন্য বিভিন্ন পতাকাধারী লোকজন ও দুই-তিন শ্রেণী বাদকদলসহ স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুঙ্গেরের রাজা রঘুনন্দন সিংহ স্টেশন হইতে হরনাথকে আনিবার জন্য তাঁহার মূল্যবান মোটর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোটরটি বিভিন্ন বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। সেই গাড়ীতে চড়িয়া হরনাথ উৎসবক্ষেত্রে আসেন।[১]

যথানিয়মে মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইল। এইবারের উৎসব হরনাথের খুব ভাল লাগিয়াছিল। উৎসব-স্থানে মনোরম দৃশ্য। এই উৎসবের বিরাট সমারোহ দর্শনে মুঙ্গেরবাসী সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র অতিথিকে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হইয়াছিল।[২]

মুঙ্গেরের জন্মোৎসবে কল্লং-এর গোপালের মা[৩] নাম্নী একজন বিদুষী প্রৌঢ়া হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং হরনাথের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া উঠেন। ব্রজের গোপাল সামান্য মনুষ্য বালকরূপে এই মহিলাটির সহিত খেলা করিতেন বলিয়া প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত ছিল। হরনাথকে দর্শন করিবার পর হইতেই উক্ত গোপালের মা সদাসর্বদা তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। উৎসব শেষ হইবার পরেও স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের অনুরোধে হরনাথকে প্রায় আরও এক সপ্তাহকাল মুঙ্গেরে অবস্থান করিতে হয়। এই সময়ে বিভিন্ন ভক্তের গৃহে হরনাথ নিমন্ত্রিত হইতেন। একদিন মুঙ্গেরের সরকারী উকিলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে হরনাথকে মৎস্যের ব্যঞ্জন দেওয়া হয়। হরনাথ নির্দ্বিধায় উহা গ্রহণ করিলে 'গোপালের মা'-এর মনে হরনাথ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরে অবশ্য তাঁহার সেই সন্দেহ নিরসন হয় এবং হরনাথের প্রতি ভক্তি পূর্বাপেক্ষা গভীরতর হয়। সন্দেহ নিরসনের কারণ হিসাবে

১। হরনাথ-স্মৃতি দশম লহরী : পৃঃ ৫৫—৫৭

২। Pagal Haranath : Part V, Page 339

৩। মুঙ্গের হইতে ২।৩ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম কল্লং। এইখানে শিবরাত্রির সময় একটি বড় মেলা হইত।

তিনি হরনাথ কর্তৃক মাছের আঁইশ ও মাটির সাহায্যে নির্মিত মৎস্যকে জীবনদান করিবার এক বিস্ময়কর কাহিনীর অবতারণা করেন।[1]

এইবারের জন্মোৎসবে 'বিশ্ববাণী' রচিত হয় নাই। কারণ, 'বিশ্ববাণী'র জন্য 'পাগল হরনাথ' হইতে যে সমস্ত অংশ নির্বাচন করা হইত, বোম্বাইয়ের জগমোহন দাসই তাহা এ-যাবৎ কাল করিয়া আসিতেছিলেন। এইবারের জন্মোৎসবকালে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায়, এই নির্বাচন-কার্য করিতে পারেন নাই বলিয়া, জন্মোৎসব উপলক্ষে হরনাথের 'বিশ্ববাণী' প্রচারিত হয় নাই।[2]

মুঙ্গের হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হরনাথের শরীরের অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে। কুসুমকুমারীর পায়েও অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। সেই কারণে হরনাথ অল্প কয়েকদিন পরেই কলিকাতা যাইতে মনস্থ করেন, কিন্তু কলিকাতায় সেই সময়ে সহসা ভীষণ গণ্ডগোল হইতে থাকায়, পূর্ব-নির্দিষ্ট ২রা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা যাইবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং মহরমের পরে কলিকাতা যাওয়া স্থির করেন।

২৪শে জুলাই কুসুমকুমারীসহ হরনাথ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং কুসুমকুমারীর রোগ আরোগ্যের জন্য ডাঃ বিজয় সিংহকে আহ্বান করেন। যত্নসহকারে রোগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া ডাঃ সিংহ কুসুমকুমারীকে ঔষধ দেন। ঔষধ সেবনের পর কুসুমকুমারীর পায়ের বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। ভক্তদের অনুরোধে হরনাথ আরও কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া, আগস্ট মাসের ৭ই তারিখে সোনামুখীতে আসেন এবং কয়েকদিন পরে সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একজন ভক্ত কর্তৃক লিখিত পত্রের উত্তরে হরনাথ জানান—'আজ হঠাৎ আমার শরীর বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। কেন এমন হোল বুঝিতে পারিলাম না।

১। ১৩৪১ সালে কুসুমকুমারীর অসুখের সময় গোপালের মা নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করেন। বিশদ বিবরণের জন্য হরনাথ-স্মৃতি দশম লহরী, পৃঃ ৫৭—৬০ দ্রষ্টব্য।

২। Pagal Haranath : Part V, Page 344

হঠাৎ প্রাতঃকালেই এমন একটা দাস্ত হয়ে গেছে, যাহা অপরে দেখিলে মূর্ছা যাইত। কোনরকম একটু পূর্বে জানা যায় নাই।'

এই পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্তকুণ্ডের দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ায় হরনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শরীর আরও কিছুদিন থাকিবে এই আশা করেন। "কিন্তু আমার শরীর আর কিছুদিন থাকবে বলেই পুকুরের দেওয়াল ভেঙে পড়ে। দরিদ্রের অর্থনাশ জীবননাশ অপেক্ষা বেশী। তাই বোধহয় দেওয়ালটি আমার এভাবে নষ্ট হয়ে গেল। টাকা ও অদম্য পরিশ্রম সকলই গেল। তার বদলে প্রাণ পেলাম।"[১]

হরনাথের অনুমান যথার্থ হইল। এইবারে তাঁহার দৈহিক অসুস্থতা আর বাড়িল না। বরং ধীরে ধীরে তাহার দেহ হইতে রোগ-লক্ষণসমূহ মুক্ত হইল এবং দশ-বারো দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। সেইজন্য বরিশালে আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্য তিনি ২৬শে আগস্ট (বাংলা ৯ই ভাদ্র) কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার দেহে তখন রোগ-লক্ষণের চিহ্নমাত্র ছিল না।

এই বৎসরও জন্মাষ্টমীর সময় দেওয়াসের মহারাজার নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসে, কিন্তু সারাজীবনের সঞ্চয় উৎসর্গ করিয়া অক্ষয়কুমার গুপ্ত বরিশালে হরনাথ মন্দির স্থাপনের সঙ্কল্পে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। তাহাতে যোগদান করিবার জন্য হরনাথ এবার দেওয়াস-গমনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন।

২৭শে আগস্ট কলিকাতায় অবস্থান করিয়া, ২৮শে আগস্ট কলিকাতা ও হাওড়ার কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তকে সঙ্গে লইয়া হরনাথ বরিশাল যাত্রা করিলেন। হরনাথের সহিত যাঁহারা বরিশাল গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মিত্র, দ্বিজেন বসু, দ্বিজেন দত্ত, ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়, নৃপেন্দ্র বসু প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ১১৮—পুষ্করিণীর জলের আঘাতে তীরের মাটি ধ্বসিয়া পড়া নিবারণার্থ অনন্তকুণ্ডের উত্তর তীরটি দেওয়াল গাঁথিয়া সংরক্ষিত করা হয়। ইহা ধ্বসিয়া পড়ে কিন্তু স্মৃতিমন্দির (শ্রীমন্দির) নির্মাণের সময় ইহা আবার ভালভাবে গাঁথা হয়।

উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ এবং অবনীও* এই বরিশাল যাত্রীদলে যোগদান করিয়াছিলেন। ২৮শে আগস্ট তারিখে বরিশাল এক্সপ্রেসে সকলেই রওনা হইলেন। বরিশাল যাত্রায় ভক্তসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাঁহারা প্রায় সমস্ত গাড়িতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বরিশাল এক্সপ্রেসের গার্ডও হরনাথের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এই যাত্রীদলকে খুলনা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। সন্ধ্যাবেলায় ট্রেনটি খুলনা পৌঁছে এবং যাত্রীদলটি স্টীমারে আরোহণ করেন। স্টীমার ছাড়িবার পর ডেকে ভক্তবৃন্দ হরনাথকে পরিবেষ্টন করিয়া বসেন। মহানন্দে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে। এই স্টীমার যাত্রা হরনাথের নিকট অতীব আনন্দদায়ক হয়।১

২৯শে আগস্ট সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদলটি বরিশালে পৌঁছিল। স্টীমার ঘাটে অসংখ্য নরনারী হরনাথকে দর্শন করিবার মানসে সমবেত হইয়াছিল। সেই বিপুল জনতার ব্যূহ ভেদ করিয়া 'ঠাকুর হরনাথ কি জয়' ধ্বনি করিতে করিতে অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ষ্টীমারে আসিয়া তিনি হরনাথকে পুষ্পমাল্য ভূষিত করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে মোটরে তুলিলেন। ভক্তদের জন্যও অনেক মোটরের ব্যবস্থা ছিল। সকলে গাড়িতে উঠিলে, এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া হরনাথকে লইয়া আসা হইল।

শহরে আসিয়া সকলে প্রবীণ মোক্তার ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠিলেন। তিনি পূর্বে সপরিবারে সোনামুখী গিয়া, তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দিবার জন্য হরনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে সরকারী উকিল রায় বাহাদুর গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সাব-জজ সারদাকুমার সেন, পোস্টঅফিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ব্রজেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি নামসংকীর্তন শুনিতেছিলেন। গণেশবাবু একজন উচুদরের দার্শনিক। তিনি মোটেই ভাবপ্রবণ নহেন। তিনিই আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করিলেন।

* যতীন্দ্রনাথ মিত্রের ভাগিনেয়।
১। Pagal Haranath : Part V, Page 343

গণেশবাবুর সহিত আলাপাদির পর হরনাথের তৈলমর্দন লীলা আরম্ভ হইল। "সে এক বিরাট ব্যাপার। যাঁহারা ঠাকুরের তৈল-মর্দন লীলা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, ঠাকুর একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা কাল কিরূপ অচল অটল ভাবে বসিয়া থাকিতেন, আর ৩।৪ জন বলিষ্ঠ ভক্ত তাঁহার অঙ্গের বিভিন্ন অংশ দলামলা করিত।

এই কার্য করিতে করিতে ভক্তের পর ভক্ত ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। আবার নূতন ভক্ত আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে—আর ঠাকুর মৃদু হাস্য করিতে করিতে তাহাদের সহিত নানাবিধ গল্প করিতেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! চক্ষে না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করা যায় না। রক্ত মাংসের শরীর যে এতক্ষণ এতলোকের দলামলা আনন্দের সহিত সহ্য করিতে পারে, তাহা ধারণাই করা যায় না। তাহার মধ্যে কেহ যদি সন্ত্রস্তভাবে তৈল মাখাইত, ঠাকুর অমনি বলিতেন, যা যা ও তোর কর্ম নয়। ঐরকম যাদুর মত গায়ে হাত বুলাইয়া যদি তেল মাখান হইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না।"[১] যতদূর জানা যায় তৈলমর্দন ব্যাপারে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন হরিদাস বসুমল্লিক, ভোজনানন্দ, আশুতোষ বাগচি এবং ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। কুমারখালির বাবুদেব মজুমদার, গোপালচন্দ্র ঘোষ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর ঠাকুরের ব্রহ্মতালুতেও মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখাইবার অধিকার ছিল।

তৈলমর্দন লীলার শেষে ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া, হরনাথ 'পরেশ সাগর' নামক একটি সুবৃহৎ দীঘিকায় স্নান করেন। কলিকাতার কয়েকজন ভক্ত বরিশালের সাব-জজ সারদাকুমার সেনের বাড়ীতে অবস্থান করেন। সন্ধ্যার সময় হরনাথ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে মোটরযোগে ভ্রমণ করিলেন। ভ্রমণান্তে ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাটীতে বহুক্ষণ ধরিয়া গান হইল। সেদিন বরিশালের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হরনাথকে দর্শন করিতে আসেন।

পরদিন ১৩ই ভাদ্র (ইংরাজী ৩০শে আগস্ট) জন্মাষ্টমী তিথিতে অক্ষয়কুমার গুপ্তের হরনাথ-কুসুমকুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাতঃকালেই

১। হরনাথ-স্মৃতি: নবম লহরী, পৃঃ ৭

ভক্তপরিবৃত হরনাথ আশ্রমে পদার্পণ করেন এবং অখণ্ড নামকীর্তন ও 'ঠাকুর হরনাথ কি জয়' ধ্বনির মধ্যে আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন ক্রিয়া সমাধা হয়। অতঃপর সকলকে চা ও মিষ্টান্ন সেবা করানো হয়। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হরনাথ-ভক্তদের সহিত তাঁহারাও উৎসবে যোগদান করেন। কিছুক্ষণ পরে হরনাথ তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপকালে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হরনাথের নিকট হইতে মন্ত্র লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদুত্তরে হরনাথ কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লইতে সকলকে উপদেশ দিলেন। এই আলাপ পরিচয়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে গান হইতে লাগিল। সরকারী উকিল গণেশবাবুর পুত্র শরৎচন্দ্র দাসশর্মা (তিনি নিজেও উকিল) হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকাভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার কাবুলি ভাষার কৌতুকপ্রদ অনুকরণটি সকলকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে হরনাথ-জগতে তিনি কাবুলী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

এইদিন তৈলমর্দন লীলার পর ভক্তগণসহ হরনাথ ডাঃ ক্ষীরোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের বৃহৎ পুষ্করিণীতে স্নান সমাপন করিলেন। স্নানের পর অক্ষয়কুমার হরনাথের পূজা করিলেন। পূজাশেষে সকলের একটি গ্রুপ ফটো লওয়া হইল। তৎপরে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া হরনাথ আহারে বসিলেন। এই সময় পরিবেশনকারী সারদা-বাবুর হস্তধৃত মিষ্টান্ন পাত্রটি হইতে একটি রসগোল্লা তুলিয়া লইয়া হরনাথ তাঁহার মুখে দিলেন এবং রসগোল্লার অর্ধেক কামড় দিয়া মুখে লইবামাত্র বাকী অর্ধেক হরনাথ নিজ মুখে ফেলিয়া দিলেন। সারদাবাবু ইহাতে অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আহারের পরে তিনি একজন ভক্তের হাত জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলে, ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা, আপনার মনে খট্‌কা ছিল আপনি কাকের মাংস ইত্যাদি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছেন, অতএব আপনার দ্বারা এই দেহে ভগবানের পূজা সম্ভবপর নয়। তাই, ঠাকুর তাঁর এই অভাবনীয় উপায়ে

আপনাকে বুঝিয়ে দিলেন আপনি নিষ্পাপ। আপনার মনের সংস্কার এইবার দূর করে ফেলুন। আপনার এই শিশুসুলভ অন্তঃকরণে যদি ভগবানের অধিষ্ঠান না হয়, তাহলে আর কোথায় হবে ? এ আমাদের জগন্নাথের মহাপ্রসাদ—এ ত উচ্ছিষ্ট হয় না। দাদা! আমরা কোন রকম ritual-এর ধার ধারি না। সরল ও প্রেমময় লোক পেলেই তাকে আমরা আপনার করে নিই। যারা অন্তঃসারশূন্য, দুষ্টস্বভাব অথচ বাহিরে ধর্মের ভাণ করে থাকে এরূপ কপট লোক ঠাকুরের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না।"[১] ভক্তপ্রবরের এই সান্ত্বনায় সারদাবাবু কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে ধীরে ধীরে তিনি হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পর ভক্তগণসহ হরনাথ স্থানীয় ডাক-বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীতে গমন করেন। বরিশালে আসিবার পূর্বে ব্রজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী স্বপ্নে হরনাথের দর্শন লাভ করেন। এখন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইল। এমন সময় গণেশবাবু আসিয়া টাউন হলে যাইবার জন্য হরনাথকে অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং জানাইলেন, সেখানে সমবেত সহস্রাধিক নরনারী হরনাথকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ হুজুগ পছন্দ না করিলেও, গণেশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া হরনাথ বরিশাল টাউন হলে গমন করিলেন।

টাউন হলে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেখানে তিল-ধারণের স্থানমাত্র নাই। সেই সময় ভাগবত পাঠ হইতেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাগবত-পাঠের ব্যাঘাত করিতে হরনাথের ইচ্ছা হইল না। তিনি বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মুকুন্দ দাস তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই স্থান হইতেই দর্শনেচ্ছু নরনারীকে দর্শন দিবার জন্য তিনি অনুরোধ জানাইলে, হরনাথ সম্মত হন এবং দর্শনেচ্ছু নরনারী সেইখানেই হরনাথকে দর্শন করেন।

পরদিন ভক্তগণসহ হরনাথ ডাক্তার ক্ষীরোদ বিশ্বাসের বাড়ীতে

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : পৃঃ ১২৭-২৮

মধ্যাহ্নভোজন করেন। সেইদিনের স্নানলীলা তাঁহার বাটীসংলগ্ন পুষ্করিণীতেই হইয়াছিল। স্নানের সময় সন্তরণরত হরনাথ একটি ভাসমান কলার ভেলায় উঠিলেন এবং ভক্তগণ তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই এমন একটি ভঙ্গীতে তিনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন যে, ভক্তগণ সকলেই চমৎকৃত হন। সেইদিন মধ্যাহ্নভোজনের অব্যবহিত পরেই হরনাথের আদেশে যতীন্দ্রনাথ মিত্র স্বগৃহে যাত্রা করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়, অবনী মিত্র মহাশয়ের পুত্রও তাঁহার অনুবর্তী হন। বৃদ্ধ সাব-জজ সারদাবাবু স্টীমার ঘাটে তাঁহাদের বিদায় দিতে আসিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বরিশাল হইতে ফিরিবার পথে হরনাথ খুলনায় আগমন করেন। এই স্থানেও বহু ভদ্রলোক তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠেন।[১]

২রা সেপ্টেম্বর (১৬ই ভাদ্র) হরনাথ সদলবলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার সহিত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন এবং কাবুলীও কলিকাতায় আসেন। মানিকতলা বাটীতে ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর বিশ্রাম গ্রহণ করিবার পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ মিত্রের আহ্বানে হরনাথকে হাওড়ায় আসিতে হয়। অক্ষয়কুমার গুপ্ত, আশুতোষ বাগচী, কিরণেন্দু প্রভৃতি অনেক ভক্ত তাঁহার সঙ্গে হাওড়ায় আসেন। যতীন্দ্রনাথের বাড়ীতে চা ও জলখাবারের আয়োজন হইয়াছিল। কীর্তনের পর প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে আহারাদি সমাপ্ত হয়। হরনাথ যতীন্দ্রনাথবাবুর বাড়ীর উপরতলায় সাধন মন্দিরে শয়ন করেন এবং ভক্তগণ বাহিরের ঘরে রাত্রি যাপন করে। পরদিন প্রাতে কাবুলী প্রভৃতি সহ হরনাথ সোনামুখী যাত্রা করেন।

১। এই স্থানে একজন ব্রাহ্মণ সভায় 'এস হরনাথ কাঙ্গালেরই নাথ' ইত্যাদি গান হইতে দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলে, হরনাথ বলেন, 'শিবের সভায় শিবের গান হয়, ইন্দ্রের সভায় ইন্দ্রের গান হয়, সুতরাং আমার সভায় ইহারা আমার গান করিবে, ইহাতে আশ্চর্য বা বিরক্ত হইবার কি আছে?' দ্রঃ হরনাথ-স্মৃতি : দ্বিতীয় লহরী, পৃঃ ১০

বরিশালে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে

বরিশাল গমনের ফলে কতকগুলি নূতন ভক্ত হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে গণেশচন্দ্র শর্মা, তৎপুত্র কাবুলী এবং সারদা-প্রসাদ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রায়বাহাদুর গণেশচন্দ্র শর্মা খুব গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া হরনাথের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বাহিরে তেমন প্রকাশ পাইল না। কিন্তু তাঁহার পুত্র শরৎচন্দ্র শর্মা, ওরফে কাবুলী, হরনাথের সাহচর্যে আসিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। হরনাথের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ এত অধিক হইয়াছিল যে, বরিশাল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন হরনাথ স্টীমারে উঠিলেন, তখনও কাবুলী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি হরনাথের সহিত কলিকাতা ও কলিকাতা হইতে সোনামুখীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কাবুলী সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, 'পূর্বে কোনদিন ধর্মের ধার ধারেন নাই, বরং স্বভাব-চরিত্র সেরূপ ভাল ছিল না বলিয়াই শুনিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর বরিশাল পৌঁছিবার সময় হইতে রওনা হইয়া যাওয়া পর্যন্ত তিনি সর্বদাই ঠাকুরের নিকট পড়িয়া থাকিতেন।'

এই কাবুলীবাবু সোনামুখীতে ঠাকুরের বাড়ী পৌঁছিলেন এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সোনামুখী ব্রজাভিন্ন ধাম বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হওয়াতেই তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে, 'সে যে ব্রজের রজ'।[১] ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবস্থা উন্মত্তের মতো হইল। তিনি আর সংসারে ফিরিবেন না বলিয়া, হরনাথের নিকট অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হরনাথ তাহা অনুমোদন করিলেন না।

নানাভাবে উপদেশ ও প্রবোধ দান করিয়া হরনাথ তাঁহাকে বরিশালে ফেরৎ পাঠাইলেন। সোনামুখী হইতে কাবুলী ১১ই সেপ্টেম্বর হাওড়ায় যতীন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে আসেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর বরিশাল যাত্রা করেন। 'সোনামুখী ধাম সাক্ষাৎ ব্রজধাম, তথাকার রজ সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের রজ, ঠাকুর-

১। আমার অভিজ্ঞতা : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২

ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ কৃষ্ণরাধা' ইত্যাদি কথায় তিনি সোনামুখী সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও কথাগুলি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি পরিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে।[১]

বরিশালের সাব-জজ সারদাবাবু হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন। বরিশাল উৎসবের অল্পদিন পরে ২রা সেপ্টেম্বর তিনি মেদিনীপুরে বদলী হইয়া আসেন এবং কয়েকদিন পরে ১১ই অক্টোবর দুর্গাপূজার ছুটিতে হরনাথের দর্শনাভিলাষী হইয়া সোনামুখী আসেন। সে-সময় বরিশালের পোস্টাল্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ব্রজেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়-কুমার গুপ্তও সোনামুখীতে আসেন। এই তিনজন ভক্তকে একত্রে পাইয়া হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে সারদাবাবু আগামী জন্মোৎসব মেদিনীপুরে করিবার প্রস্তাব করেন এবং উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছাও জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু হরনাথের সম্মতি পাইলেন না। সেজন্য তাঁহারা হরনাথকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, অবশেষে হরনাথ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। মেদিনীপুরে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে হরনাথের অসম্মতি উপস্থিত তিনজনের মনকেই ইহার কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত করিল। ইতিমধ্যে রাধানগরবাসী রামগোপাল ভট্টাচার্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অল্প কিছুদিন পূর্বে হরনাথ এক জীবনসংশয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায়, রামগোপালবাবু হরনাথের আরোগ্যের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি যজ্ঞ করেন।* এই যজ্ঞে গুরুর প্রাপ্য কয়েকটি পিতলের কলসী এবং আর কয়েকটি জিনিস হরনাথকে দিবার জন্য রামগোপালবাবু সোনামুখীতে আসেন। রামগোপালবাবু-প্রদত্ত কলসী হরনাথ অবশ্য গ্রহণ করেন নাই—উহা দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিলেন।[২]

১৮ই অক্টোবর হাওড়া হইতে যতীন্দ্রনাথ মিত্র সস্ত্রীক সোনামুখীতে

১। আমার অভিজ্ঞতা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫
* আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৫
২। আমার অভিজ্ঞতা : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৬-১১৭

আগমন করেন এবং কয়েকদিন যাবৎ হরনাথের সাহচর্য লাভ করিয়া ২২শে অক্টোবর সোনামুখী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই সমস্ত ভক্ত-সমাগমে হরনাথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অসুস্থতা-জনিত দুর্বলতা বিস্মৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছত্রপুরের মহারাজার নিকট হরনাথের কথা বলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া হরনাথকে দেখিবার জন্য মহারাজার অতিশয় আগ্রহ জন্মে এবং তাঁহাকে ছত্রপুরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে এক পত্র লিখেন। এই সময়ে বোম্বাইয়ের ভক্তগণ সোনামুখীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের ফেলিয়া ছত্রপুর যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু দেরাদুন হইতে একজন বড়লোক যখন অম্বরী টি এস্টেটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী নির্দিষ্ট করিয়া হরনাথকে ডাকিলেন, তখন কিছুদিন দেরাদুনে থাকিলে শরীর ভাল হইয়া যাইবে—এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন না। ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ভক্তের পরামর্শ চাহিলেন।[১]

এই বৎসরে সোনামুখী অঞ্চলে একপ্রকার ভয়াবহ ধরণের জ্বর ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এমন কোন গৃহ ছিল না, যাহা এই জ্বরের আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত ছিল।

এই মহামারী আকারের জ্বর সোনামুখী ও তৎপরবর্তী অঞ্চলের বহু নরনারীর প্রাণসংহার করে।[২] দেশের এইরূপ অবস্থায় অন্য কোথায়ও গমন করিতে হরনাথের ইচ্ছা হইল না। তাহা ছাড়া, তাঁহার

১। যতীন্দ্রনাথ মিত্রকে লিখিত ৮ই নভেম্বরের পত্র—শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ১৬৩

২। Pagal Haranath Part V—পত্রসংখ্যা ২৯০; পত্রের তারিখের মুদ্রণে ভুল আছে। এই তারিখটি ২৪শে নভেম্বর, ২৬শে না হইয়া ২৪শে অক্টোবর হওয়াই সম্ভব। পত্রে লেখা আছে, ব্রজেনবাবু এইমাত্র কলিকাতা গেলেন। ব্রজেনবাবুর সোনামুখী আগমন হয় ১১ই অক্টোবর তারিখে। সোনামুখী হইতে তিনি কলিকাতা গমন করেন সম্ভবতঃ ২২শে অক্টোবর। দ্রঃ আমার অভিজ্ঞতা: তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৬

নিজের শরীরের অবস্থাও এই সময়ে ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে। শরীর এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে, কথা কহিতেও তাঁহার কষ্টবোধ হইত। ঠাণ্ডায় হাত-পা ফুলিতে থাকে, দেহ রক্তশূন্য হয়, তদুপরি অর্শ হইতে প্রচুর রক্ত পড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া, বোধ হয় প্রস্রাবের দোষও হইয়াছিল। আহারেও রুচি ছিল না।[১] শরীরের এইরূপ অবস্থায় অপর কোথাও গমন করা তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন না।

ডিসেম্বর মাস পড়িবার পর হইতে রোগের আক্রমণের বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় এবং তাঁহার শরীর একটু ভাল হইলে, তিনি মাছডোবা গ্রামে চলিয়া আসেন। এখানকার জলবায়ু অনেকটা ভাল। সেজন্য এখানে থাকিলে হরনাথ অতি অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিবার আশা প্রকাশ করেন[২] এবং অল্পদিনের মধ্যে সত্যসত্যই তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠেন। সেইজন্য অন্যান্য বৎসরের মতো এবৎসরও ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে তিনি ভক্তদের সহিত তৈলমর্দন, স্নানলীলা প্রভৃতি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই বৎসরের 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে ভাণ্ডারের কার্যভার পড়ে অক্ষয়কুমার গুপ্তের উপর। কলিকাতাবাসী একজন ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে সুগন্ধি তৈল চাহিলেন। কারণ, সুগন্ধি তৈল ব্যতীত নারিকেল বা সাধারণ সরিষার তৈল ব্যবহার করার অভ্যাস তাঁহার নাই; অথচ এবার সঙ্গে করিয়া সুগন্ধি তৈল আনয়ন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার গুপ্তের ভাণ্ডারে সুগন্ধি তৈল ছিল না। এই সংবাদ অবগত হইয়া ভক্তটি বিশেষ অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অক্ষয়বাবু ভাণ্ডারঘরে খোঁজ করিতে করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে এক শিশি সুগন্ধি তৈল পাইলেন এবং ভক্তটিকে তাহা দিতেই উক্ত ভদ্রলোকটি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'আমরা রাজার ছেলে। আমাদের কি কিছু অভাব হতে পারে?' তৈলমর্দন লীলার পর বহু ভক্তসমভিব্যাহারে হরনাথ অনন্তকুণ্ডে

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ১৬৪

২। Pagal Haranath : Part V, Page 346

স্নানলীলা করিলেন। তারপর মহোৎসব আরম্ভ হইল। এই উৎসবে নিমন্ত্রিত ভক্তগণ ও স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলেই সমান উৎসাহে যোগদান করিতেন এবং অপার আনন্দ লাভ করিতেন।

এই বৎসরেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। একজন ভক্ত এই মহোৎসবের যে বিবরণ দান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই মহোৎসবের আনন্দের গভীরতা উপলব্ধ হইবে: "প্রসাদ পরিবেশন হইলে জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভক্তগণের অনেকে, আমি নিজেও, নিজ পাত হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে দিয়াছিলাম। ঠাকুরও আমাদের মুখে নিজ পাত হইতে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। সে এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি ও নয়নাভিরাম দৃশ্য। ঠিক যেন শ্রীক্ষেত্রের আনন্দবাজার। এইবারের উৎসবে আবার একজন মুসলমান ভক্তও উপস্থিত ছিলেন।* ঠাকুরের কি অপার মহিমা! তাঁহার কৃপাতেই এ সমস্ত সম্ভব হয়। আরও আশ্চর্য, যদিও পৃথক পংক্তিতে একই সভায় বসিয়া তিনি অবিচলিতভাবে প্রসাদ পাইতেছেন, তবু কেহ কোনরূপ দ্বিধা বা আপত্তি করেন নাই।"[১] এইভাবে উৎসবটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। ঠাকুর বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং স্ত্রী ভক্তগণও ঠাকুরবাড়ীতে রহিলেন। "রাত্রে পুরুষ ভক্তগণ সব বাগানবাড়ীতেই রহিলাম, আনন্দে সারা রাত্রিই হৈঃ হৈঃ রৈঃ রৈঃ! নিদ্রা প্রায় হইলই না।"

এইবারের 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে 'যশোদা মা' নামে একজন ভক্তিমতী মহিলা স্বহস্তে প্রস্তুত এক হাঁড়ি রসগোল্লা হরনাথের জন্য আনিয়াছিলেন। ভক্তগণ কর্তৃক আনীত এই সমস্ত জিনিস হরনাথ কিছু গ্রহণ করিয়া সবই বিলাইয়া দিতেন, কখনও বা নিজে কিছু গ্রহণান্তর ভক্তদের কিছু দিয়া বাকীটা ভাঁড়ারে পাঠাইয়া দিতেন। যশোদা মা কর্তৃক আনীত রসগোল্লা পরদিন চা পানের সময় গ্রহণ

* তাঁহার নাম আবদুল লতিফ, বাড়ী মানিকার চর।

১। আমার অভিজ্ঞতা: তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ২১৩

এই গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে আহার-বিহারে জাতিবর্ণ বিচার না করার জন্য প্রেরণা হরনাথ ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। দ্রঃ পৃঃ ১৭১-৭২

করিতে ইচ্ছা করিয়া, হরনাথ রসগোল্লার হাঁড়ীটি ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দেন। ভাণ্ডারী অক্ষয় গুপ্ত কিন্তু এই সংবাদ জানিতেন না। সেদিন শেষ রাত্রিতে ভূতনাথ জাগরণ-ক্লান্ত ভক্তদের প্রত্যেককে একটি করিয়া রসগোল্লা দিলেন। মহোৎসবের পর রাত্রিতে কোন ভক্তই আর কিছু আহার করেন নাই। তদুপরি রাত্রি-জাগরণহেতু সকলেরই কম-বেশী ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। একটিমাত্র রসগোল্লা সেই ক্ষুধানলে আহুতিস্বরূপ হইল এবং ভক্তগণ সকলেই 'আরও দাও, আরও দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া অক্ষয় গুপ্ত মহাশয় 'যশোদা মা'র রসগোল্লার হাঁড়িটি বাহির করিয়া দিলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ভাণ্ডারের সমস্ত মিষ্টান্নই বাহির করিয়া দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত মিষ্টান্ন ক্ষুৎপীড়িত ভক্তবৃন্দের উদর-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রাতঃকালে চা পানের সময় 'যশোদা মা' হরনাথকে মিষ্টান্ন দিতে গিয়া যখন শুনিলেন সমস্ত মিষ্টান্নই ইতিপূর্বে বিতরণ করা হইয়াছে, তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি সজলনয়নে হরনাথকে জানাইলেন, 'তোমার জন্য আনা জিনিষ তুমি একটিও পাইলে না, উহারা সব উজাড় করিয়া ফেলিয়াছে।' হরনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া অক্ষয় গুপ্তকেও সান্ত্বনা দান করিলেন। কারণ, 'যশোদা মা'র মিষ্টান্ন বিতরণ ব্যাপারে প্রধানতঃ তিনি দায়ী বলিয়া অক্ষয় এতক্ষণ দুঃখিত অন্তরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অপরাপর ভক্তগণকেও সান্ত্বনা দিয়া হরনাথ তাঁহাদের মন হইতে অপরাধবোধ দূরীভূত করিলেন। কিন্তু হরনাথের নামে আনীত জিনিস হরনাথকে না দিয়া উদরসাৎ করার জন্য ভক্তদের মনে অতিশয় দুঃখ হইল। হরনাথের সান্ত্বনাতেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইল না। এইরূপ ব্যথাতুর অন্তরে সকলে সোনামুখী হইতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইহার পর বিদায়ের পালা আসিল। 'যশোদা মা' এত লোকের মধ্যেও পাগলিনীর ন্যায় আলুথালু বেশে 'গোপাল কেমনে তোমাকে ছাড়িয়া যাইব?' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর তাঁহার স্বামী হতভম্বের মতো দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 'তমালিনী মা' কাঁদিতে

কাঁদিতে কতটুকু যান, আবার ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া থাকেন। সেই অপরূপ দৃশ্য চিরস্মরণীয়।[১]

১৯২৭

ক্রমাগত বার্ধক্য এবং রোগের আক্রমণহেতু যন্ত্রণায়, হরনাথ একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার কথার উপরে কেহ কোন কথা বলিলে, তাঁহার সহ্য হইত না। অথচ সংসারে থাকিতে গেলে মনান্তর ও মতান্তর অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য হরনাথ কিছুদিন সোনামুখী বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বসবাস করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া কুসুমকুমারীর অভিমান হইল। তাই, তিনি মাছডোবা গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

এইজন্য গৃহে অশান্তির উদ্ভব হইল। হরনাথও অভিমান-ক্ষুব্ধচিত্তে সোনামুখী ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। বোম্বাই হইতে ভক্তদল আসিয়া পড়ায় সুযোগেরও অভাব হইল না। তাঁহাদের সহিত হরনাথ প্রথমে বোম্বাই যাত্রা করেন। পরে বোম্বাই হইতে ডাকুর এবং ডাকুর হইতে বরোদা হইয়া ২৪শে জানুয়ারি বৃন্দাবনে আসিলেন। এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর জগমোহন-দাস, দ্বারকাদাস, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার কাকীমা ছাড়া অপর সকলেই বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করেন। মৈমনসিংহ যাত্রায় হরনাথের সহগামী হইতে তাঁহারা বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন হইতে হরনাথের আর সোনামুখী ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। কারণ, তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সহিষ্ণুতার অভাবহেতু তিনি গৃহের সকলের অশান্তির কারণ হইয়াছেন। সেইজন্য তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে লিখিলেন যে, "যদি সোনামুখীতে কেহ তাঁহার কথার উপর কথা না বলে, তাহা হইলেই তিনি সোনামুখী ফিরিয়া যাইবেন।"[২]

এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হওয়ায়, বৃন্দাবন

১। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৫
২। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৪

ছাড়িয়া কোথাও যাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু মৈমনসিংহ-বাসী উদ্যোক্তাগণ কোন মতেই ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরগঞ্জে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়া, হরনাথকে লইয়া যাইবার জন্য বৃন্দাবনে আগমন করেন। সুতরাং হরনাথকে ভক্তদল-সহ যাত্রা করিতে হইল। ১১ই ফেব্রুয়ারি বৃন্দাবনধাম হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা ১২ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মানিকতলায় শরৎবাবুর বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শরৎবাবু সেই সময় অসুস্থ থাকার জন্য হরনাথ অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার এবং তাঁহার ভক্তদের আদর-যত্ন ও সেবা-শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটী হইল না। শরৎবাবুও দুই-একদিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি যতীন্দ্রনাথ মিত্রের কালীঘাটের বাড়ী 'হরধামে' গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগদান করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কুমারখালির ভক্ত ননীগোপাল কুণ্ডু প্রদত্ত একটি জমিতে আশ্রম মন্দিরের ভিত্তি নিজহস্তে স্থাপন করিবার জন্য হরনাথকে কলিকাতার উপকণ্ঠে মুরারীপুকুর যাত্রা করিতে হইল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর সেখানে রীতিমত মহোৎসব ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইল। এই উৎসবে অবশ্য অটল কুণ্ডুর উপস্থিতি সম্ভব হয় নাই, তিনি তখন কুমারখালিতে ছিলেন। সেজন্য হরনাথ পত্রে অতুলচন্দ্র মজুমদারকে এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন এবং অটল কুণ্ডুকেও ইহা জানাইতে বলিয়াছিলেন।[১] এই দিন কুসুমকুমারীকে লইয়া অনুকূল সোনামুখী হইতে আসেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারি (৬ই ফাল্গুন) তারিখে হরনাথ সদলবলে মৈমনসিংহ যাত্রা করেন এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি হরনাথ ঈশ্বরগঞ্জে পৌঁছিলেন। আতরবাড়ী অঞ্চলের রজনীকান্ত কর, যামিনীনাথ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র রায়, রাসমোহন রায়, ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতির উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বহু দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ভক্ত এবং

১। Pagal Haranath : Part V, পত্র সংখ্যা ২৯৫

ঈশ্বরগঞ্জ ও মৈমনসিংহের বহু লোক বহু সরকারী কর্মচারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।[১] মহাসমারোহে দুইদিন ধরিয়া উৎসব চলিল। ১০ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে হরনাথ ঈশ্বরগঞ্জ হইতে সুন্দাইল গমন করেন। সুন্দাইলবাসী রাসমোহন রায় হরনাথের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজ বাটীতে 'শ্রীশ্রীহরনাথ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষী হইয়া এক উৎসবের আয়োজন করিয়া হরনাথকে আহ্বান জানান। অন্তরঙ্গ ভক্তের আহ্বানে হরনাথকে সুন্দাইল আগমন করিতে হইল। মহাসমারোহে 'শ্রীশ্রীহরনাথ আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উৎসবের বিবরণ রাসমোহনবাবু কর্তৃক অক্ষয়কুমার গুপ্তকে ৫।৫।৪৩ তারিখে লিখিত পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। "আশ্রম স্থাপনকালে আমি আমার গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আড্ডা স্থাপন করিলে কুলাইতে পারিব না বলিয়া ঈশ্বরগঞ্জে আড্ডা করি। ১৩৩৩ সনের ১০ ফাল্গুন প্রাতের গাড়িতে নান্দাইল রোডে নামিয়া বেলা ৯টায় ঠাকুর আমার বাড়ীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আমি ৩টি পালকি ও ৩টি হাতী স্টেশনে রাখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর এক ছোট দাঁতাল হাতী চড়িয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে ঈশ্বরগঞ্জে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে আমি মনঃ-ক্ষুণ্ণ হওয়ায় বলিলেন 'আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় বুঝিবে।' পরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা সময়ে শ্রীশ্রীমার ফটো আশ্রমঘরে একত্র অধিবাস করিয়া রাখা অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, এই ফটো এখানে কেন? তোমার গোপাল আমি, গোপালের স্ত্রী নাই। যশোদা রাধিকাকে কৃষ্ণের প্রিয়া মনে করিত না; খেলার সাথী বলিয়া মনে করিত। তোমারও তাহাই মনে করা উচিত। আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তোমার কি সংস্রব আছে? দ্বারকায় কৃষ্ণের যে স্ত্রী-পুত্র ছিল, তাহাদের সঙ্গে তো নন্দ-যশোদার কোন সংস্রব ছিল না। তোমারও তাই থাকা উচিত। তজ্জন্য তোমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীকে আমি আনি নাই।[২]

সুন্দাইল হইতে ঈশ্বরগঞ্জ হইয়া হরনাথ ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে

১। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৭

২। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৬

কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং তৎপরদিন খুলনা যাত্রা করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি খুলনার স্টেশন-মাস্টার হরিপদ সরকারের বাসায় অবস্থান করিয়া, ২৭শে তারিখ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং (১লা মার্চ ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৩) বোম্বাইদলের সহিত মেদিনীপুর যাত্রা করেন; মেদিনীপুরে সাব-জজ সারদাকুমার সেনের বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে দুই-একদিন অবস্থান করিবার পর বোম্বাইয়ের ভক্তবৃন্দ একটি টেলিগ্রাম পান। টেলিগ্রামে ছোট ভাইটির অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া দ্বারকাদাস সহ বোম্বাইয়ের দলটি বোম্বাই চলিয়া যান। হরনাথও সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বোম্বাইয়ের সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ৯ই মার্চ তারিখে বোম্বাই হইতে 'out of danger' টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি স্বস্তিবোধ করিলেন।[১]

কিন্তু এই স্বস্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। কৃষ্ণদাসের শিশুপুত্র কালু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায়, হরনাথ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। ১৭ দিন যাবৎ জ্বরে ভুগিয়া কালু আরোগ্যলাভ করিলে, তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা দূর হইল। তিনি ঝাড়গ্রামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে অনন্তকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর পাড়ের পার্শ্বস্থ দেওয়াল ইত্যাদি পুনর্নির্মাণ করিবার ও পুষ্করিণীর খননকার্য সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার হয়। এই দুইটি কার্যের জন্য প্রায় ছয় হাজার টাকা আবশ্যক। এই বিরাট পরিমাণ অর্থ তাঁহার ছিল না। এমনকি অর্থাভাবে সোনামুখীর বাটীর ব্যয়নির্বাহও হইতেছিল না। সেজন্য তিনি পুষ্করিণীর কার্য আরম্ভ করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ পুষ্করিণীটিকে সম্পূর্ণ করিবার তীব্র ইচ্ছা তাঁহার ছিল। সেইজন্য তিনি সিমলার সন্তোষকুমার রায়কে প্রতি মাসে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য সোনামুখীতে পাঠাইবার জন্য লিখেন এবং পুষ্করিণীর সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিবার জন্য মথুরাদাস ও তাঁহার স্ত্রীকে অনুরোধ জানাইবার কথাও লেখেন।[২]

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ১৮০
২। Pagal Haranath : Part V

এপ্রিল মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই হরনাথ ঝাড়গ্রাম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেখাকার পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে হরনাথ মার্চ মাসেই ঝাড়গ্রাম যাইবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু কৃষ্ণদাসের শিশু-পুত্রের অসুস্থতার কারণে সে সঙ্কল্প তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। শিশুটি আরোগ্য লাভ করিবার কয়েকদিন পরে হরনাথ সোনামুখী হইতে যাত্রা করেন।

প্রথমে তিনি মেদিনীপুরে গমন করেন এবং কয়েকদিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়া ঝাড়গ্রাম যাত্রা করেন। ঝাড়গ্রাম হইতে ১৪ই এপ্রিল তারিখে রাধানগর যাত্রা করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতে প্রতি বৎসর ইস্টারের ছুটিতে রাধানগরের বার্ষিক উৎসব হইত। এই বৎসর ১৫ই এপ্রিল তারিখে ইস্টারের ছুটি পড়ায় উক্ত দিবস হইতেই উৎসব আরম্ভ হয়।[১]

এই বৎসর রাধানগর উৎসবে সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলা হইতে প্রায় পঞ্চাশজন ভক্ত নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের অতুলনীয় প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া হরনাথ মোহিত হন।[২] যথারীতি পূজা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও অতিথিসেবা ইত্যাদি তিনদিন ধরিয়া চলিতে থাকে। মহানন্দে উৎসবের দিনগুলি অতিবাহিত হয়, কিন্তু উৎসবের উত্তেজনা এবং ভক্তদের প্রসাদের জন্য বারংবার ভোজ্য গ্রহণে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। রাধানগরের ভক্তবৃন্দ ইহাতে ভীত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় এক বিখ্যাত কবিরাজের হাতে তাঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হয়। কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধেও বিশেষ উপকার হইল না দেখিয়া, ভক্তবৃন্দ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য হরনাথ বলেন, "ঔষধে আমার কিছুই উপকার হইবে না, তবে এই আমার সোনার আশ্রম রাধানগরের মাটিতে বড়িটি ঘষিয়া আমাকে

১। The Last days of Haranath : N. C. Ghosh, P. 12
২। পাগল হরনাথ (ইংরাজী) : পৃঃ ৩০০

সেবন করাও, তা হইলে উপকার হইতে পারে।"[১] রাধানগরে চারিদিন অবস্থান করিবার পর হরনাথ সোনামুখী যাত্রা করিলেন। সোনামুখীতে প্রত্যাগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটি আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার আহ্বান আসিল। কিন্তু শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়া উঠায়, তিনি এই উৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন না।[২]

তিনি পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বিশ্রাম করিয়া তিনি স্বস্তি পাইলেন না। শারীরিক অস্বস্তির সহিত মানসিক অস্থিরতা তাঁহার বিশ্রাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। সেইজন্য প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায় নব-নির্মিত 'হরবাস'-এ প্রবেশ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিবামাত্রই তিনি হাওড়া গমনের সঙ্কল্প করিলেন এবং ৩রা মে তারিখে সোনামুখী হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বাঁকুড়া স্টেশনে সস্ত্রীক অক্ষয়কুমার গুপ্ত তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

বাঁকুড়া হইতে ট্রেন ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই হরনাথের বুকে এক ভয়ঙ্কর বেদনা উঠিল। সেই সঙ্গে নিদারুণ পিপাসা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। দুই-তিন গ্লাস জল পান করার পরেও পিপাসার নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া, ভক্তগণ অবশেষে জলের সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। ফলে, পিপাসারও নিবৃত্তি হইল এবং বুকের বেদনাও কমিয়া গেল। যথাসময়ে গাড়ি মেদিনীপুর পৌছিলে সারদাপ্রসন্ন সেন, শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি স্টেশনে আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া হরনাথকে সারদাবাবুর বাসায় লইয়া গেলেন। সহযাত্রী ভক্তগণকেও সারদাবাবুর বাসায় অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করা হইল। সেখানে সকলে মিলিয়া আগামী জন্মোৎসবের কর্মসূচী আলোচনা করিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় হরনাথের শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, তিনি নামমাত্র আহার করিলেন এবং অন্যান্য সময়ে ভোজন-

১। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১১০
২। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫

কালে ভক্তদের সহিত যেরূপ আমোদ-প্রমোদ করিতেন, এবারে তাহা পারিলেন না। ফলে, ভক্তবৃন্দ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। পরদিন ৪ঠা মে, হাওড়ায় ভক্ত প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হরবাস'-এ গৃহপ্রবেশ করার দিন ধার্য ছিল। হরনাথ রাত্রি ৩টার ট্রেনেই হাওড়া যাত্রা করেন এবং জেদ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে না উঠিয়া ভক্তদের সহিত ইণ্টার ক্লাসে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, ভক্তগণ বাধ্য হইয়া তাঁহার জন্য একটি ইণ্টার ক্লাসের টিকিট খরিদ করিলেন এবং সকলে মিলিয়া ইণ্টার ক্লাসে উঠিলেন।

প্রাণের ঠাকুরের সহিত এক স্থানে শয়ন করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে যে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, অক্ষয়কুমার গুপ্তের লেখনীমুখে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়: "রাত্রে ঠাকুরের সঙ্গে এক কামরায় থাকিয়া যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ঠাকুর এক বেঞ্চে শয়ন করিয়া আমাদের সঙ্গে নানারূপ আলাপাদি করিয়া পরে সামান্য একটু ঘুমাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের আর ঘুমাইতে ইচ্ছা করিল না।"[১]

পরদিন ৪ঠা মে প্রাতে ভক্তদলসহ হরনাথ প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নূতন বাড়ী 'হরবাসে' পৌঁছিলেন। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইল। অতিরিক্ত দুর্বলতাহেতু মধ্যাহ্নভোজনের পর হরনাথ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সুস্থ হইয়া উঠেন। সন্ধ্যার সময় নারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভক্তগণ 'হরবাসে' উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, "He was all cheerful, though very pale and weak."[২]

শারীরিক অসুস্থতাকে হরনাথ কোনদিনই বিশেষ গ্রাহ্য করিতেন না। সেদিনও তাহাই করিলেন। রাত্রিকালে ভক্তসমাগম হইলে তিনি তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঠাকুরঘর হইতে স্বেচ্ছায় নামিয়া আসিয়া,

১। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৪

২। The Last Days of Haranath : N. C. Ghosh : P. 17.

ভক্তদের সহিত কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভক্তমণ্ডলী ও সমাগত নরনারীগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সুমধুর কৃষ্ণ কথা শুনিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি ১১টা বাজিল। অতঃপর ভক্তগণসহ হরনাথ নৈশ ভোজনে বসিলেন এবং পূর্বের মতো আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন ৫ই মে প্রাতে হরনাথ কলিকাতায় আগমন করেন এবং মানিকতলায় শরৎবাবুর বাটীতে অবস্থান করেন। এইদিন হইতে ৭ই মে পর্যন্ত মানিকতলা বাটীতে ক্রমাগত ভক্ত সমাগম হইতে থাকে এবং হরনাথ মহানন্দে তাঁহাদের কৃষ্ণকথা শুনাইতে থাকেন। এই সময় তিনি শারীরিক অসুস্থতার কথা বিস্মৃত হইতেন।

ইতিমধ্যে হরনাথ হাওড়ার অন্যতম ভক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট তত্রস্থ ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহের কথা অবগত হইলেন। বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে এই দত্ত মহাশয় স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া সস্ত্রীক সোনামুখীতে আগমন করতঃ হরনাথকে দর্শন করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে জানিয়া, হরনাথ অতিশয় মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। সেইজন্য ৭ই মে প্রাতে যতীন্দ্রনাথ মিত্র হরনাথকে লইয়া হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট-কুঠীতে আসেন। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং উপরের ঘরে হরনাথের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার আলোচনা চলে। সেই ঘরে শ্রীযুক্ত দত্তের পরলোকগতা সহধর্মিণীর পুষ্পমাল্যভূষিত একটি প্রতিকৃতি ছিল। হরনাথ কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। ইহা যতীন্দ্রনাথের নিকট আশ্চর্যজনক বোধ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট-কুঠী হইতে বাহির হইবার পর তিনি হরনাথকে এই বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। উত্তরে হরনাথ বলেন, "শ্রীযুক্তা দত্তের প্রসঙ্গ আমি যদি উত্থাপন করতাম, তাহলে দত্ত মহাশয় অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়তেন। সেইজন্য আমি তাঁর মনকে দুর্বল করতে চাইনি।"

এইদিন বৈকালের দিকে কবিশেখর কালিদাস রায় যতীন্দ্রনাথ

মিত্রের সহিত হরনাথ-দর্শনে মানিকতলায় আগমন করেন। তখন রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কালিদাসবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর হরনাথ জানিতে পারেন যে, তিনি ভক্তপ্রবর বৃন্দাবনদাসের বংশধর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, "তোমরা সবাই বাঁধা পড়েছ দড়িতে। সেই দড়ি রয়েছে আমার হাতে, তোমাদের কি সাধ্য আছে আমাকে ছেড়ে যাবে?" এই একদিনের আলাপেই কবিশেখর কালিদাস হরনাথের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালে তিনি হরনাথের জীবনী-রচনার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য, তাঁহার সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।[১]

৮ই মে (১৩৩৪ সালের ২৫শে বৈশাখ) প্রাতে কলিকাতা ও হাওড়াবাসী কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে হরনাথ ঝিখিরা গমন করেন। জমিদার কিশোরীমোহন রায়ের চেষ্টায় ঝিখিরার আশ্রমটির নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্নভোজন করিয়া বৈকাল ৫টার সময় ভক্তদলসহ হরনাথ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে সমবেত নরনারীর অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়া এবং অবিরল ধারায় কৃষ্ণকথামৃত বর্ষণ করিয়া অধিক রাত্রে হরনাথ শয্যাগ্রহণ করেন এবং পরদিন ভোরের গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করেন।

৯ই মে প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া হরনাথ বরাবর মানিকতলায় শরৎবাবুর বাটীতে চলিয়া আসেন। এইদিন রাত্রিতে শরৎবাবু তাঁহার বাটীর দ্বিতলে নির্মিত 'ঠাকুরঘর' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উপলক্ষে শত শত ভক্ত-সমাগম হয়। উক্ত ঠাকুরঘরে নির্মিত মার্বেল বেদীর উপর বসাইয়া পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ শরৎবাবুর স্ত্রী মৃণ্ময়ী দেবী স্বয়ং হরনাথের অর্চনা করেন। তাহার পর সংকীর্তন হয়। সংকীর্তনান্তে হরনাথ বেদীর উপর হইতে নামিয়া আসামাত্র বেদীর উপর হরনাথ ও কুসুমকুমারীর চিত্রপট স্থাপিত হয়।

শরৎবাবুর বাটীতে ক্রমান্বয়ে তিনদিন অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ১৮৬

ব্যক্তির ন্যায় হরনাথ ভক্তগণসহ হরিকথা-কীর্তনে সময় কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু ১২ই মে সন্ধ্যার পর দোতলা হইতে অতি ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে একতলায় নামিয়া তাঁহার বিছানার উপর শয়ন করিয়া হরনাথ দুই হস্ত দ্বারা বুক চাপিয়া ধরিলেন। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার রব উঠিয়া গেল। তাঁহার আদেশানুযায়ী তাঁহাকে এক গ্লাস বরফ-জল দেওয়া হইল এবং বরফের ব্যাগ বুকের উপর চাপিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করতঃ জীবনের কোন সাড়া বা নাড়ীর কোন গতি পাইলেন না। তিনি কয়েকটি বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের জীবনে এইরূপ অবস্থা আরও ২।৩ বার হইয়াছিল। ভক্তগণ তাহা জানিতেন। কাজেই তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন নাই। সৌভাগ্যক্রমে অর্ধ ঘণ্টা পরেই ঠাকুর আবার উঠিয়া বসিলেন। অল্প কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার শরীরে কোনরূপ দুর্বলতার চিহ্নও আর দেখা গেল না। তিনি পূর্ববৎ ভক্তগণের সহিত হরিকথা-কীর্তন করিতে আরম্ভ করেন।[১] কিন্তু এইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই তিনি একজন ভক্তের নিকট সোনামুখী ফিরিবার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "আমি সোনামুখীই যেতে চাই, যে মাটিতে জন্মেছি, সেই মাটিতেই আমি দেহ রাখব বাবা।"[২]

ভক্তগণের অনুরোধে হরনাথ কিছুদিনের জন্য শরৎবাবুর বরাহনগরের বাগানবাটীতে অবস্থান করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং ১৪ই মে সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু ১৩ই মে তিনি সোনামুখী যাইবার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণের অনুনয়-বিনয়েও তাঁহার সংকল্প টুটিল না।

পরদিন ১৪ই মে প্রাতে গোমো প্যাসেঞ্জারে হরনাথ চিরদিনের জন্য কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীরের অসুস্থতার কথা অবগত হইয়া মেদিনীপুরের ভক্তবৃন্দ স্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর লইয়া গেলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল,

---

১। আমার অভিজ্ঞতা: ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৮
২। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ১৯১

কিছুকাল যাবৎ মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়া হরনাথ বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু হরনাথ ১৬ই মে প্রাতে মেদিনীপুর হইতে সোনামুখী যাত্রা করেন এবং রাত্রিকালে সোনামুখীর বাটীতে পৌঁছেন। সোনামুখীতে আসিয়াও তিনি স্বস্তি পাইলেন না। সমস্ত কিছুই তাঁহার নিকট নীরস, বিরক্তিকর ও বিস্বাদ বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোথাও তিনি শান্তি বা স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।[১] ১৮ই মে তারিখে সেইজন্য তিনি মাছডোবা গ্রামে গমন করিলেন।[২]

সোনামুখী হইতে তিন মাইল দূরে অতি নির্জন ও মনোরম এই গ্রামটি হরনাথের অতি প্রিয় স্থান ছিল। এখানে তাঁহার গ্রীষ্মাবাস ছিল। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি শান্তি পাইলেন না। সমস্ত কিছুই পূর্ববৎ বিস্বাদ বোধ হইতে লাগিল এবং অন্তরে প্রবল একটা অস্থিরতাবোধ করিতে থাকায়, শান্তিলাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। কলিকাতার কোন একজন বিশিষ্ট ভক্তকে লিখিত একটি পত্রে তাঁহার এই সময়ের মানসিক অবস্থা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে,—"দাদা, আমার কি হইয়াছে আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি একজন আগন্তুক এবং অপরিচিত লোকের মধ্যে অপরিচিত স্থানে বাস করিতেছি। এমন কি আমার স্ত্রী, ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনগণের মুখ আমার অচেনা মনে হইতেছে। চারিদিকের যাহা দেখি, তাহার কিছুই যেন চিনিতে পারিতেছি না। আমার জীবন সম্পূর্ণ দুর্বহ হইয়া পড়িয়াছে। জানি না কৃষ্ণের কি ইচ্ছা।"[৩]

মাছডোবাতেও শান্তি না পাইয়া হরনাথ ২৩শে মে সোনামুখীতে ফিরিয়া আসেন। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে সোনামুখীতে ফিরিতে

১। The Last Days of Haranath : N. C. Ghosh, P. 23

২। Souvenir on the Hundredth Birthday Celebration of Pagal Thakur Sri Sri Haranath (Published by Haranath Anath Ashram : Swargadwar : Puri), P. 17

৩। আমার অভিজ্ঞতা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯

দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং শত্রু-মিত্রনির্বিশেষে সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় হরনাথ তাহাদের সহিত পূর্ববৎ চা পান, গল্প ও ক্রীড়াদি করিতে লাগিলেন। এই সময় যে দুই-চারিজন ভক্ত হরনাথের নিকট ছিলেন, তাঁহাদেরও তিনি একে একে বিদায় দান করিলেন। কাছে রহিলেন শুধু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে একদিন অনন্তকুণ্ডের কাছে বৈকালিক ভ্রমণকালে অনন্তকুণ্ডের উত্তর তীরস্থ এক স্থানে হঠাৎ দাঁড়াইয়া হরনাথ বলিলেন, "আমি মরিলে আমাকে এই স্থানে দাহ করিও।"

এইভাবে ২৩শে ও ২৪শে মে অতিক্রান্ত হইল; অবশেষে ২৫শে মে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইদিন প্রাতঃকালেও পাড়ার যে সমস্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত হরনাথ একত্র চা পান করিলেন এবং নানারূপ গল্প-গুজব করিতে লাগিলেন। হঠাৎ নাপিত আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, হরনাথ সকলকে ক্ষৌরকার্য করিয়া লইতে বলিলেন। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিলে হরনাথ বলিলেন, "এতবড় বাঁড়ুয্যে বংশ। একজন হঠাৎ মরিয়া গেলে দশদিন ক্ষৌরকার্য বন্ধ রাখিতে হইবে।" এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি যদি হঠাৎ মরিয়া যাই, তবে তোমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। চন্দনকাষ্ঠ বাগানবাড়ীতেই আছে, আর ঘৃত ঘরেই আছে।"

এইভাবে হরনাথ তাঁহার আসন্ন দেহরক্ষার আভাস দান করিলেও কিন্তু কেহ ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গেল। হরনাথও অফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। যতদূর জানা যায়, এই দিন বিভিন্ন স্থানের ছয়জন ভক্তের নিকট তিনি ছয়খানি পত্র লিখেন। ইহাদের মধ্যে একটি ছাড়া সকল পত্রেই তাঁহার আসন্ন দেহরক্ষার আভাস পরিস্ফুট হইয়াছে।[১]

১। কেবলমাত্র বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধা কাকীমার পুত্র কৃষ্ণদাস মাধবদাসকে লিখিত পত্রে দেহরক্ষার ইঙ্গিত নাই। অপর পাঁচটি পত্র যথাক্রমে

পত্র লেখার পর হরনাথ অফিস ঘরের বাহিরে আসিয়া স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ভৃত্য তৈল মর্দন করাইল এবং পরে স্নান করাইল। স্নানান্তে হরনাথ বেলা ২টার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিলেন। কিন্তু একগ্রাস অন্ন মুখে দেওয়ামাত্র তাঁহার বুকে সাংঘাতিক বেদনা উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিছানায় ছট্‌ফট্ করিয়া হরনাথ আবার বিছানায় উঠিয়া বসেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সকলের সহিত আলাপ করিতে থাকেন। রাত্রি প্রায় আটটা সাড়ে আটটার সময়, হরনাথ কনিষ্ঠা শ্যালিকা মতিবালার নিকট হইতে চাহিয়া স্বহস্তে একবাটী দুধ-সাগু পান করেন। তৎপরে তাঁহার নিকট হইতে একটি পান চাহিলে, মতিবালা তাঁহাকে সে সময় পান খাইতে নিষেধ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই কথা বলিতে বলিতে হরনাথের মাথা যেন ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হরনাথ বলিলেন, "তুমি ত আমাকে মাথা সোজা করিয়া থাকিতে বল নাই।" তাহার পর তিনি মাথা সোজা করিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বলিলেন, "কয়েক রাত্রি আমি ঘুমাই নাই, আমার ঘুম পাইতেছে। বিছানা ঠিক করিয়া দাও, আমাকে কেহ বিরক্ত করিও না।" তদনুসারে তাঁহাকে বাটীর ভিতর একতলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের কক্ষে বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে হরনাথ বামপাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। তখন রাত্রি ন'টা।

তাঁহাকে শান্তভাবে শায়িত দেখিয়া কৃষ্ণদাস ও মতিবালা চলিয়া গেলেন। কিন্তু অর্ধ ঘণ্টা পরেই তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া না পাওয়ায় শরীরে হাত দিয়া দেখিলেন যে, শরীর শীতল হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মতিবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের শব্দে বাটীস্থ

N. Dharma Rao, রামরাখাল ঘোষ, বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতনলিনী চৌধুরী (ডাক্তার মা) এবং কালিদাস সিংহকে লিখিত। ইহাদের প্রত্যেককেই হরনাথ তাঁহার আসন্ন দেহরক্ষার আভাস দান করিয়াছেন। দ্রঃ Pagal Haranath—Part V (পত্রসংখ্যা ৩০৪—৩০৯)

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হরনাথের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলের বুক-ফাটা ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী ও জ্ঞাতিবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও একে একে দেখিলেন এবং সমস্ত শেষ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বদৈহিক কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কুসুমকুমারী ইহাতে সম্মতি দান করিলেন না। তিনি দরজা আগলাইয়া বসিয়া অশ্রুকাতরকণ্ঠে সকলকে আট ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন বামপার্শ্বে শায়িত অবস্থায় দেহে মৃত্যু-লক্ষণ দেখা গেলে আট ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবার জন্য তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। হরনাথকে মৃত স্থির করিয়া, সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাঁহারা শবদেহ সংকার করিবার সংকল্প করিলেন। ইহাতে বাধা দান করিলে, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার ভীতি প্রদর্শন করা হইল। অনন্যোপায় হইয়া হরনাথের পুত্রগণ এবং উপস্থিত একমাত্র ভক্ত ভূতনাথ জ্ঞাতিবর্গের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

তদনুসারে মৃতদেহ প্রাঙ্গণে আনীত হইল। সর্বাঙ্গে ঘৃত মর্দন করিবার পর দেহটিকে মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করা হইল। সর্বশেষে একটি রেশমের চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মৃতদেহটি খট্টার উপর স্থাপন করা হইল। ইতিপূর্বে তাঁহার সংকারের স্থান এবং চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির কথা হরনাথ স্বমুখেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা অনুসারে সংকীর্তন করিয়া হরনাথের মৃতদেহ অনন্তকুণ্ডের উত্তর তীরে বহন করিয়া আনা হইল। বাগানবাড়ীর কক্ষ হইতে চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন করিয়া শেষ শয্যা রচিত হইল। তদুপরি মৃতদেহ স্থাপন করিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘৃত নিষিক্ত করা হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র অনুকূল মুখাগ্নি করিলেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইল। ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নির লেলিহান শিখা প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইল এবং মৃতদেহের দক্ষিণপার্শ্ব দগ্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটি ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বোত্থিত হইতে লাগিল এবং উপবেশনের ভঙ্গী

গ্রহণ করিল। তৎপরে চরণযুগল পদ্মাসন গ্রহণ করিল, হস্তদ্বয় অগ্নির উপর সংস্থাপিত হইল এবং দেহখানি সম্মুখের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিয়া মনে হইল, পদ্মাসনে উপবিষ্ট হরনাথ যেন পৃথিবীর প্রতি শেষবারের জন্য দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এইভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় হরনাথের মরদেহ ধীরে ধীরে অগ্নি-কবলিত হইয়া ভস্মীভূত হইল।[১]

১। The Last Days of Haranath : N. C. Ghosh, P. 36

দেহাবসান-জনিত প্রতিক্রিয়া

১৯২৭ সালের ২৫শে মে তারিখে হরনাথের বয়স হইয়াছিল ৬১ বৎসর ১০ মাস ২৪ দিন। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে ইহা পরিণত বয়স এবং সেই কারণে এই বয়সের মৃত্যু জ্ঞাতিদের নিকট বিশেষ শোকাবহ বলিয়া মনে হয় না। বরং বার্ধক্যে কাহারও অধীন হইবার পূর্বেই পুত্রপৌত্র রাখিয়া মৃত্যু ভাগ্যবানের লক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। এই হিসাবে জ্ঞাতিবর্গের নিকট হরনাথের দেহাবসান তেমন শোকাবহ রূপ ধারণ করে নাই। সোনামুখীর অন্যান্য অংশের অধিবাসীরাও ইহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেইজন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদের বাস্তববাদিতা তথা কর্তব্যবোধের পরিচয়ই দান করিয়াছিলেন। হরনাথের অলৌকিকতায় তাঁহাদের তেমন বিশ্বাস ছিল না। সেজন্য দেহে পরিপূর্ণ মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পর আবার যে তাহাতে জীবন ফিরিয়া আসিতে পারে, এইরূপ ধারণা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্থূলভাবে তাঁহারা জানিতেন, যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। সুতরাং আট ঘণ্টাকাল মৃতদেহ আগলাইয়া বসিয়া থাকার প্রস্তাবের মধ্যে তাঁহারা কোন যুক্তি দেখিতে পান নাই। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সোনামুখী হইতে টেলিগ্রাম করিবার বা সোনামুখী হইতে কোন লোক পাঠাইবার উপায়ও ছিল না। তাহার জন্য পরদিন প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত এবং কলিকাতা হইতে ভক্তবৃন্দের আগমন পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে সম্ভব হইত না। এতক্ষণ ধরিয়া কোন মৃতদেহ সৎকার না করিয়া রাখা যায় না। সুতরাং ভক্তগণ আসিবার পর মৃতদেহ সৎকারের যে প্রস্তাব হরনাথের পুত্রগণ করিয়াছিলেন, তাহার অবাস্তবতা জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা অযথা কালহরণ না করিয়া মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা আট ঘণ্টা না হউক, অন্ততঃপক্ষে কিছুটা সময় অপেক্ষা করিলেই সকল সন্দেহের নিরসন হইত। ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা

হরনাথকে জীবন্ত দাহ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কিছু বলিবার থাকিত না। এই সমস্ত ভক্তবৃন্দ হরনাথকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসিতেন। সেইজন্য তাঁহার আকস্মিক তিরোধানের সংবাদে তাঁহারা বজ্রাহতের মতো হইয়া পড়েন।

শোকের প্রথম আঘাতের বেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুরের মরদেহ ত্যাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, কুসুমকুমারীর অনুরোধসত্ত্বেও জ্ঞাতিবর্গ ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু ভীতি প্রদর্শন করিয়া হরনাথের দেহপ্রহরারত কুসুমকুমারীকে অপসারিত করিয়াছিলেন। তখন হরনাথের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক ভালবাসা, ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদের মনকে বিরূপ করিয়া তুলিল এবং তাঁহাদিগকে demons আখ্যা দান করিল। পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনাসত্ত্বেও হরনাথকে দগ্ধ করা হইয়াছে—একটি পুস্তকে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশও করা হইল। ইহাতে হরনাথের তিরোধানকালে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি, উপস্থিত একমাত্র ভক্ত ভূতনাথের প্রতি, হরনাথের ঊর্ধ্বদৈহিক কার্যে সহকারীদের প্রতি এবং হরনাথের পুত্রদের প্রতি অবিচার করা হইল সত্য, কিন্তু হরনাথের প্রতি ভক্তদের প্রেম ও ভালবাসা কিরূপ গভীর ছিল, তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইল।[১]

অবশ্য, সকল ভক্তই যে ঐরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা নহে। দেহত্যাগের ঘটনাটি শোকাবহ হইলেও অনেকেই ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও কেহই স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে, এত তাড়াতাড়ি হরনাথ তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইবেন। এখানেও সেই অন্ধ ভালবাসা। নতুবা পুরীর জন্মোৎসব হইতে ২৫শে মে-র প্রাতঃকাল পর্যন্ত হরনাথ অনেককেই তাঁহার আসন্ন দেহাবসান সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আশঙ্কিত হইলেও, এই ইঙ্গিত বিশ্বাস করিতে কাহারও অন্তর সায় দেয় নাই।

১। মেদিনীপুর উৎসবে এই পুস্তক বিতরণ করা হয়। পুস্তকখানির নাম 'দি লাস্ট ডেজ অব হরনাথ'—রচয়িতা নারায়ণচন্দ্র ঘোষ।

যাহা হউক, দেহাবসানের পরদিন প্রভাতে হরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুকূল বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভক্তবৃন্দকে তারবার্তার সাহায্যে এই নিদারুণ শোকাবহ সংবাদটি জানাইলেন। সংবাদটি পাইয়া সকলেই বজ্রাহতের মত হইয়া গেলেন। এই দুঃসংবাদ ভক্তদের অন্তরে যে নিদারুণ বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, অক্ষয়কুমার গুপ্তের বর্ণনায় তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। "২৭শে মে বেলা আন্দাজ আটটার সময় আমি দোতলার ঠাকুরঘরে যাইবার জন্য সিড়ির উপর উঠিয়াছি, এমন সময় নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাইলাম।

Sonamukhi—26

Father died last night at 9. Come immediately.

Anukual.

টেলিগ্রামটি পাইয়া প্রথম মনে হইয়াছিল যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা অনুকূলের পিতা মারা গিয়াছেন। কারণ স্বপ্নেও ভাবি নাই, ঠাকুর এইভাবে হঠাৎ আমাদের সর্বনাশ করিয়া চলিয়া যাইবেন এবং তজ্জন্য সহস্র সহস্র ভক্তদের মধ্যে আমার মত একজন নগণ্য লোকের নিকট ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের অনুকূল দাদা এরূপভাবে টেলিগ্রাম করিবেন। পরে টেলিগ্রামের উপরিভাগে সোনামুখীর নাম দেখিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল এবং আমি বসিয়া পড়িলাম।"[১]

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে এই দুঃসংবাদটি পাইয়া যতীন্দ্রনাথ মিত্র একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্রশোক প্রাপ্ত জননীর ন্যায় শোকাকুলা হইয়া পড়িলেন। উভয়ের ক্রন্দন ও নয়নাশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিল।"[২]

কলিকাতার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি এই নিদারুণ দুঃসংবাদে এমন অভিভূত হইলেন যে, সাময়িকভাবে তাঁহাদের সকল উদ্যম, সকল কর্মশক্তি যেন লোপ পাইয়া গেল। "কলিকাতায় আমাদের আর কাহারও হাত পা যেন চলিতেছে না।"[৩] মাত্র এই

১। আমার অভিজ্ঞতা : ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯
২। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ, পৃঃ ১৯৪
৩। আমার অভিজ্ঞতা : ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১০

একটি বাক্যে কলিকাতার ভক্তদের শোকাহত মানসিকতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কেহ কেহ দুঃসহ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন।[1] আবার কেহ কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান ঘটান।[2]

অন্যান্য প্রদেশবাসীদেরও শোকের অবধি রহিল না। হরনাথের মহাপ্রস্থানে ভারতের সমস্ত প্রদেশেই শোকের কালো মেঘ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু শোকের গভীরতা যতই হউক না কেন, কর্তব্যে ত্রুটি থাকিলে চলিবে না। হরনাথের দেহবসান হইয়াছে। নিখিল ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ যাঁহার অনুরাগী ও প্রেমিক ভক্তে পরিপূর্ণ, তাঁহার পারলৌকিক কার্য তাঁহার উপযুক্ত করিয়াই করা চাই। কোন ত্রুটি থাকিলে ভক্তদেরই কর্তব্যে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। সেইজন্য শোকে মুহ্যমান হইয়াও সকল ভক্ত হরনাথের শ্রাদ্ধাদি কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৪ঠা জুন শনিবার দিন শ্রাদ্ধতিথি। ইহার দুই-একদিন পূর্ব হইতেই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইতে লাগিল। যাঁহারা অনিবার্য কারণে আসিতে পারিলেন না, তাঁহারা নিজ বাটীতেই রীতিমত হবিষ্য করিয়া নির্দিষ্ট দিবসে শ্রাদ্ধাদি কার্য করিলেন।

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হইল। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই পরিতোষসহকারে দুই-তিন দিন যাবৎ ভোজন করানো হইল। কোন কৃত্য বা কোনরূপ অনুষ্ঠান বাদ পড়িল না। অবশেষে সমাগত ভক্তবৃন্দ সাশ্রুনয়নে কুসুমকুমারীর চরণ বন্দনা করিয়া, অনন্তকুণ্ডের তীরে হরনাথের নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিয়া সজলচক্ষে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১। ললিতমোহন দত্ত হরনাথের দেহাবসানের অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহরক্ষা করেন।

২। ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় রেলের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। দ্রঃ আমার অভিজ্ঞতা: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৬

ইহার পূর্বে তাঁহারা কতবার সোনামুখী আসিয়াছেন। প্রত্যেক-বারই বিদায় লইয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া বারে বারে পশ্চাৎ ফিরিয়া শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত আনন্দঘন সেই সৌম্যমূর্তির সদাহাস্যময় বদন দেখিয়া আবার অগ্রসর হইয়াছেন। এবারেও তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারে বারে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু সেই চিরপরিচিত হাস্যোৎফুল্ল মূর্তি আর দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্তে দেখিলেন, শোকাবেগের মূর্তিমতী প্রতিমা কুসুমকুমারীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি, আর নিদারুণ হাহাকারের মত অনন্তকুণ্ডের উত্তরতীরস্থ মহাশ্মশানের চিতাভস্মরাশি। মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া এতদুভয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া ভক্তবৃন্দ সোনামুখী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দেহাবসানের পর হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত হরনাথের প্রভাব

হরনাথের দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই মেদিনীপুরে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতে লাগিল। এই বৎসর মেদিনীপুরে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে স্বয়ং হরনাথ সম্মতি দিয়াছিলেন বলিয়া, তত্রস্থ ভক্তগণের আনন্দের সীমা ছিল না। হরনাথের আকস্মিক তিরোধানে সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হইলেও, তাঁহার ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য ভক্তগণ প্রবল উৎসাহে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হরনাথের অবর্তমানে কুসুমকুমারীকে লইয়া উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার পরিকল্পনা করেন। সেই উদ্দেশ্যে ১লা জুলাই তারিখে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রকুমার দত্ত ও অক্ষয়কুমার গুপ্ত সোনামুখী আসিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়া 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী যেভাবে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পাষাণও গলিয়া যায়।'[১] ইহা দেখিয়া তাঁহারা কুসুমকুমারীকে লইয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না এবং ঐ দিনই রাত্রিতে তাঁহারা কুসুমকুমারী ও হরনাথের চিত্রপট লইয়া সোনামুখী হইতে যাত্রা করিলেন এবং ২রা জুলাই মেদিনীপুরে পৌঁছিলেন। এই চিত্রপটকে বেদীতে স্থাপন করিয়া ২রা জুলাই অধিবাস ও ৩রা জুলাই জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

যথারীতি নামসংকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ ভোজন, অতিথিসেবা প্রভৃতি হইল এবং হরনাথের সর্বশেষ 'বিশ্ববাণী' পাঠ করা হইল। অন্যান্য বার স্বয়ং হরনাথ বা তাঁহার অনুমত্যনুসারে অপর কেহ এই 'বিশ্ববাণী' পড়িতেন। এবারে ভক্তগণের মধ্যে একজন হরনাথ-কুসুমকুমারীর চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার শেষ উপদেশবাণী পাঠ করিলেন। হরনাথের এই শেষ 'বিশ্বসন্দেশ'-এ তাঁহার লীলাবসানের রহস্য যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে ভক্তগণ অনেকেই সান্ত্বনা লাভ করিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পোষাক

১। আমার অভিজ্ঞতা : ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১১

পরিবর্তন করিয়া অভিনেতা দর্শকদের মধ্যেই অবস্থান করিতে পারেন, দর্শকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারে না। কিন্তু অভিনেতৃদলের অন্যান্য মানুষের দৃষ্টিকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন না। যে পোষাকেই তিনি সজ্জিত হউন না কেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিবে।"[১]

হরনাথের তিরোধানের পর হইতে এতদিন পর্যন্ত ভক্তবৃন্দের অন্তর অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে 'বিশ্বসন্দেশ'-এর উক্ত ইঙ্গিতে তাঁহারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং হরনাথের শেষ ইচ্ছানুসারে, 'যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা লইয়াই সংসার-রঙ্গমঞ্চে আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।'[২]

হরনাথের যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা হইল তদীয় সহধর্মিণী কুসুমকুমারী ও বংশধরগণ এবং মূল্যবান উপদেশ-পরিপূর্ণ তাঁহার পত্রাবলী।

হরনাথের তিরোধানে কুসুমকুমারীর শোকাবেগ সুতীব্র হইয়া উঠিলেও, তিনি ইহাকে বেশী দিন স্থায়ী হইতে দিলেন না। অল্পকাল মধ্যে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, তিনি স্বামীর আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যেই হরনাথের বিশাল ভক্তমণ্ডলীর জননী ও নেত্রী হইয়া উঠিলেন। হরনাথ-প্রচারিত ভাবধারা দ্বিগুণ বেগে প্রচার হইতে লাগিল এবং ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে অহেতুকী করুণা ও অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসার জন্য দীক্ষা গ্রহণ না করিয়াও ভক্তমণ্ডলীর মনে হরনাথের প্রতি সুগভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কুসুমকুমারীর নিকটেও তাহা লাভ করিয়া তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পিতার পরিবর্তে মাতার স্নেহধন্য হইয়া তাঁহারই স্নেহাঞ্চল-ছায়ায় হরনাথ

১। "The actor by changing his dress can remain amongst the spectators, unrecognised by them, but he can not go out of sight of the other members of the theatrical company. In whatever dress he may be dressed, they all recognise him at once." —*World Message*, 1927.

২। এই 'বিশ্বসন্দেশ'-এ হরনাথ বলিয়াছেন, "Go on playing your part with what remains. Such is my final wish."

সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেহ কেহ আবার তাঁহারই মধ্যে হরনাথকে প্রকটিত হইতে দেখিতে পান।[১] আবার কাহারও বা উপলব্ধি হইল, কুসুমকুমারী ও হরনাথ এক এবং অভিন্ন অথবা এক অখণ্ড সত্তার দুইটি প্রকাশ।

"Haranath and Kusumkumari are really two manifestations of the same Reality. We may think them as Two in One or One in Two according to the Trend."[২]

এইভাবে ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, কুসুমকুমারী হরনাথের প্রেমধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনদিন তিনি প্রচারের জন্য কোন বক্তৃতা দেন নাই। এমনকি, কোন তত্ত্বালোচনাতেও তিনি যোগদান করিতেন না। স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ মহিমময়ী হইয়া তিনি ভক্তদের মধ্যে আসিয়া শুধু দাঁড়াইতেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগদান করিতেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ, দুঃখ ও সমস্যার কথা মনোযোগের সহিত শুনিতেন, কখনও বা সংক্ষিপ্ত দুই একটি উপদেশ দিতেন এবং প্রয়োজনবোধে ভর্ৎসনাও করিতেন এবং সকল ক্ষেত্রে বলিতেন, "প্রভুকে ভুলিও না, সর্বদা তাঁর নাম জপ কর।"[৩] অর্থাৎ, ভক্তগণের সহিত তাঁহার আচরণের মধ্যে সন্তানের প্রতি জননীর আচরণ ছাড়া অলৌকিক কিছু ছিল বলিয়া মনে হইত না। ভক্তবৃন্দের মনেও তাঁহার প্রতি একটা সুগভীর আকর্ষণ ছিল। এমনকি তাঁহাকে চাক্ষুষ না দেখিয়াও বহু জন তাঁহার পরম নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হইয়াছিল। এই কারণে কুসুমকুমারীর ভক্তসংখ্যা দিনের পর দিন জ্যামিতিক হারে বর্ধিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশের বহু নরনারী প্রতিদিন তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া হরনাথ সম্প্রদায়ের আয়তন বৃদ্ধি করিতে থাকে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক অন্ধ্র প্রদেশেই

১। হরনাথ স্মৃতি : পঞ্চম লহরী—পৃঃ ৩৯, জ্ঞানদা দেবীর বিবরণী।

২। The Lord Supreme : Vol. 1 : No. 2 : Page 10.

৩। The Glory of Matusri Kusumkumari Devi : Page 33—By M. Sri Ramamurti.

তাঁহার ভক্তসংখ্যা দুই লক্ষের মতো হয়।* কেবলমাত্র এই দৃষ্টান্তটির সাহায্যেই বুঝিতে পারা যায়, তিরোভাবের পরেও হরনাথের ভাবধারা কিরূপ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং এই প্রচারের মূল কেন্দ্র কুসুমকুমারী।

একজন ভক্ত সত্যই বলিয়াছেন,—"After the passing away of our Lord, She carried the Mission of our Lord with double force without uttering a single word, but by her sweet graceful smile. She has won the hearts of thousands of devotees all over India and elsewhere."১

তিরোধানের পর হইতে ভক্তসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উৎসবসমূহও তেমনি ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। হরনাথের জীবিতকালে এক-একটি কেন্দ্রেই বিশেষ সমারোহে তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কখনও কচিৎ একাধিক স্থলে এই উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর হইতে নির্বাচিত কেন্দ্র ছাড়াও অপরাপর সমস্ত কেন্দ্রে জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান মহা সমারোহে হইতে থাকে।*

নির্বাচিত কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবের দুই-একটি ছাড়া প্রত্যেকটিতেই কুসুমকুমারী যোগদান করিয়াছেন এবং ভক্তদের উদ্দেশে 'বিশ্ব-সন্দেশ' প্রেরণ করিয়াছেন। কোকনদে অনুষ্ঠিত ১৯৩৩ সালের জন্মোৎসব হইতে ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি বেদীর উপর স্থাপিত হরনাথের চিত্রপটের বামে বসিতে আরম্ভ করেন।

'আনন্দ-মিলন' উৎসবও পূর্বের মতো সোনামুখীর বাগানবাটীতে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং দূর-দূরান্তর হইতে অগণিত ভক্তসমাগম

* Sri Kusum-Haranath: The Lord of Love—R. V. Rao: Introduction, Page (ii)

১। The Lord Supreme: 15th September, 1961, Page 35

* নির্বাচিত কেন্দ্রের উৎসব অবশ্য সর্বাপেক্ষা বেশী সমারোহসহকারে অনুষ্ঠিত হইত। ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৪ সালে পুরী, ১৯২৯ সালে দেউলটি, ১৯৩০ সালে কলিকাতা, ১৯৩১ সালে উলুবেড়িয়া, ১৯৪৪ সালে কোকনদ এবং ১৯৩৬ সালে খড়্গপুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচিত হয়।

হইতে থাকে। যে সকল ভক্ত আসিতে পারিতেন না, তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইতেন এবং পত্র বা প্রণামী প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিকতার পরিচয় দান করিতেন।

হরনাথ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ রচনা হরনাথের তিরোধানের পরেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পুস্তক ইংরাজী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, উড়িয়া এবং তেলেগু† ভাষায় রচিত বা অনূদিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় রচিত এই সমস্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাই প্রমাণ করে যে, তিরোধানের পরে হরনাথের প্রচারের পরিধি বহুব্যাপ্ত হয়।

হরনাথের নামে বহু আশ্রম ও মন্দির তাঁহার তিরোধানের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৯২৭ সালে গুজরাটে মুক্তাম্পুরের সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হরনাথ আশ্রম, উলুবেড়িয়ার ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহধর্মিণী প্রভাতনলিনী দেবী কর্তৃক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হরনাথ আশ্রম, পি. রামদাস কর্তৃক ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের ভদ্রাচলমের শ্রীকুসুম-হরনাথ মন্দির, ১৯৪১ সালে সেপুরী লক্ষীনর সহায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রায়চৌটীর শ্রীকুসুম-হরনাথ মন্দির এবং দৌভদের হরনাথ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুসুম হরনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪১ সালের ১০ই মার্চ, ১৯৫০ সালে রায়ভরপু সুব্বারাও কর্তৃক নেলোরে প্রতিষ্ঠিত হরনাথ আশ্রম এবং মাদিরেড্ডি বেঙ্কয় প্রমুখ ভক্তগণ কর্তৃক পূর্ব গোদাবরী জেলার আত্রেয়পুরম্-এর শ্রীমন্দির এবং ১৯৫৪ সালে ডাঃ পি. সুব্রাহ্মাম্ কর্তৃক গুন্টুরে প্রতিষ্ঠিত হরনাথ মন্দির প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ৮৫ বৎসর বয়সে কুসুমকুমারীর দেহাবসান হয়। তাঁহার তিরোধানের পরও হরনাথের প্রচার ব্যাহত হয় নাই। ভক্তবৃন্দ সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। হরনাথের নির্দেশ মত তাঁহারা শুধু তাঁহার বাণী নরনারীর কাছে পৌছাইয়া দেন। সেই বাণী যাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাঁহারই হৃদয়ে গাঁথিয়া যায় এবং তিনি হরনাথ-ভক্তে পরিণত হন। এইভাবে দিনের পর দিন হরনাথ-

† উড়িয়া ভাষায় উপদেশামৃত এবং তেলেগু ভাষায় "পাগল হরনাথ" ও হরনাথের উপদেশাবলী লইয়া কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়।

সম্প্রদায়ের পরিধি বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে এবং হরনাথের নামে নিত্যনূতন আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

১৯৬৫ সালের ৩রা জুলাই নিখিল ভারতের হরনাথ-ভক্ত নরনারীগণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে হরনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই উৎসবে বিপুল সমারোহ, অপরিমিত ভক্ত সমাগম, সপ্তদিবসব্যাপী 'কুসুম-হরনাথ' নাম সংকীর্তন এবং হরনাথ-তত্ত্বের ব্যাপক আলোচনা প্রমাণ করিয়াছে যে তিরোধানের পর সুদীর্ঘ আটত্রিশ বৎসরকাল গত হইলেও, ভক্ত নরনারীর চিত্তে হরনাথ-স্মৃতি অদ্যাপি অম্লান রহিয়াছে।

হরনাথ-সম্প্রদায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হরনাথ-সম্প্রদায়ের পরিধি বহু-বিস্তৃত। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের অধিকাংশ গ্রাম ও শহরে এবং প্রধান প্রধান নগরীসমূহে বহুসংখ্যক হরনাথ-ভক্ত নরনারী আছেন। ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত বহু স্থানেও, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হরনাথ-ভক্ত নরনারী অদ্যাপি বর্তমান। এমনকি, সুদূর ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও কিছুসংখ্যক হরনাথ-ভক্ত ও অনুরাগীর সন্ধান পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হরনাথ-কুসুমকুমারীর নিকট-সংস্পর্শে আসা তো দূরের কথা, তাঁহাদের কাহাকেও চাক্ষুষ দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হরনাথের পত্রাবলী পাঠ করিয়া অথবা কোন প্রাচীন ভক্তপ্রমুখাৎ তাহা অবগত হইয়া, অনেকে হরনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন—ধীরে ধীরে সেই আকর্ষণ ভক্তিতে ও অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। ফলে, তাঁহারা হরনাথের-ভক্ত ও অনুরাগী হইয়া হরনাথ-সম্প্রদায়ের পরিধি বিস্তৃততর করিয়াছেন।

হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে গেলে কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। হরনাথ নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, কুসুমকুমারীও কাহাকেও দীক্ষা দান করিতেন না। হরনাথ-ভক্তগণের মধ্যেও কেহ দীক্ষা দিবার অধিকার পান নাই। হরনাথের পত্রাবলী বা জীবন-কাহিনী পাঠ, তাঁহার তত্ত্বালোচনা এবং তাঁহার উপদেশসমূহ সাধ্যমত পালন করিলেই হরনাথ-সম্প্রদায় মধ্যে স্থানলাভ করা যায়। আবার ইহাদের কোনটি না করিয়া শুধুমাত্র 'কুসুম-হরনাথ' নাম স্মরণ করিলেও, হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে বাধা নাই। এত সহজে অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর সংখ্যা দিনের পর দিন বর্ধিত হইতেছে।

হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পরেও কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয় না। জাতি, ধর্ম বা সমাজগত কোন স্বাতন্ত্র্যই বিসর্জন দিতে হয় না। সকল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও হরনাথ-ভক্ত

হইতে কোন বাধা নাই। হরনাথ কাহারও উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিতেন না। শুধু ভালবাসিতে বলিতেন—পুত্রের জন্য জননীর অন্তরে যে স্নেহ, স্বামীর জন্য পত্নীর অন্তরে যে প্রেম, ভগবানকে সেই স্নেহের চন্দনে চর্চিত করিতে, সেই প্রেমের পুষ্পে পূজা করিতে তিনি নির্দেশ দিতেন। সেজন্য কোন আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। সময়-অসময়ের, শুচি-অশুচির বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। যখন হউক, যেভাবে হউক, তাঁহার কথা চিন্তা বা তাঁহার নাম জপ করিলেই হইল।

ভগবানের অসংখ্য প্রকাশ। বিভিন্ন হইলেও সকল প্রকাশই সেই এক এবং অখণ্ডের। সুতরাং যে রূপটি যাহার ভাল লাগে, সেই রূপেই তাঁহার চিন্তা করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, সেই নাম জপ করিতে বলিয়াছেন।

সুতরাং কোন ধর্ম, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই হরনাথের ভক্ত হইতে বাধা নাই। সেই কারণে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নরনারী হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন।

সুতরাং সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র করিয়া চিহ্নিত করিবার কোন উপায় হরনাথ রাখেন নাই। স্নেহসহকারে বা ভালবাসিয়া ভগবানের যে-কোন রূপের চিন্তা যিনি করেন, তিনি যে-কোন ধর্মের, যে-কোন জাতির বা যে-কোন সম্প্রদায়ের হইতে পারেন, কিন্তু তিনি হরনাথ-অনুসারী। এই হিসাবে নিখিল বিশ্বের যে সমস্ত নরনারী স্নেহ বা প্রেমভরে ভগবচ্চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত। অর্থাৎ বিশ্বজন হরনাথের, হরনাথ বিশ্বজনের।

কিন্তু ইহা হইল তত্ত্বের দিক। তথ্যের দিক দিয়া হরনাথের এই বিশ্বজনীন ঔদার্য নিখিল বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, উদ্‌বুদ্ধ স্নেহপ্রেমে ভগবানের চিন্তা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষে আপনাদিগকে হরনাথ-অনুসারী বলিয়া গণ্য করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সেইজন্য হরনাথ এবং তাঁহার সম্প্রদায় একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানে নরনারীর সজ্ঞান মনে

হরনাথের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ জাগ্রত হইয়াছে, সেই স্থানকেই বিশেষভাবে হরনাথ-অনুসারী বলিয়া গণ্য করা হয়। যে সমস্ত নরনারীর অন্তরে হরনাথের মূর্তি, চিত্রপট, উপদেশ বা ভাবধারার প্রতি যে-কোন কারণেই অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহাদেরই হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা চলে।

এইভাবে চিহ্নিত করিলেও হরনাথ-ভক্তের সংখ্যা যাহা দাঁড়ায়, তাহাও নিতান্ত অল্প নয়। হরনাথ বা কুসুমকুমারী ইহাদিগকে বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ পালন করিবার নির্দেশ দান করেন নাই। তৎসত্ত্বেও কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে দেখা যায়, যাহা দ্বারা ইহাদিগকে বিশেষভাবে হরনাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমতঃ, ইহারা সকলেই হরনাথের ঈশ্বরত্বে এবং কুসুমকুমারীর ঈশ্বরীত্বে বিশ্বাসী। চৈতন্যানুসারীগণের মনে যেমন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, হরনাথ-ভক্তমাত্রেরই তেমনি দৃঢ় বিশ্বাস হরনাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্ন। তাঁহাদের মতে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, নদীয়ার নিমাই আর সোনামুখীর হরনাথ একই সত্তার বিচিত্র প্রকাশ, পরিণতির পথে একই ধারার ক্রম-বিবর্তন মাত্র।

সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রাধা এবং শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো কুসুমকুমারীকে হরনাথের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া মনে করেন। এই বিশ্বাসই হরনাথ-সম্প্রদায়ের প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

হরনাথের ঈশ্বরত্ব এবং কুসুমকুমারীর ঈশ্বরীত্বের স্বরূপ অবশ্য সকলের নিকট সমান নয়। হরনাথকে কেহ গোপাল ভাবে অর্চনা করেন, আবার কেহবা গৃহদেবতা গোপাল-বিগ্রহের সহিত একাকার হইতে দেখেন। কেহবা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভজনা করেন। এই ভাবের ভজনায় শান্ত, সখ্য, দাস্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের ভাবুকও আছেন। কুসুমকুমারী কাহারও নিকট মহেশ্বরী, মহাশক্তি বা আদ্যা-শক্তি রূপে পূজিত হন, আবার কাহারও নিকট মহালক্ষ্মী রূপে প্রতিভাত হন। রাসেশ্বরী রূপেও তাঁহার অর্চনা কোন কোন ভক্ত

করিয়া থাকেন। কেহবা তাঁহার মধ্যে হরনাথের দর্শনও লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, কুসুম-হরনাথ একই সত্তার দ্বৈত প্রকাশমাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, ইঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, অপ্রকট হইলেও কুসুম-হরনাথের লীলা অদ্যাপি চলিতেছে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সকল সমস্যা-সমাধানে পরম নির্ভরতায় হরনাথ-কুসুমকুমারীর শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা, অপ্রকট অবস্থাতেও হরনাথ ও কুসুমকুমারী সর্বদাই তাঁহাদের কল্যাণসাধনে নিরত। কেহ কেহ তাঁহাদের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াও দাবি করেন।

"After the Lord departed in 1927, His play has become more wide and intensive. Now the Mother has joined Him. They are now like two engines pulling us up."[১] ইহা প্রত্যেকটি হরনাথ-ভক্তের আন্তরিক বিশ্বাস।

হরনাথ-ভক্তগণ তাই নিষ্ঠাসহকারে হরনাথ-কুসুমকুমারীর চিত্রপট পূজা করেন, কুসুম-হরনাথ নামসংকীর্তন করেন এবং কোন উপলক্ষে কয়েকজন মিলিত হইলেই হরনাথের জীবন ও বাণীর আলোচনায় নিয়োজিত হন।

ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইয়াও হরনাথ ও কুসুমকুমারীকে তাঁহারা অতি আপনার জন বলিয়া মনে করেন এবং আপন জনের মতই তাঁহাদের চিত্রপটের সেবা করেন। চিত্রপটের পূজার্চনা ও ভোগারতির ব্যাপারে কোনরূপ বিশেষ আয়োজন করাকে ইঁহারা বাহুল্য বলিয়া মনে করেন। হরনাথ ও কুসুমকুমারীর জন্মতিথি প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলিতে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম হয়। এই সমস্ত দিনে প্রত্যেক ভক্তই সাধ্যমত পূজা, অর্চনা, ভোগ ও আরতির বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

যুগলমূর্তি-অঙ্কিত লকেট ধারণও হরনাথ-ভক্তগণের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই লকেটের জন্য হরনাথ-ভক্তদের অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

১। The Lord Supreme: 25th January, 1962 : Page 19

হরনাথ-ভক্তগণের একত্র সম্মিলনের অনেক সুযোগ আছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে হরনাথের নামে প্রতিষ্ঠিত বহু আশ্রম ও মন্দির আছে। হরনাথ ও কুসুমকুমারীর জন্মতিথি উপলক্ষে এই সমস্ত আশ্রম ও মন্দিরে উৎসবের আয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, এইগুলির বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষেও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত উৎসবে যোগদান করিতে হরনাথ-ভক্ত নরনারীমাত্রেই আগ্রহশীল। বিভিন্ন দেশের ভক্তগণ বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও সমাজগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই সব অনুষ্ঠানে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হন এবং পরস্পরের মধ্যে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিনিময় সাধন করেন।

'আনন্দ-মিলন'ও এইরূপ একটি উৎসব—ইহা বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। একবার দুর্গাপূজার সময়, আর একবার ৩১শে ডিসেম্বর।

এই দুইটি উৎসবই কেবলমাত্র সোনামুখীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব দুইটির যে-কোন একটিতে যোগদান করা হরনাথ-ভক্ত-মাত্রেরই একান্ত কাম্য। ইহাতে উৎসবের আনন্দলাভও হয়, আবার হরনাথ-কুসুমকুমারীর পবিত্র জন্মস্থান দর্শনের পুণ্যলাভও হয়। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে এই দুইটি উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হয় না, তাঁহারা কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হরনাথ ও কুসুমকুমারীর জন্মতিথি উপলক্ষে সোনামুখী আগমন করেন।

মোটের উপর, জীবনে অন্ততঃপক্ষে একবার সোনামুখী আগমন করা হরনাথ-ভক্তমাত্রেরই একান্ত কাম্য। কারণ, সোনামুখী পাগল হরনাথের ও কুসুমকুমারীর জন্মভূমি। সুতরাং হরনাথ-ভক্তের নিকট সোনামুখী মহাতীর্থ। সোনামুখী সম্বন্ধে একজন হরনাথ-ভক্ত বলিয়াছেন—"What Mecca is for Mohammedans, Jerusalem for Christians, Sonamukhi, the birth place of our Lord Kusum-Haranath, is to us all."*

হরনাথের ভক্তগণের মধ্যে কোনরূপ ভেদ-বিচার নাই। জাতি-

---

* Sri K.T. Mody: Sri Thakur Haranath: The Lord Supreme: Vol. 2: No. 1: 25th January, 1952.

ধর্ম-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল হরনাথ-ভক্তেরই সমান অধিকার। ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, শুচি, অশুচি প্রভৃতির ভেদ-বিচার কোন হরনাথ-ভক্তেরই নাই। সতীর্থ হিসাবে ইঁহারা সকলকেই সমজ্ঞান করেন। পূজারতি, ভোগ-রাগে কাহারও কোন বাধা-নিষেধ নাই। প্রসাদগ্রহণের কালেও কোনরূপ ভেদ-বিচার নাই। একত্র হইয়া নামসংকীর্তন, তত্ত্বালোচনা, প্রসাদগ্রহণ ও পান-ভোজনাদি করিয়া তাঁহারা অপার আনন্দ অনুভব করেন।

হরনাথের বাণী

ভারতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে পাগল হরনাথের মতবাদ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অথচ ঈশ্বর-সাধনা বিষয়ে তিনি যে নূতন কোন পদ্ধতির সন্ধান দিয়াছেন, তাহা নয়। হরনাথের উপদেশাবলী পর্যালোচনা করিলে বরং ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বা প্রচলিত কোন কিছুকেই তিনি অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং পদ্ধতির নূতনত্বে নয়, পদ্ধতি-নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতায় এবং বিধি-নিষেধের হ্রস্বতা বা বিলুপ্তিসাধনেই পাগল হরনাথের মতবাদের বৈশিষ্ট্য নিহিত। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সময়ে সময়ে হরনাথের মতবাদ প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রমরূপে প্রতিভাত হয়। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জনমানসে পাগল হরনাথের মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অথচ পাগল হরনাথের মতবাদ যখন জনপ্রিয়তা লাভ করে, সেই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ বিশ্বজনীন মানবধর্মের সার্বভৌম আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ। ইহার শতাব্দীকাল পূর্বে রাজা রামমোহন যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় তাহা ইতিমধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাধনায় তাহার পরিধি আরও বিস্তৃত হইয়া, 'নববিধান' নামে বিশ্বজনীন মানবধর্মরূপে শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয়। রামকৃষ্ণদেবের সাধনালব্ধ সর্বধর্মসমন্বয়ের সার্বভৌম আদর্শ প্রচার করিয়া বিবেকানন্দ বিশ্ব বিজয় করে। ধর্মের এই বিশ্বজনীন আদর্শে সমগ্র ভারত যখন উদ্‌বুদ্ধ, সেই সময়ে পাগল হরনাথের মতবাদও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না।

এই বিশেষত্বের উপাদান—পাগল হরনাথের চৈতন্যানুসারী মতবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে এই বিশেষত্ব খুব সুলভ নয়। সুতরাং এই মতবাদের জন্যই পাগল হরনাথের স্বাতন্ত্র্য—একথা মনে করা যেমন অসঙ্গত হয় না, তেমনি আবার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে তাঁহার ভূমিকা

গুরুত্বপূর্ণ—এই সিদ্ধান্তও অসঙ্গত মনে হয় না। হিন্দু ধর্ম সাধনার দুইটি প্রধান ধারা—শক্তি সাধনা ও বৈষ্ণবমতানুসারী সাধনা। শতাব্দীর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এই ধারা দুইটি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ধারাই হিন্দু ধর্মকে বিদেশী সংস্কৃতির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং যথার্থ কথা বলিতে গেলে, সাধনার ক্ষেত্রে অধিকারগত বিধি-নিষেধের হ্রস্বতা সাধন করিয়া ধর্মকে জনসমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে যখন ইসলামের সহিত সংঘাতের ফলে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তন্ত্রাচারী শক্তি সাধনা তখন বৃহত্তর জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আপন অস্তিত্ব সঙ্গোপনে রক্ষা করিতেছিল। বৈষ্ণব সাধকগণ কর্তৃক প্রদর্শিত পথেই তখন হিন্দুর অধ্যাত্ম-পিপাসার নিবৃত্তিসাধন হইয়াছিল। নিম্বার্ক, মাধবেন্দ্র পুরী, রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য, নামদেব প্রভৃতি সাধকগণ সম্প্রদায়, জাতি এবং বহু ক্ষেত্রে ধর্মগত বিভেদেরও বিলুপ্তি সাধন করিয়া ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে সার্বজনীন অধিকার দান করিবার ব্যাপক প্রয়াস করিয়াছিলেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের এই বিশিষ্ট ধারাটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব হইতে বাংলা তথা ভারতের শিক্ষিত তারুণ্যকে মুক্ত করিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজা রামমোহন রায়ের যে ভূমিকা, মত ও পথ ভিন্ন হইলেও মধ্যযুগে ইসলামী সংস্কৃতির কবল হইতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধক-বর্গেরও ছিল সেই একই ভূমিকা। তাঁহাদের ভক্তিরসাশ্রিত প্রেম-ধর্মই জনসমুদ্র-হৃদয়ে আলোড়ন তুলিয়া হিন্দুকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সহায়তা করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনাকালে কিন্তু এই বিশিষ্ট ধারাটির প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই সময়ে যখন পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে হিন্দু ধর্মের নব মূল্যায়ন হইতেছিল, সেই সময়ে এই সুপ্রাচীন ধারাটির যুগোপযোগী সংস্কারসাধনের কোন প্রয়াস কেহ করেন নাই। বরং

রাজা রামমোহন রায়ের মতো নিরপেক্ষ সমালোচকও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র বক্রোক্তি করিয়াছেন। "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য-চরিতামৃত শব্দ ব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"[১]

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজের মনোভাব সর্বত্রই এই জাতীয় বিরূপ বক্রোক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পুরোহিত রাজা রামমোহনের পৌরুষকে স্পর্শ করে নাই। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী রামমোহন ধর্মের আবেগবেপথু-উল্লাসকে সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া-ছিলেন এবং প্রেমভক্তিবিহ্বল ঐশী চেতনাকে পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দৃঢ় ভিত্তির উপর হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। মনে হয়, সে-যুগে ইহা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যুক্তিবাদের গ্রহণ-ক্ষমতা সকলের নাই।

সীমাবদ্ধ শিক্ষিত গোষ্ঠীর বাহিরে ইহার প্রভাব তেমন কার্যকরী হয় না। জনসমুদ্রের হৃদয়ে যাহা আলোড়ন জাগাইতে পারে, তাহা যুক্তি নহে—ভক্তি। যুক্তির আবেদন বুদ্ধির নিকট কিন্তু ভক্তির আবেদন হৃদয়ের দ্বারে। যুক্তিবাদ জ্ঞানমার্গের। "জ্ঞান বিচার পুরুষ মানুষ, বারবাড়ী পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি, ঈশ্বরে ভালবাসা মেয়ে-মানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।"[২] ইতিহাসের সাক্ষ্যেও বারে বারে প্রমাণিত হইয়াছে, যুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আবেদন জাগাইবার ক্ষমতা ব্যাপকতর। শঙ্করাচার্যের যুক্তিবাদ হিন্দু ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেও, সার্বজনীন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের রাগানুগা ভক্তির সাধনা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় জয় করিয়া ধর্মকে সার্বজনীন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, উচ্চপদস্থ রাজ-

১। পথ্যপ্রদান—রাজা রামমোহন রায়
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতা

কর্মচারী হইতে সাধারণ পথের ভিক্ষুকের অন্তর পর্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্ব-মানবধর্মের পর্যায়ভুক্ত হইয়াও সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় নাই। কেশবচন্দ্র সেনের উক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—"শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী আমাকে ও আমার ধর্মকে গ্রহণ করিবে।"[১]

বাস্তবিকপক্ষে, ভক্তিরসাশ্রিত প্রেমই ঈশ্বর-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। ভগবৎ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ না হইলে অন্তর ঈশ্বর-চিন্তায় নিরত হইতে পারে না। জ্ঞানযোগের সাহায্যে ঈশ্বর দর্শন মূকাস্বাদনবৎ। জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরের উপলব্ধির প্রকাশ ক্ষমতার বাহিরে। জ্ঞানের প্রখর সূর্যালোকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি সমস্ত রিপু ধ্বংস হয়, কিন্তু ভগবৎ প্রেমের মধুর রসে অন্তরকে পরিসিক্ত করিতে একমাত্র ভক্তিযোগই সক্ষম। হৃদয়কে ঈশ্বরমুখীন করার জন্য তাই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিই অধিকতর উপযোগী। সমস্ত ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। অন্যান্য সকল পথের মধ্যে ভক্তিপথেই সর্বাপেক্ষা সহজে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।[২] ভক্তিমতে প্রথমে নিষ্ঠা, পরে ভাব, তাহার পর প্রেম। ঈশ্বরলাভের সর্বপ্রধান উপাদান এই প্রেম। ইহা ধর্মসমন্বয়েরও প্রধান উপাদান। প্রেমের আলোকে ঈশ্বরের রসরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন সকল ধর্মের একত্ব ও অভিন্নত্ব স্বতঃই উপলব্ধ হয়।

সুতরাং সমন্বয়ের প্রয়াসে প্রেমভক্তির পথ পরিহার করায়, রাজা রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' নূতন একটি ধর্মরূপেই পরিচিত হয়। সার্বজনীন ধর্মরূপে সর্বজনের হৃদয়গ্রাহ্য হয় নাই। যদিও যে ব্রহ্মের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ধর্মগত

১। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ—নবশঙ্কর রায়-চৌধুরী। দ্রঃ উদ্বোধন ৫৬ তম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃঃ ৪১

২। রামকৃষ্ণ গীতা, পৃঃ ৯৮—কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বর লাভ করা যায়। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও অপর নানা পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু সে পথ এখন ভারী কঠিন।

বিশ্বাসের ব্রহ্ম, নীরস দর্শন শাস্ত্রের ব্রহ্ম নয়।[১] অথচ প্রেম ও ভক্তির পথে রামকৃষ্ণদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী তথা ভারতের জনমানসে, এমনকি নিখিল বিশ্বের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও, স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্মসমন্বয়-সাধনার প্রয়াসে রামমোহন ও রামকৃষ্ণের পার্থক্য—এই পথের পার্থক্য। রামমোহন তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্বে উপনীত হইয়া সকলের উদ্দেশ্যের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন আর রামকৃষ্ণ ভক্তিরসাশ্রিত প্রেমের পথে সাধনা করিয়া বিভিন্ন ধর্মের সার ও সত্য উপলব্ধি করিয়া সকল পথ এবং সকল মতের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। এই বিষয়ে রামকৃষ্ণের সহিত হরনাথের ঐক্য আছে। হরনাথও ভক্তিরসাশ্রিত প্রেমধর্মের সাধন-পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। পার্থক্য এই যে, সর্বধর্মের সমন্বয়-সাধক রামকৃষ্ণদেব ছিলেন মূলতঃ শাক্ত আর হরনাথ ছিলেন মূলতঃ বৈষ্ণব। রামকৃষ্ণের মতো বিভিন্ন মতের সাধনা হরনাথের ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত ধর্মাচার্যগণের মধ্যে রামকৃষ্ণের মতো প্রভাবশালী কেহই ছিলেন না। এই সময়ে আবির্ভূত প্রায় সকল ধর্মাচার্যের উপরেই রামকৃষ্ণের প্রভাব অল্প-বিস্তর বিদ্যমান ছিল। রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তার উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব থাকার কথা নয়, বরং রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম ভাবনায় রামমোহনের প্রভাব থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। কারণ, রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাঁহার ধর্ম শিক্ষিতের কাছেই উপস্থাপিত ছিল। সাধারণ্যে তাহার কোনই প্রচার ছিল না। তিনি ধর্মপ্রচারক ছিলেন না; কোন বিশিষ্ট ধর্মমতও প্রচার করেন নাই—যুগোপযোগী একটি ধর্মমত সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি তুলনামূলক ধর্মালোচনার প্রবর্তন করেন। ইহা বহুল পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষার ফল। ভক্ত-ভাগবত শ্রেণীর ধার্মিকের ধর্মীয় চিন্তা রামমোহনের ছিল

১। সুশীলকুমার দে—নানা নিবন্ধ, কলিকাতা ১৯৫৪, পৃঃ ২৩৭

না। তিনি ভোগ ও বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সুতরাং প্রায়-নিরক্ষর পরমভাগবত এবং ত্যাগ ও নিরাসক্তির পবিত্র প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্ম সাধনায় রামমোহনের প্রভাব থাকিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রামমোহনের উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে ভক্তভাগবত শ্রেণীর ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ বা দেবেন্দ্রনাথ কেহই কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হন নাই।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তবুও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার উপর রামকৃষ্ণের কোনরূপ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনের পরিণত স্তরে রামকৃষ্ণের মতো প্রেমধর্মের পথে ঈশ্বর সাধনার আভাস পাওয়া যায়।[১] ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'নববিধান'-এর প্রবর্তক হইয়াও রামকৃষ্ণকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই কেশবচন্দ্রের চক্ষে রামকৃষ্ণ কখনও 'জন দি ব্যাপটিস্ট', আবার কখনও বা 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীর চৈতন্য'-রূপে প্রতিভাত হইতেন।[২] সাধক বিজয়কৃষ্ণের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব পরিপূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল।[৩] প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলেও ঋষি অরবিন্দ রামকৃষ্ণের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৪] মহাত্মা পাওহারী বাবা রামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন।[৫] হরনাথের মনেও রামকৃষ্ণের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল।[৬] তৎসত্ত্বেও হরনাথের ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, যদিও তাঁহার মতবাদে রামকৃষ্ণ-প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত—একথা জোর করিয়া বলা যায় না।[৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় চিন্তা-ধারায় দুইটি সীমান্ত—

১। আত্মজীবনী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৪৫

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৫৪

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮৭—১৯০

৪। Awakening India : Arabinda Ghosh (Vide Speeches and Writings of Eminent Indians : S. K. Banerjee : Page 56)

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৮

৬। Pagal Haranath (Part V) পত্রসংখ্যা ৪১, পৃঃ ৯৪

৭। হরনাথ ও রামকৃষ্ণ শীর্ষক অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রামমোহন ও রামকৃষ্ণ। এই উভয় সীমান্তের মধ্যবর্তী কালে আবিভূ´ত ধর্মাচার্যগণের ধর্মীয় চিন্তা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পথে সঞ্চরণ করিয়া অবশেষে ভক্তির পথকেই যুগের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

ধর্ম-সংস্কারের সচেতন প্রচেষ্টা রামমোহনের চিন্তাধারাতেই সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। এক সার্বজনীন ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনই ছিল রামমোহনের মতে প্রকৃষ্ট উপায়। এই বিশ্বজনীন ধর্মকে তিনি জাতীয় আকারে প্রচার করিতে অভিলাষী ছিলেন। "এইজন্য একদিক হইতে যেমন ভারতবর্ষের লোকদিগের বেদান্ত প্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসানার জন্য এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদয় লোককে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর একদিক হইতে তিনি কি বলিলেন? না, বাইবেলকে নিয়ামক বলিয়া তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্বক বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই প্রকার কোরাণকে নিয়ন্তা করিয়া মহম্মদকে পরিত্যাগপূর্বক, কোরাণ দ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল।"[১]

ইহার ফলে, রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের কোনটিতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি[২] অল্পকাল মধ্যে উঠিয়া গেল এবং ব্রাহ্ম সমাজের[৩] সদস্য সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রহিল। অথচ রামমোহন রায় নিজেকে পরিপূর্ণ হিন্দু বলিয়া ঘোষণা

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (পৃঃ ৩৮৬) বিশ্বভারতী ১৯৬২

২। ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে হরকরা সংবাদপত্র অফিসের দ্বিতলে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের একত্ববাদ প্রচার করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। এখানে খ্রীষ্টীয় মতানুসারে উপাসনা হইত।

৩। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট এই সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডে কমললোচন বসুর ভাড়া বাড়ীতে এই সভার অধিবেশন হইত।

করিতেন। তিনি হিন্দু প্রথানুযায়ী পিতৃশ্রাদ্ধ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। মেরী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন,—"After his death, the thread of his caste was seen round him, passing over his left shoulder and his right."[১]

রামমোহনের বিশ্বাস ছিল যে, পরমেশ্বর রাজা ও প্রভু। সেইজন্য তিনি কখনও ধুতি-চাদর পরিয়া উপাসনা-গৃহে যাইতেন না, পোশাক পরিয়া যাইতেন। 'রাজরাজেশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইতে হইলে উপযুক্তভাবে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।'[২]

রাজা রামমোহনের পর যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং অক্ষয়কুমার দত্তই প্রধান। অষ্টম কিংবা নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের সংস্পর্শে আসেন। রামমোহনের সংস্পর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরে ধর্মভাবের উন্মেষ হয়। এই বয়স রাজার বিরাট ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিবার বা তাঁহার উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে উপযোগী ছিল না। রাজাও তাঁহাকে কোন উপদেশ দেন নাই। তথাপি দেবেন্দ্রনাথের উপর রামমোহনের এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবের ফলে তিনি রামমোহন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হন।

'যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।'[৩]

রামমোহন কর্তৃক অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে, দেবেন্দ্রনাথ প্রথমেই পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে থাকেন। দৈবক্রমে একদিন বায়ু-তাড়িত হইয়া একটি সংস্কৃত গ্রন্থের ছিন্নপত্র

১। Mary Carpenter: The Last Days in England of Raja Rammohan Ray: Calcutta: 1915: Page. 2

২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ১৯৬২, পৃ: ২৭৮

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ১৯৬২, পৃ: ২৭৫

তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। কৌতূহলবশে দেবেন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করেন কিন্তু ইহার অর্থবোধ হইল না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উক্ত ছিন্নপত্রে ঈশোপনিষদের শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিলে, দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ এবং অন্যান্য পণ্ডিতের কাছে আরও ছয় উপনিষদ্ পাঠ করিলেন। এইভাবে উপনিষদে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিল এবং সত্যের আলোক পাইয়া তাঁহার জ্ঞান ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ সেই সত্যধর্ম প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা সেই সঙ্কল্পের ফল। তত্ত্বরঞ্জিনী সভাই কালক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর) 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার সভ্যরূপে অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রথম সংবাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় ১৮৪২ সালে। ইহার অব্যবহিত পরেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা'কে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত করিয়া দেন।

ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তিনটি বিঘ্নের সম্মুখীন হইলেন। প্রথম বিঘ্ন পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বিঘ্ন খ্রীষ্ট ধর্ম এবং তৃতীয় বিঘ্ন বৈদান্তিক মত। তাঁহার মতে, পৌত্তলিকেরা যেমন ব্রহ্মাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করে, বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।[২] প্রথমে তিনি ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করায়, ইহা দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা হারাইল। উপাস্য ও উপাসক অভিন্ন হইলে কে কাহাকে উপদেশ দিবে? দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের উপর নির্ভর করিলেন। কিন্তু উপনিষদেও যখন 'সোঽহস্মি'

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২০—২৪

২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ১৯৬২, পৃঃ ১২৪

এবং 'তত্ত্বমসি' দেখিলেন, তখন ইহারও উপর ক্রমে ক্রমে তাঁহার আস্থা শিথিল হইতে লাগিল এবং উপনিষদ্‌কে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি করিতে চাহিলেন না। আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়কে তখন তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেন। হৃদয়ের সহিত যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই গ্রহণযোগ্য ভাবিয়া দেবেন্দ্রনাথ মাত্র তিন ঘণ্টায় 'ব্রাহ্ম ধর্ম' গ্রন্থ অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়া লেখান।

ব্রাহ্ম ধর্মের মূল দুইটি—একটি উপনিষদ্, দ্বিতীয়টি নিয়মনিষ্ঠা। প্রথম খণ্ডে উপনিষদ্ সমাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় খণ্ডে অনুশাসন অংশ লিপিবদ্ধ হয়। এই অনুশাসন ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের জন্য দেবেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের ব্যবস্থা এবং বাৎসরিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এইভাবে রামমোহন রায়-প্রবর্তিত যে ব্রহ্মোপাসনা সূত্রাকারে ছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে বিধিবদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্মে পরিণত করেন। তাঁহার উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় ব্রাহ্ম ধর্ম সু-প্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক হিন্দু সন্তানকে খ্রীষ্টান করার প্রয়াসও প্রবলভাবে বাধা পায়।

ঈশ্বরের সহিত উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধ—ইহাই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রাণ। সাধনা দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করেন। তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার সখ্য সম্বন্ধটি প্রতিভাত হয়। এই সখ্য সম্বন্ধ অটুট রাখার জন্য হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি পরমাত্মাকে নিবেদন করাই দেবেন্দ্রনাথের মতে পরম সাধনা। তাঁহার মতে, ভগবান মানুষকে যে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ—মানুষ নিজে নিজে তাঁহাকে প্রীতি নিবেদন করিবে। ভয়ে ভীত হইয়া মানুষ তাঁহার সাধনা করিবে—ইহা তাঁহার কাম্য নয়। মানুষের আনুগত্যও তাঁহার কাম্য নয়—মানব-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতিই পরমাত্মার একমাত্র কাম্য। 'আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্বস্ব দান করি, আমাদিগের স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায় এই। এস্থলে, অনুরোধ, ভয়, বাধ্যতা—ঐ সকল কিছুই

নাই। কারণ আপনা হইতেই তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চাহেন।'[১]

পরমাত্মার প্রতি মানব-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতিসম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহার সহিত বৈষ্ণব সাধকগণের রাগানুগাভক্তির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধু স্বরূপে।

পৌত্তলিকতার বিরোধী দেবেন্দ্রনাথের মতে ঈশ্বরের বিশিষ্ট কোন রূপ নাই—তিনি নিরাকার, নির্বিকার, অনাদি, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান। দেবেন্দ্রনাথ এই স্বরূপকে পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বা ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগণের ঈশ্বর বিশিষ্ট নামে এবং বিশিষ্ট রূপে পরিচিত। পরিচিত রূপে তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করিয়া বৈষ্ণব সাধকগণ বিভিন্ন ভাবে তাঁহার সাধনার নির্দেশ দিয়াছেন। এই সাধনার উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি বিধান, লক্ষ্য তাঁহার সাহচর্য লাভ। দেবেন্দ্রনাথের সাধনার লক্ষ্যও ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা। ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকাই তাঁহার মতে মুক্তি। 'সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা তাহাতেই যথার্থ মুক্তি।'[২] বৈষ্ণব সাধনার দাস্য ভাবের সহিত ইহার পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। সুতরাং রাজা রামমোহনের জ্ঞানমার্গের উপলব্ধি-সঞ্জাত 'ব্রহ্মোপাসনা'র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিমার্গে সঞ্চরণ করিবার প্রবণতা দেখা যায়।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। তাহার পর তিনি কিছুকাল যাবৎ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'য় শিক্ষক তা করেন এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে, তিনি ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর অক্ষয় কুমার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন।

অক্ষয়কুমার ছিলেন যুক্তিবাদী ও সংস্কারপন্থী। তাঁহার অকাট্য

১। ব্রাহ্ম ধর্মের মত ও বিশ্বাস—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ১৮৬৯, পৃঃ ৮০

২। ব্রাহ্ম ধর্মের মত ও বিশ্বাস—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ১৮৬৯, পৃঃ ৯২

যুক্তির বলে দেবেন্দ্রনাথকে স্বীকার করিতে হয় যে, বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট এবং অভ্রান্ত নয়। তিনি পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থাও রহিত করেন। অক্ষয়কুমারের ছিল বিজ্ঞানীর মন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানের আকর। সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়মই তাঁহার মতে মানুষের কার্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। তাই তাঁহার মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কার্য করাই ধর্ম, ইহার অন্যথাচরণ অধর্মের নামান্তর মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ঈশ্বরের সৃষ্ট, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা ঈশ্বরের নিয়মলঙ্ঘনের অপচেষ্টা। সেইজন্য অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে, 'মানবকুলের হিতসাধন করাই যথার্থ উপাসনা।'[১]

অক্ষয়কুমারের মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম পালনই প্রকৃত ধর্মাচরণ। ইহা দ্বারা পরমেশ্বরের প্রীতি বিধান করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করা হয়। অক্ষয়কুমার ইহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন, "পরমেশ্বরকে প্রীত করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই ব্রাহ্ম ধর্ম।" যে সমস্ত কার্য আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণপণ করিয়াও তাহার সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয় কার্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্বক তৎসমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।[২] সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও, অক্ষয়কুমারের মতে ঈশ্বরের প্রীতিবিধান ও মানবের হিতসাধন প্রয়াসই পরম সাধনা।

রাজনারায়ণ বসুর মতে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রীতিসাধন ধর্মসাধনার মর্মকথা। তাঁহার সারধর্ম অনুষ্ঠান ও প্রচারের প্রধান লক্ষণ ঈশ্বরের

১। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়: দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা ১৯০৭। উপক্রমণিকা—পৃঃ ৪০

২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার: দ্বিতীয় ভাগ—কলিকাতা ১৮৭৩, বিজ্ঞাপনের পৃঃ ৫

প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান এবং 'সকল মানুষের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন।'[১] তাঁহার মতে, 'ঈশ্বর আমাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদ বস্তু। প্রীতি এই বিশ্বের জীবন-স্বরূপ। আমাদের সকল উদ্বোধ, সকল ভাব, সকল বাক্য, সকল কার্যের মূল প্রীতি।'[২]

এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রেমের পথে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলন আকৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাধনায় ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৮৫৮ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তাঁহাকে পাইয়া তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অমিত শক্তি সঞ্চার হইল। ব্রাহ্ম সমাজও এই তারুণ্যের স্পর্শে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ এবং নবীন কেশবচন্দ্রের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজের একটি গৌরবমণ্ডিত যুগের সূচনা হইল। ধর্ম-শিক্ষার জন্য ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কেশবচন্দ্র প্রতি রবিবার প্রাতে উক্ত বিদ্যালয়ের অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। অনতিকাল মধ্যেই কেশবচন্দ্র তৎকালীন শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎবর্গকে লইয়া 'সঙ্গত সভা' নামে একটি সুহৃদ্ গোষ্ঠী স্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র স্ত্রীলোকদেরও ধর্ম-শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিলেন। 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' গঠিত হইল এবং 'বামাবোধিনী' পত্রিকা নামে স্ত্রীপাঠ্য একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হইল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের সহিত নবীন ব্রাহ্মগণের মতবিরোধ উপস্থিত হইল। নবীন ব্রাহ্ম-নেতা কেশবচন্দ্র প্রবীন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন (১৪ই নভেম্বর, ১৮৬৬)। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে এই নবীন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা অংশে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন।

১। সারধর্ম—রাজনারায়ণ বসু, কলিকাতা ১৮৮৬, পৃঃ ৫

২। ধর্মতত্ত্ব দীপিকা : দ্বিতীয় ভাগ—রাজনারায়ণ বসু, কলিকাতা ১৮৪৭, পৃঃ ৩৩

কেশবচন্দ্রের মতে, প্রার্থনাই ধর্মসাধনার উপায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রার্থনা হইবে, সকল প্রকার কামনা ও বাসনাশূন্য। বিমল প্রার্থনাকে তিনি ইহলোক, পরলোক ও সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবার উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি সেইজন্য প্রার্থনা করিবার উপদেশ দান করিতেন। "বন্ধুদিগকে এইজন্য কেবল প্রার্থনা করিতে বলি। সকলেই স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া ধর্মগ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সারবস্তু জানিয়া, এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।"[১]

কেশবচন্দ্রের ছিল সুগভীর ঈশ্বরপ্রীতি এবং অপরিমেয় মানবপ্রীতি। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে'র উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনার দিনে শিষ্যদের সহিত নগরসংকীর্তনের বাহির হইয়া কেশবচন্দ্র যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অপরিমেয় মানব-প্রীতি উচ্ছ্বসিত ধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঘোষণাটি ছিল—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

এই ঘোষণাই প্রমাণ করে যে, কেশবচন্দ্র ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যেও আবেগের আতিশয্য ও ভক্তি-বিহ্বলতা প্রবলভাবে দেখা গিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের পদধূলি গ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন ও ভাবাবেগে ক্রন্দন প্রভৃতি দেখা দিয়াছিল। এই ভক্তির আতিশয্যের জন্য কেশবপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণদেবের সুগভীর প্রভাব ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার লোকোত্তর আধ্যাত্মিক জীবন কেশবচন্দ্রকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনিই প্রথম রামকৃষ্ণদেবের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মতে, কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত 'নববিধান' ধর্মের উপর পরমহংসদেবের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

১। কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক ১৮৮২ সালের ২৩শে জুলাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে বিবৃত। দ্রঃ কেশবচন্দ্র : মণি বাগচী, পৃঃ ১৮৩

প্রকৃতপক্ষে, পরমহংসদেবের ভক্তি ও বিশ্বাসের সুর কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষদিকে সুস্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছিল।

রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত যে ধর্মান্দোলন চলিতেছিল, তাহা প্রধানত সংস্কারমূলক। সুতরাং, হিন্দু ধর্মের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি এই সংস্কার আন্দোলনের যুগে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে ধর্মকে মুক্ত করিবার প্রয়াসী হইলে, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির আলোকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির নূতন রূপ উদ্ঘাটিত হইল। কিন্তু রামকৃষ্ণের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে কোন প্রভাবশালী ধর্মাচার্য আবির্ভূত হন নাই। সংস্কারপন্থী ব্যাখ্যাতাগণই এই যুগের হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিলেন। সাহিত্য, সংবাদপত্র, সভা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁহারা হিন্দু ধর্মের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের মূলে ছিল প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাব। কেশবচন্দ্রের অনুসরণকারী এবং তাঁহার বিরোধীদলের মধ্যে আদর্শগত যে বিরোধের সূচনা হইয়াছিল, সেই বিরোধের রন্ধ্রপথ বহিয়া সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পথটি প্রশস্ত হইতে থাকে।

কেশবচন্দ্রের নরপূজার প্রথা প্রবর্তনে রাজনারায়ণ বসুর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহারই ফলে তিনি এক সভায় 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে এক বক্তৃতা দান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমসাময়িক হিন্দু সমাজে রাজনারায়ণের বক্তৃতার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকান্ত দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার জন্য রাজনারায়ণকে 'হিন্দুকুলশিরোমণি' আখ্যা দান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'কলির ব্যাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু রাজনারায়ণের বক্তৃতার বিষয় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা হইলেও, এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের পন্থায় হিন্দু ধর্মের যথার্থ মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। এই বিষয়ে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২৮৬

লিখিয়াছেন,—'গ্রন্থকার হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এইমাত্র দেখাইয়াছেন যে ইহা ইংরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকারের মনের মানদণ্ড ইংরাজ।'

ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, ভূদেবচন্দ্র ইংরাজদের ধর্মের সহিত সাদৃশ্যহেতুই যে হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এ-কথা মানিয়া লইতে পারেন নাই। এই স্বাজাত্যভিমান ভূদেবচন্দ্রের যথার্থ হিন্দু-মানসের পরিচায়ক এবং এই যথার্থ হিন্দু মনোভাব লইয়াই তিনি তাঁহার 'সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধাবলী'তে হিন্দুগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিস্তৃত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দু ভাবধারার পুনরুজ্জীবনের পটভূমিকা রচনার গৌরব ভূদেবচন্দ্রেরই প্রাপ্য। কিন্তু ১৮৭২ সালে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠার পর হইতে নব হিন্দু ধর্মের অভ্যুদয়ের যথার্থ সূচনা হয়।

এই পর্যায়ের সংস্কার-প্রচেষ্টায় প্রাচীন ধর্ম ও পুরাণের নূতন ব্যাখ্যাদানই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই প্রধান। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের উপন্যাসত্রয়ী, ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র এবং অসম্পূর্ণ হইলেও ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যায় নব হিন্দু ধর্মের যে আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সকল প্রকার মালিন্য হইতে মুক্ত হিন্দু ধর্মের সনাতন আদর্শ। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অনুবাদ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অমিতাভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন পুরাণের নবীন ব্যাখ্যা দান-প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মাদর্শের সংস্কারমুক্ত রূপটি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তাধারার প্রভাব থাকিলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তাঁহারও ধর্মের আদর্শ প্রধানত ভগবদ্‌গীতার দ্বারা প্রভাবিত, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও ধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তাধারার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্মের আদর্শ গীতোক্ত ধর্মাদর্শ হইতে অভিন্ন। বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তিবাদের সাহায্যে শতাব্দীর

পুঞ্জীভূত মালিন্য দূর করিয়া তিনি হিন্দু ধর্মাদর্শকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই নব হিন্দু ধর্মবাদ পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিলে, শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই ধর্মমত প্রচারে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়ে মসীযুদ্ধ হয়। অবশ্য, এই মসীযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল খুবই কম, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নব হিন্দু ধর্মবাদী গোষ্ঠীর সহিত রবীন্দ্রনাথের যে মসীযুদ্ধ হয়, তাহা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের নব হিন্দু ধর্মবাদে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা তাঁহাকে গোষ্ঠী-পতিত্বে বরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু ও শশধর তর্কচূড়ামণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলে। চন্দ্রনাথ বসু 'নবজীবন' পত্রিকায় হিন্দু জাতিভেদের গুণগান করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁহারই লেখনীমুখে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। চন্দ্রনাথ বসুর এই প্রগতিপরিপন্থী মতবাদকে বিদ্রূপ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে 'দামু চামু' কবিতা প্রকাশ করেন। শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করেন। এই ব্যাখ্যার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও আতিশয্য ছিল। তথাপি সেই উন্মাদনার দিনে শশধর তর্কচূড়ামণির ব্যাখ্যা সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ 'আর্য ও অনার্য' কবিতায় তর্কচূড়ামণির সেই উদ্ভট সামঞ্জস্যহীন ধর্মব্যাখ্যা এবং 'আর্যাদি'কে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ হইতে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও অব্যাহতি পান নাই। ১২৯০ সালের 'কৃষ্ণানন্দ' নাম লইয়া তিনি নূতন তন্ত্রসাধনা সুরু করিয়াছিলেন এবং 'কল্কী অবতার'রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতার বলে হিন্দু সমাজে এক নূতন ভাবের প্লাবন আসে সত্য, কিন্তু আপনাকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা

করিবার চেষ্টা করায় বিরক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তীব্র বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ শায়কে জর্জরিত করেন। প্রিয়নাথ সেনকে কবি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

> "ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে
> ছুঁচালো সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
> তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি' গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
> অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি॥"[১]

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মজীবন দ্বন্দ্ব-মুখর হইয়া উঠে। ধর্মজীবনের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধই প্রমাণ করে যে, ধর্মান্দোলন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল। ধর্মান্দোলনের মর্মগ্রহণের ক্ষমতা অবশ্য সকলের ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গণ-চেতনায় ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপটি ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি নূতন চেতনা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল এবং সকলেরই মনে আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। এই বিরুদ্ধ মনোভাবের পটভূমিকাতেই ধর্মের নবচেতনার অঙ্কুর ধীরে ধীরে উপ্ত হইতে থাকে। জ্ঞানমার্গের স্থলে ভক্তিমার্গের প্রতিষ্ঠালাভ এই নবচেতনার বিশেষ লক্ষণ। নিরাকারবাদও ধীরে ধীরে সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। বিস্তৃত ক্ষেত্রে সাকারবাদ হইতে নিরাকারবাদের প্রতিষ্ঠা এবং সাকার ও নিরাকার বাদের সমন্বয়সাধন ঘটে। বেন্থাম, মিল ও কোমত্ প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলনতত্ত্বে ঈশ্বরে ভক্তি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীও পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, তাঁহার প্রচারিত ধর্মাদর্শে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মকে অর্ধেক ধর্ম বলিয়াছেন (আনন্দমঠ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নবীনচন্দ্রের প্রচারিত

১। কড়ি ও কোমল।

ধর্মে প্রেমধর্মের একটি বিশেষ স্থান আছে।[১] রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাধামাধবোদয়" এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "স্বপ্নবিলাস", "রাই উন্মাদিনী" প্রভৃতি গ্রন্থেও ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।[২]

হিন্দু ধর্মের দুইটি প্রধান ধারা, শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সংহতিবোধও ক্রমশঃ জাগিয়া উঠে এবং খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মের আক্রমণে এই সংহতিবোধ ক্রমে সুদৃঢ় হয়। রামকৃষ্ণদেবের মতবাদে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের এই সমন্বয়ের ভাবটি বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে এবং তাঁহার জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করেন যে, এই সমন্বয়ধর্মী ভক্তিরসাপ্লুত ঈশ্বরসাধনার পথ জনগণের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। সুতরাং রামমোহন হইতে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে ধর্মসাধনা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—এই ত্রিবিধ মার্গে প্রবাহিত হইয়া যুগের পক্ষে ভক্তিমার্গেরই উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণ করিল।

ভক্তির পথে রামকৃষ্ণদেবের সাধনাদর্শ একদিকে যেমন ধর্মকে ভারতের বৃহত্তর জনসমাজে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি সকল মত ও সকল পথের সমন্বয়সাধন করিয়া বিশ্ব-মানবের জন্য ধর্মের একটি সার্বভৌম আদর্শ স্থাপন করিল। ইহার বিজয় নিশান উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর সম্মুখে ধর্মসাধনার এক মহান আদর্শ স্থাপন করিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সাধনা শুধু ভক্তিযোগের সাধনা নয়, কর্মযোগের সুমহান আদর্শ স্থাপনও তাঁহার অন্যতম ব্রত। বিবেকানন্দ কর্মযোগের মাধ্যমেই জীবে প্রেম এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

ধর্মাচার্য হিসাবে পাগল হরনাথের প্রতিষ্ঠা স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই। বিবেকানন্দের তিরোধান হয় ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে। আর পাগল হরনাথের পত্রাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। ইহার বেশ কয়েক

১। ডাঃ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন: হিন্দু ধর্মের নব অভ্যুত্থানে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। দ্রঃ কল্যাণী, তৃতীয় বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৭, পৃঃ ৬১৭

২। রাধামাধবোদয় প্রকাশকাল ১৮৫৯, স্বপ্নবিলাস ১৮৬০, রাই উন্মাদিনী ১৮১৫

বৎসরকাল পূর্ব হইতেই হরনাথ ভক্তদের সহিত পত্রালাপ করিতে আরম্ভ করেন। অটলবিহারী কর্তৃক সংগৃহীত পত্রাবলীর অধিকাংশই ১৯০৩ সালের পূর্বে লিখিত হয়। সুতরাং বিবেকানন্দের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ধর্মাচার্য হিসাবে পাগল হরনাথের জয়যাত্রা সুরু হয়। সেই সময়ে প্রায় সমগ্র ভারত এবং বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশ বিবেকানন্দের মহাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ। সেই সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন বলিয়া স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, পাগল হরনাথের মতবাদ বিবেকানন্দের ভাবধারাপুষ্ট। বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সাহচর্যলাভের সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, কাশ্মীর-পরিক্রমাব্যপদেশে বিবেকানন্দ যখন শ্রীনগরে উপনীত হন, তখন হরনাথ কাশ্মীরের ধর্মার্থ অফিসে কর্মরত। একজন বিশিষ্ট হরনাথ-ভক্তের মতে, হরনাথের বাসস্থানের সন্নিকটে একটি নৌকাগৃহে বিবেকানন্দ বাস করিতেন এবং ঝিলাম নদীতীরে তাঁহার সহিত হরনাথের সাক্ষাৎকারও ঘটিয়াছিল।[১] এই উক্তির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াও এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, অন্ততঃপক্ষে বিবেকানন্দের ভাবধারার সহিত হরনাথ পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সেই হিসাবে হরনাথের উপর বিবেকানন্দের প্রভাব থাকার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রেমধর্মের প্রচার করিলেও, হরনাথের জীবনে কর্মযোগ সাধনার দৃষ্টান্তও যথেষ্টই আছে। তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে কর্ম-যোগ উপেক্ষিত হয় নাই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কর্মযোগেরই জয়গান করিয়াছেন।[২] এইগুলি তাঁহার উপর বিবেকানন্দ-প্রচারিত ভাবধারার প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়।

হরনাথের কর্মযোগ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব ধারায় প্রভাবিত, প্রেমধর্মের অপর একটি অভিব্যক্তিমাত্র। সেবাব্রতের ও কর্মযোগ সাধনার যে আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দের মতোই তাঁহার মূল কথা—জীবে প্রেম। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে হরনাথ ও বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং

১। Haranath Souvenir : B. C. Mitra P. 42
২। হরনাথ স্মৃতি : দ্বিতীয় লহরী, পৃঃ ১৫

হরনাথের কর্মযোগ তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত—বিবেকানন্দের প্রভাবের ফলমাত্র নয়।

হরনাথের মতবাদে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি তাঁহাকে যুগের প্রচলিত ধর্মীয় ধারা হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। সেই হিসাবেও হরনাথের মতবাদকে প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম বলা চলে। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমসমূহ যুগের ধর্মীয় ভাবনার মূল সুর হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে নাই, বরং ব্যতিক্রমের জন্যই তাঁহার ধর্মমত যুগের প্রয়োজনকে পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত করিয়াছে এবং যুগের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এক সার্বজনীন ও সর্বকালীন ধর্মমত হিসাবে যুগান্তরে প্রবাহিত হইয়াছে।

হরনাথের উপদেশাবলী

(১)

হরনাথের উপদেশাবলীর দুইটিমাত্র উৎস—একটি প্রত্যক্ষ, পাগল হরনাথের স্বহস্ত-লিখিত পত্রসমূহ ইহার উপাদান; অপরটি পরোক্ষ, ভক্তবৃন্দের স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাসমূহ ইহার উপাদান।

হরনাথের উপদেশাবলী তাঁহার পত্রসমূহের মধ্যে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভক্ত বা অনুরাগীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে হরনাথ যে সমস্ত পত্র দিতেন, সেই সমস্ত পত্রের মধ্যেই তাঁহার উপদেশসমূহ সন্নিবেশিত। এই সমস্ত পত্রের কতকগুলি সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'পাগল হরনাথ' নামে এই সমস্ত পত্রসংগ্রহ প্রসিদ্ধিলাভ করে। এগুলিই হরনাথের উপদেশাবলীর আকর গ্রন্থ। 'পাগল হরনাথ' হরনাথের স্বহস্ত-লিখিত পত্রসমূহের সঙ্কলন বলিয়া, এগুলির মধ্যে প্রকাশিত উপদেশাবলী অবিকৃত অবস্থায় থাকারই পরিপূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং হরনাথের অধ্যাত্ম ভাবনার যথার্থ পরিচয় এই গ্রন্থচতুষ্টয়ে যেমন পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা দুর্লভ।

হরনাথের উপদেশাবলীর অন্য একটি আকর 'হরনাথ-স্মৃতি'। তিরোধানের পর ভক্তবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া হরনাথের যে স্মৃতি-চারণা করিতেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দান করিতেন, 'হরনাথ স্মৃতি' শীর্ষক দ্বাদশ খণ্ড গ্রন্থে সেগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থসমূহে হরনাথের জীবনের বহু মূল্যবান তথ্যের সহিত তাঁহার এমন কতিপয় উপদেশও প্রকাশিত হইয়াছে, যেগুলি তাঁহার জীবনীগ্রন্থ বা পত্রাবলীতে দৃষ্ট হয় না।

হরনাথ সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও হরনাথের কিছু কিছু উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমস্ত উপদেশাবলী কোথাও বা সূত্রাকারে গ্রথিত[১], আবার কোথাও বা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কালে উদ্ধৃত। এই জাতীয় পত্রিকার মধ্যে 'গৃহস্থ', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'হরনাথ',

১। Gospel of Haranath : Duncun Greenless.

দ্বিভাষিক 'দি লর্ড সুপ্রীম', ইংরাজী 'দি ডিভাইন পেন' এবং ইংরাজী 'জ্যোতি' পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

হরনাথের জীবনীগ্রন্থসমূহে এবং উপদেশ-সংগ্রহগ্রন্থেও তাঁহার উপদেশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কুসুমকুমারীর জীবনীগ্রন্থটিও[১] হরনাথের উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ। পত্রাবলীতে প্রকাশিত উপদেশ ছাড়াও, কিছু কিছু নূতন উপদেশ এই সমস্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 'হরনাথ-তত্ত্ব' আলোচনমূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহেও ব্যাখ্যা বা আলোচনা প্রসঙ্গে হরনাথের উপদেশাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তের নিজস্ব দৃষ্টিতে হরনাথ এবং তাঁহার উপদেশাবলী যেভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, গ্রন্থগুলিতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় রচিত 'হরনাথ-তত্ত্ব', 'ওয়াণ্ডারফুল লীলাজ অব হরগোপাল', দি মেসেজ অব হরনাথ' প্রভৃতি এই জাতীয় গ্রন্থ।

হরনাথের তিরোধানের পর তাঁহার কতকগুলি পত্র সংগৃহীত হয়। ইহাদের কতকগুলি মুদ্রিত হয় এবং প্রায় সমস্তগুলিরই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিছুসংখ্যক পত্রের মূল বা অনুবাদ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এগুলিও হরনাথের উপদেশাবলীর অন্যতম আকর-রূপে গণ্য হইতে পারে। ইংরাজীতে প্রকাশিত 'পাগল হরনাথ' পঞ্চম খণ্ড এবং বাংলা ভাষায় আংশিকভাবে প্রকাশিত 'পাগল হরনাথ'—পঞ্চম খণ্ড এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রধান।

'আন্‌পাবলিস্‌ড লেটার্‌স্‌ অব লর্ড হরনাথ' নামক তিন খণ্ড পত্র-সংগ্রহের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এগুলির মধ্যে প্রকাশিত পত্রসমূহের অধিকাংশ পত্র 'পাগল হরনাথ' শীর্ষক গ্রন্থচতুষ্টয় হইতে সংগৃহীত।

হরনাথের উপদেশাবলী প্রধানতঃ গৃহস্থ নরনারীর জন্য। সংসারের দাবদাহে যাহারা নিরন্তর পীড়িত অথচ সংসারের বন্ধনপাশ ছিন্ন করা যাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই সমস্ত মুগ্ধ জীবের জন্য হরনাথের হৃদয়ে ব্যাকুলতার সীমা নাই। সংসারের মায়া যাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ভগবদ্দর্শনের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে, প্রেমের অঞ্জন পরাইয়া

১। প্রকাশকাল ১৯৩৮ সালের জুন মাস।

হরনাথ তাহাদের দৃষ্টিকে ভগবদ্দর্শনের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব ইহাদের জন্য নয়। সহজ পথ ও পরিচিত বস্তুর দৃষ্টান্তই তাহাদের মনে রেখাপাত করিতে সক্ষম। তাই সংসারী নরনারীর অতি-পরিচিত দৃষ্টান্ত সহযোগে হরনাথের উপদেশাবলী উপস্থাপিত। দেহের নশ্বরত্ব বুঝাইবার জন্য হরনাথ কোন তত্ত্বকথার অবতারণা করেন নাই। তিনি ভাড়াটে বাড়ীর উপমা দিয়াছেন। ভাড়াটে বাড়ীর প্রতি ভাড়াটিয়ার কোনরূপ মমতা থাকে না। কারণ, সে জানে যে ঘরটিতে তাহার কোন স্বত্ব নাই। একটা ঘর যাইলে আবার নূতন ঘর পাইবে। দেহ সম্বন্ধেও এইরূপ মনে করিবার জন্য হরনাথ তাঁহার ভক্তদের উপদেশ দিয়াছেন।

তাঁহার মতে, "দেহ ভাড়াটে ঘর। থাকিলেও ভাল, গেলেও ভাল, ইহার জন্য আমার কোন ক্ষতি বা লাভ নাই। এ ঘর ভাঙ্গিলে আবার ভাল ঘর লইব। ঘরের জন্য যারা ভাবে, তারা সত্যই ভ্রমে পড়িয়াছে, শরীরের জন্য ভাবিবেন না।"[১]

সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরভজন করিবার জন্য হরনাথ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সংসারের শত সহস্র কর্তব্যের ভারে বিব্রত মানুষের ঈশ্বর-চিন্তা করিবার জন্য বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। সেজন্য নিরাশ হইতে নিষেধ করিয়া হরনাথ বলিয়াছেন, 'ঢেউ চলুক স্নান করে লও।' সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্তমনে ঈশ্বর-চিন্তা করিবার সঙ্কল্প প্রায়ই কার্যে পরিণত হয় না। অভিজ্ঞতার ফলে হরনাথ বুঝিয়াছেন যে, সংসারী মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্তচিত্তে ঈশ্বর-চিন্তার আশা দুরাশামাত্র। সুতরাং সংসারের কাজ করিতে করিতেই ঈশ্বর-চিন্তা করিতে হইবে। এই তথ্যটি বুঝাইতে হরনাথ সমুদ্রস্নানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদ্রের তরঙ্গ বন্ধ হইবার পর স্নান করিবার সঙ্কল্প করিলে সমুদ্রস্নান সম্ভব হয় না। সুতরাং ঢেউ উঠিতে থাকিলেও স্নান করিয়া লইতে হয়।

১। পাগল হরনাথঃ চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬

কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণবিমুখতাকে হরনাথ 'স্ক্রু'-র প্যাঁচের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'স্ক্রু' একই পথে খোলে এবং লাগে। পার্থক্য কেবল শক্তি-প্রয়োগের বিভিন্নতায়। তেমনি কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণবিমুখতা উভয়ই একটি পথেই কার্য করে—একে মুক্তি, অন্যে বন্ধন হইয়া থাকে।

হরনাথ শিক্ষা, দীক্ষা ও রুচি অনুযায়ী মানুষকে উপদেশ দিতেন। আইনজীবীকে আদালত, জজ, কন্‌টেম্পট্ অব কোর্ট প্রভৃতির, চাকুরিজীবীকে অফিস, ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতির, শিক্ষককে ক্লাস পিরিয়ড, রুটিন, হেডমাস্টার প্রভৃতির এবং ডাক্তারকে রক্ত-সঞ্চালন-তন্ত্র প্রভৃতির উদাহরণ দিয়া উপদেশ দান করিয়াছেন। সাধারণ মানুষকে মাছ ধরা, চার ফেলা, বনের পাখী, গোত্রান্তর, বোঝা বহা প্রভৃতির উদাহরণ দিয়া উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু উপদেশগুলি ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রদত্ত হইলেও, সর্বজনের শিক্ষণীয় বিষয় এগুলির মধ্যে আছে। সেইজন্য ব্যক্তিবিশেষকে লিখিত পত্রে প্রদত্ত উপদেশ সর্বসাধারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেজন্যই বোধ হয় বলা হয়, "Kusum-Haranath is for all and special to each."[১] হরনাথের উপদেশাবলী ঈশ্বরসাধন সম্বন্ধে প্রচলিত কোন প্রকার বিধিনিষেধের প্রতি কোনও গুরুত্ব আরোপ করে নাই। সেইজন্য প্রচলিত মতানুযায়ী যাহা অনিয়ম বা অনাচার, হরনাথের মতে তাহা ঈশ্বর-সাধনার পরিপন্থী নয়।

তিনি বলিয়াছেন, "Brother! On no account can any become guilty before the Lord. To the Lord every work is beautiful; in His eyes no guilt can appear. It is not proper to be happy or sorry at what one puppet says is criticism of the work of another puppet."[২]

হরনাথের মতে, ঈশ্বরপ্রেমের জন্য সাধনাই পরম সাধনা। প্রেমের পথে কোন বিধিনিষেধ নাই। শাস্ত্রবিধি ও লোকাচারের রাজপথ বাহিয়া প্রেমের অভিসার হয় না, বরং লোকাচার, শাস্ত্রবিধি

১। একান্ত আপন : তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩
২। Pagal Haranath : Part V, P. 333

প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া প্রিয় মিলনের প্রেরণা যোগায় প্রেম। প্রেমের রাজ্যে তাই কোন নিয়ম নাই। সকল বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে প্রেমের স্থান। এখানে সকলেরই সমান অধিকার।[১] জীবজগতে হরনাথ এই প্রেমের পথে ঈশ্বর-সাধনার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই হরনাথের উপদেশাবলী সকলেরই সম্মুখে এক নব দিগন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। হরনাথের উপদেশাবলী তাঁহার নিজস্ব ভাষাতেই রক্ষিত হইয়াছে। উপদেশাবলীর আকর হরনাথের পত্রগ্রন্থসমূহ। 'পাগল হরনাথ' নামক গ্রন্থসমূহে হরনাথের স্বহস্ত-লিখিত পত্রসমূহের সংকলনে করা হইয়াছে। অপরাপর পত্রগ্রন্থগুলিতেও হরনাথের ভাষা অবিকৃতরূপে রক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থসমূহের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে হরনাথের নিজস্ব। যে সমস্ত ধর্মাচার্যের উপদেশাবলী এইভাবে তাঁহাদের নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে লাভ করিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প। এই অল্প কয়েকজনের মধ্যে হরনাথ একজন।

হরনাথের পত্রাবলী শুধু ধর্মীয় উপদেশেরই সমষ্টিমাত্র নয়। গৃহস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনার চিত্রও পত্রগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্কিত হইয়াছে। দেশের ও সমাজের বিচিত্রমুখী সমস্যাসমূহও বাদ পড়ে নাই। সুতরাং পত্রগুলিতে অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বের দেশ ও সমাজের সম্বন্ধে কতিপয় মূল্যবান তথ্য যেমন লাভ করা যায়, তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্বস্তরের সংসারী নরনারীর গার্হস্থ্য জীবনেরও নির্ভরযোগ্য একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে গৃহস্থধর্মী অধ্যাত্ম-সাধক হরনাথের গার্হস্থ্য জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মাচার্যের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, তথ্য সংগ্রহ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হইয়া উঠে। 'পাগল হরনাথ' গ্রন্থসমূহ সেই দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়াছে। হরনাথের ব্যক্তিগত জীবনের বহু মূল্যবান তথ্যে 'পাগল হরনাথ' পত্রগ্রন্থরাজি সমৃদ্ধ।

১ দেশামৃত, পৃঃ ১২৬

(২)

হরনাথের মতে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার রূপ অসংখ্য, নাম অনন্ত। প্রত্যেকটি রূপ এক-একটি শক্তির বিকাশ। "রাজ-শক্তি যেমন ভাইসরয় হতে নীচে চৌকিদার পর্যন্ত, সূক্ষ্মরূপে কোন প্রভেদ নাই, কেবলমাত্র শক্তি কমবেশী, তেমনই প্রভুর শক্তি ও স্বরূপ সবই এক। তবে কার্যমত শক্তির তারতম্য আছে মাত্র। সেই সর্বেসর্বাকে কৃষ্ণই বলুন, আর রামই বলুন, আর কালীই বলুন, কিছুতেই কিছু আসে যায় না।"[১] তাঁহার মতে, "কালী কৃষ্ণ এ সেই একমাত্র প্রভুর নামভেদ মাত্র।"[২]

সমস্ত দেবমূর্তি মধ্যে হরনাথের মতে কৃষ্ণই প্রধান; কারণ, কৃষ্ণের কিছু কর্ম নাই। "যে কেবল বালিস ঠেস দিয়ে বসে আছে, জানিতে হবে সেই গৃহস্বামী। অন্যান্য সকল মূর্তিতে কোন-না কোন একটা কর্মভাবের নিদর্শন স্বরূপ অস্ত্র-শস্ত্র আছে কিন্তু কৃষ্ণতে কেবল বাঁশী বই আর কিছুই নাই। ইহাই বলে দিতেছে কৃষ্ণ সর্বময় কর্তা।"[৩]

এই কৃষ্ণই হরনাথের ঈশ্বরের বিশিষ্ট নাম। তিনি পরম প্রেম-স্বরূপ। জীবের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার সীমা নাই। নিরন্তর বংশীধ্বনি করিয়া মায়ামুগ্ধ জীবকে তিনি প্রতিনিয়ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করেন।[৪] যাঁহাদের শ্রবণপথে এই বংশীরব বারেকের জন্যও প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারে না—জাতি, কুল, মান সব-কিছু বিসর্জন দিয়া তাঁহারা সেই মোহন বংশীধারীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু সংসারে এরূপ সৌভাগ্যবান জীবের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অপার প্রেম হইতে তাহারা বঞ্চিত নয়। সমস্ত সংসার কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রে পরিপূর্ণ, প্রেমসমুদ্রে সকলেই ডুবিয়াছে।[৫] এই পরম প্রেম-

---

১। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৩
২। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৭
৩। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৪
৪। হরনাথ-স্মৃতি : চতুর্থ লহরী, পৃঃ ৯
৫। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৬০

স্বরূপকে ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, পাপী, তাপীকেও তিনি শাস্তি দান করেন না। পাপীও সেই কৃষ্ণেরই।[১] ক্ষণেকের জন্য তাঁহার স্মৃতি অন্তরে উদিত হইলে, বারেকের জন্য তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে জীবের অন্তরে ভগবৎ-প্রেমের উদ্বোধন হয়। জীবকুলকে হরনাথ এই অপূর্ব মাধুর্যময় ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন।

ঈশ্বরের অপার করুণার সংবাদও হরনাথ জীবকুলকে দিয়াছেন। জীবের সহিত ঈশ্বরের যে নিত্যসম্বন্ধ, সেই প্রেমের আকর্ষণ দুর্নিবার। সেই পরম সম্বন্ধের কথা বিস্মৃত হইয়া জীব সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া নিদারুণ দুঃখে ও কষ্টে কালাতিপাত করে, অথচ ভ্রমেও ঈশ্বর চিন্তায় ব্রতী হয় না।

"প্রেমময় কৃষ্ণ আমাদের সদাই কোলে নিয়ে আদর করিতেছে আর আমরা কাণার মত চোখ বুজে বসে আসি, তাকে না দেখে এদিক ওদিক দেখিতেছি, তাই মনে হইতেছে—আমি একা আমার কেউ নাই।"[২] কিন্তু বারেকের জন্য তাঁহার স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত হইলে, জীবের সকল দুঃখ দূরে পলায়ন করে। জীবের অন্তরে তাঁহার স্মৃতি নিরন্তর জাগরূক রাখিবার জন্য কৃষ্ণ তাই প্রতিটি হৃদয়েই অধিষ্ঠান করেন। ইহার ফলে তাঁহাকে ডাকিবার আয়াস-স্বীকারও জীবকে করিতে হয় না। স্মরণ করিলেই তিনি আসিয়া ধরা দেন। তাহাতেও অশক্ত হইয়া জীব যদি তাঁহারই উপর তাঁহাকে স্মরণ করাইবার ভার দেয়, তাহা হইলেও কাজ হয়—তিনি স্বয়ং জীবকে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া জীবের দুঃখ নিবারণ করেন।[৩] হরনাথ ব্যতীত অপর কেহ এইরূপ পরম করুণাঘন ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

হরনাথের ঈশ্বর কৃষ্ণনামে অভিহিত হইলেও, তিনি রাধার সহিত বিচ্ছিন্ন নহেন। রাধা ও কৃষ্ণ—এই দুই স্বরূপের মিলিত রূপকেই

১। পাগল হরনাথ : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫১
২। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৬
৩। হরনাথ-স্মৃতি : পঞ্চম লহরী, পৃঃ ৯

হরনাথ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কৃষ্ণ দয়াময়, রাধা প্রেমময়ী। কৃষ্ণ সকল বস্তুর দেহ, রাধা তাহাতে রূপ। তিনি বলিয়াছেন, "জগতে যতরকম রূপ আছে সবই আমার রাধার, কৃষ্ণ-দেহ আশ্রয় করে নিজরূপে জগৎ ভরে রয়েছে, আমার রাধা।"[১] হরনাথের মতে, "যুগল রাধাকৃষ্ণ নামটি মাখন মিছরীর একত্র মিলন। মিছরী সুমিষ্ট হইলেও তাহাতে কঠিনত্ব আছে কিন্তু রাধাযোগে সে কাঠিন্য লুপ্ত হইয়া পূর্ণ মাধুর্যময় হইয়া থাকে, রাধা-অঙ্গে মিলিয়া তার মাধুর্য।'[২]

এই অনুপম মাধুর্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ হরনাথ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তদীয় পার্ষদ্ নিত্যানন্দের কথা বলিয়াছেন। "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি কাঁদিয়া জীবকুলকে শিখাইয়াছেন কেমন করিয়া তাঁহার জন্য কাঁদিতে হয়। আর যাহাকে সবাই তাড়াইয়া দেয়, খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিতাই তাহাকে দয়া করেন।" করুণাঘন এই উভয় স্বরূপকে হরনাথ তাই অবতারশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন।[৩]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী হরনাথের উপদেশাবলী রাধাকৃষ্ণ-কথা এবং গৌরনিতাইয়ের প্রশস্তিতে পরিপূর্ণ হইলেও, অন্যান্য ধর্মমত, উপাস্য এবং অবতারাদির সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব অতিশয় উদার। তিনি প্রেমের পথে কৃষ্ণপ্রেম লাভের নির্দেশ দিয়াছেন এবং অন্তরে এই প্রেমের উদ্বোধন করিবার জন্য 'রাধাকৃষ্ণ' নাম গ্রহণ ও নিতাই-চরণে শরণ লইবার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু কোথাও তিনি অন্যান্য সাধন-পন্থার অকিঞ্চিৎকরত্ব বা নিষ্ফলতার কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে, সকল পথেই ভগবৎ সমীপে উপনীত হইতে পারা যায়। 'যার যেই মত সেই সর্বোত্তম। তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম্য' —এই মহাজন বাক্যের দ্বারা তিনি সকল মতের ও সকল পথেরই জয়গান করিয়াছেন। সকল দেবমূর্তির মধ্যে কৃষ্ণকে প্রধান বলিয়া

১। পাগল হরনাথ: তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩২
২। পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২১২
৩। পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৭৫

মনে করিলেও, হরনাথ অন্যান্য দেবমূর্তিসমূহের প্রতিও সুগভীর শ্রদ্ধা-মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'প্রভুর কৃপা চান ছোট বড় সকল দেবতারই মান্য করতে হবে।'[১] মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা-মনোভাবাপন্ন ছিলেন।[২] সুতরাং বলা যাইতে পারে, হরনাথ সকলের এবং সকলেই হরনাথের। অর্থাৎ, আস্তিক, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, এমনকি সচ্চরিত্র বা অসচ্চরিত্র যাহাই হই, হরনাথকে ভালবাসিতে ও আপনজনরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই এবং হরনাথও সকলের প্রতি ঐরূপ মিত্রভাবাপন্ন।[৩]

ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য হরনাথ প্রেমমার্গ অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন। ভগবৎ-কৃপা-লাভের জন্য আরও বহুবিধ পন্থা আছে। হঠযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের পথেও ভগবৎ-কৃপা লাভের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভক্তির পথে বা ভালবাসার পথে ভগবানের সহিত যে নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, অন্য পথে তাহা হয় না। ভালবাসার বন্ধনে সকলেই ধরা দেয়, প্রেমময় ভগবানও প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা—তিনি ভক্তির অধীন, প্রেমের বশ। তাই প্রেমের পুষ্পই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। হরনাথ তাই প্রেমের পথকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।[৪] ইহার জন্য উদুখলে বাঁধা পড়িতে, দ্বাররক্ষী সাজিতে তাঁহার দ্বিধা নাই; এমনকি প্রেমের জন্যই তিনি রাধার নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন, আপনি কাঁদিয়া অপরকে কাঁদাইয়াছেন এবং প্রেমাস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি ধূলি-ভরা ধরণীর ধূসর পথে ও প্রান্তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন। এই পরম প্রেমস্বরূপকে হরনাথ কৃষ্ণনামে অভিহিত করিয়াছেন। রাখালরূপে যিনি গোষ্ঠবিহার করিতেন, ব্রজগোপীগণের নবনী চুরি

১। পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৮
২। পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৪
৩। হরনাথ-স্মৃতি: একাদশ লহরী, পৃঃ ৩৫
৪। পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ

করিয়া রাখাল-বালকদের বিলাইতেন, সখাগণের সহিত হাস্য-পরিহাস ও ক্রীড়া করিয়া কালযাপন করিতেন, যমুনাপুলিনে মোহন মুরলী বাদন করিয়া ব্রজাঙ্গনার মনোহরণ করিতেন, রাসেশ্বরী রাধা ও অন্যান্য ব্রজললনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাসমণ্ডলে বিহার করিতেন, সেই প্রেমমাধুর্যে পরিপূর্ণ 'গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ'ই হরনাথের উপাস্য। সেই পরম প্রেমস্বরূপকে তিনি দয়াময়, অধমতারণ প্রভৃতি নামে ডাকিতে নিষেধ করিয়াছেন, রাজা সাজাইতে নিষেধ করিয়াছেন, প্রাণনাথ, বন্ধু, হৃদয়বল্লভ ইত্যাদি নামে ডাকিয়া অল্পায়াসে তাঁহাকে পাইবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।[১]

প্রেমের পথের পথিক বলিয়া হরনাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতারশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, গৌরাঙ্গের কৃপালাভকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াছেন এবং গৌর কৃপালাভের উপায় হিসাবে নিত্যানন্দের শরণ লইতে নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে, বৃন্দাবনরাজ্যে যেমন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা তাঁহার লীলার প্রধান সহায়, এমনকি তাঁহার শিক্ষিকা, এই প্রকৃতিরাজ্যে নিত্যানন্দও সেইরূপ ভগবানের সহায়। নিত্যানন্দের ইচ্ছা ব্যতীত গৌর কোন কার্য করেন না। নিত্যানন্দই গৌরের দ্বিতীয় কলেবর এবং তাঁহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছেন।[২] তাঁহার মতে, নিত্যানন্দ তাই প্রেমের পথের গুরু।[৩]

সুতরাং হরনাথকে একজন কৃষ্ণভক্ত এবং গৌরাঙ্গ-ভাবুক বলাই সঙ্গত। কিন্তু অপরাপর ভাবের প্রতি তিনি অনুদার মনোভাবাপন্ন নহেন। তিনি প্রত্যেককে আপন আপন রুচি অনুসারে ঈশ্বর-সাধনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। চিরাচরিত সংস্কার বা কুলগত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে অনুসরণ করিবার কোন প্রেরণা হরনাথ কাহাকেও কোনদিন দান করেন নাই। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও, অনেকে আপন আপন কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাদের লৌকিক দেবতার আরাধনা করিয়াছেন।

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০

২। হরনাথ-স্মৃতি : পঞ্চম লহরী, পৃঃ ২০

৩। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৮৬

খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ভক্তবৃন্দ হরনাথের অনুরক্ত হইয়াও, স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশসমূহ পালন করিতেন।

এইভাবে অপরাপর ধর্মমত ও সাম্প্রদায়িক উপাস্য সম্বন্ধে হরনাথের যে ঔদার্য অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত খুব বেশী না হইলেও একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সাধন-পদ্ধতি ও সাধন-সম্বন্ধে হরনাথের যে ঔদার্য, তাহার দৃষ্টান্ত সত্যই দুর্লভ। বস্তুতঃ, হরনাথের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানেই। ঈশ্বরপ্রেমিক হওয়াই হরনাথের সাধনার মূল লক্ষ্য।[১] এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তিনি নামগান বা নামজপের নির্দেশ দিয়াছেন। কোন বিশেষ নামের প্রতি তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। অভিরুচি অনুযায়ী যে-কোন নাম গ্রহণ করিলেই হইল। নাম গ্রহণের জন্য কোন বিধিনিষেধ পালন করিতে হয় না, এমনকি বিক্ষিপ্তচিত্তে ভজন করিতেও কোন বাধা নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার নাম স্মরণ করিলেই কাজ হয়।[২] নামের প্রভাবে সমস্ত মালিন্য দূরীভূত হয়, সমস্ত অশুচি শুচিস্নাত হইয়া উঠে এবং নামের প্রতি প্রেম জাগে।[৩] এইজন্য হরনাথের মতে, নামই মহামন্ত্র।[৪] অন্যান্য সাধনা, যথা—পূজা, পাঠ, ধ্যান প্রভৃতি দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ করা যায়। কিন্তু "কলিতে পূজাপাঠে ধ্যানে কেহ হরিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এমন মনে হয় না, তবে নামের দ্বারা হরি নিশ্চয়ই বশ হইবেন।"[৫] যোগ তপস্যা ইত্যাদিতে পদে পদে পদস্খলনের ভয় বিদ্যমান; এই কারণেই ফলাফল অনির্দিষ্ট, কিন্তু নাম আশ্রয় করিলে কোন প্রকার ভয়ের কারণই নাই।[৬] প্রাণায়াম ইত্যাদি নিয়মমতো না করিতে পারিলে কষ্ট পাইতে হয়। অতএব, ইহা হইতে সুফলের বাসনা করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হরনাথ নিষেধ

১। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৬০
২। হরনাথ-স্মৃতি : দ্বিতীয় লহরী, পৃঃ ১০
৩। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২২৮
৪। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৩১
৫। পাগল হরনাথ : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৮
৬। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩১

করিয়াছেন।[১] তিনি বলিয়াছেন, "সদাই হরিনামে মত্ত থাক, শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণনামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে।"

সাধক সম্বন্ধেও হরনাথ কোন বিধিনিষেধের আরোপ করেন নাই। তাঁহার মতে, ঈশ্বর-সাধনায় কেহই অনধিকারী নহেন। এই রাজ্যে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। সেই প্রবেশাধিকার লাভের জন্য কোন প্রস্তুতি বা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন নাই। যখনই প্রাণ চাহিবে, তখনই নামে মত্ত হইতে কাহারও কোন বাধা নাই। সাধনার রাজ্যে প্রবেশের এই অবাধ অধিকার দান হরনাথের বৈশিষ্ট্য।

হরনাথের পূর্বেও অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের বিধি-নিষেধের হ্রস্বতা-সাধনের চেষ্টা বহুবার হইয়াছে। ফলে, অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা ক্রমে ক্রমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। হরনাথ ইহাকে শুধু সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহিত হইবার সুযোগ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সকল স্তরের নরনারীর কাছে সহজলভ্যও করিয়া দিলেন।

সাধনার রাজ্যে প্রবেশের জন্য জাগতিক কোন আসক্তিকেই হরনাথ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। ফলে, কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত সাধারণ মানুষেরও সাধনার রাজ্যে প্রবেশের কোন বাধা থাকে না।

সংসারী মানুষের পক্ষে কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তিবিহীন হইয়া সংসারে বাস করা সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা কঠিন। এই কঠোর ব্রতপালন সাধারণ জীবের যেমন সাধ্যায়ত্ত নয়, একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বর-সাধনায় তেমনি ব্রতী হওয়াও ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য হরনাথ যেমন করিয়া হউক, তাহাদিগকে ঈশ্বর-সাধনায় ব্রতী হইতে বলিয়াছেন। এইখানেই হরনাথের ঔদার্যের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে। হরনাথও বিষয়কে বিষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহারের তারতম্য

১। উপদেশামৃত: পৃঃ ৬৪

প্রাণনাশিনী। বিষ প্রাণরক্ষার উপাদানরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে, এ-কথা তিনি জোরের সহিত বলিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর-সাধনার জন্য বিষয়ের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগের কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। তবে অর্থ-পিপাসাকে কম করিবার জন্য তিনি ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতেন।[১] হরনাথ নারীকে ঈশ্বর-সাধনার পথে প্রতিবন্ধক মনে করেন নাই। তাঁহার মতে, নারী নিত্যশুদ্ধা, চিরপবিত্রা। নারী সাধনার পরিপন্থী নয়, সাধনার পথে অপরিহার্য সহায়স্বরূপা। নারী-হৃদয় নিরন্তর প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ। তাই, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট নারী পরমপ্রিয়। তাই কৃষ্ণের লীলার প্রধান উপাদান নারী। নারী ভাবের ভাবুক না হইলে, ঈশ্বরের প্রেমঘন স্বরূপটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না। সাধনার পথে তাই নারীই উপযুক্ত সঙ্গিনী। ভাবের দিক দিয়া পুরুষ অপেক্ষা নারীরই সাধনার রাজ্যে প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা বেশী। ইহাদের উদ্দেশ্যে হরনাথের শ্রদ্ধা তাই শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। সংসারের তোমরাই মূল, গৃহের তোমরাই ভিত্তি, স্বর্গ-নরকের তোমরাই পথপ্রদর্শক, আর সেই রাই-রাজার রাজত্বে লইয়া যাইবার তোমরাই মালিক।[২]

ভজনাঙ্গ সম্বন্ধে হরনাথের পত্রাবলীতে যে সমস্ত উপদেশ দৃষ্ট হয়, সেগুলিও অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। হঠযোগ, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগে সকলের অধিকার নাই। সমর্থ অধিকারীর পক্ষে এই সমস্ত সাধনা সবিশেষ কষ্টসাধ্য। হরনাথের উপদেশ তাই এই সমস্ত সাধনার জন্য নয়। পূজা-পাঠ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সময়সাপেক্ষ বলিয়া এবং এইগুলির জন্য প্রচলিত বিধিনিষেধ অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া, হরনাথ এগুলিরও প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি এমন একটি পথের নির্দেশ দিলেন, যাহা দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে অবলম্বন করিতে পারা যায়, যে-কোন সময়ে যে-কোন অবস্থায় যাহার অনুষ্ঠানে কোন অসুবিধা নাই। সেই সার্বজনীন ও সহজসাধ্য ধর্মসাধন-পদ্ধতি 'নামসংকীর্তন' ও 'নামজপ'।

১। পাগল হরনাথ: তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮২
২। পাগল হরনাথ: চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৭

সংসারী মানুষের মন সাধারণতঃ ঈশ্বরবিমুখ। সংসারের জ্বালা যতই হউক, তাহাকে ছাড়িবার কথা কাহারও মনে ভ্রমেও উদিত হয় না। আপাতরমণীয় এবং আপাতসুখকর বহুবিধ উপাদানে নীরস সংসার পরম সুখের আগাররূপে প্রতিভাত হয়। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, অর্থ, যশ, বিদ্যা, ধন, মান প্রভৃতি নানাবিধ প্রলোভন সর্বদাই সংসারী মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইহাই মায়া—এই মায়ার কুহেলিকা সহজে অপসারিত হইবার নয়। সংসারী নরনারীও ইহার অপসারণ চাহে না। তাহাদের নিকট ইহা বরং পরম কামনার ধন। সুতরাং মায়ার এই সমস্ত বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপদেশ সংসারী মানুষের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই দুর্বলতার জন্যই ত্যাগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির আদর্শে সংসারী মানুষকে দীক্ষিত করা সহজ নয় এবং সেই কারণেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও সাধকগণ সংসারী জীবের সম্বন্ধে চিরদিন হতাশার ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না—গতানুগতিক এই ধারণাকে অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া ভারতের গৃহস্থ সাধক যুগে যুগে গৃহীর ঈশ্বরলাভের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সেই সমস্ত মহাজন-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হরনাথও দেখাইয়াছেন যে, সংসারীর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও ঈশ্বর-সাধনার পথে কোন বাধা নাই। তাঁহার জীবনাদর্শে মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব অনুপ্রাণিত হইল। ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন এই সংসার শুধু তোমাদের নয়, ইহা তোমাদের গোপালের। যদি তোমরা গোপালকে ভালবাস, তাহা হইলে তার খেলার সামগ্রী এই পৃথিবীকেও ভালবাসিতে শেখো।

হরনাথ স্বয়ং পরিপূর্ণরূপে সংসারধর্ম পালন করিয়াছেন, গৃহী হিসাবে তিনি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সংসারী মানুষের মনকে ঈশ্বরবিমুখ করিবার জন্য প্রধান যে দুইটি উপাদান কামিনী ও কাঞ্চন, তাহাদের মধ্যেই হরনাথের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। সংসারে তিনি সংসারীরূপেই লীলা করিয়াছেন, সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসীর

মতো জীবনযাপন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সংসারী মানুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি পরিপূর্ণরূপেই সচেতন ছিলেন। সংসার-জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত তাঁহার হৃদয় সংসারী মানুষের প্রতি পরিপূর্ণরূপে সহানুভূতিশীল ছিল। সেইজন্য সংসারে জীবের ভুল-ত্রুটি, মায়া, মোহ, ঈশ্বরবিমুখতা প্রভৃতি তাঁহার তিরস্কারে জর্জরিত হয় নাই। সমব্যথীর মতো তিনি সেগুলি যথাযোগ্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই উপলব্ধির আলোকে হরনাথ দেখিয়াছিলেন যে, সংসারের বহুমুখী কর্তব্য সম্পাদন করিতে নরনারী এমনই বিব্রত যে, বিধিসম্মত পথে ঈশ্বর-সাধনায় ব্রতী হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাময়িক উৎসাহ বা উত্তেজনার বশে ব্রতী হইলেও, শেষ পর্যন্ত বিধিমার্গে সঞ্চরণ করা সংসারীবাসী অধিকাংশ নরনারীর পক্ষেই সম্ভব হয় না। এই কারণে হরনাথ এমন একটি পদ্ধতির সন্ধান দিলেন, যাহা সহজসাধ্য এবং সহজে আচরণ করা যাইতে পারে। সহজসাধ্য বা সুখসাধ্য হইলে কোন আচরণ করিতে কাহারও কোনরূপ আলস্য জাগে না। সেইজন্য হরনাথের পদ্ধতি সংসারী মানুষের মন সহজে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

হরনাথের মতানুযায়ী ধর্মানুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই, অথচ অনুষ্ঠান করিলে বিপুল ফললাভের সম্ভাবনা। লৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার সহিত অতিরিক্ত লাভরূপে ঈশ্বরপ্রেম লাভের পথ প্রশস্ত হয়।[১] নিতান্ত অল্পায়াসে আশাতীত লাভের সম্ভাবনা যে-কোন লোকের দ্বারাই সাদরে গৃহীত হইবার কথা। কোন বস্তু লোভনীয়রূপে একবার গৃহীত হইলে, তাহা আস্বাদন করিতে সকলেরই আগ্রহ জন্মে। সুতরাং লোভের বশেও জীবের মনে হরনাথ-নির্দিষ্ট পথে নামাস্বাদন করার আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। এইভাবে একবার যে-কোন ভাবে যে-কোন নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেই ধীরে ধীরে নামের প্রতি আগ্রহ জাগে। তখন আর নাম ছাড়িবার কথা কাহারও মনে উদিত হয় না। এইভাবে নামাসক্তি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইলেই প্রেম জাগ্রত হয়। প্রেম আত্ম-

---

১। Pagal Haranath—Dahigouri Khambolja, Page 42

বিস্মৃত করে, আত্মসুখে প্রেমিকের স্পৃহা নাই। প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ, এমনকি আত্মবিলোপসাধনেই প্রেমিক প্রকৃতপক্ষে সুখী হয়। সুতরাং নামের প্রতি প্রেম জাগিলেই নাম-গ্রহণকারীর মনে প্রেমের স্বভাবধর্ম স্ফুরিত হইবে। আসক্তি, আত্মপরতা প্রভৃতি তখন আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে, প্রেমের পরিধি বিস্তৃত হইবে। জগতের সমস্ত বস্তু সেই পরম প্রেমাস্পদের সৃষ্ট বলিয়া সকলেরই প্রতি ভালবাসা জাগিবে।[১] এই অবস্থায় দয়া, পরোপকার-প্রবৃত্তি, অভিমানহীনতা, সাধুসঙ্গ-লিপ্সা প্রভৃতি আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িবে। ঈশ্বরপ্রেমরূপ পরমার্থ লাভের সম্ভাবনা তখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিবে। হরনাথ তাই বারেবারে বলিয়াছেন, 'নামটি কোন কারণবশতঃ ছাড়িয়া থাকিও না, নিত্যশুদ্ধ নাম শুচি অশুচি সকল অবস্থাতেই লইবেন।'

আমি অশুদ্ধ হইলেও নিত্যশুদ্ধ নামের স্পর্শে পরম বিশুদ্ধ হইবে। "নাম নিতে সময় অসময় ভাবিও না। কার বের* ফুল কখন ফুটিবে কে বলিতে পারে? তাই বলি, সদাই কনে সেজে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল, তা না হলে স্বামী এসে যখন আমাকে চাহিবে, তখন সাজিতে গেলে হয়ত তিনি চলে যাবেন। তাই বলি, সকল সময়ে নাম নিয়ে সেজে থাকিবে। তিনি যেমন হাত ধরিতে চাহিবেন, অমনি হাত বাড়িয়ে দিব। মধুর কৃষ্ণনামটি জীবনে মরণে নিজসর্বস্ব মনে করিবেন।"[২]

১। Haranath, the Saviour—Vimala Modi, Page 78

* বে—বিয়ে, বিবাহ

২। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৬১-৬২

হরনাথ ও শ্রীচৈতন্য

পথের দিক দিয়া হরনাথ রাগমার্গের পথিক শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্তী। তাঁহার বাক্যে এবং উপদেশেও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত সাধন-পন্থার প্রভাব সুস্পষ্ট। হরনাথের শ্রীচৈতন্য-প্রীতি ছিল সুগভীর। তাঁহার বাক্য ও উপদেশাবলী পর্যালোচনা করিলে সর্বত্রই শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবিমুগ্ধ একটি অন্তরের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অন্তরে ভগবানের প্রতি ভালবাসা জাগরূক রাখিয়া, তাঁহার নামগান করাই শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য ঈশ্বর-সাধনার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর-সাধনার এই সহজ ও সার্বজনীন পথ প্রদর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্য হরনাথের নিকট অবতারশ্রেষ্ঠরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'জীবকে এই নির্ভুল পথটি দেখাইয়াছেন বলিয়াই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের নিকট শ্রেষ্ঠ অবতার।'[১]

গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া ধর্মকে সংস্থাপিত করিবার জন্য এবং অধর্মের বিনাশসাধন করিবার জন্যই অবতাররূপে ঈশ্বরের মর্ত্যাবতরণ। শ্রীচৈতন্য স্মৃতির শাসন এবং ইসলামের প্রভাব হইতে বাংলা দেশ তথা বাঙ্গালী হিন্দুকে মুক্ত করিয়া বাংলা এবং বাংলা দেশের বাহিরে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ধর্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। স্বীয় আচরণের দ্বারা দেশের সুবৃহৎ এক জনসমষ্টিকে শ্রীচৈতন্য যেভাবে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের অবতারেই তাহা সম্ভব এবং সেইজন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহার জীবৎকালেই পূর্ব-ভারতের এক বৃহৎ ভূখণ্ডে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অন্যত্রও শ্রীচৈতন্য-বিশ্বাসীর সংখ্যা কম ছিল না। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, তাঁহার আকৃতি ও আচরণ দেখিত, তাহারা সকলেই তাঁহাকে দেবতা অথবা দেবকল্প মহাপুরুষ বলিয়া মাথা নত করিত।[২]

১। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১

২। ডাঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ—১৯৪৮, পৃঃ ২৮০

হরনাথের শ্রীচৈতন্য-প্রীতির গভীরতা তাঁহাকে শুধু অবতাররূপে বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ঈশ্বর ও শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ তাঁহার নিকট এক ও অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। 'কাঙ্গালের উপর কৃপাপরবশ হইয়া সেই দয়াময় হরি অতি কাঙ্গাল গৌরাঙ্গরূপে দয়া করেছেন এবং যেচে যেচে নিতাইরূপে প্রেম দিয়াছেন।'[১] হরনাথের মতে, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ঈশ্বর এবং নিতানন্দ তাঁহার শক্তি।[২] জগতে প্রেম বিলাইতে তাঁহাদের আগমন। তাই তিনি বলিয়াছেন—'জীবজগতে গৌরনিতাই—ইহাদের নিকট অধিকারী বিচার নাই। গৌরের প্রেম অহেতুকী আর নিতাই নিরভিমান। সে মার খেয়ে যেচে যেচে লোককে গৌর প্রেম বিলায় এবং গৌরের হাতে হাতে সঁপে দেয়।'[৩] সেইজন্য হরনাথ ভক্তদিগকে দ্বিধাহীনচিত্তে চৈতন্য-প্রদর্শিত পথের পথিক হইবার উপদেশ দান করিতেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, করুণাঘন গৌরাঙ্গের মর্ত্যাবতরণ শুধু মানুষকে ভগবৎ সকাশে উপনীত করিবার জন্য।

"যখন আমাদের গৌর করুণার অবতার হইয়া আসিয়াছেন এবং অবোধ নিতাইচাঁদ আমাদের সহায়, তখন আমাদের বিচার করিবার আর কি আছে? সেই অমূল্য চিন্তামণিরত্ন আমাদিগকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিবার জন্য নিতাই আসিয়াছেন।"[৪]

শ্রীচৈতন্যের প্রতি এইরূপ সুগভীর ভক্তি ও প্রীতি হরনাথের উপদেশাবলীর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভক্তি ও প্রীতির বশে হরনাথের অনেক উপদেশেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রভাব এমন সুস্পষ্ট যে, তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে গৌরাঙ্গ-ভাবক বলিয়া মানিয়া লইতে কোনরূপ বাধা থাকে না। তাঁহার পত্রাবলীতে এবং ভক্তদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার গৌরাঙ্গ-ভাবনা এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে যে, তাঁহাকে

১। পাগল হরনাথ: প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২
২। হরনাথ-স্মৃতি: ষষ্ঠ লহরী, পৃঃ ৬৪
৩। হরনাথ-স্মৃতি: দ্বিতীয় লহরী, পৃঃ ২
৪। হরনাথ-স্মৃতি: চতুর্থ লহরী, পৃঃ ৪

একজন নিষ্ঠাবান চৈতন্য-ভাবক বলিয়াই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ উপদেশকে হরনাথ শ্রীকৃষ্ণের বাণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ হরনাথ বলিতেন যে,

"When I speak, I speak from a higher plane according to the dictates of the Supreme Spirit within me."[১]

এইরূপ উক্তির জন্য ভক্তগণের চক্ষে হরনাথ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হইতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মিলিত স্বরূপ বলিয়াও জ্ঞান করিতেন।

অবিসংবাদিতরূপে না হইলেও, শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসও হইয়াছে। ব্রজলীলায় অপূর্ণ তিনটি বাসনা (যথা—স্বমাধুর্য আস্বাদন বাসনা, শ্রীরাধা কর্তৃক কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার বাসনা এবং শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার বাসনা) পূরণ করিবার জন্য একমাত্র উপায়রূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন।[২] হরনাথের মতে, 'রাধার প্রেমের ঋণ পরিশোধের জন্য গৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যাবতরণ।' সুতরাং হরনাথ যে গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণকে অভিন্ন মনে করিতেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে, 'আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসার নাম প্রেম, কৃষ্ণ এই প্রেমের অধীন। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের ঋণী। এই ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষেই গৌর হওয়া।'[৩]

কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমের মাধুর্য কৃষ্ণের জন্য তাঁহার অন্তহীন ব্যাকুলতায়, কৃষ্ণপ্রেমের পরিপূর্ণতার মধ্যেও চির অতৃপ্তির বেদনায় এবং অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণময়ী হইয়াও কৃষ্ণবিরহে উচ্ছ্বসিত অশ্রুপাতে। রাধার জগৎ কৃষ্ণময়, অন্তর কৃষ্ণময়, কিন্তু তবুও তাঁহার ব্যাকুলতার

১। শ্রীশ্রীহরনাথ সঙ্গ : (যতীন্দ্রনাথ মিত্র) পাণ্ডুলিপি : পৃঃ ৯৬
২। ডাঃ রাধাগোবিন্দনাথ মহাপ্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ : পৃঃ ৫৭
৩। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ৮৮

শেষ নাই। কৃষ্ণমিলনের পরিপূর্ণ মুহূর্তেও তাই তাঁহার ওষ্ঠাধরে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠে, 'মাধব কৈছে কহবি তুঁহু মোয়।' জন্মাবধি তিনি কৃষ্ণরূপ দর্শন করিতেছেন, তবু তাঁহার আঁখিযুগ পরিতৃপ্ত নয়, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া হৃদয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়াছেন তথাপি তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় না। এই চির-অতৃপ্তি রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। তাই কৃষ্ণের হৃদয়েশ্বরী হইয়াও তিনি চিরদিন কৃষ্ণবিরহিণী। গৌরাঙ্গদেবের মধ্যে রাধাপ্রেমের এই ব্যাকুলতা, অতৃপ্তি এবং বিরহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছেন। বিরহিণী রাধার সহিত গৌরাঙ্গদেবের বিরহভাবের সাদৃশ্যের আধিক্য-হেতু বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহাকে রাধাপ্রেম-মাধুর্য আস্বাদন-প্রিয়াসী, রাধা ভাব ও কান্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হরনাথও তাঁহাদের মতই বিশ্বাস করিতেন, "এই প্রেমাস্বাদনের জন্যই জগৎপ্রাণ কৃষ্ণ গৌর হয়ে কেবল দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে কেঁদে বেড়াইয়াছেন।"[১] সম্ভবতঃ, গৌরাঙ্গদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের সূত্র ধরিয়াই হরনাথ ভক্তগণ হরনাথকে শ্রীচৈতন্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অনেকেরই বিশ্বাস এই যে, নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ সোনামুখীতে হরনাথরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[২] শ্রীচৈতন্যের মতো হরনাথও কাহাকেও দীক্ষা দান করিতেন না।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত হরনাথের সাদৃশ্য যেমন প্রচুর, পার্থক্য তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। শ্রীচৈতন্যের মতো হরনাথও কোন বিশিষ্ট ধর্মের সাধনা করেন নাই এবং বিশিষ্ট কোন সাধন-পন্থাও নির্দেশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের মতো হরনাথের অধ্যাত্ম-ভাবনাও রাগমার্গের পথ অনুসরণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের সহিত জীবের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহার মূলে যে প্রেম, অন্তরে সেই প্রেম জাগরূক রাখাই পরম সাধনা। যাহার অন্তরে এই প্রেম একবার জাগ্রত হয়, তাহার হৃদয়ে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থাকে না, কামনা-বাসনার অগ্নি

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ৬৩

২। The Last Days of Haranath—N. C. Ghosh, P. 12

সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়। ঈশ্বরের প্রেমই তখন একমাত্র কামনার ধন হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীচৈতন্যের একমাত্র কামনা ছিল এই অকাম, অহেতু ভগবৎ-প্রীতি। শিক্ষাষ্টকে তিনি এই নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতির জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন :—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না—না ধন, না জন, না সুন্দরী নারী—না কবিতা-রচনার প্রতিভা। আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি থাকুক।[১]

শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী মানুষের যে সমস্ত বিষয় চিরকালের কামনার ধন, তাহাদের কোনটিতেই শ্রীচৈতন্যের কামনা নাই। তাঁহার একমাত্র কামনা—নিষ্কাম ঈশ্বরপ্রীতি।

হরনাথের ঈশ্বরপ্রীতিও এইরূপ নিষ্কাম। ঈশ্বরের নিকট প্রেম ও ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু তিনি প্রার্থনা করেন নাই। ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার উপদেশ, "তাঁহার নিকট কেবল প্রেম ও ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয় চাহিও না।"[২] কিন্তু প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—বেদনার বহ্নিদাহে কামনা-বাসনার মালিন্য দগ্ধ না হইলে প্রেমের সোনা খাঁটি হয় না। প্রলোভনও প্রেমিককে পথভ্রষ্ট করে। প্রলোভন জয় করিতে না পারিলে প্রেমের পথে অভিসার অসম্ভব। হরনাথ এই সমস্ত বাধার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনা ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ঈশ্বর-প্রেমের সাধনা করিবার জন্য ভক্তবৃন্দকে নির্দেশ দিয়াছেন :

"তাঁর নিকট কেবলমাত্র, প্রেমভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয় চাহিও না। প্রেম চাহিতে গেলে প্রথমেই দুই-একটা বড় ধাক্কা খাইতে হইবে, তাহাতে পেছুপা হইলে, আর নয়। আর যদি তাহাতেও অগ্রসর হওয়া যায়, তবে কেল্লা ফতে। প্রেম চাহিলে

১। ডাঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড—পূর্বার্ধ, ১৯৪৮, পৃঃ ৩০৭

২। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৭

ছেলেকে চাঁদ ভুলানোর মত কত কি খেলনা দিবেন। কিন্তু যেন ভুলিয়া যাইও না।"[১]

শ্রীচৈতন্যের মতো হরনাথও ভুক্তি-মুক্তি-নির্বাণ প্রভৃতির প্রত্যাশী নহেন। তাঁহার মতে, "এই ভালবাসার রাজ্যে মুক্তির দর অতীব কম, কেহই কিনতে যায় না—মুক্তি এখানে দোকানে পড়ে বস্তাপচা হয়ে গেছে।"[২] নির্বাণও তাঁহার কাম্য নয়। নির্বাণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'আমাদের যেন কখন এ অবস্থা না হয়, এই মাত্র দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। চিরদিন যেন তাঁর ললিত মধুর মূরতি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যেন পৃথক থাকিয়া তাঁর লীলা পুষ্টি করিতে পারি।'[৩] পরমাত্মার মধ্যে লীন হইয়া অস্তিত্ব বিলোপ হইলে পরমাত্মার সাহচর্য-লাভের সৌভাগ্য ঘটে না। অথচ হরনাথ চিরকাল পরমাত্মার সেবা ও সঙ্গসুখ লাভ করিতে চাহেন। সেইজন্য মোক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভই তাঁহার অধিকতর কামনার বস্তু। শ্রীচৈতন্যের মতো হরনাথ কাহাকেও দীক্ষা দান করেন নাই এবং তাঁহার ধর্মমতেও কোনও শাস্ত্রবিধি প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং যে-কোন ধর্ম, যে-কোন সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষেই তাঁহাদের আদর্শ অনুশীলনে কোন বাধা নাই। হরনাথের মতে, সাধকের ইচ্ছামত যে-কোন পথে চলিলেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়। "যে স্রোতকেই আশ্রয় কর, সময়ে মহাসমুদ্রেই যাইবে, তাই বলি গা ঢেলে দাও, নিশ্চিন্ত হবে।"[৪] তাঁহার মতে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু অসংখ্য তাঁহার রূপ। ভক্তের ভালবাসা তাঁহাকে যে রূপে দেখিতে চায়, ভক্তের অধীন ভগবান সেই রূপেই দেখা দেন। সেইজন্য সকল মতই শ্রেষ্ঠ, সকল ভাবই উত্তম। "প্রভু একজনই তাঁকে পুরুষই বল, প্রকৃতিই বল, আর ক্লীবই বল, যাতে প্রাণ গলে যায়, তাই করিতে থাক। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে গীতাবাক্যই স্থির জানিবে। অতএব

১। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৭
২। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৮
৩। পাগল হরনাথ তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১০৪
৪। উপদেশামৃত, পৃঃ ৬৩

পৃথক দেখিবার আবশ্যক নাই। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন, 'যার যেই ভাব, সেই সে উত্তম। তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম।'[১] শেষোক্ত উদ্ধৃতিটিই উপাস্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের মতবাদের সহিত হরনাথের মতবাদের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরের বিশিষ্ট নাম কৃষ্ণ। রাগানুগা ভক্তির পথে তিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পদ্ধতি হিসাবে শ্রীচৈতন্য নামগানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঈশ্বরের রূপের পরিবর্তে নামের প্রতিষ্ঠা করায় কোন ধর্ম, কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরই চৈতন্যানুসারী হইবার পথে কোন বাধা থাকে না। ঈশ্বরের প্রেমলাভের জন্য হরনাথও নাম জপের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু নাম করিবার জন্য কোন বিধিনিষেধের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন নাই। যখন ইচ্ছা যেভাবে হউক, যেকোন নাম করিলেই হইল। নাম করিতে করিতে নামের প্রতি প্রেম জাগিবে এবং তাহা হইলেই নামী আপনি আসিয়া ধরা দিবেন। নাম সম্বন্ধেও কোন বিধিনিষেধ তিনি আরোপ করেন নাই। যে নামই হউক, করিলেই হইল। কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, গৌর, নিতাই প্রভৃতি যে কোন নাম জপ করিলেই কাজ হইবে। তবে কৃষ্ণ নামটিই তাঁহার সমধিক প্রিয়। শ্রীচৈতন্যের মতো হরনাথেরও ঈশ্বরের বিশিষ্ট নাম কৃষ্ণ। সেজন্য তিনি অনেক সময়ে বলিয়াছেন, "ইষ্টমন্ত্র যাহাই হউক, নাম লইবার সময় মধুমাখা রাধাকৃষ্ণ নাম লইবে। সবই এক, নাম মাত্র প্রভেদ। কোন রকম দ্বিধা করিবে না।"[২]

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সাধনা যে রসধর্ম, তাহার সহিত হরনাথের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর শ্রীচৈতন্য সর্বদাই বিরহভাবে আচ্ছন্ন থাকিতেন। পূর্বরাগে তাঁহার যে ব্যাকুলতা, বিরহেও তেমনি আকুলতা। বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিণী রাধা শ্রীচৈতন্যের আধারে মূর্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিক্ষাষ্টকে তাঁহার এই বিরহভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়—

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় ভাগ—পত্রসংখ্যা ১১০
২। উপদেশামৃত, পৃঃ ৬০

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥

'নিমেষ হইয়াছে যুগের মত দীর্ঘ, চক্ষু শ্রাবণ গগনের কাজ করিতেছে। গোবিন্দ বিরহে আমার সমস্ত জগৎ শূন্য হইয়া গিয়াছে।'[১]

বিরহভাবে শ্রীচৈতন্যের যে আর্তি, হরনাথে তাহা একান্তই দুর্লভ। বিরহের মাহাত্ম্য তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন। পার্থিব কাম বিরহের আগুনে পুড়িয়া প্রেমে পরিণত হয়। ভালবাসার বস্তু যখন নিকটে থাকে, তখন তাহার সম্বন্ধে কোন ভাবনাই জাগে না। দূরে সরিয়া গেলেই ভাবনা আরম্ভ হয়। প্রিয়জনের ভাবনাকে হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য বিরহই একমাত্র উপায়। অন্তরে রাধার ধ্যানের জন্যই কৃষ্ণের মথুরায় গমন। আর কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিবার পর হইতেই রাধার কৃষ্ণভাবনা গভীর হইয়া উঠে এবং ভাব-সম্মিলন হয়। তখন পুলকে আকুল দিক নেহারিতে রাধা সব শ্যামময় দেখেন। বিরহের এই অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে হরনাথ বলিয়াছেন, "ভাবিতে ভাবিতেই জীব শিব হয়, প্রকৃতি পুরুষ, পুরুষ প্রকৃতি হয়। ভাবিতে ভাবিতেই কালা গৌরাঙ্গ হন, ভাবিতে ভাবিতেই শিব গোপীশ্বর হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে রাধা, বাহিরে কৃষ্ণ। অন্তরে প্রকৃতি, বাহিরে পুরুষ। রাধাবিরহে কাতর হইয়াই কৃষ্ণ আমার গৌর হয়েছিলেন। এই কারণেই গৌরের চক্ষে সদাই জল।"[২]

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের গোবিন্দবিরহের যে আর্তি, হরনাথে তাহা তেমন সুস্পষ্টগোচর নয়। শ্রীচৈতন্যের বিরহভাবে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা; হরনাথের বিরহভাবে ধীরস্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া সান্ত্বনা-লাভের প্রয়াস। বিরহের ভাবে হরনাথ বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ আজ তোমাদের কুঞ্জে নাই, অপর কোন অধিক অনুগতার মনরক্ষা করিতেছেন, অপর কোন নবীনার প্রেমে পড়িয়া নূতন কুঞ্জে বিহার-মানসে তোমাদের ভুলিয়া অন্য স্থানে গিয়াছেন। তা কি করিবে,

১। ডাঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড—পূর্বার্ধ, ১৯৫৯, পৃঃ ৩০৭

২। উপদেশামৃত, পৃঃ ১৩৭-৩৮

ভাই? তিনি হলেন বহুবল্লভ, তাঁহাকে অনেকের মনরক্ষা করিতে হয়। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাদির প্রাণাধিক, তবে তোমরা একা চাহিলে পাইবে কেন? তোমরা তাঁহাকে যেমন চাও, তেমনি অপরাপর সকলে তাঁহাকে চায়। তাই তিনি জগৎস্বামী। তাই বলি, অস্থির না হইয়া ধৈর্য ধর।"[১]

বিরহবেদনার অভিজ্ঞতা না থাকিলে অপরের বিরহব্যথা এইভাবে উপলব্ধি করা যায় না। চিরসুখী জন কখনও ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারে না। সুতরাং যতদূর মনে হয়, কৃষ্ণবিরহের অভিজ্ঞতা হরনাথের ছিল। তাহা না থাকিলে এইরূপ পরিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হইত না। স্বীয় বিরহের বেদনার আলোকে হরনাথ অপরের বিরহব্যথার গভীরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য আপনার বিরহে তিনি অধীর নহেন, স্বামীর সহিত মিলনে অপরের আনন্দের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আপনার বিরহের বেদনা বিস্মৃত হইয়াছেন। মিলন ও বিরহ যাঁহার নিকট সমান, একমাত্র তাঁহারই পক্ষে ইহা সম্ভব। আবার প্রিয়-মিলনের আনন্দের স্মৃতিতে যাঁহার হৃদয় সর্বদাই পরিপূর্ণ, মিলন-বিরহের ঊর্ধ্বে উঠা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব। প্রিয় বিরহে হরনাথের প্রতিক্রিয়া দর্শনে মনে হয়, যেন তিনি সদাসর্বদাই মিলনের আনন্দাস্বাদে বিভোর। এই বিষয়ে হরনাথের উক্তিটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "আমি আসিয়াছি বাসরঘরে খেলা খেলিতে।"[২] উক্তিটি রহস্যমণ্ডিত। কিন্তু ইহারই সাহায্যে হরনাথ-লীলার মূলতত্ত্বটি যেন আভাষে ব্যক্ত হইয়াছে। বাসরঘর প্রথম মিলনের পটভূমি। এখানে শুধুই মিলনের স্বপ্ন। মিলনের শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় বিভোর দুইটি মুগ্ধ হৃদয় শুধু মাধুর্যে পরিপূর্ণ। পূর্বরাগের আনন্দ, বেদনা, আশা, নিরাশার দোলা এবং ব্যাকুল প্রতীক্ষার শেষে পরিপূর্ণ মিলনের যে সোনালী স্বপ্ন বাসর-ঘরেই তাহার অরুণোদয়। এইখানে প্রেমমুগ্ধ দুইটি হৃদয় পরস্পরের সন্নিধানে আসে, প্রথম মিলনের মাধুর্য আস্বাদ করে। লৌকিক

১। পাগল হরনাথ: দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ১১১

২। হরনাথ-স্মৃতি: পঞ্চম লহরী, পৃ: ৬

জীবনে এই পরম মধুর ক্ষণটি একবারই আসে। কিন্তু তাহারই স্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকিয়া প্রেমিক ও প্রেমিকার হৃদয় রসসিক্ত করে। অধ্যাত্ম জীবনে যিনি চিরকাল এই বাসরঘরের খেলা খেলেন, তাঁহার অন্তর সর্বদাই প্রথম মিলনের মাধুর্যস্বাদে বিভোর। হরনাথ বলিয়াছেন, তিনি বাসরঘরের খেলা খেলিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার খেলা শুধুই প্রেমের খেলা। তাহাতে শুধুই প্রথম মিলনের মাধুর্যের আবেশ। বাসরঘরের খেলা বলিতে হরনাথ সম্ভবতঃ জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রেমমধুর মিলনের নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্যের খেলাকেই বুঝাইয়াছেন। হৃদয়ের বাসরে প্রেমে পাগল হরনাথ প্রেমময় কৃষ্ণের সহিত নিত্যমিলনের আনন্দে বিভোর। ভক্তদের সহিত হরনাথের যে খেলা, তাহাও এই মিলনের খেলা। তাঁহার ভালবাসার খেলাঘরে বিরহের প্রবেশাধিকার নাই। সকলের সহিত তাঁহার মধুর সম্পর্ক, সকলের জন্যই তাঁহার অহেতুক ভালবাসা। ভক্ত-হৃদয়ের বাসরঘরে এই ভালবাসার খেলাই হরনাথ-লীলার বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই হরনাথের সহিত শ্রীচৈতন্যের পার্থক্য বিশেষভাবে সূচিত করিয়াছে।

সন্ন্যাস-ব্রতধারী শ্রীচৈতন্যের ভগবৎ-প্রেমের গভীরতা অতলস্পর্শী ছিল, কিন্তু সেই প্রেম আস্বাদনের শক্তি সকলের ছিল না। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, 'শ্রীচৈতন্যের যে অন্তরঙ্গ সাধনা রসধর্ম তা কখনই জনসাধারণের জন্য নয়।'[১] সেইজন্য প্রবল আকর্ষণ থাকিলেও সাধারণ নরনারী তাঁহার নিকট-সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পাইত না। চৈতন্য-বিরহে তাই তাহাদের কাতর হওয়া স্বাভাবিক। আবার শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দবিরহে কাতর, অর্থাৎ চৈতন্যলীলার বিরহ দুইদিক হইতে। হরনাথ গৃহস্থধর্মী, বাহ্যিক ব্যবহার ও আচরণে সাধারণের একজন মাত্র। সুতরাং তাঁহার সহিত সম্ভ্রমের ব্যবধান রক্ষা করিবার প্রশ্ন ভক্ত বা অনুচরদের অন্তরে উঠিত না। নিকট-সান্নিধ্যে আসিয়া হরনাথ-ভক্ত ও

১। ডাঃ সুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, ১৯৬২, পৃঃ ২২

অনুসারীগণ তাঁহার সহিত নিত্যমিলনের আনন্দে বিভোর হইতেন। এদিক দিয়াও হরনাথের খেলা মিলনের খেলা।

জীবনাদর্শের পার্থক্যও শ্রীচৈতন্য ও হরনাথের মধ্যে পার্থক্যের ভেদরেখা সুদৃঢ় করিয়াছে। প্রথম জীবনে গার্হস্থ্য ধর্মাচরণ করিলেও, লোকসমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা সন্ন্যাসীরূপে। যতদূর মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের গার্হস্থ্য জীবনও সাধারণ গৃহস্থ জীবন হইতে পৃথক। অপরদিকে, হরনাথ পরিপূর্ণ গৃহস্থ; সাধারণ গৃহস্থের সহিত তাঁহার কোনও পার্থক্য নাই। শৈশবে ও কৈশোরে বিদ্যার্জন, যৌবনে বিবাহ ও ধন উপার্জন, পুত্রকন্যা লাভ, প্রৌঢ়াবস্থায় কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ এবং বার্ধক্যে ধীরে ধীরে পরলোকের পথে যাত্রা প্রভৃতি সকল বিষয়েই হরনাথের সহিত সাধারণ গৃহস্থ জীবনের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য। সাধারণ গৃহস্থের মতোই রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর সম্মুখে তিনি অসহায়। সর্বাংশে আপনাদের মতো একজনের নিকট-সান্নিধ্যে গমন করিতে কাহারও মনে কোন দ্বিধা না জাগাই স্বাভাবিক। নিকট-সান্নিধ্যে আসিয়াও সাধারণ নরনারী তাঁহাকে সর্বদা চিনিতে পারিত না। বিভ্রান্তকারী গৃহস্থের ছদ্মবেশ থাকায়, অনেকেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট পার্থিব কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা জানাইত, সংসারের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা করিত। হরনাথের মনে এজন্য কোনরূপ বিরক্তিবোধ জাগিত না। তিনিও তাহাদের সহিত অসঙ্কোচে সংসার বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এইভাবে আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইত। সংসারী নরনারীগণ বৈষয়িক উন্নতির এবং আত্মিক মুক্তির উপায়রূপে ভগবৎ-সাধনার নির্দেশ পাইত। অর্থ ও পরমার্থ লাভের উপায়ের সন্ধান পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল নরনারী হরনাথের সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিত। সংসারী ও বিষয়াসক্ত বলিয়া কেহই হরনাথের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইত না। এইভাবে প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতির খেলা চলিত এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতির জন্য প্রস্তুতিও চলিত।

গার্হস্থ্য জীবনে হরনাথ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবৃত, অর্থোপার্জনে

রত, বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়াসী এবং সর্বোপরি কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্ত নহেন। অথচ অধ্যাত্ম-পথে অভিসার করিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকে সেই অভিসারের পথে প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করেন নাই, বরং সহায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্বীয় জীবনের এই অভিজ্ঞতার আলোকে হরনাথ সাধনার ক্ষেত্রে কামিনী-কাঞ্চনের নব মূল্যায়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সহধর্মিণী ঈশ্বর-সাধনার সাহায্যকারিণী। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে সাধনার পথে অভিসার সহজ হইয়া উঠে। তাঁহার অসন্তোষ বা অনাদর কৃষ্ণকৃপা লাভের পরিপন্থী। তাঁহার মতে, 'কৃষ্ণ দিবার তাঁরাই অধিকারিণী। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া করিতে পারে না। কৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁদের বশ।'[১] প্রকৃতরূপিণী এই স্ত্রীজাতিকে হরনাথ তাই মহাশক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই মহাশক্তির প্রীতিবিধানে প্রয়াসী হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রকৃতিগণ সহায় হইলে কৃষ্ণকৃপা লাভ সুনিশ্চিত। 'এই প্রকৃতির কৃপা হইলে, একদিন সেই পরম পুরুষকে দেখিতে পাইব।'[২] বিষয় ও অর্থসম্পদ্ সম্বন্ধে হরনাথ শ্রীচৈতন্যের মতো উদাসীন ছিলেন না। সন্ন্যাসীর জীবনে অর্থের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অর্থ ব্যতীত গৃহীর চলে না। অর্থ না থাকিলে সংসার প্রতিপালন দুষ্কর। অন্নচিন্তা চমৎকারা হইলে নিশ্চিন্তচিত্তে সাধন-ভজনের আশা দুরাশা মাত্র। গৃহী হরনাথ এই তথ্য জানিতেন বলিয়া, অর্থকে অনর্থ বলিয়া গণ্য করেন নাই। তবে সঞ্চয় অপেক্ষা অর্থের সদ্ব্যবহারের উপরেই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সঞ্চিত অর্থ হৃদয়কে কঠিন করে, আর সদ্ব্যবহার দ্বারা অর্জিত অর্থের চলাচল হৃদয়কে কোমল করে। তাই তিনি বলিয়াছেন—'যেমন সুশৃঙ্খলে চালিত রক্ত শরীর পোষণ করে, কিন্তু স্থগিত রক্ত শরীর নষ্ট করে, তেমনি অর্থ আসা যাওয়াতে হৃদয় নরম ও পবিত্র করে আর একত্র হইয়া হৃদয়কে কঠিন ও অপবিত্র করে।'[৩]

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৭৫

২। উপদেশামৃত, পৃঃ ৯

৩। পাগল হরনাথ : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮৪

শ্রীচৈতন্য বিষয়ী ও স্ত্রীলোকের নাম পর্যন্ত শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের মতো পরম ভক্তকেও তিনি প্রথমে দর্শন দান করিতে চাহেন নাই। সার্বভৌম যখন শ্রীচৈতন্য সকাশে নিবেদন করিলেন যে, রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অভিলাষী, তখন—

'কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্বভৌমে কহে, কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥'[১]

শ্রীচৈতন্যের অপরিমেয় করুণা হইতেও যাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে সেই হরিজন—বিষয়ী ও নারীকে হরনাথ অধ্যাত্ম-সাধনার রাজ্যে শুধু প্রবেশাধিকার দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, স্বীয় উপলব্ধির আলোকে নব মূল্যায়ন করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই স্থানে সূচিত হইলেও, তিনি যে শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায়ই পূরণ করিয়াছেন, একথা বলা বোধ-হয় অসঙ্গত হয় না। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে বাস করিতেন, তখন ভক্তগণ প্রতি বৎসরই তাঁহার নিকটে ছুটিয়া যাইতেন এবং তখনই শ্রীচৈতন্য উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের ফল অবিমিশ্ররূপে ভাল হয় নাই। ভক্তেরা নীলাচলে তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিলে চৈতন্যের উদ্দেশ্য যে হরিনাম প্রচার, তাহা সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য তিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং কয়েকজন শক্তিশালী ভক্তকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নাম ও প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের প্রতি নিত্যানন্দের উপদেশের মূলকথা ব্যঙ্গবিজড়িত হইলেও, পর পৃষ্ঠার ছড়াটিতে নিহিত আছে :

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : মধ্যলীলা : একাদশ পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা ৫-৬, পৃঃ ২৫০। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত, ১৩৬১

'মাগুর মাছের ঝোল
ভর যুবতীর কোল
বোল হরিবোল'

অর্থাৎ, সংসারের সকল প্রকার ভোগসুখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও, শুধুমাত্র হরিনাম গ্রহণ করিলেই পরলোকে নিস্তারলাভ সুনিশ্চিত।

নিত্যানন্দ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের হরিনাম প্রচারে লোকের কিয়ৎ পরিমাণে চিত্ত সংস্কার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ বা বৈরাগ্য অবলম্বনের প্রবণতা তীব্রাকারে দেখা দিল। সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-সাধনায় নিমগ্ন হওয়াই যদি শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে এ সংবাদে তিনি সুখী হইতেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। "অদ্বৈত আচার্য প্রহেলিকার মধ্যে সংপুটিত করিয়া চৈতন্যকে সংবাদ দিয়াছিলেন, 'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল, ইত্যাদি। চৈতন্য এ ব্যাপারে দুঃখিত হইয়াছিলেন।"[১] সেইজন্য শেষ বয়সে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে সংসারী হইবার নির্দেশ দান করেন। উদ্দেশ্য ছিল, পরমভাগবত নিত্যানন্দ সংসারধর্ম পালন করিয়াও ধর্মসাধনার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন, তাহার দ্বারা সংসারী নরনারী অনুপ্রাণিত হইবে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রায় ছিল এই যে, সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বর-সাধনায় নিমগ্ন হওয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের বা সংসারবিরাগী হইয়া অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতী হওয়ার বিরুদ্ধ মতই তিনি পোষণ করিতেন।

হরনাথের জীবনে শ্রীচৈতন্যের সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে বলা চলে। শ্রীচৈতন্যের মতো তিনি ঈশ্বরের নাম বিলাইয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। নিত্যানন্দের মতো সংসার করিয়াছেন। কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই—নিত্যানন্দের মত শেষ বয়সে নয়। সুতরাং হরনাথের জীবনে যেমন চৈতন্যের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি আবার নিত্যানন্দের আদর্শও স্থাপিত হইয়াছে। প্রেমভক্তির পথে শ্রীচৈতন্যের নাম-সাধনা, আর সংসারের আশ্রয়ে, নিত্যানন্দের

১। ডাঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড: পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪২৫

গৌরাঙ্গ ভাবের সাধনা—এই দুই আদর্শ হরনাথে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। 'হরনাথ-তত্ত্ব'দর্শী তাই দেখিয়াছেন,—

"If we study carefully the incidents of Haranath's life and his character, we shall have to say that his advent here was but an enactment of the second chapter of Sri Gouranga's with this difference only that Sri Gouranga's body combined both the bodies of Sree Krishna and Sree Radha (in Bhab) in one whereas Haranath's body had in him the manifestation of Sree Gouranga but that of Nityananda Prabhu also."[১]

১। Haranath Tattwa—Narayan Chandra Ghosh, P. 14

হরনাথ ও রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-ভাবনা যুগ-প্রচলিত পন্থা অনুসরণ না করিয়া স্বীয় বিশিষ্ট পথে সঞ্চরণ করিয়াছিল এবং সর্বধর্ম-সমন্বয়ের তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল। এই বিশিষ্ট পথ প্রেমভক্তির পথ। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত অনুরাগ মার্গের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

রামকৃষ্ণের পুঁথিগত বিদ্যা খুব বেশী ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালায় মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্ররূপে পরিচিত হইলেও, সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানস-রাজ্যে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের পক্ষে তাহা অনুকূল ছিল না। সেই বয়স হইতেই তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হইতেন এবং নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠেন। প্রতিবেশী লাহাদের অতিথিশালায় আগত সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ও সেবা এবং গৃহদেবতা রঘুবীরের অর্চনা রামকৃষ্ণের জীবনে অধ্যাত্ম-ভাবনার সূচনা করে। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আনুড় গ্রামে গমনকালে পথিমধ্যে অদ্ভুত জ্যোতি দর্শনের ফলে তাঁহার প্রথম ভাবসমাধি হয়।[১]

একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কর্তৃক আনীত হইয়া রাণী রাসমণিপ্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারী নিযুক্ত হইবার পর রামকৃষ্ণের ঈশ্বর ভাবনা নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তাঁহার ঈশ্বর জগন্মাতার মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়া 'কালী' নামে অভিব্যক্তি লাভ করেন। জগন্মাতার সহিত রামকৃষ্ণের সম্পর্ক ছিল মাতাপুত্রের সম্পর্ক। রামপ্রসাদের মত রামকৃষ্ণের ভাবদৃষ্টিতে জগন্মাতা জননীর রূপে প্রতিভাত হন। ব্রাহ্মণীর তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ তন্ত্রোক্ত সাধন করেন এবং 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রবণ করেন। তোতাপুরীর নিকট রামকৃষ্ণ বেদান্ত শ্রবণ করেন এবং বৈষ্ণবচরণের সহায়তায় 'চৈতন্য সভা'র সহিত পরিচিত হন। এইভাবে ধর্মতত্ত্বের সহিত পরিচিত হইলেও, রামকৃষ্ণের সাধনা তত্ত্বালোচনা কিংবা বিধিমার্গের সাধনার

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৫৭

পথে প্রবাহিত হইল না। তিনি সন্তানভাবে জগন্মাতার করুণালাভের জন্য আকুল হইয়া প্রার্থনা করিতেন। জননীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিশুসন্তানের যে ব্যাকুলতা, রামকৃষ্ণের মাতৃমন্ত্র সাধন সেই ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ। রামকৃষ্ণের সেই সময়ের ব্যাকুলতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বর্ণনায় আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদিতেন, সর্বদা মার সঙ্গে কথা কহিতেন, মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, মা তোর কথা কেবল শুনবো, আমি শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বুঝবো।"[১] জগন্মাতার উপর এই পরিপূর্ণ নির্ভরতা এবং তাঁহার জন্য এই ব্যাকুল আর্তি উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় চিন্তার রাজ্যে এক নূতন উষার স্বর্গদ্বার খুলিয়াছিল, তামসিকতায় আচ্ছন্ন নরনারীর সম্মুখে অধ্যাত্ম-সাধনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিল এবং যুগের পক্ষে জ্ঞানমার্গের বা তত্ত্বালোচনার পথের অনুপযোগিতার কথা প্রমাণ করিয়া ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিল। বাস্তবিক রাম-মোহন হইতে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ধর্মসাধকগণের ব্যাপক প্রচারে যাহা সম্ভব হয় নাই, রামকৃষ্ণের জীবনের দৃষ্টান্তে তাহা সম্ভব হইল। রামকৃষ্ণ কোথাও ধর্মপ্রচার করিতে যান নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণের নিকটে যাঁহারাই আসিতেন, তাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহার বাণী শুনিতেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। এইভাবে রামকৃষ্ণের দর্শন, সাহচর্য, এমন কি কাহিনী শ্রবণেও লোকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হইতে লাগিলেন।

জগন্মাতার দর্শনলাভের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের উন্মত্ততা ধীরে ধীরে প্রশমিত হইতে লাগিল। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন (১৮৭৯—১৮৯০) সালে, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। তখন শান্ত, সদানন্দ, বালকের অবস্থা। কিন্তু প্রায় সর্বদা সমাধিস্থ। কখনও কখনও জড়সমাধি, কখনও ভাবসমাধি—সমাধিভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। "যেন পাঁচ বছরের ছেলে। সর্বদাই মা মা।"[২]

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৭

মাতৃমন্ত্রের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার পর রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সাধনা করেন। আল্লামন্ত্র জপ ও যীশুখ্রীষ্টের চিন্তাও তিনি করিয়াছিলেন এবং সকল সাধনার লক্ষ্য যে এক এবং অভিন্ন, এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করেন—"যত মত, তত পথ।"

ধর্মান্দোলন বলিতে যাহা বুঝায়, রামকৃষ্ণ কোনদিনই তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই; অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের সার্থক পরিণতিলাভের পথে তাঁহারই অবদান সর্বাধিক। রামকৃষ্ণের সাধনা বহুলাংশে শ্রীচৈতন্যের মতো। অনুরাগের পথে সঞ্চরণ করিয়া স্বীয় জীবন-সাধনার দৃষ্টান্তে বহির্মুখ জীবকে শ্রীচৈতন্য যেভাবে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়াছিলেন, ভক্তিপথের পথিক রামকৃষ্ণও ঠিক তেমনি ভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাকে ভগবচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। জীবনাদর্শেও শ্রীচৈতন্যের সহিত রামকৃষ্ণের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যের মতো তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিবাহিত হইয়াও আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মতো রামকৃষ্ণ অবশ্য সহধর্মিণীকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, কাছেই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিতেন। অন্তরেও রামকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধামনোভাবাপন্ন। তাঁহার উপদেশে এবং ভক্তদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে সেই শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হইত। তাঁহার মতে, জীবজগতের বহু ঊর্ধ্বে ছিল শ্রীচৈতন্যের স্থান। "গৌরাঙ্গের মহাভাব—প্রেম। এই প্রেম হলে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না, তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হত।"[১]

রামকৃষ্ণের ভাবদৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরকোটী বা অবতাররূপে প্রতিভাত হইতেন। কারণ, ঈশ্বরকোটী বা অবতার ছাড়া প্রেম হয় না। শ্রীচৈতন্যের এই প্রেম হইয়াছিল বলিয়া রামকৃষ্ণ বলিতেন যে,

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৯

তিনি ঈশ্বরকে বাঁধিবার দড়ি পাইয়াছিলেন। কারণ, "প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।"[১] এইভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রতি রামকৃষ্ণের শ্রদ্ধামনোভাব বারেবারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ভক্তও অনুচরদিগের সহিত রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ লীলা গান, নাম-সংকীর্তন, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা-গীতি প্রভৃতি আস্বাদন এবং ঈশ্বর-সাধনায় অনুরাগরঞ্জিত ভক্তির অনুসরণ করিবার উপদেশ দান প্রভৃতির মধ্যেও রামকৃষ্ণের সুগভীর শ্রীচৈতন্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শ্রীচৈতন্য-প্রীতির ভূমিতে রামকৃষ্ণের সহিত হরনাথের সাদৃশ্যের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-অনুসৃত পথ উভয়েই অনুসরণ করেন এবং উভয়েই সহজ পথে ভগবৎপ্রীতি লাভের জন্য জীবকুলের অন্তরে ব্যাপক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমভাব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ ও হরনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রামকৃষ্ণের মতে, শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরকোটী বা অবতার। হরনাথের মতে, শ্রীচৈতন্য ও কৃষ্ণ অভিন্ন। প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপে মর্ত্যাবতরণ ঘটিয়াছিল। প্রেমের সাধনার ব্যাপারেও হরনাথ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর সমূহ সাদৃশ্য। রামকৃষ্ণের মতে, "কলিতে নারদীয় ভক্তি। এ পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব বা প্রেম। এই মহাভাব বা প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে, তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।"[২] অর্থাৎ, রামকৃষ্ণের মতে, মহাভাব বা প্রেম ঈশ্বরলাভের প্রধান সোপান। হরনাথের মতেও, ভগবৎ-সাধনার একমাত্র উপায় ভালবাসা ও প্রেম। অন্তরে এই প্রেম জাগাইবার উপায় নামগান। তাই বলি, "প্রেমের তুলনা প্রেমই। এই অমূল্য মহারত্নটি কেবলমাত্র নামসমুদ্র মন্থনেই পাওয়া যায়। তাই ভাগবত বার বার করে বলেছেন, হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা !! অনবরত নামসমুদ্র

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৩৬
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১০৬

মন্থন করিতে থাক, রত্ন পাইবেই পাইবে, কোন ভুল নাই।"[১]
এইভাবে প্রেমলাভ করিবার নির্দেশ দেওয়ায় ইহাই প্রতীতি হয় যে, নামে রুচি এবং জপে নিষ্ঠা থাকিলে যে-কোন জীবের পক্ষেই প্রেমলাভ সম্ভব। সুতরাং রামকৃষ্ণ যাহাকে জীবের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, হরনাথের মতে তাহা জীবের আয়াসসাধ্য। এই প্রেমের সরণি বাহিয়াই হরনাথ সর্বধর্মসমন্বয়ের তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রেমই সকল বিভেদ দূর করিতে সমর্থ, প্রেমে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। সুতরাং প্রেমের পথই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি দূর করিবার প্রকৃষ্ট পথ। "সকলকে ভালবাস, এই ভালবাসার রাজ্য যত প্রশস্ত করিবে ততই চক্রবর্তী রাজা হইয়া পূর্ণ প্রেমে কাল কাটাইবে। যার এই ভালবাসার সীমা যত সঙ্কীর্ণ সে ততই নির্দয় ও প্রেমশূন্য। ভালবাসার গাছেই প্রেমফল ধরে। এতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান নাই। এখানে সকলের সমান অধিকার। তাই বলি, ভালবাস।"[২]

ভক্তিপথের পথিক রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্ম-সমন্বয়ের তত্ত্বে উপনীত হন, বিবিধ মতের সাধনা করিয়া। তিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ হিন্দু মতের এবং মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মমতের সাধনা করিয়া সকল ধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করেন এবং সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেন। ভক্তির পথে সাধনা করিয়া তিনি উপলব্ধি করেন যে, সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এক। সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বরের কৃপালাভ। সেই ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন তাঁহার নাম। তাঁহার সকাশে উপনীত হইবার পথও অনেক। এক-একটি ধর্মমত এক-একটি পথের মতো। সেই পথ বাহিয়া তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই মহাসত্য উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, শাক্তেরা যাঁহাকে কালী বলেন তিনিই বৈষ্ণবের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, শৈবের শিব, আবার নিরাকারবাদীর ব্রহ্মও সেই তিনি। খ্রীষ্টানের গড্, আর মুসলমানের আল্লাও সেই তিনি।

১। পাগল হরনাথ : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৪
২। উপদেশামৃত, পৃঃ ১২৫

একই ব্যক্তি নামরূপ ভেদ। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা রামকৃষ্ণ ইহা সুন্দর-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "যেমন জল, water, পাণি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে জল। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে পাণি। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে water। তিনিই এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ গড্, কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"[১] বিভিন্ন ধর্মসাধনার লক্ষ্যের ঐক্য এইভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া, রামকৃষ্ণ সকল মত ও সকল পথের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম-সাধনা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি যার যা ভাব, তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, একথা বলো না আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভুল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।"[২]

রামকৃষ্ণের উপদেশের সহিত হরনাথের উপদেশেরও সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। রামকৃষ্ণের মতো হরনাথও নির্জনে সাধনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দিবারাত্রি সংসারের মধ্যে থাকিলে সংসারী মানুষের মন ঈশ্বরমুখীন হইতে পারে না। সেজন্য সাধনার প্রথম অবস্থায় মনের ভক্তিভাবকে সুদৃঢ় করিয়া লইবার জন্য রামকৃষ্ণ নির্জনে সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।"[৩]

নির্জনে হরিনাম করিবার জন্য হরনাথও উপদেশ দিয়াছেন। নির্জন স্থানে আপন মনে হরিনাম করিলে সংসারের জ্বালার নিবৃত্তি

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬২
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৫০
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৩

হয়, মন ভগবৎমুখীন হয় এবং পরমানন্দস্বরূপ নামগ্রহণের ফলে অনির্বচনীয় ভাবে ও রসে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাই হরনাথ ভক্তদের বলিয়াছেন, "সময় পাইলেই নির্জন স্থানে বেড়াইবে, বনে, নদীর ধারে, মাঠে বেড়াইয়া যে সুখ ইন্দ্রের ইন্দ্রালয়েও সেই সুখ নাই।" এইরূপ স্থানে মন যখন গভীর সুখাবেশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন যদি ভগবানের নাম উচ্চস্বরে গান করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রেমে শরীর পরিপূর্ণ হয়। নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়ে। তাই তিনি বলিতেন, "মাঝে মাঝে একটু নির্জন স্থানে যাইয়া উচ্চরবে নাম করিলেই প্রেমে শরীর পূর্ণ হয়, দুনয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়িবে, তখন সকল দুঃখ নিবারণ হইবে এবং সকল জ্বালা জুড়াইবে।"[১]

রামকৃষ্ণ শাস্ত্র-বিচার পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে, শাস্ত্র-বিচার অপেক্ষা গুরুবাক্যে আস্থা স্থাপন করাই ঈশ্বরলাভের প্রশস্ত উপায়। যদি গুরু না থাকে, তাহা হইলে ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কাঁচা ভক্তি, কাঁচা ঘিয়ের মতো। শাস্ত্রবিচারের কল-কলানি আসে কাঁচা ভক্তি হইতে। ভক্তি পাকা হইলে কলকলানি আর থাকে না। পাকা ভক্তি সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ। এই সিদ্ধি যে কি বস্তু, তাহা মুখে বলিয়া বুঝানো যায় না। সিদ্ধি না খাইয়া মুখে শতবার সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলেও যেমন নেশা হয় না, তেমনি সিদ্ধ না হইলে সিদ্ধ অবস্থার উপলব্ধি অসম্ভব। রামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, "সিদ্ধি, সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে? কুলকুচে করলেও কিছু হবে না পেটে ঢুকতে হবে। তবে নেশা হবে। ঈশ্বরকে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাকলে এসব ধারণা হয় না।"[২]

হরনাথও শাস্ত্র-বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার অনুরাগের পথে বিচার-বিতর্কের অবকাশ নাই। বিচার-বিতর্ক মাপ-কাঠির মতো। অনুরাগের কোন মাপ নাই। ভালবাসা ছটাক-কাঁচ্চায় বা ফুট-ইঞ্চিতে মাপিয়া দিবার বস্তু নয়। ভালবাসা অন্ধ,

১। পাগল হরনাথ: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৩১১

ভালবাসার চক্ষু পৃথক—Love sees angel's beauty in Egyptian brow.[১] সুতরাং ভালবাসার পথে বিচারের অবকাশ নাই। হরনাথের মতে তাই অন্ধের মতো ভালবাসাই ঈশ্বরের প্রেমলাভের প্রধান উপায়। তিনি বলিয়াছেন, "কৃষ্ণপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণ লইয়া ও কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চলিতে থাকুন দেখিবেন কত সুখ ও কত আনন্দ। আপনি কৃষ্ণের জন্য পাগল হইলেই কৃষ্ণও আপনার জন্য পাগল হইবেন। কৃষ্ণের জন্য যখন রাধা অতীব কাতর ও কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্তা তখন কৃষ্ণের অবস্থা চণ্ডীদাস লিখিয়া গিয়াছেন :—

তার উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছে সার।
শয়নে কিশোরী, স্বপনে কিশোরী, কিশোরী গলার হার॥

ইত্যাদি। তাই বলি, যদি কৃষ্ণকে কাঁদাইতে চান, নিজে কৃষ্ণ বলে কাঁদুন। কৃষ্ণকে যদি পাগল করিতে চান, 'কৃষ্ণ'নামে পাগল হউন, যদি 'কৃষ্ণে'র ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান, তাঁহাকে ভালবাসুন।"[২]

প্রেমের পথে যাঁহাদের অভিসার, ভুক্তি, মুক্তি, নির্বাণ প্রভৃতি কোন কিছুই তাঁহাদের কাম্য নয়। তাঁহাদের একমাত্র কামনা ভগবৎ-সাহচর্য এবং তাঁহার সেবার অধিকারপ্রাপ্তি। রামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্ম-ভাবনায় অনুরাগের পথের পথিক। তিনি সন্তান—এই অভিমান মাত্র কামনা করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের কামনা তাঁহার নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা—এই অভিমান রাখতে চায়।"[৩] প্রেমের পথের পথিক হরনাথও ভুক্তি, মুক্তির প্রত্যাশী নহেন, নির্বাণও তাঁহার কাম্য নয়। তিনি বলিয়াছেন, "যাঁদের ভজন সাধন আছে, তাঁরাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতির সহিত আলাপ করুন। কিন্তু আমার কিছুই নাই, বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ২৯
২। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১-৪২
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১৭

সহিত আলাপ করিতে চাই। তাই আমি গয়লার ছেলে, গরুর রাখাল, সেই প্রাণ-কানাইয়ের সঙ্গ চাই।"[১] এই সাহচর্যলাভই হরনাথের একমাত্র কাম্য।

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনা কোন বিশেষ শাস্ত্রবিধি-সম্মত ছিল না। তিনি স্বীয় অভিরুচিমত বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মতের সাধনা করিয়াছিলেন। ভক্তদিগকেও তিনি আপন আপন ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। যাহার যেভাবে ইচ্ছা সাধনা করিতে তিনি উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সকল ভাবেরই মূল যে ভক্তি, সেই ভক্তিকেই তিনি ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায়রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। যাঁহার হৃদয়ে এই ভক্তি সঞ্চার হইয়াছে, বিধিমার্গের অনুসরণ না করিলেও রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিমুখ হইতেন না। তিনি বলিতেন, "যদি শূকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য।"[২]

অর্থাৎ, সাধকের বাহ্যিক লক্ষণের উপর এবং বিধিসম্মত রীতিনীতি পালনের উপর রামকৃষ্ণ কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। তাঁহার মতে, ভক্তি থাকিলেই ঈশ্বর-সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে। এই বিষয়ে হরনাথের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঈশ্বরলাভের সুনিশ্চিত উপায় হিসাবে হরনাথ আকুলতা ও তাহার আদরের ভগিনী লালসাকে নিজ সঙ্গিনী করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ইহারা নিত্যসঙ্গিনী হইলে—সাধকের বাহ্যিক লক্ষণ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কৃষ্ণের জন্য আকুলতা এবং কৃষ্ণলালসা জাগ্রত হইলেই অন্তরে কৃষ্ণচিন্তা আসে, তাহা হইলেই প্রেম আসে। এই প্রেম অন্তরে জাগরূক রাখাই হরনাথের মতে পরম সাধনা। যাঁহার অন্তরে এই প্রেম জাগিয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার মতে, "কণ্ঠে মালা ধারণ, কপালে ও নাসিকায় তিলক কাটা, সর্বগাত্রে হরিনামের ছাপ, হাতে মালা না ফিরিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কৃষ্ণরাজ্যের ধার ধারেন না।"[৩]

১। উপদেশামৃত, পৃঃ ১২৭
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৫
৩। অমিয় হরনাথ-লীলাকথা : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫

রামকৃষ্ণ কর্তৃক ব্যবহৃত উপমা ও রূপকাদিও হরনাথের কয়েকটি উপদেশে ব্যবহৃত হইয়া, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সংসারী মানুষ কিরূপভাবে সংসারের মধ্যে থাকিবে, ইহা বুঝাইবার জন্য রামকৃষ্ণ নষ্ট স্ত্রীর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। "সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ীর সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাতদিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ করে কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।"* অনুরূপক্ষেত্রে হরনাথ উপদেশ দিয়াছেন, "কুলরমণীর উপপতি-চিন্তার মতো কৃষ্ণচিন্তা করিলেই মনে-প্রাণে অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণ ভাবা হয়, তাতেই প্রেম আসে, এই কথাই নরোত্তম ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন।" রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁন্দি।[১]

এইভাবে বহু বিষয়ে রামকৃষ্ণের সহিত হরনাথের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া গেলেও, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যসমূহের জন্যই রামকৃষ্ণ-প্রভাবিত যুগে আবির্ভূত হইলেও, হরনাথের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণের সহিত হরনাথের মূল পার্থক্য অধ্যাত্ম-সাধন সম্বন্ধীয় মতবাদে নয়, জীবনাদর্শে। বিবাহিত হইয়াও রামকৃষ্ণ আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী, সন্ন্যাস-জীবনই তাঁহার আদর্শ। প্রথমে সংসারের উপর তাঁহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। পরে অবশ্য এই ভাবের কতকাংশে উপশম হয়।† ফলে, তিনি সংসারী ভক্তদের সহিতও আলাপ-আলোচনা করিতেন। অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমের পিয়াসী হরনাথ জীবনাদর্শে পরিপূর্ণ গৃহস্থ। সাধারণ গৃহস্থের সহিত বাহ্যিক লক্ষণে তাঁহার কোন পার্থক্য ছিল না। ভক্তিমান পুত্র, শ্রদ্ধাবান ভ্রাতা, প্রেমময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা হিসাবে সংসার-জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১১১

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩

† শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সেনের মতে, কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবেই রামকৃষ্ণের মন হইতে সংসারের প্রতি বিরক্তির ভাব অপসারিত হয়। দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮৫

সংসার-জীবনের কর্তব্যপালনে তাঁহার কোন ত্রুটি ছিল না। সংসার পালনের জন্য তিনি অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, পোষ্যগণের ভরণ-পোষণ ও সুখ-সুবিধার জন্য সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, জমি-জমার তত্ত্বাবধান, উদ্যান-রচনা, পুষ্করিণী খনন, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি সম্পন্ন গৃহস্থের প্রত্যেকটি করণীয় কার্য হরনাথ নিজ জীবনে সম্পাদন করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, সংসারী জীবনে অনিবার্য যে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি, হরনাথের জীবনেও তাহাদের প্রভাব কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং বাহ্যিক জীবনে হরনাথ পরিপূর্ণ গৃহস্থের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শ রামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্তরঙ্গে হরনাথ ছিলেন পরম ভাগবত। ঈশ্বরের প্রেমলাভের জন্য তাঁহার আকুলতা, মিলনে প্রশান্তি এবং বিরহে স্থৈর্যের তুলনা অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে দুর্লভ দৃষ্টান্ত। বাহ্যিক জীবনে কিন্তু ইহার লেশমাত্র অভিব্যক্তি নাই। গার্হস্থ্য জীবন যেন আবরণস্বরূপ হইয়া হরনাথের অধ্যাত্ম-জীবনকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিল। সেইজন্য অধ্যাত্ম-পথের পথিক বলিয়া হরনাথকে চিহ্নিত করা সহজসাধ্য ছিল না।

সাধনাদর্শেও হরনাথ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য ছিল। রামকৃষ্ণের ঈশ্বরের বিশিষ্ট নাম 'কালী'। রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে জগন্মাতার রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনিই কালী। সন্তানভাবে রামকৃষ্ণ এই মাতৃরূপের উপাসনা করিয়াছেন। হরনাথের ঈশ্বরের বিশিষ্ট নাম 'কৃষ্ণ'। ব্রজের গোষ্ঠে রাখালবেশে যিনি গোচারণ করিতেন, শারদ পূর্ণিমা নিশীথে গোপাঙ্গনাগণসহ রাসমণ্ডলে যিনি বিহার করিতেন হরনাথের ঈশ্বর সেই গোষ্ঠবিহারী, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ। মাধুর্যের ভাবে তিনি সেই কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। ব্রজগোপিনীর ভাব ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। হরনাথ তাই বাহিরে পুরুষ, অন্তরে প্রকৃতি। তিনি বলিতেন, "I am Purasha outside but Prakriti within" গোপবধূ শ্রীরাধার মতো তিনিও ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী।

রামকৃষ্ণের সাধনা-ভক্তিপথের সাধনা। ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম

প্রভৃতি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইলে মন ভক্তিপথের উপযোগী হয়। আত্মশুদ্ধি ঘটিলেই অন্তরে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। বৈরাগ্যের অন্তরায় বলিয়া রামকৃষ্ণ অন্ততঃপক্ষে মনে মনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। হরনাথ ইহাদের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য ইহাদের কোনটিরই গুরুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, ঈশ্বরলাভের জন্য অপরিহার্য ভালবাসা বা প্রেম। পার্থিব বস্তুর প্রতি ভালবাসা যখন কোন উচ্চভাবকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হয়, তখনই প্রেমের জন্ম সম্ভব হয়। সুতরাং হরনাথের মতে, প্রেম-সাধনার অর্থ ভালবাসার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা। ভালবাসার রাজ্যে কোন বিধিনিষেধ নাই, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি এখানে ক্ষমার্হ, ভালবাসা অন্তরে গোপন করাই এখানে সাধনা।

রামকৃষ্ণদেব কামিনী ও কাঞ্চন সম্বন্ধে বারেবারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য একেবারেই অনুচিত। চিত্রপট দর্শন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। সংসারীর পক্ষেও রামকৃষ্ণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, সংসারী মানুষ বিকারের রোগী মাত্র। স্ত্রীলোক তাহার পক্ষে আচার, তেঁতুল, আর বিষয়াসক্তি জলের কলসীর সমতুল্য। বিকারের রোগীর পক্ষে আচার তেঁতুল ও জল যেমন একেবারে নিষিদ্ধ সংসারীর পক্ষে স্ত্রীলোক ও বিষয়াসক্তি তেমনি নিষিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসার কঠিন। যত সেয়ানা হওনা কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।"[১]

সাধনার ক্ষেত্রে হরনাথ কামিনী-কাঞ্চন পরিহারের নির্দেশ দান করেন নাই। তাঁহার মতবাদে সাধনার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার অগ্রগণ্য। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনও সাধনার পরিপন্থী নয়। নারীকে হরনাথ সাধনার সঙ্গিনী করিয়া লইতে

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৮৬

উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, "স্ত্রীভাবশূন্য পথটি অনেকটা নিষ্কটক বটে, তবে মরুভূমির তুল্য ভয়ানক নীরস, সে পথের ধারে ধারে মনোরম পুষ্পোদ্যান নাই মাঝে মাঝে সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপও নাই, সে পথটি একটানা একঘেয়ে রকম, সে পথে পথিক শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে উদ্দেশ্য হারাইবারও সম্ভাবনা। সে পথটি নিষ্কণ্টক বটে, কিন্তু ক্ষুরধার তুল্য, সামান্য এদিক ওদিক হইলেই নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে।"[১] অতএব, পথটি গ্রহণ করিবার পূর্বে আপন শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া পথিকের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। শক্তিহীন জীবের পক্ষে এই পথ অতিশয় কঠিন। শ্রীচৈতন্যদেব ইহা উপলব্ধি করিয়াই নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে সংসারী জীবের অধ্যাত্ম-সাধনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হরনাথ তাই সকলকে নিত্যানন্দ প্রভু-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতী হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এ পথে যাইতে যাইতে যদি কোন কারণে পদস্খলন হয়, তবু তত নিন্দার হইবে না। এ পথের একটি গুণ হারিলে তত লোকসান নাই, কিন্তু জিতিলে খুব বেশী লাভ। অতএব আমাদের মত শক্তিহীন জীবের পক্ষে এ পথটিই ভাল মনে হয়।"[২]

রামকৃষ্ণদেবের মতে, টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। "টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়। সে মানুষ থাকে না।"[৩] হরনাথ টাকাকে বিলক্ষণ উপাধি বলিয়া অভিহিত করেন নাই। কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

অর্থ না থাকিলে জগতে কোন সৎকর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। সুতরাং সৎকর্মের অনুষ্ঠানের জন্যও অর্থ উপার্জন অপরিহার্য। কিন্তু সেই অর্থ সঞ্চয় করা উচিত নয়। হরনাথ সেই অর্থ দ্বারা সৎকর্ম সঞ্চয় করার নির্দেশ দিয়াছেন। "অর্থের সদ্ব্যয় করিতে হইবে। অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রী পরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া পোলাও

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮
২। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১২

খাওয়াই অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে। রাজচক্রবর্তীও যাবার সময় ভিখারীর মত যাইতে বাধ্য হয়। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসে না, যাইবার সময় কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায়, নিয়ে আসে, কেবল ধর্ম। তাই বলি মহাশয়, অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থ দ্বারা সৎকর্ম সঞ্চয় করাই ভাল, তাহা সঙ্গে যাবে।"[১]

এইভাবে অধ্যাত্ম-সাধনায় কামিনী ও কাঞ্চন সম্বন্ধে প্রচলিত বিধিনিষেধ হ্রাস করার ফলে হরনাথের রাজ্যে নারী ও বিষয়ীর অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে। গৃহস্থ জীবনে কামিনী ও কাঞ্চন পরিহার অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। সেজন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। পথের কঠোরতার জন্যই গৃহস্থ মানুষেরা অধ্যাত্ম-সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। অনিচ্ছুক এই পুরুষগণকে অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতী করিবার জন্য হরনাথ নিত্যানন্দ-প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সাধনার পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে নারী ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায় এবং সাধকের অন্তরে প্রেম ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তখন সাধক আপনা হইতেই সাধকের অবশ্যপালনীয় বিধিনিষেধসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া লইতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে ত্যাগ ও আসক্তির পথে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরের প্রেমলাভের জন্য সাধকের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেজন্য সংসার পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই। সংসারের মধ্যে বাস করিয়াই সাধক তখন ত্যাগ ও অনাসক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। হরনাথের মতে, ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগ করার নামই ত্যাগ। মনে মনে ত্যাগ করা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক।[২]

এই বিষয়ে মহারাষ্ট্রের সাধক রামদাসের সহিত হরনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্ময়কর ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শিষ্য শিবাজীকে

১। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫
২। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪

রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দানকালে তিনি হরনাথের মতো ভোগের বস্তুর মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনার উপদেশ দিয়াছেন :

"পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"[১]

রামকৃষ্ণের সহিত এইখানে হরনাথের সমূহ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত সংসারী শিষ্যদিগকে রামকৃষ্ণদেব সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি মনে মনে ত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হরনাথের মতে, এইরূপ মনে মনে ত্যাগ অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক।

রামকৃষ্ণদেবের মতে, ঈশ্বর দর্শন হইলে স্ত্রীলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সেইজন্য রামকৃষ্ণদেবের মতানুসারে ঈশ্বর দর্শনের পূর্বে স্ত্রীলোকের সঙ্গ সযত্নে পরিহার করা বিধেয়। হরনাথের মতে কিন্তু প্রকৃতিরাই কৃষ্ণ দিবার অধিকারিণী; সেইজন্য স্ত্রীলোকের সাহচর্য হরনাথের মতে সাধনায় পরিপন্থী নয়, সাধনার সহায়ক। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের জন্য রামকৃষ্ণদেব ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য হইতেও দূরে থাকিবার জন্য পুরুষ ভক্তদের নির্দেশ দিতেন এবং পুরুষ ভক্তদের নিকট নারী ভক্তদের কথা বলিতেন না। কিন্তু হরনাথের নিকট স্ত্রী-পুরুষের কোন ভেদ ছিল না, সকলেই একত্র সম্মিলিত হইত, একত্র বসিয়া হরনাথের উপদেশ গ্রহণ করিত, উৎসব-অনুষ্ঠানে সকলে মিলিয়া কাজ করিত। হরনাথের বহু পত্রে পুরুষ ভক্তদের নিকট স্ত্রী ভক্তদের কথা এবং নারী ভক্তদের নিকট পুরুষ ভক্তের কথা লিখিত হইয়াছে। এইভাবে নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখা গেলেও, হরনাথ যে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের অভিপ্রায়কেই সিদ্ধ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম ও সন্ন্যাসের জয়গান করিলেও, রামকৃষ্ণদেব সংসারীদের সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। সংসারী জীবের প্রতি তাঁহার কোমল অন্তরে করুণার অভাব ছিল না। তাই সংসারী জীবের জন্যও তিনি ঈশ্বর-সাধনার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং

১। প্রতিনিধি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংসারে থাকিয়া সংসারের বন্ধন, আসক্তি প্রভৃতি অতিক্রম করিবার জন্য তিনি সংসারীদের উপদেশ দিতেন। তাহাদের তিনি বলিতেন, "সংসার একেবারে ত্যাগ করার কি দরকার ?" আসক্তি গেলেই হলো তবে সাধনা চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা। কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান। এক একটি জিনিস ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল, সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেল। সোনার গোট পরলুম। পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে।"[১]

এইভাবে চলিলে সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরলাভ হয় বলিয়া পরমহংসদেব মত প্রকাশ করেন। হরনাথও এইভাবে চলিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলার পথ আরও সহজ এবং সরল হইয়াছে। সংসারী মানুষের মনে অনাসক্তি ও বৈরাগ্য সহজে আসিতে চায় না। সেইজন্য সাধনার প্রথম স্তরে হরনাথ কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন নাই। ঐহিক সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার উপায়স্বরূপে তিনি প্রথমতঃ যে-কোন নাম যেভাবেই হউক না কেন, গ্রহণ করিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। এইভাবে নামের প্রতি আকৃষ্ট হইলে সংসারী মানুষের মনে ধীরে ধীরে প্রেমের সঞ্চার হইবে। প্রেমভাবে হৃদয় উদ্দীপ্ত হইলেই অন্তর প্রশস্ত হয় এবং সেই প্রশস্ত হৃদয়ক্ষেত্রে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম প্রভৃতির বীজ উপ্ত হয়। মানসিক অবস্থার এই পর্যায়ে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মে।

রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরলাভের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই পথে অগ্রসর হইবার জন্য ভক্তসাধকের প্রস্তুতির প্রয়োজন। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অনাসক্তির সাধনা সেই প্রস্তুতির সাধনা। এই সমস্ত সাধনার দ্বারা দেহ-মন শুদ্ধ হইলে, রামকৃষ্ণের মতে, ঈশ্বর-সাধনায় অধিকার জন্মে। হরনাথের মতে, প্রথম হইতেই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য—ঈশ্বরের কৃপালাভ নয়, ঈশ্বরের

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১২০

সেবাধিকার লাভ। সেবকের দেহ ও মন মালিন্য-বর্জিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু না হইলেও ক্ষতি নাই। ঈশ্বর সকলের প্রতি সদাই স্নেহশীল। তিনি অনন্ত করুণার আধার। পার্থিব বিচারের মানদণ্ডে শুচি, অশুচি, সাধু, অসাধু, পুণ্যবান ও পাপাত্মার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাঁহার নিকট সেরূপ কোন ভেদ না থাকারই সম্ভাবনা। থাকিলেও অসাধু, অশুচি, পাপী ও পতিতের জন্য তাঁহার অন্তরে অহেতুক করুণা যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান। তাই তাহারা যদি অপটু বা অনভ্যস্ত হাতে ঈশ্বরের সেবা করিতে অগ্রসর হয়, তবে সেই সেবা ঈশ্বর কর্তৃক গ্রাহ্য না হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং ঈশ্বরের সেবা করিবার পথে কাহারও কোন বাধা নাই। কোনমতে হৃদয়ে একবার ঈশ্বরসেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলেই, হরনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। যে-কোন ভাব লইয়াই ঈশ্বরসেবায় অগ্রসর হইতে পারা যায়। সেবার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিসাধনের ইচ্ছা প্রশমিত করিবে এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিসাধনায় পর্যবসিত হইবে। এই শুভ সূচনাতেই ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি, সংযম প্রভৃতি আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই পর্যায়ে সাধকহৃদয় রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণে কোনরূপে বাধা প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং এই দিক দিয়াও হরনাথ রামকৃষ্ণের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন বলা চলে।

হরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ

রামকৃষ্ণের মতো ভক্তির পথ অনুসরণ করিয়া সাধক বিজয়কৃষ্ণ সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করেন। সাধনার বহু বিচিত্র পন্থা অনুসরণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ অবশেষে ভক্তিপথের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং ঈশ্বরের সাকার মূর্তি উপাসনার মাহাত্ম্য স্থাপন করেন।

শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশের সন্তান বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার সূত্রপাত হয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের সময় হইতে। উপনয়নের পর তিনি নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। কিয়ৎকাল পরে টোলে সংস্কৃত পাঠকালে বেদান্ত আলোচনায় তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে উপবীত পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মাতার কাতর অনুরোধে তিনি পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। তাহার পর ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ধারণা হয় যে, উপবীত জাতিভেদের চিহ্ন। তখন তিনি পুনরায় উপবীত পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ রীতিমত উপাসনাদি করিতে থাকেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবামাত্র মানুষ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবে।

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ ১৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটে বাস করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে তাঁহার গৃহদ্বারে করাঘাতের শব্দ শ্রবণ করিয়া তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে দলবলসহ মহাপ্রভু প্রবেশ করেন। দলের মধ্যে অদ্বৈত আচার্যও ছিলেন। তাঁহার নির্দেশানুযায়ী কূপোদকে স্নান করিয়া আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নাম দিলেন। তিনি চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিগত রাত্রির ঘটনা তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কিন্তু গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর উপবেশন করিবার জন্য তাঁহারই স্বহস্তে পাতা আসন এবং কূপের পার্শ্বে পতিত সিক্ত বসন দেখিয়া তাঁহার সংশয় দূর হইল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয় নাই। তাই

তাঁহার ধারণা হইল যে, তিনি কেমন ব্রাহ্ম তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি স্পিরিট আসিয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনা করিয়া তাঁহার মধ্যে নানা প্রকার অবস্থা প্রকাশিত হইতে লাগিল, অপ্রাকৃত দর্শন, শ্রবণাদিও হইতে লাগিল, কিন্তু কোনটিই স্থায়ী হইত না। সত্যবস্তু প্রকাশ হইলে তাহা আবার যায় কেন, বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে তখন এই সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি তখন সত্যবস্তুর সন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ইহার পর হইতে বিজয়কৃষ্ণ অস্থিরভাবে সত্যবস্তুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'অনেক ঘুরলাম, কোথায় কি আছে প্রত্যক্ষ করতে। কবীরপন্থী, দায়ুদপন্থী, গোরখপন্থী, সুন্দরপন্থী, বাউল দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ করলাম। এক একটি করে তাঁদের প্রণালীমত সাধন করে, কোন্ সম্প্রদায়ের কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হলো না। আমি যাহা চাই, তাহা কোথাও পেলাম না।'[১]

অস্থির হৃদয়ে বিজয়কৃষ্ণ সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং বিন্ধ্যাচল, তিব্বত, হিমালয় প্রভৃতি বহুস্থানে গুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে একদিন তিনি যখন নিদারুণ নৈরাশ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন তখন মানস সরোবরবাসী একজন পরমহংস আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। চৈতন্য হইবার পর পরমহংসকে দেখিতে না পাইয়া তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং রঘুবর বাবাজীর আশ্রম-সন্নিধানে অবস্থিত একটি প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া, আচ্ছন্নের মতো একাদশটি দিবস ও রাত্রি অতিবাহিত করেন। রঘুবর বাবাজী সেই অবস্থায় পরম যত্নে বিজয়কৃষ্ণের দেহটি রক্ষা করেন।

১। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : দ্বিতীয় খণ্ড—১৩৬৭ আষাঢ়, পৃঃ ১০৭

ইতিপূর্বে ত্রৈলঙ্গস্বামীও বিজয়কৃষ্ণকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁহাকে তিনটি মন্ত্র দিয়াছিলেন। এই মন্ত্রত্রয় প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "একটি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্র পূর্বে মাঠাকরুণও আমাকে দিয়াছিলেন। অপরটি সর্বদা জপ করতে ভগবানের নাম। আর একটি আপৎ বিপদে পড়লে জপ করতে বলেন।"[১]

এইভাবে বিভিন্ন পন্থায় সাধন করিয়া এবং একাধিক গুরু-নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ সত্যবস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাহচর্যে আসিয়া তিনি শুদ্ধাভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত এই পথেই তাঁহার সম্মুখে সত্যবস্তু স্বীয় মহিমায় প্রকাশিত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ কিঞ্চিদধিক কুড়ি বৎসরকাল ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সাত-আট বৎসরকাল তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকের কার্যও করেন। আচার্যরূপেও বিজয়কৃষ্ণ কয়েক বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকাকালে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ভক্তিভাবের প্রবর্তন করেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের অবতারত্ব বা চৈতন্যভাব স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকার সময়েই বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ত্রৈলঙ্গস্বামী এবং তৎপরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও, বিজয়কৃষ্ণের সত্যানুসন্ধিৎসা কোন দিনই ব্যাহত হয় নাই। বরং ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার মধ্যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম ধর্মের বিরোধী ভাবসমূহ পরিস্ফুট হইতে থাকে। ঈশ্বরের সাকার মূর্তিপূজার প্রতি প্রবণতা এবং গুরুবাদে নিষ্ঠা অতিশয় স্পষ্ট আকার ধারণ করে। ফলে, বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মমত-বিরোধী ভাব বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করে এবং অবশেষে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করেন। বিজয়-কৃষ্ণের মতো অধ্যাত্ম-সাধনার বিচিত্র পথের পথিকের পক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের নির্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। অপরিমেয়

১। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ: দ্বিতীয় খণ্ড—১৩৬৭ আষাঢ়, পৃঃ ১১০-১১১

সত্যানুসন্ধিৎসাহেতু তিনি নানাবিধ মত ও পথে সাধনা করেন এবং সকল পথেই কিছু-না-কিছু সত্যবস্তু লাভ করা যায়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু সত্যবস্তুকে সহজে লাভ করিবার উপায় যে 'নামসাধনা', ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। সেইজন্য ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দকে যোগসাধন, ব্রহ্মচর্য রক্ষা, দৃষ্টিসাধন প্রভৃতির উপদেশ দিলেও, তিনি নামসাধনের উপরেই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি বলিতেন, "নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধরে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে ভগবানের অনন্ত রাজ্য, অনন্তরূপ, অনন্ত ভাব ও অনন্ত লীলা প্রকাশ পাবে।"[১] বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরের সাকার মূর্তি উপাসনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে, সাকার ও নিরাকার—এই দুই রূপেই পরমেশ্বরের উপাসনা করা যায়। সাকাররূপে তিনি রূপযুক্ত আর নিরাকার-রূপে রূপহীন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"পরম ঈশ্বর ধরে উভয় আকার।
রূপহীন রূপযুক্ত কহি এইবার॥
তাঁহার তৃতীয় রূপ কিন্তু কিছু নাই।
পরব্রহ্ম নিরাকার এ সিদ্ধান্ত তাই॥
চিন্ময় স্বরূপ তাঁরে হেরে ভক্তগণ।
সাকার বলিয়া তাই পরিচিত হন॥
নিরাকার অর্থ ইহা কদাচ না হয়।
স্বরূপ বিগ্রহ তাঁর কিছু নাহি রয়॥"[২]

এইভাবে নিরাকার হইতে সাকারবাদ এবং জ্ঞানমার্গীয় যুক্তিবাদ হইতে ভক্তিবাদের পথে সঞ্চরণ করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ যুগের পক্ষে উপযোগী মত ও পথটিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ অত্যন্ত উদার ছিল। এই ঔদার্যহেতু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সমান্তরালে প্রবাহিত এই ধর্মত্রয় মধ্যে তিনি

১। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১২ : কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
২। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত : বারাণসী—পৌষ, ১৩৬৯, পৃঃ ২৮২—অমিয় কুমার সান্ন্যাল

কোনরূপ ভেদ দেখিতে পাইতেন না। সেজন্য তিনি এমন একটি অভিনব তিলক ধারণ করিতেন, যাহার মধ্যে এই তিন ধর্মের প্রতীকের চিহ্ন বিরাজিত ছিল। এই তিলকটি কোন সম্প্রদায়ের ছিল না। ইহার সম্বন্ধে গৌর শিরোমণি একদিন জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "আমার কোন সম্প্রদায় নাই, এইজন্য মহম্মদের অর্ধচন্দ্র, যীশুখ্রীষ্টের ক্রশ এবং মহাদেবের ত্রিশূল নিয়ে এই এক নূতন রকমের তিলক করছি।"[১]

বিজয়কৃষ্ণের মতে, "খ্রীষ্ট ও কৃষ্ট এক। একটুও ভিন্ন নন। যাঁদের নিকট এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, তাঁরাই ভেদবুদ্ধিতে দেখেন। বস্তুতঃ একই বস্তু, দুই নয়, খ্রীষ্টের ক্রশ, কৃষ্ণের চূড়া ও মহাদেবের ত্রিশূল এই তিনে ওঁকার হয়েছে।"[২] মহম্মদকে তিনি 'খোদার দোস্ত' বলিয়া মনে করিতেন।[৩]

এইভাবে বিজয়কৃষ্ণ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই ধর্মত্রয়ের মধ্যে সমন্বয়ের যোগসূত্রটি রচনা করেন। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে বিজয়কৃষ্ণকেও একজন সমন্বয়-সাধনকারী-রূপে অভিহিত করা যায়। সমন্বয়-সাধনায় রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যেরূপ সাদৃশ্য, সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বৈসাদৃশ্য তাহা অপেক্ষাও বেশী। রামকৃষ্ণের প্রভাবে কেশবচন্দ্র 'কালী' (শক্তি) মানিয়াছিলেন এবং 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন।* কিন্তু Singular man কেশবচন্দ্রের জিজ্ঞাসু ও যুক্তিবাদী মনে ভক্তিভাবের অভাব না থাকিলেও, তাহা কোনদিন বিজয়কৃষ্ণের 'ধুলট' উৎসবের মতো উচ্ছ্বসিত আকার ধারণ করে নাই। অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তি দ্বারা যাচাই করার দিকেই তাঁহার প্রবণতা ছিল বেশী। রামকৃষ্ণদেবের সহিত এইখানে তাঁহার পার্থক্য। রামকৃষ্ণদেব এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একবার বলিয়া-

---

১। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : দ্বিতীয় খণ্ড, পুরীধাম ১৩৬৭ পৃঃ ৭৫ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
২। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬৫, পৃঃ ১৪৬ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
৩। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬৫, পৃঃ ১৬৬ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৩৫

ছিলেন, "যদি এক কথায় বুঝতে পার তো, আমার কাছে এসো আর খুব তর্ক যুক্তি করে যদি বুঝতে চাও তো কেশবের কাছে যাও।"[১]

বিজয়কৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের পার্থক্যও উপরোক্ত রূপ। বিজয়কৃষ্ণ প্রধানতঃ ভক্তিপথের পথিক, কেশবচন্দ্রের মধ্যে শেষজীবনে ভক্তিভাবের প্রাধান্য দেখা গেলেও তিনি প্রধানতঃ যুক্তিবাদী। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও, তাঁহার বংশধারায় যে ভক্তিভাবের স্রোত ওতঃপ্রোতভাবে প্রবহমান ছিল, তাহাই কালক্রমে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে। তাঁহার পূর্বপুরুষ অদ্বৈত আচার্যের মনেও যুক্তিবাদ ও ভক্তিভাব সমান্তরালে প্রবাহিত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভক্তিভাবই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-ভাবনায় অনুরূপ ধারার অনুবর্তন দেখা যায়। সত্যবস্তু অনুসন্ধানের আকুল আগ্রহে তিনি বিভিন্ন মতের অনুসরণ করিয়াছেন, বিভিন্ন পথের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভক্তিপথে 'নামসাধনা'কেই ঈশ্বরলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিভাবের আতিশয্য বিজয়কৃষ্ণের নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধিকে কোনদিন আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তাই তিনি কেশবচন্দ্রের অবতারত্ব স্বীকার করেন নাই বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে 'চৈতন্যভাব'ও দেখিতে পান নাই। হরনাথের সহিত এই বিষয়ে তাঁহার সাদৃশ্য ছিল। বর্গীর আক্রমণ হইতে ভক্ত রাজার রাজধানী বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করিবার জন্য মদনমোহন কর্তৃক কামান দাগার কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিয়াছেন, "ছত্রপতি কমল বিশ্বাসের পূর্বে যুগল বিশ্বাস প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে ভাস্করপণ্ডিত বিষ্ণুপুর অবরোধ করেন। মহারাজাকে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকারের হুকুম প্রচার করিতে দেখিয়া সেনাপতি যুগল বিশ্বাস মহারাজাকে বদ্ধ পাগল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। যুগল বিশ্বাস মহারাজার সহিত মদনমোহনের মন্দিরে হরিসংকীর্তন করিতে গেলেন। কিন্তু গোপনে সৈন্যগণকে

১। উদ্বোধন: ৫৬তম বর্ষ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬১, পৃঃ ৩২৯

গড়ের উপর হইতে কামান দাগিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের গোলায় অস্থির হইয়া ভাস্করপণ্ডিত পলায়ন করেন।”

এই উক্তির মধ্যেই হরনাথের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ ও হরনাথ মূলতঃ বৈষ্ণব ছিলেন। উভয়েই ‘নামগান’ করাকে ঈশ্বর-সাধনার সর্বপ্রধান উপায়রূপে নির্দেশ দিয়াছেন। জীবনাদর্শেও উভয়ে গৃহস্থ ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত উভয়েরই সংস্পর্শ ছিল। বিজয়কৃষ্ণ চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, হরনাথ বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র উভয়েই পাঠ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ শঙ্করদর্শনের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, হরনাথের মনে কোন দর্শনই কিন্তু সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। শঙ্করদর্শন বিজয়কৃষ্ণকে সাময়িকভাবে অদ্বৈতবাদী করিয়া তুলিয়াছিল, হরনাথের ধর্ম্মমত গঠনে কোন দর্শন-শাস্ত্রের এতাদৃশ প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জীবনাদর্শে হরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই গৃহস্থ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মতো তাঁহারা সংসার করিয়াছেন, সংসার প্রতি-পালনের জন্য অর্থোপার্জন করিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ শেষের দিকে সহধর্মিণীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বসবাস করিতে অভিলাষী হন।* যোগমায়া দেবীর আকস্মিক দেহাবসানে তাঁহার সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু হরনাথ কোনদিনই কুসুমকুমারীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বসবাস করিতে অভিলাষ করেন নাই। জীবনাবসানের কিছুকাল পূর্বে হরনাথ কটক হইতে সোনামুখীতে ফিরিয়া আসিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কারণ সাংসারিক গোলযোগ। কুসুমকুমারীকে তিনি কোনদিন সাধনার বিঘ্ন বলিয়া মনে করেন নাই।[১]

অধ্যাত্ম-পিপাসা নিবারণের জন্য বিজয়কৃষ্ণ সাধনার বিভিন্ন পথের পথিক হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে ভক্তিপথে ঈশ্বরের সাকার

* কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩

১। ভাগবত মিত্র—অমিয় হরনাথ-লীলাকথা : প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২৫

মূর্তি উপাসনা ও নামজপের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হরনাথ প্রথম হইতেই নামজপের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি ছিলেন অনুরাগ-পথের পথিক। কলিকাতায় আগমনের পর হইতে বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে অদ্বৈতবাদী এবং পরে ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক এবং আচার্য-পদেও বিজয়কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার প্রচার ও উপদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম বিশেষভাবে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কিন্তু ১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্র সেনের পরলোকগমনের পর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ক্ষীণ হইতে থাকে এবং ১৮৮৭-৮৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার সকল যোগসূত্র ছিন্ন হয়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের সংস্পর্শে আসেন নাই। তিনি আপনার মনে ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বর-সাধনায় কালযাপন করিতেন। ১৮৯০ সালে অবশ্য তিনি স্বামী ভূতানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাহা মাত্র কয়েক দিনের জন্য। সুতরাং সূচনা হইতেই হরনাথের অধ্যাত্ম ভাবনা তাঁহার স্বনির্বাচিত পথে অগ্রসর হইয়াছিল, কোনদিন পথ পরিবর্তন করেন নাই। এই পথে তাঁহার পদক্ষেপের কোন উপলক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ও বিনা উপলক্ষে হরনাথ অধ্যাত্মপথের পথিক হইয়াছিলেন। ইহার জন্য মনে হয় যে, হরনাথ জন্মাবধি ভগবৎ-প্রেমিক।

ধর্মাচার্য হিসাবে বিজয়কৃষ্ণ দীক্ষা দান করিতেন। কিন্তু হরনাথ কোন দিন কাহাকেও দীক্ষা দান করেন নাই। এইজন্য হরনাথকে সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলা চলে। অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করাই প্রবর্তকের কাজ, বিধিমার্গে দীক্ষা দান করা তাঁহার পরবর্তিগণের কার্য। শ্রীচৈতন্যদেবের মতো হরনাথও শুধু স্বীয় জীবনাদর্শের সাহায্যে অপরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বিবিধ পথের পথিক বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-ভাবনাও পরিশেষে চৈতন্য-অনুসৃত পথে পদসঞ্চার করিয়াছিল। তিনি নদীয়ায় 'ধূলট' উৎসবে যোগদান করেন এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। নামসংকীর্তনেও তাঁহার চৈতন্যভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং চৈতন্যদেবের মতো

তিনিও 'নামজপ'কেই ধর্ম-সাধনার উপায় বলিয়া নির্দেশ করেন। তিনি বলিতেন, "যা বলি, তাই করে যাও। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে খুব চেষ্টা কর। নামসাধনের মত এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আমার নিজের জীবনে নামসাধনের ফল পেয়েছি। একবার তেমনভাবে নামসাধন করে দেখ দেখি, কেমন ফল না পাও। প্রথম প্রথম নাম করতে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হয়, কিন্তু তাই বলে ছাড়তে নাই। খুব নাম করে যাও। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করার বড়ই উপকার। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করলে প্রারব্ধ কেটে যায়। তখন ভাল ভাল অবস্থাও লাভ হতে থাকে। প্রারব্ধ ক্ষয়ের এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই।"[১]

এই বিষয়ে হরনাথের সহিত বিজয়কৃষ্ণের সাদৃশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। হরনাথের মতে, যেখানে খুশী, যখন হউক নাম করিলেই হইল। নাম করিবার জন্য কোন নিয়ম নাই। শুচি, অশুচি বিচার নাই। কারণ, নাম নিত্যশুদ্ধ ও পরম মন্ত্রস্বরূপ। তিনি বলিতেন, "হরিনাম যেমন তেমন করে কর, সকলই মনের মত হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। নাম কর। হইতেছে না হইতেছে নিতাই বিচার করিবেন।"[২] সেইজন্য তিনি নির্দেশ দিতেন, "সদাই হরিনামে মত্ত থাক। শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি বলিয়া জগতে কিছুই নাই। যদি থাকে, তাও কৃষ্ণনামের স্পর্শে শুচিতম হয়ে উঠে।"[৩]

ধর্ম-সাধনার আনুষ্ঠানিক দিকটির উপর বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ভাবগ্রাহী জনার্দন। অনুষ্ঠান বা আচারের দ্বারা ঈশ্বরের প্রেমলাভ সম্ভব নয়। হৃদয়ের কুসুমে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেই হৃদয়েশ্বরের প্রীতিবিধান হয়। ভগবান মানুষের বাক্য বা আচরণ দেখেন না, তিনি গ্রহণ করেন হৃদয়ের ভাব। বিশ্বাস না হইলে হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হয় না। সেজন্য তিনি বলিয়াছেন, "নিজের

১। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬
২। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড. পৃঃ ১৮৭
৩। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১

বিশ্বাস না হইলে মন্ত্রাদি লওয়া কেবল সমাজের নিয়মরক্ষা করা। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় ধর্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া ক্রমে শাস্ত্রানুসারে চলিতে চলিতে একটি কিছু ধরিয়া বিশ্বাস করে। নতুবা ভগবান মানবাত্মাতে যে ধর্মভাব দিয়াছেন, তাহাতে স্বাভাবিক বিশ্বাস হইলে চলিতে পারে। শাস্ত্রে অথবা আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বাস না থাকিলে, যদি ধর্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা হয়, তবে পূর্বপুরুষগণ, দেশের প্রসিদ্ধ ধার্মিকগণ, যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই মহাজনদের পথ অনুসরণ করা কর্তব্য।"[১]

সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ কোন নির্দিষ্ট পথের কথা বলেন নাই, যে-কোন একটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে, হৃদয়ে বিশ্বাস আনাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই বিশ্বাস আসিলে তিনি নাম করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ কলিযুগের পক্ষে সহজতম পথটি ধরিতে বলিয়াছেন। নাম সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ কোন নির্দেশ নাই। ভগবানের অনন্ত রূপ, অনন্ত তাঁহার নাম। কখন কোন্ রূপে তিনি কাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন তাহা পূর্বাহ্ণে অনুমান করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পূর্বকল্পিত রূপে আবির্ভূত না হইলেও, ভগবানের প্রতি ভক্তিহীন ভাব পোষণ করা সাধকের কর্তব্য নয়। যে রূপে তিনি প্রকাশিত হইবেন, সেই রূপটিকেই তাঁহার রূপ বলিয়া ধরিয়া লইয়া ভক্তি করিতে হয়। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ কোন রূপেই আবদ্ধ না হইবার উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে, নাম করিতে করিতে ভগবানের অনন্ত রূপের প্রকাশ হইতে থাকে। তাই তিনি বলিয়াছেন, "ভগবানের রূপের অন্ত নাই। কখন কোন্রূপে তিনি কার নিকট প্রকাশ হন কিছুই বলা যায় না। যখন যে রূপেই তিনি প্রকাশ হন না কেন, ভক্তি করবে। কিন্তু কোন রূপেই বদ্ধ হবে না। নাম করতে করতে তাঁর অনন্ত রূপের প্রকাশ হতে থাকে। শুধু একটি রূপ ধরে থাকলে হবে কেন?"[২]

হরনাথও ধর্ম-সাধনার আনুষ্ঠানিক দিকটির উপর কোন গুরুত্ব

১। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১০৬
২। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭

আরোপ করেন নাই। শুধুমাত্র নাম করাকেই তিনি পরম সাধনা বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহার মতে, নাম করা অপেক্ষা মহত্তর তপস্যা আর কিছুই নাই। এই মহাযোগসাধনের জন্য কোন বিধি-নিষেধ নাই, কোন বিশেষ নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "উপদেশ দিতেছি, নাম কর। নাম করা অপেক্ষা মহত্তর যজ্ঞ, মহত্তর তপস্যা, মহত্তর ব্রহ্মচর্য, আর কিছুই নাই। সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া, খেতে শুতে জাগিতে মধুমাখা কৃষ্ণনামটি কর। নাম করিতে আসন প্রাণায়াম, আঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূতশুদ্ধি কিছুই করিতে হয় না। গঙ্গাজল যেমন কোন মন্ত্রেই শুদ্ধ করিতে হয় না, নিত্যশুদ্ধ নাম তাহা অপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এ পবিত্রতা বিষ্ণুপাদস্পর্শের জন্য। অতএব নাম যে গঙ্গা অপেক্ষাও পবিত্রতর সে সম্বন্ধে আর বিচার নাই। অতএব সকল ছেড়ে নামে ডুবে থাক। নামই তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবে, কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না।"[১]

এই সর্বার্থসাধক নামসাধন করিয়াই ভগবৎ-কৃপা লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু সেজন্য নিরভিমান হওয়ার প্রয়োজন। ভগবান অনন্ত করুণার আধার, তিনি পরম প্রেমময়। অভিমান প্রেমের পথের কণ্টকস্বরূপ। সেইজন্য ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে অভিমানশূন্য হইতে হয়। অভিমানশূন্য হইবার উপায় আপনাকে সকলের অপেক্ষা নীচ জ্ঞান করা। এই নীচ জ্ঞান করাকেই শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বর-সাধনার অন্যতম উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিজয়কৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের মতের সমর্থন করিতেন। তিনি তাই বলিতেন, "দীন হীন কাঙ্গাল বলে নিজেকে না বুঝা পর্যন্ত কিছুই ত হবে না। কাঙ্গালকেই দীননাথ দয়া করে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দয়ার পাত্র নয়।"[২]

হরনাথও নিরভিমান হইয়া ভগবৎ-সাধনায় ব্রতী হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, নিরভিমানীই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভগবৎ-

---

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১০৪

২। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৯

প্রেম পাইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি তাই বলিতেন, "আমার নিতাই নীচজনকে বড় ভালবাসেন। নিজকে নীচ জ্ঞানটি যেন চিরস্থায়িরূপে বিরাজ করে। মৃত্তিকা সকল হতে নীচ, তাই সকল প্রকার উচ্চরত্নের জন্মভূমি। যে যত নীচ, প্রভুর নজরে সে ততই উচ্চ। প্রভুর নিকট নীচের আদর বেশী।"[১]

কিন্তু মানুষের পক্ষে অভিমানশূন্য হওয়া অতিশয় কঠিন। বিবিধ প্রকার অভিমান নানা ছদ্মবেশে মানবের হৃদয়-রাজ্যে নিরন্তর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। এইগুলিকে সকল সময়ে চিনিয়া উঠাও দুষ্কর। আবার, দীনতার অভিমানও বৈষ্ণব হৃদয়ে স্থান পাইলে তিনি পথভ্রষ্ট হন।* সেইজন্য হরনাথ অভিমান করিতে বলিতেন, কিন্তু তাহা অপর কাহারও উপর নয়। জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমান করিবার কথা হরনাথ বলিয়াছেন। যাঁহার সহিত গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ, অভিমান করা চলে তাঁহারই উপর। এইভাবে অভিমানের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ দিবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথ মানুষকে ভগবানের সহিত নিবিড় প্রেমের সম্পর্কটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

হরনাথ প্রেমের পথে ভগবৎ-সাধনার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রেমের সম্বন্ধটি অতিশয় মধুর। সেইজন্য প্রেমের ভাব সর্বদাই গোপনে রক্ষা করিতে হয়। বস্তুতঃ, গোপনীয়তাই প্রেমের মাধুর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। হরনাথ সেইজন্য ভক্তকে তাহার ভাবটি সদাসর্বদাই গোপনে রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটি ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন যাকে তাকে দেখাইলে নির্লজ্জা বলিয়া অপবাদ করিতে পারে।"[২]

বিজয়কৃষ্ণও ভক্তির ভাবকে গোপনে রক্ষা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট ভাবটিকে গোপনে রক্ষা করা কর্তব্য। তিনি বলেন, "ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য

১। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-১৪৬

* দ্রঃ ত্রিরত্ন (কবিতা)—কবিশেখর কালিদাস রায়

২। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

তিনজন বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে যাইয়া যুবতী হইলেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য বৃদ্ধই রহিলেন। ভক্তিকে কৃপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সহিত উহার তুলনা করিয়া থাকেন। বালিকা মুক্তদেহে ঘুরিয়া বেড়ায়, যুবতী হইলে স্তন বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। স্বামী ব্যতীত পিতামাতা গুরুজন কেহ তাহা দেখিতে পায় না, ভক্তিও তদ্রূপ। ভগবান ব্যতীত সকলের নিকট সন্তর্পণে গোপনে রক্ষণীয়।"[১]

হরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ উভয়েই ব্রজাঙ্গনার ভাবের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। হরনাথের অধ্যাত্ম-অভিসার প্রেমের পথে। ভগবান পরম প্রেমিক, অনন্ত প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ। সেই অপরিমেয় প্রেমের সায়রে অবগাহন করিবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে যে অভিলাষ জাগে, তাহারই প্রেরণায় ভক্ত সদাসর্বদাই ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হন। প্রেমিকা যেমন প্রিয়তমের প্রীতিবিধানের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন, প্রেমের পথে যাঁহারা ভগবৎ-কৃপা লাভের জন্য অভিসার করেন, তাঁহারাও তেমনি অনুরাগিণী প্রেমিকার মতোই সদাসর্বদা আপনার কার্য, বাক্য ও আচার-আচরণের দ্বারা সেই পরম প্রেমময় পুরুষ ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করেন। ইহাই ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য ভাব। ভগবান তাঁহাদের নিকট প্রেমময় ব্যক্তি-পুরুষ। স্বদেহের নৈবেদ্যে তাঁহারা ভগবানের পূজা করেন, নিভৃতে মানস-দীপ জ্বালিয়া তাঁহারা সেই পরম প্রেমিকের আরতি করেন। এই মাধুর্য ভাবটি হরনাথের অতিশয় প্রিয়। তাই তিনি বলেন, "সত্যই গোপীগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের অন্য কেহ প্রিয় নাই। অতএব তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। আর সেই প্রেমময়ী গোপীগণ যে স্থানে থাকেন তাহার নাম বৃন্দাবন, অতএব বৃন্দাবন অপেক্ষা শান্তিময় ও প্রেমময় স্থান দ্বিতীয় নাই। গোপীদিগের মত প্রেম না হইলে সেই প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে কেহ যাইতে পায় না। সে প্রেম শিখিতে হইলে গোপী-অনুগত হইতে হয়। গোপী-অনুগত হইয়া গোপী-ভজন করিলে তবে সেই পরম দয়াময়ীরা দয়া করে তোমাকে

১। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৭২

আমাকে সেই প্রেম-নিকুঞ্জে ডেকে লন। তখন সকল অভিমান চলিয়া যায়, একমাত্র প্রেম থাকে।"[১]

ব্রজনারীদের এই প্রেমময় ভাবের উচ্চ প্রশংসায় বিজয়কৃষ্ণও মুখর হইয়াছেন। শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মাধুর্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে ব্রজনারীগণ ভগবৎ সাধনা করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকটি ভাবই অতিশয় উচ্চস্তরের। কিন্তু মাধুর্য ভাবের কথা বলিতে বিজয়কৃষ্ণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "দেহ দ্বারা ভগবানের ভজন কত যে মধুর, তা যিনি করেন, তিনিই জানেন। বৃন্দাবনে এসব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্বর্য ভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে একটা সাধন ভজন নিয়ে থাকলেই চিত্তে ঐ সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হইতে থাকে।"[২]

হরনাথের সহিত বিজয়কৃষ্ণের মতবাদে প্রচুর পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিপথে 'নামসাধনা'কেই ঈশ্বর-সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে অভিহিত করিলেও, ব্রহ্মচর্যসাধন, দৃষ্টিসাধন, যোগ-সাধন প্রভৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়ার কথা বলেন নাই। কিন্তু হরনাথের মতে, 'নামসাধন'ই একমাত্র উপায়। তিনি বলেন, "প্রাণায়াম ইত্যাদি নিয়মমত না করিতে পারিলে কষ্টই পাইতে হয়। অতএব তা হতে সুফলের বাসনা করে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না। পাড়ে জাল রেখে দিনরাত জলে ডুবে থাকলেও যেমন মাছ ধরা যায় না, তেমনি নামে বিশ্বাস না রাখিয়া যতই যোগতপ কর, কৃষ্ণ ধরিতে সমর্থ হবে না।"[৩] অপরপক্ষে, বিজয়কৃষ্ণ ধর্মলাভের যে সহজ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণায়াম, ন্যাস, ধর্মগ্রন্থপাঠ প্রভৃতির কথাও বলিয়াছেন। "জীবনটিকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত করতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্তব্য। ভাল না লাগলেও ঔষধ গেলার মত করলে ক্রমে রুচি জন্মে। প্রাতঃকালে উঠে স্নান করে একঘণ্টাকাল প্রাণায়াম ও ন্যাস। পরে

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪
২। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩
৩। উপদেশামৃত : পৃঃ ৬৪

একঘণ্টা ধর্মগ্রন্থপাঠ, তারপর বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের সেবা। নিকটে দুঃখী লোক থাকলে তাহার তত্ত্বাবধান করতে হয়। আহারের পর নিদ্রা যাওয়া ঠিক নয়। দিবানিদ্রায় বুদ্ধিনাশ ও আয়ুক্ষয় হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অধ্যয়ন করতে হয়। অপরাহ্ণে অল্প ভ্রমণ। সন্ধ্যার সময়ে নামগান, প্রাণায়াম ও নামজপ। তৎপরে পরিমিত আহার করে শয়ন করবে। ইহা অভ্যস্ত হলেই সহজে ধর্মলাভ হবে।"[১]

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ ও হরনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সমূহ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ উর্দ্ধরেতা হওয়া অপেক্ষা শ্রদ্ধাভক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "উর্দ্ধরেতা বরং না হওয়া ভাল। উর্দ্ধরেতা হইলেই যে ভগবানকে লাভ করা যায়, তা নয়। একটি লোক দিনে দশবার স্ত্রীসঙ্গ করলেও যদি তেমন শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, ভগবানকে লাভ করতে পারে। উহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একজন উর্দ্ধরেতা হয়েও যদি অহঙ্কারী হয়, তার কিছুই হবে না।"[২]

গৃহস্থগণকে বিজয়কৃষ্ণ বৈধ ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয়ের যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন কঠোর নিষেধাজ্ঞা দান করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "গৃহী ঋতুগামী হবেন। শাস্ত্রব্যবস্থা মত স্ত্রীসঙ্গ করবেন। নেশাবস্তু, উচ্ছিষ্ট ও মাংসাহারে সাধন শক্তিকে একেবারে চেপে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। এ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবেন। ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করবেন না। এমনকি গুরু জিজ্ঞাসা করলেও বলবেন না।"[৩]

এই সমস্ত বিষয়ে হরনাথের সহিত বিজয়কৃষ্ণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হরনাথ নারীকে যে সম্মানের সুউচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণে তাহা দুর্লভ। বিজয়কৃষ্ণের মতে, "সিদ্ধাই হউন, আর মহাসিদ্ধাই হউন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করলেও নারীদেহ কখনও আচার্য হতে পারে না। গুরুর দেহ সর্বদাই পবিত্র, তাঁকে সেবা

১। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৯
২। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯
৩। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭

করে, স্পর্শ করে শিষ্য শুদ্ধ হন। শাস্ত্রকর্তারা কোনও কোনও প্রাকৃতিক অনিবার্য কারণে, স্ত্রী শরীর স্বাভাবিকই অশুচি বলে গেছেন।"[১] সেইজন্য বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদিগকে নারী ভক্তবৃন্দের সহিত অত্যধিক মেলামেশা করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, "স্ত্রী পুরুষ সর্বদাই খুব সাবধানে না থাকলে চলবে না। যেভাবে বর্তমান সময়ে স্ত্রী পুরুষে মেশামেশি দেখা যাচ্ছে তা কিছুকাল চললে শেষে বাউলদের মত ক্রমে নানা প্রকার ব্যভিচার আমাদের ভিতরেও আরম্ভ হবে। এখন হতে সকলেরই খুব সাবধান হয়ে চলা আবশ্যক। এসব বিষয়ে শিথিল হলে বিষম অনর্থ ঘটবে। স্ত্রী পুরুষ কখনও একাসনে বসবে না। এমনকি ভগিনী ও কন্যার সঙ্গেও বসতে সাবধান হবে। চুম্বক ও লোহার যেমন পরস্পর সন্নিকর্ষে মিলন হয়, ঠিক সেইরূপ সহস্র ভাল হলেও স্ত্রী পুরুষ একত্র হওয়া মাত্র একের দেহ অন্যের দেহকে আকর্ষণ করবে। তোমরা ইচ্ছা না করলেও দেহের ধর্মে, দেহের স্বভাবে দেহের গুণে অন্য দেহকে যে আকর্ষণ করবে তা তোমরা কি প্রকারে বাধা দিবে? স্ত্রী ও পুরুষের শরীরে এমন উপাদান আছে তাতে উভয় দেহ নিকটবর্তী হলেই একে অন্যকে চাবে—টানবে। কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন পুরুষের থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদেরও কখনও পুরুষের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়।"[২]

হরনাথের মতে, নারী নিত্যশুদ্ধা, কিছুতেই অপবিত্রা হইতে পারে না। তিনি নারীজাতিকে চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তিরূপে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রকৃতিরূপিণী নারীজাতির কৃপালাভ না করিলে, তাঁহাদের ভাবের ভাবুক না হইতে পারিলে ঈশ্বরের কৃপালাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। নারীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়াই, হরনাথ কখনও স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন নাই। স্ত্রীলোককে তিনি 'প্রেমের গুরু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহাদের কৃপালাভকে ঈশ্বরের কৃপালাভের সোপান বলিয়া মনে করিতেন।

১। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬
২। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ : পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৫০-১৫১

অর্থের প্রতি আসক্তিকে বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রীলোকে আসক্তি অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সম্ভোগের দ্বারা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু অর্থপ্রাপ্তিতে অর্থের প্রতি আসক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন, "আসক্তি সর্বত্রই অনিষ্টকর। তবে স্ত্রীলোকে আসক্তি অপেক্ষাও অর্থে আসক্তি অধিক অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে আসক্তি কমে। এমনিও সহজে কাটান যায়, কিন্তু অর্থে আসক্তি জন্মিলে কাটান সহজ নয়। অর্থ যতই পাও না কেন তৃপ্তি হয় না। যত পাবে ততই আরও পাইতে ইচ্ছা হয়।"[১]

হরনাথ অর্থ-পিপাসাকে যতদূর সম্ভব কম করিতে বলিয়াছেন এবং অর্জিত ধনের সাহায্যে সৎকর্ম সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ-জগতের সমস্ত কিছুই সেই পরমেশ্বরের। অর্জিত যে ধন তাহাও সেই ভগবানেরই। সুতরাং এই ধনকে পরের ধন বলিয়া মনে করিয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিলেই ধনের সার্থক ব্যবহার হয়। তিনি এইরূপ পরের ধনে পোদ্দারি করিতে বলিয়াছেন। "পরের ধনে পোদ্দারি করা বড়ই আনন্দের। এ সংসারে যা কিছু আপনার বলিতেছেন, সে সকল আপনি আনেন নাই, নিয়েও যাবেন না, কেন না এই সকলই পরের ধন। তবে কেন বৃথা আতু পাতু করে খরচ করা? পরের ধন খরচ করিতে আর চিন্তা কেন? মাঝে থেকে 'খোস' নাম নিয়ে যান। নিম্নস্থ কর্মচারিগণকে যিনি আদর করেন তিনিও অফিসার এবং তিনি যত বেতন পান—সেই পদস্থ অন্যজন, যিনি নিম্নস্থগণকে তাড়না করেন, তিনিও সেই বেতন পান। তবে দুজনের মধ্যে লাভবান কে হয় বলুন দেখি? তার যেমন কিছু খরচ করিতে হয় না, শুধু মুখের মিষ্টতা, পরের টাকা দিয়ে বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করা, ইহাতে তার নিজের কিছুই যায় না। মাঝে থেকে, সকলের প্রাণ চুরি করে, তেমনি এ পৃথিবীতে আসিয়া পরের ধন বিলাইয়া ফাঁকে ফাঁকে 'খোস' নাম কেন না লইয়া যাই।"[২]

১। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩
২। পাগল হরনাথ : তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩-১৬৪

হরনাথ ও বিবেকানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের বৃহৎ একটি অংশে বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন ধর্মের প্রচার করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন।– সিমলার বর্ধিষ্ণু দত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং সচ্ছল জীবনযাত্রার মাধ্যমে বিদ্যার্জন ও সঙ্গীত-সাধনায় তাঁহার প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের আকস্মিক তিরোধানে সংসার প্রতিপালনের ভার স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার উপর আসিয়া পড়ায়, তাঁহার বিদ্যার্জন-প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়। ইতিপূর্বে দর্শনশাস্ত্রের নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের মনে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা প্রবল হইয়া উঠে এবং জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার অধ্যাত্ম-পিপাসার নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরের সাক্ষাৎদর্শন লাভের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে প্রশ্ন জাগে, তাহার সদুত্তর লাভের জন্য তিনি বহু সাধু-মহাপুরুষের সাহচর্য করেন, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। অবশেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটও যখন তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইলেন না, তখন নরেন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া পড়েন। এদিকে সুষ্ঠুভাবে সংসার প্রতিপালনের জন্য তিনি কোনরূপ উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। সংসারের নিদারুণ অভাব-অনটন এবং অন্তরের দুরন্ত জিজ্ঞাসায় নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে অস্থির হইয়া উঠেন। ইহারই মধ্যে আপনমনে ভজন গান করিয়া তিনি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেন।

এই অস্থির মানসিক অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের অর্ধোন্মাদ পূজারী রামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত হন। ইহার পর হইতেই তাঁহার অন্তর রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। অবশেষে তিনি যখন রামকৃষ্ণদেবের মুখে শুনিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎলাভ

করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে নরেন্দ্রনাথও ঈশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন, তখন নরেন্দ্রনাথও পরিপূর্ণরূপে রামকৃষ্ণ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। কিন্তু সাংসারিক অনটনের জন্য তিনি পরিপূর্ণরূপে অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতী হইতে পারিলেন না। দারিদ্র্য-পীড়িত জননী এবং ভ্রাতা-ভগিনীর ম্লান মুখগুলি স্মরণ করিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং রামকৃষ্ণকে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য তাঁহার 'মা'কে অনুরোধ করিতে বলিলেন। উত্তরে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেই ভবতারিণীর মন্দিরে প্রেরণ করিলেন। সাংসারিক অভাব-অনটন দূর করিতে প্রার্থনা জানাইবার ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন ভবতারিণীর মন্দিরে উপনীত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, প্রতিমা চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে। সেই চিন্ময়ী প্রতিমাকে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চরণে বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রার্থনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বিবেকবৈরাগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে তিনি ভবতারিণী-সকাশে পুনরায় প্রেরণ করিলেন—সাংসারিক দুর্দশা দূরীকরণের প্রার্থনা জানাইবার জন্য। কিন্তু এবারেও নরেন্দ্রনাথ মাত্র বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করিলেন, তৃতীয়বারেও তিনি সাংসারিক সুবিধার প্রার্থনা জানাইতে পারিলেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছায় এবং জগন্মাতার কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর হইল। নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে তাঁহার নাম হইল "বিবেকানন্দ"। পরমহংসদেবের নিকট ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলেন এবং স্বীয় সাধনায় আপন জীবনে গুরুমুখে শ্রুত সত্যের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সার্বভৌম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের পর বিবেকানন্দ ভারত-পরিক্রমায় বাহির হইলেন। এইরূপ পরিক্রমাকালেই তিনি আমেরিকার শিকাগো নগরীতে ধর্মসম্মেলনের সংবাদ অবগত হইলেন এবং মাদ্রাজ প্রদেশবাসী কতিপয় যুবক শিষ্যের আগ্রহে উক্ত ধর্মসম্মেলনে যোগদান

করিবার জন্য যাত্রা করেন। এই ধর্মসম্মেলনের প্রথম বক্তৃতাতেই বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীর অন্তর জয় করিলেন। অতঃপর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

বিবেকানন্দের ধর্মীয় ভাবনা কর্মযোগের পথে প্রবাহিত হয়। কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশবাসীকে তিনি কর্মযোগের মাধ্যমে ধর্ম-সাধনায় ব্রতী হইতে অনুপ্রাণিত করেন। অবিলম্বে তরুণ ভারত বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য দেশ হইতেও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল তরুণ-তরুণী ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সমস্ত তরুণ প্রাণের কর্মোন্মাদনায় কর্মযোগের মাধ্যমে ধর্ম-সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। তরুণ সন্ন্যাসী দলকে লইয়া বিবেকানন্দ "রামকৃষ্ণ মিশন" গঠন করেন। রোগার্ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত নরনারীর অক্লান্ত সেবায় এই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী দল আত্ম-নিয়োগ করেন। শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টাও বিবেকানন্দের কর্মযোগ-সাধনার অন্যতম অঙ্গ। এইভাবে বহুমুখী প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দের কর্মযোগ প্রবাহিত হইয়া দেশবাসীর অন্তরে ব্যাপক প্রেরণার সঞ্চার করে। সমগ্র ভারত তাঁহার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ হয় ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই। ইহার অব্যবহিত পরেই ধর্মাচার্য হিসাবে হরনাথ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মূল ভাবে ও সুরে বিবেকানন্দের সহিত হরনাথের কোনরূপ বিরোধ থাকিলে, ইহা সম্ভব হইত না। সুতরাং পথ ও জীবনাদর্শে আপাত-বিরোধী ভাব দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ বিবেকানন্দ ও হরনাথের সাধনাদর্শে কোনরূপ বিরোধিতা ছিল না।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সুযোগ্য উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ। ভক্তির পথে রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যে তত্ত্বে তিনি উপনীত হইয়াছিলেন, সেই মহান আদর্শের বিজয়-নিশান বহন করিয়া বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

করেন। রামকৃষ্ণদেবের যে সাধনাদর্শ পঞ্চবটীর ছায়াঘন পরিবেশে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, বিবেকানন্দ তাহাকেই বিশ্ব-মানবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং এক হিসাবে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণলীলার নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ যেমন শ্রীচৈতন্মের বাণী জনসমাজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন, বিবেকানন্দও তেমনি রামকৃষ্ণের বাণী বিশ্ব-জন-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। কার্য এক, কেবল পদ্ধতি বিভিন্ন এবং কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃততর। সুতরাং বিবেকানন্দের মতবাদকে রামকৃষ্ণের মতবাদের বিশ্ব-বিজয়ী সংস্করণ বলা যাইতে পারে। রামকৃষ্ণদেব প্রবর্তক। অনুচর ও অনুসারীবৃন্দের হৃদয় উদ্‌বুদ্ধ করাই প্রবর্তকের কার্য। বিবেকানন্দ প্রচারক—বিশ্ব-জনমানসে রামকৃষ্ণবাণী প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যে কার্যসূচী অবলম্বন করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের আদর্শই তাঁহার অন্তরঙ্গে প্রেরণা যোগাইয়াছে। সুতরাং বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার পূর্বেই বলা যাইতে পারে যে, রামকৃষ্ণের সহিত হরনাথের সাধনাদর্শ ও জীবনাদর্শে যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

বিবেকানন্দের মতে, জীবে প্রেমই পরম ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীব-সেবাকেই তিনি ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে অভিহিত করিয়াছেন। "যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী, সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।"[১]

জগৎকে বাদ দিয়া জগন্নাথের আরাধনা বৃথা, জীবসেবাকে বাদ দিয়া শিবপূজা তাঁহার মতে নিরর্থক। পরম প্রেমিক বিবেকানন্দ তাঁহার ভারত-পরিক্রমাকালে দেখিয়াছিলেন, দিকে দিকে নিরন্নের হাহাকার, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ভারতের অধিকাংশ নরনারী।

১। ভারতে বিবেকানন্দ: রামেশ্বরমন্দিরে বক্তৃতা—চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ : ২৬

উদর পূর্তির জন্য অন্ন যাহাদের জোটে না, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র সংস্থান করিতে যাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, রোগে ঔষধপত্র যাহাদের নিকট মহার্ঘ বিলাসের সামগ্রীর মতো, উচ্চ আদর্শের বাগাড়ম্বর তাহাদের নিকট নিতান্ত হাস্যকর। বিবেকানন্দ তাহাদের অন্তর ধর্মমুখীন করিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বলিয়াছিলেন তাহাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে। ভারতবর্ষে ধর্মসাধকের অভাব নাই, মত এবং পথও অসংখ্য, দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটী। যেদেশে ধর্মের এত প্রাচুর্য, সেদেশে ধর্মের কথা শুনাইবার মানুষের অভাব হয় না, অভাব হয় কর্মযোগীর।

বিবেকানন্দ তাই জীবসেবার মাধ্যমে কর্মযোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন এবং ভক্ত ও অনুসরণকারীদের জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর-সাধনার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে। অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটা সর্বদা স্মরণ রাখিবে।"[১]

হরনাথের আদর্শও জীবে প্রেম। ভালবাসার ক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান-হারে বিস্তৃত করিবার জন্যও হরনাথ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার উপায় হিসাবে তিনি একটি ইংরাজী মহাবাক্য উদ্ধৃত করিতেন—"Charity begins at home." প্রথমে আপনাকে, পরে আপনার পরিবারবর্গকে, তাহার পরে প্রতিবেশীকে ভালবাসিবার প্রয়াস করিলে ভালবাসার ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। ভালবাসার ক্ষেত্র এইভাবে বিস্তৃত করিতে করিতে মানুষ একদিন জগৎ তথা জগন্নাথকে ভালবাসিতে সক্ষম হয়। হরনাথ-জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, জীবসেবার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাল্যজীবনে পশু-পক্ষীদের প্রতি করুণার প্রকাশে

১। ভারতে বিবেকানন্দ : চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩

ইহার সূচনা হয়। পরিণত বয়সে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন অন্নাভাব মোচন করিবার জন্য তাঁহার এই আগ্রহ অভিব্যক্ত হয় নিরন্নদের কর্মসংস্থান দ্বারা অন্নসংস্থানের প্রয়াসে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দরিদ্রদিগকে ঔষধ ও পথ্যদানের ব্যবস্থাও তাঁহার জীবসেবার অন্যতম উদাহরণ। মূল্যবৃদ্ধিহেতু দরিদ্রগণের পক্ষে পরিধেয় বস্ত্রসংস্থান সমস্যার আকার ধারণ করিলে, হরনাথ সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মোৎসব এবং 'আনন্দ-মিলন' উৎসবে বহু-সংখ্যক দীন-দরিদ্রকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। বিবেকানন্দের বিরাট আয়োজনের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও, জীবসেবার প্রতি হরনাথের যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, এই সমস্ত কার্যাবলীই তাহার স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়।

বিবেকানন্দের ধর্ম-সাধনা কর্মযোগের সুকঠোর পথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার জীবে প্রেম, সেবাব্রতরূপ কর্মযোগের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দকে তাই তিনি কর্ম-সাধনার পথে ধর্ম-সাধনার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীন কালে বড় বড় কার্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইতেই পারে না, তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না। পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে, অতএব অগ্রসর হও এবং মহত্তর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য।"[১]

কর্মযোগের পথ বড় কঠিন। এই পথের পথিকের পক্ষে বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতির জন্য বিবেকানন্দ চরিত্র-গঠনকেই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়রূপে অভিহিত করিয়াছেন। দেশের কাজ, আত্মোন্নতি, ধর্ম-সাধনা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই দৃঢ়নিষ্ঠ চরিত্রের প্রয়োজন। নিষ্কলুষ চরিত্রের মতো অপর কোনও শক্তির মানুষকে যথার্থ যোগ্যতা-

১। ভারতে বিবেকানন্দ : চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ ১৪৪

দানের সামর্থ্য নাই। স্বামীজী তাই বলিতেন, "চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।"[১]

আদর্শ চরিত্র গঠনের জন্য স্বামীজী যে গুণটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন, তাহা শ্রদ্ধাশীলতা। প্রথমতঃ, সম্মানী ব্যক্তির (পিতামাতা, গুরুজন প্রভৃতির) উপর আস্থাস্থাপন ; দ্বিতীয়তঃ, আত্ম-বিশ্বাস অর্থাৎ আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা। বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি চাই এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক। এই আত্মবিশ্বাস, আর এই বিশ্বাস উপার্জনস্বরূপ মহৎ কার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে * * * ধীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।"[২]

চরিত্র-গঠনের জন্য বিবেকানন্দ-নির্দিষ্ট এই যে পদ্ধতি, হরনাথের উপদেশের মধ্যেও ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। হরনাথের মতে, পিতামাতাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে হয়, নতুবা ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয় না। জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী জননীর প্রতি যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, ঈশ্বরের সহিত পিতা বা মাতার সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরসেবার প্রথম পাঠ পিতামাতার সেবা। এই প্রথম পাঠ ভালভাবে আয়ত্ত না হইলে, পরবর্তী পাঠসমূহে অধিকার জন্মে না। সেইজন্য হরনাথ বলিয়াছেন, "পিতামাতাকে মনুষ্য দেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে। যদি কেহ চর্মচক্ষে ঈশ্বরকে in flesh and blood দেখিতে চান, তিনি মা বাপকে দেখুন। Entrance Examination Pass না হলে কেহ কখনও Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতামাতার সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে College-এ থাকার ইচ্ছা বাতুলের কর্ম।"[৩]

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নররূপী দেবতা মনে করিবে, তাঁহাদিগকে সেবা বাক্য

১। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—বাংলার বিবেকানন্দ : পৃঃ ৫৭
২। ভারতে বিবেকানন্দ : চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৯
৩। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩

প্রভৃতি দ্বারা সর্বদাই তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহারা আনন্দিত হইয়া তোমায় বরদান করিবেন।"[১]

বিবেকানন্দের মতো হরনাথও সর্বদাই আপনার উপর বিশ্বাস রাখিতে বলিয়াছেন। মানুষের মনে সদাসর্বদাই হীনমন্যতা থাকিলে সে আপনাকে পাপী মনে করিয়া সঙ্কুচিত হয়। আত্ম-সঙ্কোচের এই নীতি ধীরে ধীরে আত্ম-বিস্মৃতির পথ প্রশস্ত করে। এই আত্ম-বিস্মৃতিই তখন তাহাকে আত্ম-শক্তিতে অবিশ্বাসী করিয়া তুলে। মানুষ তখন ভুলিয়া যায় যে, সে অমৃতের পুত্র, পরম পবিত্র ঈশ্বরের অংশ, তাহার হৃদয়ের সিংহাসনে হৃষীকেশ সমাসীন। এই আত্ম-বিস্মৃতি বিদূরিত হইলেই মানুষ আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং আপনার উপর শ্রদ্ধাশীল হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে সে দুর্বলই হয়। তাই, আপনার সম্বন্ধে হীনমন্যতা দূর করিয়া আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবার জন্য তিনি উপদেশ দান করিতেন। বিবেকানন্দও সকলকে আপনার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হইবার উপদেশ দিতেন। নচিকেতার কাহিনীর উল্লেখ করিয়া তিনি সকলকে নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান হইবার উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহারা শারীরিক বলে বিশ্বাসী, আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও, তাহা হইলে ফল আরও অদ্ভুত হইবে।"[২]

আপনার সম্বন্ধে হীনমন্যতাবোধ দূর করিবার জন্য হরনাথও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কদাচ আপনাকে ঘৃণিত পাতকী মনে করিও না। যাহারা কৃষ্ণ নাম লইয়াছে, পাপ তাহাদের নিকট যাইতে ভয় পায়। একবার মাত্র কৃষ্ণনাম লইলে সুদর্শনচক্র সদাই তাহার চারিদিক রক্ষা করেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করেন।"[৩]

১। পাগল হরনাথ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৭
২। ভারতে বিবেকানন্দ : চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৮
৩। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬২

এই মাভৈঃ মন্ত্র মানুষের অন্তর হইতে হীনমন্যতাবোধ দূর করিয়া আপনার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল করিবার পক্ষে যথেষ্ট। বিবেকানন্দ আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আত্ম-বিশ্বাসী হইবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। হরনাথ তাহার উপায় বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং হরনাথ বিবেকানন্দের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

সন্ন্যাসী হইলেও বিবেকানন্দ নারীজাতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রামকৃষ্ণের মতো তাঁহারও চক্ষে নারী মহাশক্তির অংশরূপে প্রতিভাত হইত। তাঁহার মতে, নারীর অনাদর অকল্যাণের সম্ভাবনা বহন করিয়া আনে, নারী পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠালাভ না করিলে, দেশ বা জাতির উন্নতি সম্ভব হয় না। বিশ্ব-পরিক্রমার ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সেই দেশ, সেই জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালেও পারিবে না।"

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের অবনতির কারণ নারীশক্তির অনাদর ও অবমাননা। পুরুষের মতো নারীও সমাজের অর্ধাঙ্গ। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য ভারতবাসী তাহার সমাজ-জীবনের অর্ধেক অংশকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। তাই জীর্ণভিত্তি অচলায়তনের মতো ভারতের সমাজ। অথচ উপনিষদের যুগে যখন নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল, সেই সময় ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু দর্শনের ফলে বিবেকানন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।"[১]

হরনাথের অন্তর নারীজাতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল। নারীকে তিনি মহাপ্রকৃতির অংশ বলিয়া মনে করিতেন। "জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তিশালিনী মহাপ্রকৃতির এক

১। উদ্বোধন : ৫৬তম বর্ষ—ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬১, পৃঃ ৩২৯

একটি মূর্তি।"[১] হরনাথের মতে, এই মহাশক্তির সহায়তা ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়। ঈশ্বর-সাধনার ক্ষেত্রে হরনাথ তাই নারীকে অপরিহার্য সহায়রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। কারণ, হরনাথের মতে, "কৃষ্ণ দিবার তাঁরাই অধিকারিণী—তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া করিতে পারেন না। কৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁদের বশ।"[২] হরনাথের মতে, স্বভাব-কোমলা নারীজাতি মহাশক্তিশালিনী, তাঁহাদের অপরিসীম শক্তির নিকট স্বয়ং ভগবানও অসহায়। হরনাথ সশ্রদ্ধবিস্ময়ে এই মহাশক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই, নারীজাতির প্রশস্তিগানে মুখর হইয়াছেন, "রাসে তোমরা, কুঞ্জলীলাতে তোমরা, যমুনা-জলকেলিতে তোমরা, গোষ্ঠে তোমরা, পুলিন-বিহারে তোমরা, কাঁধে চাপিতে তোমরা, পায়ে ধরাইতে তোমরা, তোমরাই এ রাজ্যের রাজা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী, কৃষ্ণকে দ্বারবান রাখিতে কেবল তোমরাই পারিয়াছ। যে কৃষ্ণকে ধ্যানধারণা ইত্যাদি দ্বারা মহা মহাযোগিগণও ধরিতে পারে নাই, সেই কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধতে কেবল তোমরাই পার।[৩]

এই মহাশক্তিশালিনী নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধামনোভাব পোষণ করিবার জন্য এবং সর্বদা ইঁহাদের প্রীতিবিধানের জন্য সচেষ্ট থাকিতে হরনাথ তাই নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ, ইঁহারা তুষ্ট থাকিলে ঈশ্বরপ্রেম লাভের পথ প্রশস্ত হয়। সুতরাং নারীজাতির সহিত ব্যবহারে হরনাথ অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সকলেই বশীভূত হয়। নারী-জাতিও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। তাই হরনাথ নিরন্তর ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধামনোভাব পোষণ করিতে এবং ইঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য যত্নবান হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইঁহারা প্রসন্ন হইলে দেবতারাও প্রসন্ন হন। তিনি বলিয়াছেন, "এই জগতের সকল স্ত্রীলোককেই

১। পাগল হরনাথ: প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩
২। পাগল হরনাথ: তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৫
৩। উপদেশামৃত, পৃঃ ১৬-১৭

মনে প্রাণে আদর করিলে কখনও না কখনও কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কখনও স্থির থাকিয়া জয়লাভ করিতে পারে নাই।"[১] স্বামী বিবেকানন্দ নারীজাতিকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষী ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি বলিতেন :—

যেখানে নারী পূজা পান, সেখানে দেবতাগণ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেখানে নারীর সম্মান নাই, সেখানে সকল কাজই নিষ্ফল।

হরনাথের মতে, "নারী নিত্যশুদ্ধা.. কিছুতেই অপবিত্রা হইতে পারেন না।"[২] নারীর দুইটি রূপ—একটি অমৃতময়ী, অপরটি গরলরূপিণী। দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচি অনুসারে একই নারী বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। হরনাথ এই তথ্যটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "গরলই সুধা, আবার গরলই প্রাণনাশ করিবার ঔষধ। শক্তি প্রাণনাশিনী ও প্রাণতোষিণী —উভয়রূপিণী। যে, যে ভাবে এই মহাশক্তিকে দেখে, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দেখা দেন।"[৩] হরনাথের মতে, নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই পতনের কারণ। নারীকে ভোগের বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিলে, নারীর কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু প্রেমানন্দময় রাজ্য হইতে ব্যবহারকারী চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হন। ভ্রান্ত জীব ইহা বুঝিতে পারে না। হরনাথ প্রকৃতিমাত্রকেই প্রণম্যা বলিয়া মনে করেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা দ্বারা যেমন গুরুকৃপা লাভ করা যায়, সেইভাবে প্রকৃতির কৃপালাভ করিতে পারিলে কৃষ্ণকৃপা লাভের পথে সকল বাধা অপসারিত হয়। তাই, হরনাথ ইহাদের কৃপালাভের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করেন। "এখন প্রার্থনা, যেন আপনাদের দয়া না হারাই। আমি যেন সদাই আপনাদের পরম প্রেমময়ী, দয়াময়ী মূর্তি দেখিতে পাই। আপনাদের ভয়ে সদাই

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৭
২। পাগল হরনাথ : তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১১৫
৩। পাগল হরনাথ : প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭

জড় সড়, আর ভয় দেখাইবেন না, সদাই শিশুজ্ঞানে দয়ার নেত্রে দেখিবেন, এইমাত্র প্রার্থনা।"[১]

নারীজাতির উন্নতির আদর্শ সম্বন্ধে হরনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। ভারতের নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি উভয়েই কামনা করিতেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারীজাতিকে অধিকার দান করিবার স্বপক্ষে বিবেকানন্দ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য আদর্শে ভারতের নারীজাতিকে শিক্ষাদান করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি ভারতীয় নারীকে সীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতীয় রমণীর যেরূপ হওয়া উচিত, সীতাই তাহার আদর্শ। মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ংশুদ্ধা হইতে শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ, নিত্যসাধ্বী, নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা এবং আদর্শ পত্নী। সীতাকে তিনি নরলোকের, এমনকি দেবলোকেরও আদর্শীভূতা বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি বলিতেন, "সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতা চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।"[২]

লেখাপড়া শিখিলে মেয়েরা সংসারের কাজ করিতে চায় না। জননীও স্নেহপরবশ হইয়া তাহাদের কর্মবিমুখতাকে প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন। ফলে, তাহারা সংসারের কাজ শিখিবার কোন সুযোগ পায় না। সংসারের খুঁটিনাটি কার্যগুলি সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞতা তাহাদের পরবর্তী জীবনে অভিশাপ হইয়া উঠে।

১। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫
২। ভারতে বিবেকানন্দ : চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ ২৪৪-৪৫

অধীত বিদ্যার সাহায্যে সংসার-পরিচালনা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতি পদে নারী কষ্ট পায় এবং স্বামীর সংসারে সমালোচনার পাত্রী ও অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। হরনাথ এইজন্য বেশী লেখাপড়া শেখা অপেক্ষা সংসারের কাজকর্ম শিখিবার উপর বেশী জোর দিতেন। তিনি হিন্দু নারীকে আদর্শ গৃহস্থবধূ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সম্ভবতঃ, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অনুপ্রবেশ তিনি অনুমোদন করিতেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্ত্রীলোকদের সংসারের কর্মে অনভিজ্ঞতা বা অনিচ্ছা দেখিয়া তিনি বিরক্তিবোধ করিতেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করিবার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিতেন। ভারতীয় নারীকে তিনি মহিমময়ী মাতৃমূর্তিকে দেখিতে চাহিতেন। বিবাহিতা কন্যার জন্য ঈশ্বরসকাশে তিনি প্রার্থনা করিতেন—"তাহাকে তিনি যেন চিরসুখে ও চির-শান্তিতে সংসার করিতে দেন, যেমন গরীবের মা-বাবা হয়, জগজ্জননী হয়ে সকলকে অন্নদান ও স্নেহদান করে।"[১]

অর্থ ও সম্পদ সম্বন্ধে হরনাথ ও বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ অর্থের প্রতি আসক্তি রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমরা নিজের মনে করো না, আপনাকে ভগবানের ভাণ্ডারী বলে মনে করো। তার প্রতি আসক্তি রেখো না। নাম যশ, টাকা কড়ি, সব যাক্—এসবতো ভয়ানক বন্ধনস্বরূপ। স্বাধীনতার অপূর্ব মুক্তবায়ু সম্ভোগ কর।"[২] অর্থ ও সম্পদ সম্বন্ধে হরনাথের উপদেশেও বিবেকানন্দের উপদেশের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "ধন মান কেহ সঙ্গে করে আনে না, এ কাহারও নিজের চিরসত্বও নয়। এক মহাজনের সকল পুত্রই ভাণ্ডারী হইতে পারে না ; পিতা যাকে সমদৃষ্টি ও সরলস্বভাব দেখেন, তাকেই ভাণ্ডারীর কার্যে নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য সকলকে তাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইবার আদেশ করেন। জগৎপিতাও তেমনি সকলকে বড়লোক করেন

১। তমালিনী দত্তকে লিখিত পত্র—সংগৃহীত পত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ৪৯
২। দেববাণী—নবম সংস্করণ, ১৩৭০, পৃঃ ১৩৫

না, কাহাকেও বিশ্বস্ত বাছিয়া ভাণ্ডারের ভার দেন, আর অপরাপর সকলকে তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতে বলেন। ভাণ্ডারীগণ নিজ নিজ কর্তব্য পালন না করিলে, বাবা ভাণ্ডারীগিরি কাড়িয়া লইয়া অন্যের হাতে দেন। এইজন্যই সতর্কভাবে পিতার আদেশ পালন না করিলে চিরদিন বড় থাকা যায় না।"[১]

ভক্তবৃন্দকে হরনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "যাহাকে পাইবে, বলিয়া দিও—যেন আপন আপন পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া তাহারা নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া প্রেমের হরিকে প্রাণ খুলিয়া ডাকে, নরক আমার পক্ষে ভয়ের স্থান নয়।"[২]

চিন্তায় ও আদর্শে সাদৃশ্য সত্ত্বেও বিবেকানন্দের সহিত হরনাথের পার্থক্য ছিল। বিবেকানন্দের সহিত হরনাথের প্রথম পার্থক্য জীবনাদর্শে। বিবেকানন্দ ছিলেন চিরকুমার আজীবন ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী। অপরপক্ষে, হরনাথ ছিলেন গৃহী, তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

ধর্মীয় ভাবনাতেও বিবেকানন্দের সহিত হরনাথের পার্থক্যের ভেদরেখা সুস্পষ্ট। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিবেকানন্দ প্রধানতঃ জ্ঞানের পথে ভগবানের সন্ধান করিয়াছিলেন, প্রবল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা তাঁহার অন্তরে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তাড়নায় তিনি ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন, পরিশেষে রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন। আচার্যভাবে তিনি ভক্তিপথেরই জয়গান গাহিয়াছেন এবং ভক্তিপথকেই সহজতম পথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর জিনিস। তোমরা নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে, ততই জগৎকে বিভিন্ন ভাবে—কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে সম্ভোগ করতে পারবে। নিজের প্রকৃতিটাকে আগে ঠিক কর। তারপর সেই প্রকৃতি অনুযায়ী পথ অবলম্বন করে তাতে

১। পাগল হরনাথ : চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৩৫-৩৬
২। পাগল হরনাথ : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৩

লেগে পড়ে থাকো। প্রবর্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই একটা ভাবে দৃঢ় হওয়ার একমাত্র উপায়, কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাকে এবং ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তবে ঐ নিষ্ঠাই তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে।"[১]

হরনাথও ভক্তিপথের জয়গান গাহিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব পথ প্রেমের পথ। তিনিও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের শুষ্ক মরুপথের পথিক হন নাই। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি প্রেমভক্তির পথে ভগবানের প্রেমলাভের সাধনা করিয়াছেন। যুগে প্রেমকে উপজীব্য করিয়া বৈষ্ণব মহাজন ও সাধক কবিগণ অপার্থিব যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে অমর আদর্শের জয়গান করিয়াছেন, সেই আদর্শের উর্ধপথ বাহিয়াই হরনাথের অধ্যাত্ম-অভিসার। তাই রাধাকৃষ্ণ নাম লইবার জন্য ভক্তবৃন্দকে তিনি বারে বারে নির্দেশ দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণলীলাগীতি আস্বাদন করিতে চিরদিন আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনা জীবনের উদ্দেশ্যরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

বিবেকানন্দের মতে, ঈশ্বর পরম প্রেমস্বরূপ। তিনি সর্বদা সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, অনাদি অনন্ত ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালীর অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা হইবে না—তাঁহার এ অভিপ্রায় নহে। লোকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার দিকে চলিয়াছে। পতির পরম অনুরাগিণী রমণী জানে না যে, তাহার পতির মধ্যে সেই মহা আকর্ষণশক্তি রহিয়াছে; তাহাই তাহাকে তাহার স্বামীর দিকে টানিতেছে। আমাদের উপাস্য কেবল এই প্রেমের ঈশ্বর।"[২]

হরনাথের মতেও ঈশ্বর পরম প্রেমময়। তিনিই জীবের প্রাণ-বল্লভ। অনুরাগিণী পত্নীর মতো জীব তাঁহার উদ্দেশে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। প্রেমের পথ আনন্দের পথ। এ-পথে কোন ভয় নাই,

১। দেববাণী: নবম সংস্করণ ১৩৭০, পৃঃ ৪১
। পাগল হরনাথ: চতুর্থ ভাগ—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৫৯

কোনরূপ চিন্তা নাই। হরনাথ তাই বলিয়াছেন, "তোমার প্রাণবল্লভ যেমন প্রেমময়, তেমনি রসময় ও দয়াময়, কোন রকম চিন্তা বা ভয় করিও না, মনের আনন্দে ভাল সাজে সেজে বন্ধুর নিকট চল, বড়ই আদর করিবেন সন্দেহ নাই। তার মত আদর করিতে কেহই জানে না। তার আদর পেলে আর অন্যের আদর মনে লাগে না, জীব কুল হারাইয়া কুলটা হয়।"

বিবেকানন্দের মতে, ব্রহ্মস্বরূপিণী এই মহাশক্তি অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপিণী এবং জগতের সকল শক্তির সমষ্টিস্বরূপিণী। পরিদৃশ্যমান জগৎ এই মহাশক্তির বিকাশ মাত্র। সেই জগজ্জননীর চরণে পরিপূর্ণ-রূপে আত্ম-সমর্পণই দক্ষিণাচারী শক্তিসাধনার মূল কথা। স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-সাধনা এই পথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। শিশুর মতো পরম নির্ভরতায় জগন্মাতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। শিশু যেমন তাহার মাতাকে সর্বশক্তিমতী বলিয়া মনে করে, তেমনি জগন্মাতার অনন্ত শক্তিমত্তায় তাঁহার এমন ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি তাঁহার নিকট জগজ্জননীর মহাশক্তির এক-একটি বিন্দু বা কণারূপে প্রতিভাত হইতেন। পার্থিব জননীতে তিনি সেই মহাশক্তির এক কণার প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার উপাসনাকে মহত্বলাভের উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং জগজ্জননীর উপাসনাকে পরম জ্ঞান ও আনন্দলাভের উপায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ মাতৃরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার নির্দেশ দান করিলেও, বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতির প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন না। বরং বৈষ্ণবের ইষ্টদেবতা কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাকাহিনী সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি বৈষ্ণব সাধনা সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধামনোভাবেরই পরিচয় দান করে। কৃষ্ণকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি রাধার যে প্রেম, সেই প্রেমোন্মাদনাকেই বিবেকানন্দ ঈশ্বরলাভের উপায়রূপে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের মহান ভাবরাজি

বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ঈশ্বরপ্রেমের যথার্থ অভিব্যক্তি বলিয়া তিনি ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

হৃদয়ে গভীর কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে, রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিয়া আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আরাধ্য দেবতার চরণে ঐকান্তিক আত্ম-নিবেদন, সর্ব্বস্ব-সমর্পণ এবং নিষ্কাম ভালবাসা রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতির উপজীব্য বিষয়। এই সমস্ত মহাভাবের প্রতি স্বামীজীর ন্যায় মহাযোগী যে অন্তরে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি আচার্য-জীবনে তিনি জনসাধারণের পক্ষে রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব নয়। ইহার কারণ, দেশবাসীর মানসিকতায় রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতিকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতার অভাব তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের কাম্য ছিল ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন। এই মহাব্রতকে উদযাপন করিবার পথে তিনি যে সমস্ত বাধা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান দেশবাসীর অনুন্নত নৈতিক মান। তাহারা ধর্ম-সাধনার নামে কতকগুলি আচার-সর্বস্ব অনুষ্ঠান করিত; স্বামীজীর ভাষায়, 'আসল ছাড়িয়া ছোবড় লইয়া মাতামাতি করিত।' শ্রদ্ধার অভাবেই তাহাদের নৈতিক মানের অবনতি হইয়াছিল, স্বামীজী ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

স্বামীজি তাই প্রথমেই দেশবাসীর অন্তরকে শ্রদ্ধাবোধে উদ্বু[দ্ধ] করিতে চাহিয়াছিলেন। এই শ্রদ্ধাবোধ না জাগিলে ধর্মের মূ[ল] উদ্দেশ্য উপলব্ধি অসম্ভব, রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর উচ্চ আদর্শে[র] যথার্থ মূল্যায়নও সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ[্য] করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাহীন জাতির অন্তরে উচ্চ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা[র] একান্তই অভাব। মহৎ ও উচ্চাদর্শে পরিপূর্ণ যাহা-কিছু, তাহা লঘুভাবে গ্রহণ করিবার একটা সর্বনাশা প্রবণতা জাতিকে অধঃপতনে[র] পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি

১। দ্রঃ ভারতে বিবেকানন্দ: চতুর্দশ সংস্করণ, পৃঃ ২৪৭

মহান ভাবাদর্শ গ্রহণ করিবার মতো উচ্চ মানসিকতার ঐকান্তিক অভাবরে জন্য জাতির অন্তর ইহার লঘু দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফলে, দেশের জনমানস কোমল রোমান্টিক ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিষ্ক্রিয়তা ও কাপুরুষতা জাতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল। এই সর্ব্বনাশ অবক্ষয় হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

শাক্ত হইলেও, বিবেকানন্দের কৃষ্ণভক্তির অভাব ছিল না এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতির প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না। তৎসত্ত্বেও হরনাথের সহিত তাঁহার পার্থক্যের ভেদরেখা অস্পষ্ট হয় নাই। বরং ব্যতিক্রম দ্বারা যেমন নিয়মসিদ্ধ হয়, তেমনি কৃষ্ণপ্রীতির পটভূমিকাতেই বিবেকানন্দের সহিত হরনাথের পার্থক্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—আধ্যাত্মিকতার পটভূমিকায় ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন। সমাজক্ষেত্রে ও জাতির মানসিকতায় যে সমস্ত কুসংস্কার ভারতের উন্নতির পথে অন্তরায় ছিল, সেইগুলি অপসারিত করিতে বিবেকানন্দ সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। জীবসেবার মাধ্যমে শিবপূজার নির্দেশ দান করিয়া, তিনি জাতির অন্তরে কর্মযোগের প্রেরণা দান করেন। সেজন্য তিনি পঞ্চাশ বৎসর বাদ দিতেও পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাকে প্রাধান্য দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। সুতরাং ধর্মাচার্য ছাড়াও, সমাজ-সংস্কারক ও দেশাত্মবোধ জাগরণের পুরোহিতরূপে বিবেকানন্দের আরও দুইটি ভূমিকা ছিল। তিনি দেশবাসীর অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন—ইহাই ছিল তাঁহার ধর্মসাধনার আদর্শ। অপরদিকে হরনাথ ভক্তবৃন্দের অন্তর মাধুর্যরসে পরিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বহুমুখী ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহার একমাত্র ভূমিকা ছিল—গৃহস্থ জীবনে ধর্ম-সাধনার আদর্শস্থাপন। এইখানেই বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার মূলগত পার্থক্য।